।। পূর্ণ পরমাত্মনে নমঃ।।



জ্ঞান গঙ্গা



-ঃ প্রচার প্রসার সমিতি ঃ-

সসতলোক আশ্রম, হিসার- টোহানা রোড, বরবালা
জেলা- হিসার (হরিয়ানা)।



"জগতগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল জী মহারাজের সৎসংঙ্গের সংগ্রহ দূর্লভ পুস্তক"

"জ্ঞান গঙ্গা"

-ঃ প্রকাশক ঃ-

-ঃ প্রচার প্রসার সমিতি ঃ-
সতলোক আশ্রম হিসার- টোহানা রোড, বরবালা
জেলা হিসার (হরিয়ানা)ভ

ধর্মার্থ মূল্য কেবল **₹15/-**

"ভক্তি সৌদাগারের সংবাদ পুস্তকের বিকল্প "জ্ঞান গঙ্গা"
অনুবাদক — **সরস্বতী মজুমদার**

সতলোক আশ্রম

সতলোক আশ্রম, হিসার- টোহানা রোড, জেলা - হিসার
(হরিয়ানা)

☎ 9992600801, 9992600802, 9992600803, 9992600804, 9992600806, 9812166044, 9812151088, 9812026821

Visit us at : www.jagatgururampalji.org

e-mail : jagatgururampalji@yahoo.com.

-ঃ বিষয় সূচী ঃ-

ভূমিকা

অনাদি কাল থেকেই মানুষ পরম শান্তি, সুখ ও অমৃতের খোঁজে লেগেই রয়েছে। প্রত্যেকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেই চলেছে, কিন্তু তাদের এই ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হচ্ছে না বা হবেও না। কারণ হল, তাদের মনের সকল ইচ্ছা কোন পথে প্রাপ্ত হবে, সে পূর্ণ জ্ঞান জানা নেই। সমস্ত প্রাণী চায়, যাতে কোনো কাজ করতে না হয়, খাওয়ার জন্য সুখাদ্য পাওয়া চাই, পরনের জন্য সুন্দর বস্ত্র মেলে, থাকার জন্য আলিশান বাংলা, ঘোরার জন্য সুন্দর পার্ক, মনোরঞ্জনের জন্য মধুর মধুর সঙ্গীত, গান, নৃত্য খেলা, মোজমস্তি আনন্দ করা, এবং কোনোদিন অসুখে না পরা, বৃদ্ধ না হওয়া, মৃত্যুও না হয়, বিপদ আপদও না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যে সংসারে আমরা রয়েছি, সেস্থানে এ হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এইলোক **নাশবান,** আর এখানকার সব বস্তুই **নাশবান**। এই লোকের রাজা হল "ব্রহ্ম কাল" যে এক লক্ষ মানবের সুক্ষ শরীর খায়। কাল ব্রহ্ম সব প্রাণীকে কর্ম-ভর্ম ও পাপ-পুন্য রূপী জালে উলঝিয়ে, তিনলোকের খাঁচায় বন্ধ করে রেখেছে। পরমাত্মা কবীর বলেন যে—

কবীর, "তিন লোক পিঞ্জরা ভয়া, পাপ পুন্য দো জাল
সব জীব ভোজন ভয়ে, এক খানেবালা কাল।।"

গরীব "এক পাপী এক পুন্যি আয়া, এক হে সুখ দলেল রে
বিনা ভজন কই কাম নহী আবে, সব যমকি জেলেরে।।"

ব্রহ্মকাল চায় না যে, কোনো প্রাণী এই খাঁচা রূপী জেল থেকে বেড়িয়ে যাক্। সে এটাও চায় না যে সতলোকে যাওয়ার ঠিকানা বা রাস্তা কেউ জানুক বা জেনে যাক্। এই জন্য নিজের ত্রিগুনী মায়ার দ্বারা জীবকে বশ করে রাখে। তবুও মানুষের উপরোক্ত চাহিদা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়? এখানে শুধু মরণ হয়, সব দুখী ও অশান্তিতে থাকে। উপরোক্ত লেখা যে মানুষের ইচ্ছা, সেটা একমাত্র সতলোকেই পাওয়া যাবে। মানুষের উপরের এই ইচ্ছা গুলি কোথা থেকে উৎপন্ন হয়? সত লোক মানুষের আসল ঘর বা আদি স্থান। কাল ব্রহ্মলোকে এসে আমরা ফেঁসে গিয়েছি ও নিজের আপন বাড়ীর রাস্তাই ভুলে গিয়েছি। **(তাই কবীর সাহেব বলেন —)**

কবীর, "ইচ্ছা রূপী খেলন আয়া, তাতে সুখ সাগর নহী পায়া।।"

এই কাল ব্রহ্মলোকে শান্তি বা সুখের নামনিশান নেই। ত্রিগুন মায়া থেকে উৎপন্ন কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া, অহঙ্কার, হিংসা-দ্বেষ, শোক-উল্লাস, লাভ-ক্ষতি, মান-সম্মান রূপী অবগুন, প্রতিটি জীবকে অশান্ত করে রেখেছে। যেখানে এক জীব অন্য জীবকে মেরে খায়, শোষন করে, ইজ্জত কেড়ে নেয়, ধন সম্পদ লুটে নেয়, শান্তিও ছিনিয়ে নেয়। এই চারিদিকে আগুন লেগেই থাকে। যদি কেউ শান্তিতে থাকতে চায়, তাকে শান্তিতে অন্য একজন থাকতে দেয় না বা দেবেও না লোকে ভাবে যে চুরি হবে না, তবুও চোরে চুরি করে চলে যায়, ডাকাত ডাকাতি করে চলে যায়। ব্যাপারীর ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যায়, রাজার রাজ্য কেড়ে নেয়, সুস্থ শরীরে অসুখ লেগে যায়, অর্থাৎ এখানকার কোনো বস্তু সুরক্ষিত নেই। রাজার রাজ্য, ইজ্জতদারের ইজ্জত, ধনবানের ধন, শক্তিমানের শক্তি, এমনকি আমাদের প্রত্যেকের শরীরও হঠাৎ কেড়ে নেওয়া হয়। মা-বাবার সামনে যুবক যুবতী ছেলে মেয়ে মারা যায়, দুধ খাওয়া শিশুকে ফেলে মা-বাবা মারা যায়। যুবতী বোন বিধবা

হয়ে যায় এবং তখন পাহাড় সমান দুঃখ ভোগার জন্য মজবুর হতে হয়। বিচার করেন, যে এই স্থান থাকার উপযোগী কি? কিন্তু আমাদের অসহায় অবস্থায় এখানে থাকতে হচ্ছে, কেননা এই কালের খাঁচার বাইরে যাওয়ার রাস্তা কেউ দেখেনি বা জানেনা। আমরা একজন আরেকজনকে দুখী করি অথবা দুঃখ সহ্য করবার সহনশক্তি ধারণ করে রেখেছি কিংবা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, যদি এই কাললোকের দুঃখ থেকে কেউ বাঁচতে চায় তাহলে পরম শক্তিযুক্ত পরমেশ্বর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) -র স্মরণে যেতে হবে। পরমেশ্বরের ভয় কালব্রহ্মও পায়। যদি (সত্য পুরুষ) পরম অক্ষর ব্রহ্মের মার্গ কোনো পূর্ণ সাধু দেখায় বা তার স্মরণে পৌছে দেয়, তাকে কাল ব্রহ্ম কষ্ট দিতে পারে না। সে যতক্ষন এই সংসারে ভক্তি করতে থাকবে, উপরোক্ত কষ্ট আজীবন হবে না। যে ব্যক্তি এই 'জ্ঞান গঙ্গাঁ" বই পড়বে এবং পরে যদি তার জ্ঞান হয়ে যায় যে, আমি আমার নিজের ঘরের কথা ভুলে গিয়েছি। ঐ পরম শান্তি ও সুখ এখানে নেই, সেটা আমার আসল ঘর, সতলোকে আছে। সেখানে না জন্ম, না মৃত্যু, না বৃদ্ধ, না দুঃখ, না কোনো লড়াই-ঝগড়া, না অসুখ-বিসুখ, না টাকা পয়সার লেন দেন বা না কোনো মনোরঞ্জন সাধনের কোনো জিনিস কিনতে হবে। সেখানে পরমাত্মা দ্বারা বিনামূল্যে সব ও অখন্ড আছে বন্দি ছোড় **(গরীবদাস জী মহারাজের বাণীতে প্রমান ঃ—)**

বিনহী মুখ সারঙ্গ রাগ সুন, বিনহী তন্ত্রী তার, বিনাসুর অলগোজে বাজে, নগর নাচ ঘুমার।।
ঘন্টা বাজে তাল নগ, মঞ্জীরে ডফ ঝাঁনঝ, মুরলী মধুর সুহাবনী, নিসবাসর আর সাঁঝ।।
বীন বিহঙ্গম বাজহিং তরফ তম্বুরে তীর, রাগ খন্ড নহী হোত হে, বন্ধা রহতে সমীর।।
তরক নহী তোরা নহী, নাহী কশীস কবাব, অমৃত প্যালে মধ পীবে, জিউ ভাটি টবে শরাব।।
মতবালে মস্তানপুর গলী গলী গুলজার, সংঘ শরাবী ফিরত হে, চলো তাস বাজার।।
সংখ-সংখ পত্নী নাচে, গাবে শব্দ সুভান, চন্দ্র বদন সুরজমুখী, নাহী মান গুমান।।
সংখ হিন্তোলে নুর নগ, ঝুলে সন্ত হুজুর, তখত ধনী কে পাস কর, এইসা মুলক জহুর।।
নদী নাব নালে বগৈ, ছুটে ফুয়ারে সুন্য, ভরে হোদ (গর্ত্ত) সরবর সদা নহী পাপ নহী পুন্য।।
না কই ভিক্ষুক দান দে, না কই হার ব্যবহার, না কই জন্মে মরে, এইসা দেশ হমার।।

জহা সংখ্যং লহর মেহর কী উপজৈ, কহর জাহা নহী কোই,
দাস গরীব অচল অবিনাশী, সুখ কা সাগর সোই।।

সতলোকে একই রকম এক ভাবে পরম শান্তি ও সুখ আছে। যতক্ষণ আমরা সতলোকে না যেতে পারব ততক্ষণ আমরা পরমশান্তি সুখ ও অমৃত্ব কে লাভ করতে পারব না। সতলোকে তবেই যাওয়া সম্ভব হবে যতক্ষন না পূর্ণ গুরুর উপদেশ পাব বা পূর্ণ ব্রহ্মপরমাত্মার আজীবন ভক্তি না করতে পারব। এই "জ্ঞান গঙ্গাঁ" পুস্তকের মাধ্যমে যে সংবাদ দিতে চাই তাতে কোনো দেবী-দেবতা ও ধর্মের নিন্দা না করে, সর্ব পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে লুকানো যে গুঢ় রহস্য লুকানো রয়েছে সেটা বুঝতেই পারিনি। পরম পুজ্য কবীর সাহেব নিজের বাণীতে বলে গেছেন ঃ-

"বেদ কতেব ঝুঠে না ভাই, ঝুঠে হে সো সমঝে নাহী।।"

যার কারণ ভক্ত সমাজে অনেক হানি হচ্ছে। সবাই নিজের নিজের অনুমানে ও মিথ্যা গুরুর দ্বারা শোনা, শাস্ত্র বিরুদ্ধে সাধনা করে, তবে না তাতে মানসিক শান্তি মেলে, না শারিরীক সুখ, না ঘরে, না কারবারে লাভ হয়, না পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়, না মোক্ষ লাভ হয়। মানুষকে

জানতে হবে যে, এইসব সুখ কোথায় পাব? আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় জন্ম নেব? কেনই বা মৃত্যু হয়? কেনই বা দুঃখ ভুগী? এসব আসলে কে করাচ্ছে? আর পরমেশ্বর কে? কি রকম, কোথায় আছেন ও কিভাবে উনাকে পাব? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মাতা-পিতা কে? কিভাবে এই কাললোক ব্রহ্মের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের ঘর সতলোকে ফিরে যাব, বা যেতে পারব? এই সব প্রশ্নের প্রতিটি উত্তর এই পুস্তকের মাধ্যমে জানা যাবে। যাহাতে এই পুস্তক পড়ে ভক্তের বা ভক্ত-আত্মার কল্যান সম্ভব হতে পারে। এই পুস্তক সতগুরু রামপাল জী মহারাজের প্রবোচন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যাহা সদগ্রন্থে লেখা তথ্য থেকে আধারিত। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে কি, পাঠকগণ নিষ্পক্ষ ও রুচি রেখে এর অনুসরণ করলে, তার কল্যান সম্ভব ঃ—

আত্মপ্রান উদ্ধার হি, এইসা ধর্ম নহি ওর, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ, সকল সমানা ভৌর।।
জীব উদ্ধার পরম পুন্য, এইসা কর্ম নহী ওর, মরুস্থল কে মৃগ জো, সব মর গয়ে দৌড় দৌড়।।

ভাবার্থ ঃ- যদি এক আত্মাকে সদভক্তি মার্গে নিয়ে, তার আত্ম কল্যান করানো যায়, তাহলে কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় এবং তার সমান কোনো ধর্ম নেই। জীবাত্মা উদ্ধার করা কার্য বা সেবা থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো কার্য নাই। নিজের পেট ভরার জন্য তো পশু-পাখীও সারা দিন ঘুরে বেড়ায়। ঠিক সেইরকম ওই ব্যক্তি, যে কিনা পরমার্থী কাজ না করে। পরমার্থী কর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা, যাহা জীব কল্যানের ক্রিয়া কার্য কর্ম। জীব কল্যানের কার্য না করে, সর্ব মানুষ মরুভূমিতে হরিণের মত দৌড়াতে দৌড়াতে মারা যায়। দূরে জলই জল দেখে, পরে মরুভূমিতে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে স্থলই দেখতে পায়, শেষে পিপাসায় সেই হরিণের মৃত্যু হয়। ঠিক এইভাবে জীব সব আমরা কাল ব্রহ্মালোকে রয়েছি, সবাই আশা রাখে সুখ পাব, বা নিঃসন্তান ব্যক্তি ভাবে সন্তান পাব, সন্তান হলে সুখী হয়ে যাব। আর যার সন্তান আছে তার কাছে প্রশ্ন করলে, অনেক সমস্যার কথা জানতে পারবে। নির্ধন ব্যক্তি ভাবে ধন পেলেই সুখী হব, যখন ধনবানের কুশল খবর জিজ্ঞাসা করবে, তখন দুনিয়ার সমস্যার কথা শোনাবে। কেউ রাজ্য প্রাপ্তি করে সুখ মানে, কিন্তু সেটা তার মহাভুল। রাজার (মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির) স্বপনে ও সুখ হয় না। সামান্য চার পাঁচ সদস্যের পরিবারে যে মুখ্য, সংসার সামলাতে কতসময় হিমসিম খেয়ে যায়। সেও স্বপ্নেও সুখী হতে পারে না। রাজা লোক মদ খেয়ে কিছুক্ষনের জন্যে দুঃখ ভুলে থাকতে পারে। টাকা পয়সা (মায়া) জমা করে জনতার কাছ থেকে কর নিয়ে। পরের জন্মে রাজা সৎভক্তি করে না, পরে পশু যোনীতে জন্ম নিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে যে কর বসুল করেছিল তা পশু হয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়। যে ব্যক্তি মনমত মিথ্যা গুরুর দীক্ষা নিয়ে ভক্তি ও ধর্ম করে ভাবতে থাকে যে কি, ভবিষ্যতে সুখী হব কিন্তু তার বিপরীত সে দুঃখই পেয়ে থাকে। কবীর সাহেব বলেন যে, আমার জ্ঞান এইরূপ, যদি জ্ঞানী পুরষ হয় তাহলে হৃদয়ে বসিয়ে নেবে, আর যদি মূর্খ হয় তাহলে বুঝবে সে জ্ঞানের বাইরে আছে।

কবীর "জ্ঞানী হো তো হৃদয় লগাই, মূর্খ হো তো গম না পাই।।"

অধিক জানতে হলে কৃপা করে প্রবেশ করুন এই "জ্ঞান গঙ্গাঁ" পুস্তকে। এই পুস্তক পড়ে, সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ অধিবক্তা শ্রী সুরেশ চন্দ্র বলেছেন, এই পুস্তকের নাম "জ্ঞান সাগর" হওয়া উচিৎ ছিল।।

—ঃ "কলিযুগে সত্যযুগ" ঃ—

(সাধু রামপাল জী মহারাজের সৎসংগ বচনের বাণী উদ্ধৃত)

সত্যযুগ ওই সময়কে বলা হত, যে সময় ওই যুগে কোনো অধর্ম হতো না। পিতার আগে পুত্রের মৃত্যু হত না, স্ত্রী বিধবা হত না, কোনো রোগ হতো না, সর্ব মানুষ ভক্তি করতো। পরমাত্মাকে ভয় করতো, কারন আধ্যাত্মিক কর্ম জ্ঞান সর্ম্পকে পরিচিত ছিল। মন, কর্ম ও বচনে কাউকে কোনো কষ্ট দিত না বা দুরাচারীও হত না। জতি - সতী, স্ত্রী - পুরুষ হোত। বৃক্ষও অনেক ছিল বা হোত। সব মানুষে বেদের নিয়ম আধারে ভক্তি করত। বর্তমান কলিযুগে অধর্ম বেড়ে গিয়েছে। কলিযুগের মানুষের ভক্তির প্রতি আস্থা কমে গিয়েছে, কেউ কেউ ভক্তি করেই না। যদিও কেউ ভক্তি করে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে, মনমানী ভক্তি করে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ১৬ অধ্যায় শ্লোক ২৩-২৪ -এ বর্জিত আছে। যার কারনে পরমাত্মার কাছে যে লাভ পাওয়া যেতো তা প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য অধিকতর মানুষ নাস্তিক হয়ে যায়। ধনী হওয়ার জন্য ঘুষ, চুরী ও ডাকাতি মাধ্যমে চলে যায়। সেই জন্য এ বিধিতে ধন লাভ না হওয়ার কারণে পরমাত্মার কাছে দোষী হয়ে যায় তাই প্রাকৃতিক কষ্ট ভুগতে হয়।

পরমেশ্বরের বিধান ভুলে যায় মানুষ, ভাবে না যে ভাগ্যের অধিক কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। আর যদি অবৈধ অন্য বিধিতে ধন প্রাপ্ত করা হয়, সেটা থাকে না। যেমন, এক ব্যক্তি নিজের পুত্রকে সুখী দেখার জন্য, অবৈধ বিধিতে ধন প্রাপ্ত করেন কিছু দিন পরে উনার পুত্রের দুটো কিডনি খারাপ হয়ে যায়, যেমন তেমন করে কিডনি বদলিয়েছ্নে তাতে তিন লাখ খরচ হয়ে গিয়েছে। যে ধন অবৈধ বিধিতে জমা করে তা তো সব খরচ হয়ে যায় উপরন্ত দেনাও হয়ে পড়ে। পরে পুত্রকে বিয়ে দেওয়া হয়, ছয় মাস পরে বাস দূর্ঘটনায় একমাত্র পুত্র মারা যায়। এরপর না তো পুত্র থাকল, না অবৈধ বিধিতে উপার্জিত ধন থাকল, অবশেষে কি বাঁচল বা থাকল ? অবৈধ বিধিতে ধন সংগ্রহ করার পাপ, বা যা কিছু অবশেষ আছে, সেই সকল ভোগার জন্য, যার যার কাছ থেকে পয়সা জমা করেছিল, তাকে পশু হয়ে যেমন - (গাধা, বলদ, গায় হয়ে) শোধ করতে হবে। তবে পরম অক্ষর ব্রহ্মের শাস্ত্রানুকুল সাধনা করা ভক্তের ভাগ্য পরমেশ্বর বদলিয়ে দেয়। কেননা পরমেশ্বরের গুণে লেখা আছে যে কি, পরমাত্মা নির্ধনকে ধনবান বানিয়ে দেয়।

সত্য যুগে প্রাণী মাছ মাংস, তামাক, মদ খেত না। কেননা এসব খেলে যে কি ধরনের পাপ হতে পারে, তারা ভালো ভাবেই জানত।

▣ **মাংস খাওয়া পাপ ঃ—** এক সময় এক সাধু তার শিষ্যকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় দেখেন একটা পুকুরে জেলে মাছ ধরছিল। মাছগুলো জলের বাইরে ছট পট করে মারা যাচ্ছে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করল, হে গুরুদেব, এই অপরাধী প্রাণীর কোন দন্ড হবে ? গুরু বললেন বৎস, সময় আসলে বলব। চার পাঁচ বৎসর পরে আবার গুরুশিষ্য কোনো এক জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ওখানে এক হাতীর বাচ্চা খুব জোরে জোরে চিৎকার করচ্ছিল। লাফালাফি করতে করতে হাতির বাচ্চা দুটো গাছ প্রায় কাছাকাছি, তার মধ্যে ফেঁসে যাওয়ার পর বেরিয়ে তো গেছে কিন্তু বের হওয়ার চেষ্টা করার সময় সর্ব শরীর ছিলে গিয়ে ক্ষত হয়ে যায়। পরে সেই শরীরের ঘায়ে পোকা হয়ে গেছে। আর সেই পোকা হাতীর বাচ্চার শরীরকে, খুচিয়ে খুচিয়ে কামড়াচ্ছে,

হাতীর বাচ্চা খুব চিৎকার আওয়াজ করছে। শিষ্য এই দৃশ্য দেখে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করল হে গুরুদেব, এই প্রাণী কোন পাপের দন্ড ভুগছে? গুরুদেব বললেন বৎস এ ওই জেলে, যে কিনা কয়েক বছর আগে মাছ ধরে বেড়াত।

▣ মদ খেলে কতটা পাপ হয় ঃ—মদ খাওয়া লোক সত্তর জন্ম কুকুর হয়ে থাকে। পচা মল, পচা জিনিষ খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া অনেক কষ্টও পেয়ে থাকে। শরীর তো হানি হয়, তবে শরীরে যে চার অঙ্গ আছে যেমন-ফুসফুস, লিভার, কিডনি, হৃদয় এসব নষ্ট করে শরীরকে হীন করে মৃত্যুর মুখে শীঘ্র পৌছিয়ে দেয়। মদ খেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশু তুল্য ব্যবহার করে। কাঁদায় পড়ে যায়, রাস্তার পাশে বেঁহুশ হয়ে পড়ে থাকে, কাপড় চোপড় মল ও বমি করে নষ্ট করে। মদ খেলে ধন হানি, মান হানি, ঘরে অশান্তি হয়ে থাকে। সত্য যুগে মদের প্রয়োগ হত না। সত্যযুগে প্রতিটি মানুষ পরমাত্মার বিধানে পরিচিত ছিল। তার কারণ তারা সুখে জীবন-যাপন করতেন। **গরীব,** "মদিরা পীবে কড়বা পানী, সত্তর জনম স্বান কে জানি।।"

▣ দুরাচার করা কত পাপ ঃ—"পর দ্বারা স্ত্রী কা খোলে, সত্তর জনম অন্ধা হো ডোলে।।"

পূজ্য কবীর পরমেশ্বর বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো পরস্ত্রীর সঙ্গে দুষ্কর্ম করে, সে সত্তর জন্ম অন্ধ হয়ে ভোগে। বুদ্ধিমান লোক এই বিপদ কখনও ডেকে আনেনা ধরণের মূর্খ লোকই এই কাজ করে। যেমন আগুনে ঝাঁপ দিলে অনিবার্য তার মৃত্যু হয়। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের জমিতে বীজ বোনে, তাকে মহামূর্খ বলা হয়। বেশ্যাগমনাক এইটাই জানবে যে ময়লা ফেলা ড্রামের মদ্যে শুদ্ধ গমের বা ধানের বীজ ফেলে দেওয়া। বিচারের বিষয় এই যে, পদার্থ পদার্থকে শরীর থেকে বেরিয়ে নাশ করার জন্য আনন্দ অনুভব করায় যদি, সেই পদার্থ শরীরের মধ্যে সুরক্ষিত রাখা যায়, তাহলে কত আনন্দ দেবে? দীর্ঘায়ু, সুস্থ শরীর, সুস্থ মস্তিষ্ক, শুরবীরতা ও স্ফুর্তি প্রদান করে। যে পদার্থতে মূল্যবান বাচ্চা প্রাপ্ত হয়। সে পদার্থ নাশ করা মানে, বাচ্চা হত্যা করার সাথে তুলনা করা হয়। এইজন্য দুরাচার কিংবা অনাবশ্যকে ভোগ বিলাস করা বর্জিত।

▣ তামাক সেবন করা কতটা পাপ? পরমেশ্বর কবীর দেব বলেছেন ঃ—

সুরাপান মদ্য মাংসাহারী, গমন করে ভোগে পর নারী
সত্তর জনম কটত হে শিশম, সাক্ষী সাহিব হে জগদীশম্।।
পর দ্বারা স্ত্রীকা খোলে, সত্তর জনম অন্ধা হো ডোলে;
সৌ নারী জারী করে, সুরাপান সৌবার,
এক চিলম হুঁক্কা ভরে, ডুবে কালী ধার।।

যেমন উপরে বর্ণন করেছে যেকি, একবার মদ খেলে সত্তর জন্ম কুকুরের জীবন ভোগে। আর মল-মূত্র খেয়ে বেড়ায়। পরস্ত্রী গমন করলে, সত্তর জনম অন্ধ হয়ে ভোগে। মাংস খেলে মহাকষ্টের ভাগী হতে হয়। উপরোক্ত সর্ব পাপ শত শত বার করা ব্যক্তির যে পাপ হয়, একবার তামাক, হুঁক্কা খেলে বা তামাক খাওয়া লোককে সহযোগ করলে তার সে রকম পাপ হয়, সে ঘোর পাপী হয়। এক ব্যক্তি সিগরেট, বিড়ি, ছিলুম, গাঁজা, এইরকম নানা ধরনের ধূঁয়ো ছাড়ে, সেই পদার্থ থেকে যে ধোঁয়া বের হয়, সেই ধোঁয়া ছোট ছোট বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে হানি করে থাকে। সে বাচ্চা তাড়াতাড়ি খারাপ গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্যও নষ্ট হয়ে যায়।

এক বৃদ্ধের পুত্র সন্ত রামপালজি মহারাজের শিষ্য ছিলেন তার বৃদ্ধ পিতা তাকে বললেন, তোমার গুরুদেব তো, বৃদ্ধদের সেবা করতেও মানা করেন। কারণ আমার নাতি আমাকে বলে যে দাদু! আমি আর কোনোদিন ছিলুমেতে (হুঁক্কা) তামাক ভরে দেব না, আমার পাপ হবে। আরও বলে যে, দাদু! তুমি এই সব খাওয়া ছেড়ে দাও, হুঁক্কা খেলে ঘোর পাপ হয়, তাছাড়া এই কাজে যারা সহযোগ করে, তাদেরও মহাপাপ হয়। এই শুনে পিতা (দাদু) বললেন,হুঁক্কা তো পঞ্চপেয়ালা, এটা একটা ঘরের সন্মান। এই কথা শুনে সন্ত রামপালজি মহারাজের শিষ্য (পুত্র) বলল, বাবা! সন্ত রামপালজি মহারাজকে সত সঙ্গে বলতে শুনেছি যে, আগেকার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা, কাকা, ও পিতা তাহারা নিজেদের নাতিপুতি বা সন্তানদের দুধ খেতে বলতেন, না খেলে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। কারণ তাহারা জানতেন যে, দুধ খাওয়ালে জ্ঞানবুদ্ধি ও শক্তি হবে, অতএব দুধ খুব উপকারী ও লাভদায়ক। তবে আবার, ওই বাচা যদি হুঁক্কা খেতে যেত তখন তার গুরুজনেরা বলতেন, হুঁক্কা খেতে নেই, হুঁক্কা খুবই খারাপ জিনিষ। তাই বলছি যে বাবা! যদি হুঁক্কা খেলে ভাল হয়, তাহলে বেশী করেই খাওয়ান আপনার নাতিকেপুতিকে।

বাবা ঃ- কথা তো তোর গুরুদেব ঠিকই বলেন, কিন্তু মর্যাদা তো আছে।

পুত্র ঃ- পিতা (বাবা) এই ধরণের মর্যাদা ছাড়লেই, পাপ থেকে বাঁচবেন।

পুত্র তার বাবাকে যখন বললেন, বাবা! আপনি হুঁক্কা খাওয়া ছেড়ে দেন এই কথা বললেন এবং ধ্রম্রপানের অবগুনের সমস্ত কথা বোঝাল। ছেলেটার বাবা বললেন, কথা তো তোর সঠিক আছে, তবে এই হুঁক্কার জন্যই তো আমার চার পাঁচ মিত্র আমার কাছে আসে আর যদি হুঁক্কা ছেড়ে দিই, তাহলে আর কেউ আমার কাছে আসবে না। তখন পুত্র বলল, বাবা! যাদের আপনি মিত্র বলছেন, যদি তারা হুঁক্কার জন্যই আপনার কাছে আসেন, তাহলে তারা আপনার মিত্র নয়, তারা আপনার তামাকেরই মিত্র জানবেন। যদি তাহারা আপনার সঠিকই মিত্র হয়, তাহলে তারা আপনার প্রশংসা করবেনও বলবেন আপনি খুবই ভাল করেছেন তামাক খাওয়া ছেড়ে। যদি তাহারা এই কথার বিপরীত কথা বলেন, তাহলে বুঝবেন, তাহারা আপনার মিত্রই নয়, কেননা সঠিক মিত্র কোনোদিন, তার মিত্রের কোনো অহিত চাইবেন না;হিতই চাইবেন।

পরে রামপাল মহারাজের শিষ্য তার পিতাকে বলল, পিতাজি দেখো এই কুকুরের গায়ে কেমন ঘা হয়েছে, সারা শরীর থেকে রক্ত পড়ছে। যে ব্যক্তি পরমাত্মার নাম নেয় না, তার এইরকম দশা হয়। সেই জন্য ভক্তিও পূর্ণ গুরুর নাম নিয়েই করতে হয়। অধিকারী গুরুর কাছ থেকে নাম নিতে হয়, অনাধিকারী গুরুর কাছে থেকে নাম নিয়ে ভক্তি করলে, কোন লাভ হয় না। ওই দিন ছেলেটার বাবা বললেন, আমি নাম নিতে পারব না, নাম নিলে সবাই আমাকে উপহাস করবে।

পরের দিন ছেলেটার বাবা বললেন, সারা রাত্রে আমি ওই ঘাওয়ালা কুকুরকে দেখেছি। ঘুমের ঝোঁক আসলেই, ওই ছট্‌ফট্‌ ঘায়ালা কুকুরের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ভেবে বললেন যে, আমায় তাড়াতাড়ি যে কোনো গুরুর কাছ থেকে নাম দিয়ে নিয়ে আয়। আমি কিন্তু ওই গুরু (রামপাল মহারাজ)-র কাছে কোনোদিন নাম নেব না। উনার সৎলোক আশ্রমে অনেক ভুল কাজ হয়।

পুত্র বলল ঃ— পিতাজি (বাবা) আমার বয়স ২৬ বৎসর, আমি কোনো শিশু নয়, যে আমাকে এখনও কারর বোঝাতে হবে, বা পরের কথা শুনে আমার অন্য ব্যক্তির সিদ্ধান্ত মানতে হবে। পিতাজি (বাবা) ওখানে কোনো খারাপ কাজ হয় না, যে কথা আপনি অন্যের কাছ থেকে শুনে বলছেন।

পিতা বললেন ঃ- তবে কি আমি ভুল শুনেছি।

পুত্র বলল ঃ- আপনি ভুলই শুনেছেন। সন্ত রামপাল মহারাজজির মতো সন্ত এই সারা বিশ্বতে নেই। যে কথা আপনি ভুল শুনে আমাকে বলছেন, ওই সময় আমি করোথা আশ্রমেই ছিলাম। ওইদিন সেখানে আমি নাম উপদেশ নিতেই গিয়েছিলাম। চারদিনের দিন আমি ঘরে ফিরেছি। আপনাকে আমি অন্য জায়গার কথা বলে গিয়েছিলাম। পিতাজি (বাবা) ওই দিন যদি আমি ওখানে না থাকতাম, তাহলে আপনার মত, আমিও শুনে মিথ্যাকে সত্য মনে করতাম। তারপর ওই পরম সদগুরুর নিন্দা করে ঘোর পাপের ভাগীদার হতাম।

বিচার করেন পিতাজি (বাবা) সন্ত রামপাল মহারাজের দুটো আশ্রম, একটা করৌথা, আরেকটা বরবালা হিসার জেলা হরিয়ানাতে। করৌথা আশ্রমের বিষয়ে যে গুজব ফেলেছিল সব মিথ্যা। তলাশি করে সরকার পরিস্কার বলেছেন, কোনো আপত্তিজনক জিনিষ আশ্রম থেকে পাওয়া যায় নি। মিডিয়াবালাও কিছু বলতে পারেনি।

ধরুন এক ব্যক্তি মদ খায়, দুটো ঠিকানা-ই খবর জানে যে, এই দুই জায়গায় মদ পাওয়া যায়। সে দুই জায়গা থেকেই মদ কেনে।

ভাবার্থ ঃ এই যে, যদি কোনো আপত্তিজনক জিনিষ থাকত তাহলে, করৌথার কথা উঠেছে, আর এই আশ্রম বরবালায় কথা কেন ওঠেনি ? কারণ এই যে, সব ভন্ডগিরি গুরুর মুখোশ খুলতেই ভগবান তার দাসকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। তারা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের আত্মার সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের সঙ্গে প্ররোচনা করছে বা ঠকাচ্ছে, অনেক শিষ্য বানিয়ে পয়সা জমা করছে, প্লেনে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনগণের আত্মারও ক্ষতি, এবং সম্পত্তিও নষ্ট করছে। এই সব গুরুর চোখে সন্ত রামপালজি মহারাজ শুলের মতো বিঁধছে। তাই পেপারে বা খবরে এই মিথ্যা কথা বলে তাহাকে বদনাম করার চেষ্টা করেছিল। পুত্র বলল, পিতাজি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, আমি আপনার ছেলে, মিথ্যাকথা ছাপানো খবরের উপর বেশী বিশ্বাস করছেন। পিতা বললেন, পুত্র তোমার উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে কিন্তু সব হরিয়ানার লোক বলছেন তাহলে এসব ঝুট (মিথ্যা) কি হতে পারে ?

পুত্র ঃ— পিতাজি, সব এক মিথ্যাবাদী খবরয়ালা থেকেই ছড়িয়েছে। কেউকি সেখানে গিয়ে নিজের সচোখে দেখেছে কি ? এ সত্যি সব সামনে এসে গেছে। এও মানতে হবে; আচ্ছা, কেউ কি ২০. ০৭.২০০৬-এ পাঞ্জাব কেসরী খবরের কাগজে কি লিখেছিল, সে পেপারের কিছু অংশ এখানেই প্রমানের জন্য প্রস্তুত রেখেছি। ১৯-০৭-২০০৬-এ মিডিয়ায়ালা নিজে আশ্রমে না গিয়ে, কারোর মুখে শুনে পেপারে ছাপিয়ে দিয়েছিল। আবার ১৯-০৭-২০০৬ এ সরকার মিডিয়াকে আশ্রম দেখার আজ্ঞা দিয়েছিল। যে খবর ২০-০৭-২০০৬-এ সত্যি প্রমাণ করে লিখেছিল। সেই ২০.০৭.২০০৬-এ খবরে কেউ কি ধ্যান দেয়নি ?

पंजाब केसरी पानीपत | वीरवार 20 जुलाई 2006

तथ्यों को तरोड़ा-मरोड़ा है मीडिया ने : एसपी

आश्रम से सोना, नोटों की बोरियां, विदेशी शराब व आपत्तिजनक सामान मिलने की खबरों को झूठा करार दिया

रोहतक, 19 जुलाई (ब्यूरो): मीडिया से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस तरह से तथ्यों को तरोड़-मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जा रहा है, उससे न सिर्फ मीडिया व पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा है, बल्कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई भी बाधित हो रही है। यह कहना है एसपी डा. सीएस राव का। वे आज शाम अपने कैम्प कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक-दो अखबरों में प्रकाशित हो रही तरह-तरह की खबरों को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में डीजीपी, लोकसंपर्क विभाग के निदेशक व रोहतक (शेष पृष्ठ 2 कालम 6 पर) रेंज के आईजी को भी लिखा जा चुका है। उल्लेखनीय है कि करौंथा आश्रम प्रकरण में अखबारों में तरह-तरह की खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। कोई अखबार आश्रम से तीस किलोग्राम सोना व नोटों से भरी हुई बोरियां मिलने की बात लिखता है तो कोई आश्रम के नीचे कमरे बने होने और कमरों में कैमरे लगे होने की बात कहता है। एसपी ने इस सभी बातों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को आश्रम से तीस किलो तो क्या एक किलो सोना भी नहीं मिला है और न ही नोटों व सिक्कों से भरी हुई बोरियां मिली हैं।

उन्होंने कहा कि इस अखबार (पंजाब केसरी नहीं) में प्रकाशित खबर से पुलिस की कार्रवाई प्रभावित हुई है। आश्रम से विदेशी शराब मिलने की बात को भी उन्होंने झूठा बताया। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आश्रम से ऐसा कोई सामान पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, जिसे आपत्तिजनक कहा जाए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मिला है, वह कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई में अगर कोई ऐसी चीज पुलिस को मिलती है तो वह भी कोर्ट में पेश कर दी जाएगी।

डा. राव ने कहा कि आश्रम की जमीन में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का सुरंगनुमा रास्ता जरूर बनाया हुआ है, लेकिन जमीन के नीचे एक भी कमरा नहीं है।

जब जमीन के नीचे कमरे ही नहीं हैं तो कैमरे लगे होने की बात भी अपने आप ही गलत साबित हो जाती है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सच्चाई के प्रकाशित हो रही खबरों के बाद ही प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों का आश्रम में दौरा करवाया गया था।

अब वे स्वयं ही निर्णय लें कि आश्रम में क्या है और क्या नहीं। एसपी राव ने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मीडिया के लोगों का आह्वान किया है कि वे तथ्यों के आधार पर ही खबरें प्रकाशित करें, लोगों को भ्रमित न करें।

এই সমাচার পত্রে স্পষ্ট লিখেছে আশ্রমে কোন আপত্তিজনক জিনিষ পাওয়া যায়নি বা দেখিনি। ১৯.০৭.২০০৬-এর আগে মিডিয়া (সাংবাদিক) লোক একদম মিথ্যা প্রচার করেছে।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তবে, করৌথা আশ্রম কান্ডের কি কারণ হয়েছিল?

উত্তর ঃ- পিতাজি! যখন দুই পালোয়ান (কুস্তিবাজ)-এর মধ্যে লড়াই শুরু হয় আর সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ানকে কেউ যদি হারিয়ে দেয়, তখন ওই সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ানের সমর্থকরা মাঝখানে এসে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। সে নিজে ও সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ানের সমর্থক মাঝখানে এসে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। সে নিজে ও সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ানের সমর্থক তার হার দেখতে চায় না। আর যখন দুই পালোয়ানের মধ্যে সমর্থক এসে যায় তো, গন্ডগোল-ই হয়। মহর্ষি দয়ানন্দের দ্বারা রচিত পুস্তকের নাম হল "সত্যার্থ প্রকাশ" এই পুস্তকের জ্ঞানের উপর সন্ত রামপাল মহারাজজি প্রশ্ন উঠিয়েছিল। এবং সেই পুস্তকের অজ্ঞানতা সর্বজনের সামনে প্রমান সহিত লিখে সি.ডি.তে দেখিয়েছিলেন। তারজন্য আর্য সমাজের আচার্য-এর দুঃখ হয়েছিল, কেননা মহর্ষি দয়ানন্দ সাহিত্য বিক্রয় করেই তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হত। সাধু রামপাল মহারাজের দ্বারা সত্য প্রমাণ শুনে, হতভম্ব হয়ে, জ্ঞানের উত্তর জ্ঞান দ্বারা না দিয়ে, সত্যকে লুকানোর উদ্দ্যেশে এবং জনতার ধ্যান অন্য দিকে সরানোর জন্য, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী (যিনি মহর্ষি দয়ানন্দের ভক্ত) তথা জনতাকে ভ্রমিত করে। সন্ত রামপাল দাসজি মহারাজকে মারার জন্য ঘৃণা যুক্ত ষড়যন্ত্র করেছিল। মিডিয়া সাংবাদিককে প্রভাবিত করে গুজব রটেছিল; কি যদি সন্ত রামপাল জি মহারাজকে মারতে সফল হত, তাহলে জনতা এই ভাবত, খারাপ লোক তাই মারা গেছে। উনার মরাই ভালো। এই মিথ্যা গুজবের কারণ সন্ত রামপাল জি মহারাজের অনুযায়ী শিষ্য পালিয়ে যাবে। পরন্তু, "রাখে হরি মারে কে?" "যাকো রাখে সইয়া, মার সকে না কই।।"

কিছুদিনের মধ্যে সব সত্যি বিশ্বের সামনে বেরিয়ে আসবে। এইরকম অন্যায় রাজার বংশ নষ্টই হয়। পূর্বের ইতিহাস দেখলে বুঝবেন, রাবণের কুল কি কারণে নষ্ট হয়েছিল, সবাই জানে। সন্ত রামপাল জি মহারাজ তার অনুযায়ী সঙ্গতদের বলতেন ঝগড়া করো না। পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখো পরমাত্মা ভক্তের সাথে থাকে ও অন্যায় অত্যাচারীদের নষ্ট করে। দিনাঙ্ক-১২.০৭.২০০৬-এ সন্ত রামপালজি মহারাজকে মারার জন্য যে ষড়যন্ত্র রটেছিল, যদি সে ষড়যন্ত্রকারী সন্ত রামপালজি মহারাজকে মারাতে সফল হত, তাহলে জনতার সভ্য ব্যক্তি এমনই অনুতাপ করতো, যেমন, যাযাবর নিজের প্রভুভক্ত কুকুরকে মেরে অনুশোচনা করেছিল।

এক যাযাবর (এদেশ ওদেশ ঘুরে ব্যাপার করে) ছিল। তার কাছে একটা কুকুর ছিল। সে কুকুরের মানুষের মত বুদ্ধি ছিল। ওই যাযাবর এক ধনী লোকের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল। ঋণ শোধ করতে সে অসমর্থ, তাই ধনী ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলেন, আমি আপনার পয়সা কড়ি ফেরাৎ দিতে অসমর্থ, আপনি আমার এক স্বামীভক্ত কুকুর আছে, সে কখনও চুরি হতে দেয় না। সারারাত্র জেগে থাকে ও দিনে ঘুমায়, আপনি একে রাখেন। যেদিন আপনার ঋণ শোধাতে পারব, সেদিন কুকুরকে ছাড়িয়ে নেব। ধনী ব্যক্তি যাযাবরের কথা শুনে কুকুরকে রেখেনিলেন। কিছুদিন পরে ধনী ব্যক্তির ঘরে চুরি হয়। লাখ টাকার জিনিষ সকালে সবাইয়ের দুঃখ হচ্ছিল। সবাই কুকুরের সম্পর্কে বলতে লাগল। ওই সময় কুকুরটা ধনী ব্যক্তির ধূতি মুখে নিয়ে টানছে, তাই দেখে কিছু লোক কুকুরের পিছে পিছে জঙ্গল পর্যন্ত্য গেছে। রাত্রে চোরে চুরি করে সেই ধন গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল, কুকুর চোরের পিছে পিছে গিয়ে দেখেছিল। ওই সময় ভোর হয়ে যাচ্ছিল। তাই চোর তাড়াতাড়ি মাটিতে গর্ত্ত করে লুকিয়ে রাখে। ওই স্থানে গিয়ে কুকুর নিজের পা দিয়ে গর্ত্ত করতে লাগল। ধনী ব্যক্তির চাকররা গর্ত্ত খুঁড়ে সব ধন বের করে নিল। ধনী ব্যক্তি কুকুরের গলায় একটা চিঠি লিখে বেঁধে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল কুকুরের প্রভুভক্তের প্রমাণ। তাতে এও লিখেছিল যে তার ঋণ আমি মুক্ত করে দিলাম। সাথে কুকুরকেও ফিরিয়ে দিলাম। কুকুরকে সংকেত করে যাযাবরের কাছে ফিরে যেতে বলল। কুকুর দৌড়িয়ে যাযাবরের কাছে গেল। যাযাবর ভেবেছে মনে হয়, কুকুর ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। যাযাবর ভাবল, কুকুর তো আমার সম্মান, মান ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে, আমি কোন মুখ নিয়ে আবার ধনী ব্যক্তির কাছে যাবে। এই ভেবে দূর থেকেই গুলি করে কুকুরকে মেরে দিল। কিন্তু যখন কুকুরের গলায় চিঠি খুলে পড়েছে, তখন জোরে জোরে কুকুরের শোকে কাঁদতে লেগল।

যদি ষড়যন্ত্রকারী দ্বারা ভ্রমে পড়া জনতা ও মুখ্যমন্ত্রী হরিয়ানার শ্রী ভূপেন্দ্র সিং হুড্ডা, ঐ দিন সন্ত রামপাল মহারাজজীকে মারতে সফল হত, তাহলে বনজারার (যাযাবরের) মত, বিনা দেখে বিনা চিন্তায় কাজ করে কান্না বা অনুশোচনা ছাড়া কিছুই পেত না। শুধু তাও নয়, ফ্রান্সের ভবিষ্যবক্তা নাস্ত্রেদমস ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রামপাল মহারাজের বিষয়ে ভবিষ্যবাণী বলে গেছে, যে, ২০০৬-তে এক হিন্দু নেতা হঠাৎ প্রকাশ্যে আসবে। সে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞাতা (Great Chyren)-র বিষয়ে আমার ভবিষ্যবাণী দ্বারা জোর গলায় বলছি কোন নেতার উপর তর্ক-বিতর্ক করে দেখবে, কিন্তু তার সামনে কোন গুরু তর্কশাস্ত্র করতে সাহস পাবে না বা হবে না। আমি (নাস্ত্রেদমস) বুকে হাত ঠুকে বলছি, আমার শায়রনের কৃতিত্ব ও গুঢ় রহস্যের জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান সব শাস্ত্রের মাধ্যমেই সব গুরুর পোল খুলে দেবে, যে গুরু তার শিষ্যদের শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধনা করাচ্ছে বা তাদের আত্মা নরকের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাস্ ২০০৬ আসতে দাও, এই সব বিধানের এক এক

শব্দের ঠিক ঠিক সমর্থন তত্ত্বজ্ঞাতা (গ্রেট শায়রণ)-ই দেবেন। নাস্ত্রেদমসের নিজস্ব ভবিষ্যবাণীতে বলেছিলেন ২১বী শতাব্দীর প্রারম্ভে দুনিয়ার ক্ষিতীজ পর "শায়রনের উদয় হবে এবং যাহা কিছু বদল হবে তাহা আমার আজ্ঞায় নয়, শায়রণের ইচ্ছার নিয়তি অর্থাৎ বিধান থেকে সব ভালই পরিবর্তন হবে। ওর মধ্যে নতুন পরিবর্তন হল, যেকি হিন্দুস্থান সর্ব শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হবে। কেউ কোন শতাব্দীতেও এমন দেখেনি, হিন্দুদের সুখ সাম্রাজ্য দৃষ্টি গোচর হবে। ওই দেশের জন্ম, ধার্মিক গুরু তত্ত্বদৃষ্টা বা জগৎ তারনহার (উদ্ধার) জগজ্জেতা হবে। এশিয়া খন্ডে রামায়ণ, মহাভারত আদি জ্ঞান, যা কিছু হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তার থেকেও ভিন্ন পূর্বের জ্ঞান ওই তত্ত্বদর্শীসাধুরই হবে। উনি সৎপুরুষের অনুযায়ী হবে, তিনি এক অদ্বিতীয় গুরু হবে, বহু গুরু আসবে ও যাবে। সবাই পরমাত্মার দ্রোহী ও অভিমানী। আমার উনার সঙ্গে আন্তরিক সাক্ষাৎকার হয়েছে। আমি উনার স্বাগত করে, আশ্চর্যচকিত হচ্ছি। কেননা আমি এখন ১৫৫৫ খ্রীঃ রয়েছি, যখন উনি ২০০৬-তে আসবেন তখন আমি হয়তো থাকব না।

সেই কথা ভেবে আমি উদাস হয়ে যাচ্ছি। কারণ ২০০৬-তে উনার জ্ঞান আমি পাব না। আমি তত্ত্বদর্শী (শায়রন)-এর উপেক্ষা পাত্রই থেকে গেলাম, আমার ভাগ্যে ওই তত্ত্বদর্শীর জ্ঞান শোনা হল না। সত্য, দ্বাপর, ত্রেতাতেও এই তত্ত্বদর্শীর জ্ঞানের অভাব রয়ে গেছে। ওই তত্ত্বদর্শীর বয়স ২০০৬-তে ৫০/৬০-এর মধ্যে থাকবে। উনি তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞাতা, তথা জ্ঞেয় হয়ে ত্রিখন্ডের কীর্ত্তিমান পুরুষ হবে। উনি যে সাধনা মন্ত্র নিয়ে আসবেন, তা অতি শক্তিমান, যেমন যেমন মহাবিষযুক্ত শাপকে করা হয় মন্ত্র দ্বারা বশ প্রকাশ্য ঠিক ওই ধরনের। উনি নতুন পদ্ধতি, নতুন কানুন বানানো তত্ত্ববেত্তা, দুনিয়ার সামনে উজাগর হবে। উনার সাক্ষাৎকার হয়ে অচম্ভিত হয়ে, আমি উনাকে (গ্রেট শায়রন) বলছি। উনার জ্ঞানের দিব্য তেজের প্রভাবে, ওই দ্বীপকল্প (ভারতবর্ষ) -তে আক্রমক ঝড় ও তুফানের মতো খলবল আরম্ভ হবে, অর্থাৎ অজ্ঞানী গুরুদের স্বার্থে আঘাত হবে তাই তারা বিদ্রোহ করবে। ১২ই জুলাই ২০০৬-এ উনার অর্থাৎ (রামপাল মহারাজ) শায়রনের করৌথা আশ্রমের কান্ডের সংকেত বোঝায়। সেই ঝড় তুফান শান্ত করার উপায়ও উনার জানা আছে।

প্রথমে অজ্ঞানীদের জ্ঞান দ্বারা ঘুম থেকে জাগ্রিত করবে। যারা শাস্ত্র বিধির বাইরে সাধনা করবে, তাদের বুরখা ছিঁড়ে ফেলে গুঢ় গহরী রহস্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ করাবে। আমাদের আদি যে সনাতন ধর্ম (নিত্য, সত্য মানব ধর্ম) পালন করিয়ে সমৃদ্ধ শান্তির অধিকারী তৈরী করবে। তাছাড়া উনার তত্ত্বজ্ঞান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। ঐ মহান তত্ত্বদর্শী গুরুর জ্ঞানের সমানতা কেউ করতে পারবে না। জগৎকে নতুন প্রকাশ দেওয়া সর্ব শ্রেষ্ঠ জগজ্জেতা ধার্মিক বিশ্ব নেতা, নিজের পরমার্থী উদাসী, নিঃস্বার্থ হয়ে, পরমেশ্বরের অবতার রূপে, পৃথিবীতে মানব উদ্ধারে, পরোপকারী কার্য করে, মানব উদ্ধারের চিন্তা করে। কোন অভিমান থাকবে না। স্বার্থও থাকবে না, আমার এই ভবিষ্যৎবাণী ওই সময় গৌরব যুক্ত হবে। উনার বলা জ্ঞান অনেক বৎসর পর্যন্ত্য থাকবে। ওই সাধু (শায়রন) তত্ত্বজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিকদের চোখ খুলে দেবেন। এই রকম অধ্যাত্মিক চমৎকার কার্য্য করবেন যে, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার সার্জেনরাও আশ্চর্যতে পরবে। তার প্রমাণ এই জ্ঞান গঙ্গার পিছনের পৃষ্ঠায় রয়েছে। উনার সর্বজ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণিতই হবে। আমি (নাস্ত্রেদমস) বলছি, বুদ্ধি মান লোক উনার উপেক্ষা যেন ভুল করেও না করে। উনাকে ছোট জ্ঞানদীপ ভেবো না। ওই তত্ত্ববেত্তা মহামানব (শায়রন)-কে সিংহাসনে বসিয়ে আরাধ্য দেব মনে করে যেন পূজা করে অতএব উনি আদি পুরুষ (সত পুরুষ)-এর অনুযায়ী দুনিয়ার তারণহার অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্তা।

তত্ত্বদর্শী রামপাল মহারাজের সমর্থনে অন্য ভবিষ্যবক্তার ভবিষ্যবাণী

১। ইংলন্ডের জ্যোতিষী 'কীরো' ১৯২৫-র লেখা পুস্তকে ভবিষ্যবাণী। খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ সন্ ২০০০ ইং উত্তরার্ধে (১৯৫০সের পরে উৎপন্ন গুরু)-ই বিশ্বে এক নতুন সভ্যতা" নিয়ে আসবে। সেই সভ্যতা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। ভারতে ওই এক ব্যক্তিই সারা সংসারে জ্ঞানক্রান্তি নিয়ে আসবে।

২। আমেরিকার 'শ্রীএন্ডারসন্"-এর অনুসারে ২০ বী সদীতে অন্ত থেকে আগে বা ২১ বী শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্বে অসভ্যতা ল্যাংটা তান্ডব হবে। এর মধ্যে ভারতের এক গ্রামে এক ব্যক্তি ধর্ম এক, মানব এক, ভাষা এক আর পতাকার রূপরেখার সংবিধান বানিয়ে সংসারকে সদাচার, উদারতা, মানবীয় সেবা, ভালবাসার শিক্ষার সঠিক জ্ঞান শেখাবে। সে মসীহা সন্ ১৯৯৯থেকে শুরু করে বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে হাজার বছর পর্যন্ত্য সুখশান্তিতে ভরিয়ে দেবে।

৩। আমেরিকার ভবিষ্যবক্তা "শ্রী চার্ল ক্লার্ক"-র অনুসারে ২০ শতাব্দীর অন্তে ও প্রথমে এক দেশ বিজ্ঞানের উন্নতিতে সব দেশকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে। পরন্তু ভারতের প্রতিষ্ঠা সেই দেশের ধর্ম ও দর্শনে হবে, তাহা সারা বিশ্ব মেনে নেবে। সেই ধার্মিক ক্রান্তি ২১ বী সদীর প্রথম দশকে সম্পূর্ণ বিশ্বকে প্রভাবিত করবে। আর মানবকে আধ্যাত্মিকের উপর বিবশ করে দেবে।

৪। হেঙ্গরী মহিলা জ্যোতিষী "বোরিস্কা"-র অনুসারে সন্ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে আগে উগ্র পরিস্থিতিতে হত্যা, লুটপাটের মাঝখানেই সদগুণের বিকাশ এক ভারতীয় ফরিস্তার দ্বারা ভৌতিকবাদের সফল সংঘর্ষের ফলস্বরূপ হবে, যা চিরস্থায়ী হবে। এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তির প্রচুর সংখ্যা প্রমাণে ছোট ছোট লোকেরা অনুগামী হয়ে, তারই ভৌতিকবাদকে আধ্যাত্মিকতায় বদলে দেবে।

এই রকম আরও ভবিষ্যবক্তা বলে গেছেন। যেমন ফ্রান্সের 'ডঃ জুনবর্ণ' ইজরায়েলের 'প্রোঃ হরার" নার্বের শ্রী আনন্দাচার্যরও ভবিষ্যতবাণী বলে গেছে। আজ বিশ্বে সেই ঘটনাই ঘটতে চলেছে। যুগ পরিবর্তন হবে প্রকৃতির অটল সিদ্ধান্ত। চারিযুগে ব্যবস্থা করে গেছে, যখন পৃথিবীতে পাপের ভার বেড়ে যায় তখন ভগবান মানব রূপে প্রকট হন। আরও বেশী জানতে হলে "কৃপা করে ধরত্রী উপর অবতার" পুস্তকে তত্ত্বদর্শী সন্তের (সন্ত রামপাল মহারাজ")-র বিষয়ে অনেকানেক ভবিষ্যলেখ যা আজ সত্য সিদ্ধ হচ্ছে।

এই সব কথা জেনে আপনারা বিচার করুন। যদি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী এই সন্তগুরু (সন্ত রামপাল দাস মহারাজ)-কে মারাতে সফল হতো, তাহলে আজ এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের দশা সেই যাযাবর যেমন তার প্রভুভক্ত কুকুরকে মেরে যে অনুশোচনা করেছিল তা কি দিয়ে পূর্ণ করবে। ও তো একটা পশু তাই এত শোক হয়েছে বা যতদিন সে যাযাবর বেঁচে থাকবে? শোক নিয়েই তার মৃত্যু হবে। ভবিষ্যবক্তা নাস্ত্রেদমসেরও সেই রূপ দুঃখ হয়েছিল যা কোনদিন পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমি মনে করি দাঁত থাকতে দাঁতের যত্ন করা উচিৎ। কে কত আগে দাঁতের যত্ন নিতে শিখবে, সেটাও তার পূর্ব জন্মের ফল অনুযায়ী হয়তো সে পেতে পারে। এখন তো দিনে দুইবার ২০/২৫ মিনিট দেখতে পাই, সেই তত্ত্বদর্শী গুরুদেব রামপাল দাস মহারাজজীকে। তবে এমন একদিন আসবে হয়তো দশবিশ বছরের মধ্যেও উনাকে দর্শন করতে পারব না। কারণ বিশ্বের লোক যখন দেব হিসাবে উনাকে জানবেন বা পূজার স্থানে বসাবেন, তখনের পরিস্থিতি এখনই অনুভব করা যায়। দশবারো বছর আগে যারা উনার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আজ তাদের এই আফসোস হয় যে গুরুজিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখার সৌভাগ্য এখন আর হয় না। এখন এত ভিড় যে, উনি কখন আসবেন ও আমাদের কখন দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ দেবেন, তার জন্য

প্রতিক্ষা করতে হয়। আজ এই পরম আদরের গুরুদেবকে যদি কেউ এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়, তাহলে এই বিশ্বকে, কে এই তত্ত্বজ্ঞানের কথা শোনাতেন। সারা বিশ্বে প্রভু পিপাসু লোকের হাহাকার ও আফসোসই থেকে যেতো।

শিক্ষা ঃ— নিজের চোখে না দেখে তাড়াতাড়ি সমাধান করা যে, কত বড় ধরনের হানিকর হয়। গুরু (সন্ত রামপাল দাস মহারাজ)-র গলায় পরমেশ্বর কবির অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান গলায় পত্রের মত লিখে বেধে দিয়েছে। তারজন্য উনি গলায় বেঁধে সবাইকে পড়তে বলছেন। সরল ভোলা জনতা এই সব না পড়ে, স্বার্থী তত্ত্বে ভ্রমিত হয়ে গুরুদেবের উপেক্ষা করছে। সন্ত মহারাজ রামপালজী বিশ্বের মহা পরোপকার করছেন ও সমাজের খারাপ সব দূর করছেন। উনার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে মানুষ, মাংস, মদ, তামাক, বিড়ি, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কেউ কেউ ঘুষ নেওয়া, দুরাচার করাও ছেড়ে দিয়েছে। এই প্রকার তত্ত্বদর্শী গুরুজীর (সন্ত রামপাল দাস মহারাজজী) দ্বারা এক স্বচ্ছ (পরিস্কার দূষণ মুক্ত) মানব সমাজ তৈরী হতে চলেছে।

।। মিথ্যা মুকদ্দমা ।।

সন্তু রামপাল দাসজী মহারাজার ও উনার অনুযায়ী উপর তৈরী করা যে মিথ্যা মুকদ্দমা সে এই প্রকারেরঃ-

সতলোক আশ্রমের জমি কেনার বিষয়ে ঃ— যার জমি ছিল, তার বোনের বাচ্চা হওয়ার সময় হয়েগিয়েছিল। তাই বোনের স্থানে জমিয়ালা নিজের পিশির ফটো লাগিয়ে, পেশ করেছিল, এই কথাটা গোপন রেখেছিল, কেনার বা ক্রেতার (ট্রাস্টের সদস্যের) কাছে। নম্বরদার সাক্ষী বলেছিলেন যে সব সদস্য সঠিক আছে। এতে জমি কেনার সদস্যের কি দোষ? রামপাল মহারাজজী তো জমি কেনার দলিলে কোন স্বাক্ষর করেনি। তবুও সন্ত রামপাল মহারাজজী ও ট্রাস্টের সদস্যদের নামে এই মিথ্যা কেসে জড়িয়ে রেখেছে।

২। ছুড়ানী আশ্রমের সাথে মিথ্যা কেস ঃ- ওই দিন সন্ত রামপাল জী মহারাজ, মহারাষ্ট্র প্রান্তে পুনা জেলায় সৎসঙ্গ করতে গিয়েছিলেন। ওখানের খবর কাগজ ছাপানো হয়েছিল, সেটাও পুলিশকে দেখিয়েছিল, তাও সন্ত রামপালজী মহারাজের আর উনার অনুযায়ীদের নামে মিথ্যা কেস বানিয়ে দিয়েছিল।

৩। হত্যার মিথ্যা মোকদ্দমা ঃ- ষড়যন্ত্রকারীদের কুচক্রের কথা শুনে, অসামাজিক তত্ত্ব নিয়ে সতলোক আশ্রম করৌথায় আক্রমণ করতে এসেছিল, কিছু আক্রমণকারী। তার মধ্যে একজন আক্রমণকারীর মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। কেননা ঐ সময় আক্রমণকারীও গুলি চালাচ্ছিল পুলিশও গুলি চালাচ্ছিল আর আশ্রমবাসী নিজে বাঁচার জন্য ফাঁকা ফায়ার করে যাচ্ছিল। আশ্রমের বন্দুকের গুলিতে তার (আক্রমণকারীর) মৃত্যু হয়নি। কেননা সরকার দ্বারা মধুবন পরীক্ষা বা সন্ধান কেন্দ্রের রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলেছে যে, আশ্রমের বন্দুকের গুলি দ্বারা তার মৃত্যু হয়নি। সন্ত রামপাল মহারাজজীর হাজার অনুযায়ী আশ্রমে সৎসঙ্গ শুনতে গিয়েছিল। তারা সবাই ওখানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সত্য ঘটনা সব দেখেছে।

সন্তরামপাল দাস মহারাজকে দোষী বানানোর জন্য মিথ্যা মুকদ্দমা তৈরী করে বলেই যে, রামপাল মহারাজের বন্দুকের গুলিতেই ওই লোক মারা গেছে। যখন সরকার অনুসন্ধান করে তখন দেখলেন ওই বন্দুকের গুলি নয়। উনারা এও বলতে পারেনি যে, কবে আশ্রমের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়েছিল।

ভাবার্থ হল, এই যে আগের অনেক মাস ধরেও ওই বন্দুক থেকে কোন গুলি ছাড়ার প্রয়োগ

হয়নি। পরমাত্মার বিধান যে কি, 'সাঁচ কো আঁচ নহী''।

এই রকম অন্যায় ও অত্যাচার বর্তমানের কিছু ভ্রষ্ট রাজনেতা ও ভ্রষ্ট কিছু অধিকারী করছেন। ন্যায়ালয়ের ছবিও কিছু ভ্রষ্ট জর্জ নষ্ট করছেন। উচ্চ ন্যায়ালয় বা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে, ও কিছু স্বার্থী ভ্রষ্ট জর্জ নিজের স্বার্থের জন্য অন্যায় করছেন। এই সময়ে 'পৃথিবীর উপর অবতার' আসা স্বাভাবিক, এটাই পরমাত্মার বিধান। বর্তমান কলিযুগে অন্যায়, অত্যাচার, অপরাধ ও অধর্ম বেড়ে গিয়েছে। বেশীর ভাগ রাজনেতা অন্যায়ী হয়ে গিয়েছেন। এই সবের সমাধান তখন অবতারগণই করে থাকেন।

।। অবতারের পরিভাষা ।।

অবতারের অর্থ হল সর্বোচ্চ স্থান থেকে নীম্ন স্থানে অবতীর্ণ হওয়া। বিশেষ করে এই শুভ শব্দ ওই স্থানে অবতীর্ণ হওয়া। বিশেষ করে এই শুভ শব্দ ওই উত্তম আত্মার জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে;যিনি পৃথিবীতে এসে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন অসাধারণ কায্যকলাপ করে থাকেন। যাকে পরমাত্মার কাছ থেকে পাঠানো হয়েছে কিংবা স্বয়ং পরমাত্মাই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে এসেছেন মানা হয়ে থাকে।

শ্রীমদভাগবদ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং ১৬-১৭ তে তিন পুরুষের (প্রভুর) জ্ঞান আছে।

▣ **১। ক্ষর পুরুষ ঃ-** যাকে ব্রহ্ম বলা হয়। **ওঁ** নাম এই ব্রহ্মের সাধনা মন্ত্র। যাহার প্রমাণ, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১৩ তে দেখতে পাবে।

▣ **২। অক্ষর পুরুষ ঃ-** যাকে পরব্রহ্ম বলা হয়। **তত্** মন্ত্র এই পরব্রহ্মের সাংকেতিক সাধনা মন্ত্র। প্রমাণ, গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২৩ শে।

▣ **৩। উত্তম পুরুষ তুঃ অন্যঃ —** শ্রেষ্ঠ পুরুষ তো দুই পুরুষ ছাড়া অন্য। (ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ ভিন্ন)। তিনি হন পরম অক্ষর পুরুষ। যেখানে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১-এর উত্তরে ৮ অধ্যায় ৩-এ বলা হয়েছে, তার নাম হল পরম অক্ষর ব্রহ্ম। তাহার সাংকেতিক জপ হল **সত্**। এই পরমেশ্বরকে প্রাপ্তি হলে সাধকের পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত হবে। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-তে এই পরমেশ্বর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) গীতা জ্ঞান দাতা থেকে আলাদা। অধিক জ্ঞান জানতে হলে কৃপা করে পুস্তক **"জ্ঞান গঙ্গা"** সতলোক আশ্রম (বরবালা) থেকে প্রাপ্ত হবে। অবতার দুই প্রকারে হয়ে থাকে, তবে আপনারা জানলেন। যে কি মুখ্য রূপে তিন পুরুষ (প্রভু)। যার উল্লেখ উপরে দেওয়া হয়েছে। আমাদের জন্য মুখ্য ভূমিকা করতে দেখাচ্ছে দুই প্রভু।

১। ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) ঃ— যাহা গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৩২ শে নিজে নিজেকে কাল বলে।

২। পরম অক্ষর পুরুষ (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) ঃ- যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৩ তথা ৮, ৯, ১০-এ এবং গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-তে। ১৫ অধ্যায় শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং ১৭ তে বলা হয়েছে।

।। ব্রহ্ম(কাল)-এর অবতারের বিষয় পরিচয়।।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৭

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৭ ।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থান ম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
"যদা, যদা, হি, ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ, ভবতি, ভারত। অভ্যুত্থানম্, অধর্ম্মস্য, তদা, আত্মানম্, সৃজামি, অহম্।।

অনুবাদ ঃ— (ভারত) হে ভারত! (যদা যদা) যখন যখন (ধর্মস্য) ধর্মের (গ্লানিঃ) হানি বা ক্ষতি আর (অধর্মস্য) অধর্মের (অভ্যুত্থানম্) বৃদ্ধি (ভবতি) হয়ে থাকে (তদা) তখন তখন (হি)ই (অহম্) আমি (আত্মানম্) নিজের অংশ অবতার (সৃজামি) রচনা করি অর্থাৎ উৎপন্ন করি।

যেমন, শ্রীমদভাগবদ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৭ -এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, যখন যখন ধর্মে ঘৃণা উৎপন্ন হয় বা ধর্মের হানি হয় ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়। তখন আমি (কাল = ব্রহ্ম= ক্ষর পুরুষ) নিজের অংশ অবতার উৎপন্ন বা সৃজন করি।

যেমন, শ্রী রামচন্দ্রজী ও শ্রীকৃষ্ণদের কাল ব্রহ্মই পৃথিবীতে উৎপন্ন করে পাঠিয়েছিল। যাকে বিষ্ণুজী হিসাবে মানা হয়।

এছাড়া ৮ অবতার আরও বলা হয়েছে। যে কি শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং আসে না তার বদলে নিজের লোক থেকে নিজের আপন কৃপা পাত্র পবিত্র আত্মাকে পাঠায়। এদেরও অবতার বলা হয়। পুরাণে বা কোনো কোনো শাস্ত্রে ২৫ অবতারেরও উল্লেখ করা আছে। কাল ব্রহ্মে (ক্ষর পুরুষ)-র পাঠানো অবতার পৃথিবীতে অনেক বড় ধরনের অধর্মের নাশ সরাসরি সংহার করে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ - শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রী পরশুরাম অবতার রূপে এসেছিল এক অবতার রূপে এসেছিল। এক অবতার বাকী আছে যার নাম শ্রীনিঃকলঙ্ক জী। এসব অবতার ঘোর সংহার করেই অধর্মকে নাশ করে। অধর্মকে মেরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে। পরন্তু শান্তি না হয়ে অশান্তিই বাড়তে থাকে। যেমন শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে মারার জন্য যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধে কোটি কোটি পুরুষ মারা যায়। তার মধ্যে ধর্মী লোক অধর্মী লোক দুই তরফেই মারা যায়। তাদের স্ত্রী ও ছোট ছোট বাচ্চার জীবন নরক সমান হয়ে গেছিল। বিধবাদের অন্য ব্যক্তি ইচ্ছার বিরুদ্ধে শোষণ করত। খাওয়ার সমস্যা হত ইত্যাদি ইত্যাদি অশান্তি সামনে আসত। ওই নিয়মবিধি শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করেছিল, ঐ বিধি রামচন্দ্র ও পরশুরাম করেছিল। কাল ব্রহ্ম ঐ নিয়মবিধি নয় জন অবতারের সময় ও উৎপন্ন করেছিল। এক অবতার কলিযুগে বাকী আছে তার নাম হবে নিঃষ্কলঙ্ক অবতার। এই অবতারও কাল ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষের) কলিযুগের শেষের দিকে হবে। সেই যে নিঃষ্কলঙ্ক অবতার আত্মা, সে পূর্বে রাজা হরিশ্চন্দ্রেরই আত্মা ছিল। সম্ভল নগরে শ্রীবিষ্ণু দত্ত শর্মার ঘরে জন্ম নেবে। ওই সময় সব মানুষ অত্যাচারী ও অন্যায়ী হয়ে যাবে। উনি সবাই কে মারবে। ওই সময়ে যে যে মানুষের মনে পরমাত্মার ভয় থাকবে ও অন্যায় না করে সদাচারী হয়ে থাকবে, তাকে তাকে ছেড়ে দেবে এবং অন্য সবাইকে মেরে ফেলবে। এই বিধি হল ব্রহ্মের (কাল-ক্ষর-পুরুষের) অধর্মকে নাশ করে শান্তি স্থাপনা করার।

"পরম অক্ষর ব্রহ্মঅর্থাৎ সত্য পুরুষের অবতারের বিষয় জানা"

১। পরম অক্ষর ব্রহ্মস্বয়ং পৃথিবীর উপর প্রকট হয়ে থাকেন। তিনি সশরীরে আসেন ও সশরীরে ফিরে যান ঃ- এই লীলা পরমেশ্বর দুই ভাবে করে থাকেন।

(ক) প্রত্যেক যুগে শিশু রূপে কোনো সরোবরে পদ্মফুলে বা বনের মধ্যে প্রকট হয়। পদ্ম ফুলে শিশু রূপে থাকে তখন কোনো নিঃসন্তান প্রভু ভক্ত মাতা পিতা নিজের ঘরে নিয়ে লালন পালন করে বড় করে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচার করে অধর্মকে নাশ করে। সরোবরে পদ্মফুলে

অবতার হয় বলে, পরমেশ্বরকে নারায়ণও বলা হয়। (নার - জল, আয়ন-আসা) অর্থাৎ জলের উপর নিবাস যিনি করেন তাকে নারায়ণ বলা হয়।

(খ) যখন ইচ্ছা হয় তখনই সাধু সন্ত জীবন্ত রূপে নিজ (আপন) সত্য লোক থেকে পৃথিবীতে আসেন এবং ভালো ভালো আত্মাদের জ্ঞান দেন। সে পুণ্যাত্মাদের জ্ঞান দিয়ে অধর্মকে নাশ করে। তিনিও পরমেশ্বরের পাঠানো অবতার। কলিযুগে জৈষ্ঠ মাসে পূর্ণমাসী শুক্লাপক্ষে (সন্ ১৩৯৮)-তে সতলোক থেকে কবীর পরমেশ্বর এসেছিলেন, কাশী শহরে লহর তারা নামের এক সরোবরে পদ্মফুলের উপর শিশু রূপে বিরাজমান হয়েছিলেন। নীরু ও নীমা নামে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি ছিলেন, তাকে সমাজ থেকে এক ঘরোয়া করে দিয়েছিলেন, মুসলমানরা জুলুম করে মুসলমান হতে বাধ্য করেছিল, নির্বাহ করা কিভাবে সম্ভব হবে, তাই কাপড় বুনে সংসার চালিয়ে যেতেন। তাদের তাঁতীও বলা যায়। সেই দম্পতি পদ্মফুলের মধ্যে থেকে শিশুকে এনে নিজের ঘরে নিয়ে যান। শিশুরূপধারী কর্বিদেব (কবীর দেব) ২৫ দিন পর্যন্ত্য খান নি। নীরু-নীমা ঐ জন্মেই পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও শিবের ভক্তও ছিলেন। মুসলমানের অত্যাচারে তাঁতীর কাজ করতেন, তারা তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল। বাচ্চা খাচ্ছে না দেখে, নীমা তার ইষ্টদেব শিবকে স্মরণ করেছিলেন। শিব সাধু বেশে এসে বালক রূপ কবীর পরমেশ্বরকে দেখছেন। বালক রূপে কবীর সাহেব শিবকে বললেন। শিব এদের বলো কুমারী গায় নিয়ে আসতে। ও তোমার আশীর্বাদে দুধ দেবে। কুমারী গায় আনা হলে, শিব ভাগবান, পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে গায়ের কোমড়ে হাত দিয়ে চাপর মারলেন তক্ষুনি কুমারী গায়ের বাট থেকে দরদর করে দুধ বেরোতে শুরু করল। একখানি বাসনে দুধ ভরে যাওয়ার পর আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল দুধ পরা। এইভাবে প্রত্যেক দিন কুমারী গায় দুধ দিত আর পরমেশ্বর কবীর সাহেব খেতেন। তাঁতীর ঘরে জন্ম হয়েছে বলে কবীর পরমেশ্বর তাঁতীর কাজই করতেন, আর ভাল ভাল আত্মা দেখে তাদেরকে আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান বোঝাতেন। তার মধ্যে কিছু কিছু মহাত্মাকে সতলোক ঘুরিয়ে আবার পৃথিবীতে পাঠাতেন। মহাত্মাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়েই পৃথিবীতে পাঠাতেন। তারাও পরমেশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করে, অধর্মের নাশ করতেন। সতলোক থেকে পরমেশ্বরের অবতার হয়ে কে কে এসেছেন?

(1) আদরণীয় ধর্মদাস জী (2) আদরণীয় মলুক দাস জী (3) আদরণীয় নানক দেব সাহেব জী (শিখ ধর্মের প্রবর্তক) (4) আদরণীয় দাদু সাহেব জী (5) আদরণীয় গরীব দাস জী, গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝঝজড় (হরিয়ানা) বালা, আদরণীয় ঘীসা সাহেব জী, গ্রাম খেখড়া, জেলা-মেরঠ (উত্তরপ্রদেশ) বালা, এই উপরোক্ত সমস্ত অবতার পরম অক্ষর ব্রহ্ম(সত্য-পুরুষ)-এর ছিল। তাহারা যার যার কাজ করে চলে গেছে, অধর্মকে নাশ করে গেছে। তার জন্য বেশী সময় ধরে জনতার মধ্যে খারাপ আসতে পারেনি। বর্তমান সাধু সন্ত কম নেই, তবে শান্তির নাম নেই, কারণ এই সন্তসাধুরা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধনা করাচ্ছে। তার জন্যই সমাজে অধর্ম বেড়ে চলেছে। এই সব সম্প্রদায়ের এক কোটি বছর হয়ে গেছে জ্ঞান প্রচার করতে করতে, তবুও অধর্ম বেড়েই চলেছে।

"সত পুরুষের বর্তমান অবতার"

যে সত্য সাধনা আর তত্ত্বজ্ঞানের প্রচার পরমেশ্বরের পূর্বোক্ত, পরমেশ্বরের অবতার সন্তেরা (গুরুরা) করতেন। যার কারণে একজন অন্যজনের প্রতি প্রেম ভালবাসা রাখত, একব্যক্তি অন্যব্যক্তির দুঃখে কাতর হয়ে সাহায্যাদি করত। ওই সময়ে যেমন শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা ছিল, ঠিক সেই

রকম আধ্যাত্মিক সঠিক জ্ঞান, তত্ত্বদশী সন্ত রামপাল দাসজি মহারাজকে পরমেশ্বর কবীর সাহেব প্রদান করেছেন। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে শুক্লপক্ষের প্রথমায় দশটায়, জীবন্ত মহাত্মা রূপে সতলোক থেকে এসে, সন্ত রামপাল দাসজি মহারাজকে সতনাম ও সারনাম দান করার আদেশ দিয়ে অন্তর্ধ্যান হন।

সন্ত রামপাল দাসজিও পরমেশ্বরের (পরম অক্ষর পুরুষের) ওই অবতারের মধ্যে এক অবতার আছেন। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা অধর্মের নাশ করছেন, এখন বিশ্বে শান্তি হবে। সমস্ত ধর্ম তথা সমস্ত পন্থের ব্যক্তিরা এক হয়ে প্রেম ভালবাসা বজায় রেখে চলবে। রাজনেতারা হবে নির্ভিমানী এবং ন্যায়কারীরা ও অন্যান্যরাও পরমাত্মার ভয়ে কাজ করতে থাকবে এবং জনতাদের সেবক হয়ে নিষ্পক্ষ হয়ে কার্য্য করবে, পৃথিবীতে পুনঃ সত্যযুগের মত স্থিতি হবে। বর্তমানে ধরতীর (পৃথিবীর) উপর সে অবতার সন্ত রামপাল দাসজি মহারাজ এখন ঘরে ঘরে পরমেশ্বরের জ্ঞানের চর্চা (আলোচনা) হবে এইরকমই শুরু করাবেন। যেখানে গ্রামে, শহরে, পার্কে বসে সবাই তাস খেলতো, কেউ রাজনীতির আলোচনা, স্বামী স্ত্রীর বিবাদের কথা, কোন বন্ধুর বা পুত্রের ভালো মন্দ আলোচনা করতো, আজ থেকে সেখানে পরমেশ্বরের মহিমার চর্চা হবে আর 'জ্ঞান গঙ্গা পুস্তকে লেখা জ্ঞানের উপর বিচার করবে। পরমাত্মার মহিমা করা মাত্রই পুণ্যের ভাগী হবে, পরে শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা করে জীবন সুখী বানাবে ও আত্মকল্যান করবে। এই কলিযুগে সত্যযুগের মত সময় আসবে, অনেক ভাগ্য হলে এই সময়টা পাওয়া যায়। তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল দাসজি মহারাজই বর্তমানের বাস্তবে ধরতীর উপরে অবতার হয়ে এসেছেন, অধিক জানতে হলে, কৃপা করে পুস্তক ধরতীর উপর অবতার পড়েন (সম্পূর্ণ)।

এই সময়টা পায় নি। কারণ তারা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধনা করে শরীর ত্যাগ করেছেন। আজ পরমাত্মার অবতার এসেছেন, এই জীবাত্মা তাহারই সন্তান, তিনি সবাইকেই ভালবাসেন। যেমন ডাক্তারের কাছে বড়লোক ও গরীবলোককে সমান ভাবে চিকিৎসা করে থাকেন। ডাক্তার রোগীকে। বসতে বললে বসে, শুয়ে থাকতে বললে শুয়ে থাকে। বেরিয়ে যেতে বললে বেরিয়ে যায়, রোগীর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না। ঠিক সেই ভাবে আদরণীয় গুরুদেবের কাছে গেলে, অসাধ্য কামনাও সাধ্যে পরিণত হয়ে যায়। তার অনেক প্রমাণ গুরুদেবের অনুযায়ী শিষ্যদের কাছে রয়েছে। এই পুস্তকে পিছনের পাতায় তার কিছু কিছু ব্যক্তির আত্মাকথা বলা হয়েছে। এই রকম যদি প্রতিটি অনুযায়ী শিষ্যের মুখ থেকে শুনে লেখা হয় তাহলে, বইয়ের পাতা ভরে যাবে। আজ যতজন আমরা, উনার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছি, আমরা উনার রূপ বা উনার দর্শনে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি মনে মনে খুব গর্বও অনুভব করছি। উনার সৎসঙ্গ যে একবার শুনবেন বা জানতে পারবেন, তখন সে যদি বুদ্ধি মান বা ঈশ্বর ভক্ত হয়। তাহলে, সে ভাববেন এই অনমোল (অর্থাৎ যার মূল্য করের দেওয়ার ক্ষমতা নেই), দূর্লভ তত্ত্বজ্ঞানের কথা তো আমরা কোনোদিন শুনিনি, এই তত্ত্ব এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? এই তত্ত্ব কোনো মানুষ বা দেবতার কাছেও পায় নি। কারণ আমরা মানুষ জনমকে তুচ্ছ জনম ভাবি। মানব দেহে তাড়াতাড়ি পরমেশ্বরকে সাধনা করতে শেখে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কাল ব্রহ্মের পুত্র, দূর্গা এই তিনদেবের মাতা, ক্ষর পুরুষ (কাল ব্রহ্ম) হল পিতা। তবে এই কাল ব্রহ্মেরও উপরে যিনি, তিনি হচ্ছেন আমাদের পরমেশ্বর কর্বিদের (কবীর সাহেব)। এই কবীর পরমেশ্বরের কৃপায় আজ আমাদের মাঝে আদরণীয় গুরুদেব সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজকে পেয়েছি, এই কথা ভাবতেই আনন্দে বুক ভরে যায়। ১৯৯৭ ফাল্গুন

মাসে শুক্ল তিথীর প্রথমার দিনে ১০ টার সময় জীবন্ত মহাত্মা রূপে সতলোক থেকে এসে, সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজকে সতনাম ও সারনাম দান করার আদেশ দিয়ে অন্তর্ধ্যান হয়ে গিয়েছিলেন।

সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজও পরমেশ্বর (পরম অক্ষর ব্রহ্ম)র অবতারের মধ্যে একজন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা অধর্মকে নাশ করতেই এসেছেন। এখন বিশ্বে শান্তি আসবে, সর্ব ধর্ম এক হবে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ভালবাসবে। রাজনেতারাও নির্ভিমানী, ন্যায়কারী ও পরমাত্মার ভয়ে কাজ করতে আরম্ভ করবেন। জনতার সেবক হয়ে নিষ্পক্ষভাবে কাজ করবেন ধরতীর উপর আবার সত্যযুগের মত স্থিতি তৈরী হবে। বর্তমানের ওই অবতার সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজ। এবার ঘরে ঘরে পরমেশ্বরের জ্ঞান চর্চা হবে। আজকাল গ্রামে ও শহরে বা পার্কে যেখানে সেখানে তাসের আড্ডা জমে, কেউ কেউ রাজনীতির কথা চর্চা করে। কেউ কেউ বা পুত্র, পুত্রী, বউয়ের চর্চা করে। পরে পরমেশ্বরের মহিমা চর্চা সব জায়গায় শোনা যাবে। "জ্ঞান গঙ্গা পুস্তকের লেখা সেই জ্ঞানের চর্চাই হবে বিচারও করবে। সত্যকে কখনও চাপা যায় না। এতদিন কাল ব্রহ্মের চক্রতে পরে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সব সাধনা করিয়েছেন পন্ডিতরা ও মহর্ষিরা। তাদের জ্ঞানে বেদ থেকে যা বুঝেছেন তাই বলেছেন। আর তাহা মেনে আমরা সাধনার প্রথমেই ভুল করেছি, আমাদের পূর্ব পুরুষরাও সেই ভুল সাধনা করে চলেগিয়েছেন, সেই কাল ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডের চুরাশীযোনিতে ঘোরার জন্য, বহু জন্মের ভাগ্যের ফলে এক এক জনের ভাগ্যে এই অবতারের সময়ের যুগে তাদের জন্ম হয়ে থাকে। তাই সবই প্রভু ভক্তকে বলা হচ্ছে যে, এই সুযোগ হাত ছাড়া করবেন না। আজ পর্যন্ত সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজের কাছ থেকে যারা যারা নাম উপদেশ নিয়েছেন। তারা তাদের পরিবারকে নিয়ে মনে করছেন যে আমরা স্বর্গের সুখ অনুভব করছি। আরও কিছু জানতে হলে পুস্তক 'ধরতী পর অবতার' কৃপা করে পড়বেন। সন্ত রামপাল দাস মহারাজ বাস্তবেই পৃথিবীর উপরে বর্তমানে অবতার হয়ে এসেছেন। তাহার কাছ থেকে নাম উপদেশ না নেওয়া পর্যন্ত, আশা করি তাহাকে বুঝতে আপনাদের দেরী হতে পারে, তবে তিনি প্রতিটি পবিত্র শাস্ত্র গ্রন্থের সত্য প্রমান নিয়ে। (সত্যকে প্রমান দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের ভিতরে যে গুঢ়-রহস্য তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বকে প্রমাণ সহিত বুঝিয়ে সবাইকে সত্যজ্ঞানের আলোতে অর্থাৎ অন্ধকার থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবতারিত হয়েছেন) অতএব আমাদের উদ্ধার করার জন্য এসেছেন। যারা জ্ঞানী বুদ্ধিমান, প্রভু প্রেমী, বা শাস্ত্রজ্ঞান মোটামুটি একটু আধটু বোঝেন। তাদের হয়তো এই "জ্ঞান গঙ্গা", পুস্তক পড়তে অসুবিধা হবে না। তারা এই সত্যকে হৃদয়ে ধরে যতন করতে চেষ্টা করবেন। আর মূর্খরা তাকে তো অনশোনা ভেবে উড়িয়ে দেবেন। এই গুঢ় রহস্য তত্ত্বজ্ঞান পড়ে আপনারা আশাকরি নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান/সৌভাগ্যবতীই মনে করবেন। যারা অনেক ধর্মমূলক শাস্ত্র পড়েছেন, সেই সব শাস্ত্র পুস্তক পড়ে যা অনুভব কোনদিন করতে পারেননি বা জানেননি, তা এই পুস্তক দ্বারা জানতে পারবেন। এই পুস্তকে সৎগুরু ও পরমেশ্বরের কৃপায় অনেক অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা বা উপলব্ধি করা ভক্তের হৃদয় স্পর্শ কাহিনীর সত্য ঘটনা আছে, সবই জানতে ও পড়তে পারবেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা ও পিতা কে? পরমেশ্বরের কাছে কারা গিয়েছেন, পরমেশ্বর পরমাত্মা দেখতে কেমন? তিনি যেখানে থাকেন সে স্থান কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি গুঢ় রহস্য তত্ব জানতে পারবেন। কৃপা করে অধিক জানতে হলে, পড়েন পুস্তক, "ধরতীর পর অবতার" (পৃথীবির উপর অবতার) (সম্পূর্ণ)।

।। “ভক্তি মর্যাদা” ।।

“জীব হমারী জাতি হে, মানব ধর্ম হামরা।
হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই, ধর্ম নহী কই ন্যারা।।”

প্রিয় ভক্তজনেরা,

আজ থেকে পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায় ছিল না। না ছিল হিন্দু, না ছিল মুসলিম না ছিল শিখ না ছিল খ্রীষ্টান, কেবল মানব ধর্মই ছিল। কিন্তু এখন যেমন ভাবে কলিযুগের প্রভাব বাড়ছে তেমন তেমন আমাদের মধ্যে মতভেদ বাড়ছে। কারণ মাত্র এই যে, ধার্মিক কুল গুরুর দ্বারা শাস্ত্রের সত্যকে চেপে রেখে দিয়েছে। তাতে তাদের স্বার্থ ও থাকতে পারে, বা নিজেদের পান্ডিত্যের বাহাদুরী দেখানোর ইচ্ছা থাকতে পারে, যার কারণে আজ ধর্ম চার ভাগ ও সম্প্রদায় অনেক হয়ে গেছে। এই কারণে মতভেদ স্বাভাবিক হতে পারে। কাহারও প্রভু /ভগবান/রাম/আল্লাহ রব/গড়/খুদা/পরমেশ্বর/পরমাত্মা, এ সব নামই একজনের। এ ভাষা ভিন্ন পর্যায়বাচী শব্দ। সবাই মানে বা জানে যে সবার মালিক সেই একই পুরুষ, তবুও এ আলাদা আলাদা সম্প্রদায় কেন?

একথা তো ঠিক যে সবাই আলাদা আলাদা নামে ডাকে, তবে তার বাস্তবিক নাম কবীর আর তিনি তার নিজে সতলোক/সতধাম/সচ্চখন্ডে মানব সদৃশ্য স্বরূপ আকারে থাকেন। কিন্তু এখন হিন্দু বলে আমার রাম বা কৃষ্ণ বড়, মুসলিম বলে আমার আল্লা বড়, ইসাই বলে আমার ইসামসীহা বড়, শিখ বলে আমার গুরু নানক বড়, এসব অবুঝ লোকেরা বাচ্চার মতই বলে। একমাত্র মানবকেই ভগবান বুদ্ধি দিয়েছে, বুদ্ধি থেকেও মানুষ নির্বুদ্ধি র মত কথা বলে। এই নির্বুদ্ধির জন্যই আমাদের সমাজে লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকে। একটা মানুষের আয়ূ মনে করেন। একশো বৎসর পর্যন্ত্য, ভগবান আত্মার উন্নতির জন্য মানব জনম দিয়েছেন। পশু পাখী এইভাবে চুরাশী লক্ষ নানান ধরনের যোনীতে জন্ম নেবার পরে, এই মানব দূর্লভ জনম পায়। তার ভাগ্যে আর কবে এই মানব জনম হবে। এই কথা কাহারও জানা নেই। পশু যোনিতে ভুগে কোন রকমে ভাগ্যের ফলে সেই আত্মা মানব রূপে দেহ পেয়েছে। পশুরা তো সাধনা করতে জানে না কথা বলতেও জানে না, তারা ভগবানের সাধনা করতেও জানে না, এবার সেই যোনি ছেড়েমানব যোনি পেয়েছে। এখন বুদ্ধিমান মানবের কি করা উচিৎ? নিজেরই ভাবতে হবে। তার আত্মার কল্যাণ বা উন্নতি কিভাবে করবে? কোন কুটুম্ব বা আত্মীয় স্বজন করে দেবে না। কারণ ভগবানের দেওয়া মানব দেহেব তার আত্মা পশু যোনি ভুগে ফিরে এসেছে। এখন সে নিজে ভাবুক। ব্রহ্মকালের এই ব্রহ্মান্ডে স্বর্গ মহাস্বর্গও আছে, আর তার উপরে আছে সৎলোক। সেখানে আগে আমাদের ঘর ছিল, সেখানে গেলে কোন দুঃখ নেই পরম শান্তি ও চিরদিনের জন্য সুখ পাওয়া যায়। স্বর্গে গেলেও আবার জনম নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে বেড়াতে হয় কারণ যতদিন পূণ্য, ততদিন স্বর্গে থাকতে পারবে, তবে চিরদিন কেউ স্বর্গ ভোগ করতে পারে না। কারণ এই স্বর্গ মহাস্বর্গ কালের মায়া জাল বিছানো ব্রহ্মান্ডের মধ্যে আছে। আরও অনেক অনেক জ্ঞান আমাদের আদরণীয় গুরু মহারাজের

কাছে শুনতে পাবেন। ব্রহ্মান্ড কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন সে বা কে? ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মাতা বা পিতা কে? সব শাস্ত্রের ভেতরে যে গুঢ় রহস্যের সত্য লুকিয়ে আছে, তাহা দেব দেবীরাও জানে না, মহর্ষি বা সাধু মহন্তরাও সত্যকে খুঁজে কোনদিন পায়নি। এইবার আমাদের মাঝে এসেছেন আদরের পূজ্য গুরুদেব যাহাকে পরমেশ্বর কবীর সাহেব পাঠিয়েছেন, সত্যকে প্রকাশ করার জন্য। যুগ যুগ ধরে মানুষ সাধনা করে সত্যের সন্ধান খোঁজ করে আজ পর্যন্ত্য পায়নি, তবে আমাদের সৌভাগ্য যে, আজ আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েছি বা কেউ পাব। তবে মানব জাতি বুদ্ধিমান, তারা নিজে বিচার করে দেখুক, কাল ব্রহ্মান্ডে থাকার ইচ্ছা না, ঈশ্বর পরমাত্মার সৎলোকে থাকার ইচ্ছা?

"কই কহে হমারা রাম বড়া হে কই কহে খুদাই রে
কই কহে আমার ইসামসীহ বড়া যে বাটা রহে লগাই রে।।"

আমাদের সব ধার্মিক গ্রন্থে ও শাস্ত্রে ঐ এক প্রভু / মালিক / রব / খুদা / আল্লাহ / রাম / সাহেব /গড়্/পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ নাম লিখে, মহিমা গেয়েছে যেকি, সেই এক মালিক প্রভু কবীর সাহেব, যিনি সতলোকে মানব সদৃশ স্বরূপের আকারে আছেন।

বেদ, গীতা, কোরান ও গুরু গ্রন্থ সাহেব, এসব বেশীর ভাগই সব গ্রন্থের সাথে সব গ্রন্থ মিল খায়। যজুর্বেদে অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ৩২ তে, সামবেদের সংখ্যা নং ১৪০০, ৮২২ তে, অথর্ববেদে কান্ড নং ৪-তে অনুবাক্ ১ -এর শ্লোক নং ৭-এ ঋগ্‌বেদে মন্ডল ১অধ্যায় ১ এ সুক্ত ১১-র শ্লোক নং ৪-এ কবীর নাম লিখে বলা হয়েছে, যে পূর্ণ ব্রহ্মকবীর যিনি সৎলোকে আকার রূপে থাকেন। গীতা চার বেদের সংক্ষিপ্ত সার। গীতাও ঐ পূর্ণ ব্রহ্মসৎপুরুষ কবীরের দিকে ইশারা করেছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭, গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৪৬, ৬২, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৮ থেকে ১০ তথা ২২-এ। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১-২-৪-এ বলা হয়েছে। ঐ পূর্ণ পরমাত্মার দিকে ইশারা করে। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ২৪-এর মধ্যে ও পৃষ্ঠা নং ৭২১-এ নাম লিখে কবীর সাহেবের মহিমা করেছে। এছাড়া বাইবেল ও কোরান একই শাস্ত্র বুঝবেন। দুটোতেই এক সংবাদ দিয়েছে যে কি, ওই কবীর আল্লাহের মহিমা বয়ান করো, যার সৃষ্টিতে এই সব চলছে। কোরান শরিফে সুরত ফুর্কানি নং ২৫-এর আয়ত নং ৫২ থেকে ৫৯ পর্যন্ত্য যে কবীরন্ খবীরা, কবীরু আদি শব্দ লিখে, এক কবীর অল্লাহে (শুদ্ধ) পাকি বয়ান করা হয়েছে যে কি, এ পয়গম্বর (মহম্মদ)! ওই কবীর অল্লাহের পাকি বয়ান করো, যে ছয় দিনে নিজের শক্তি দ্বারা সৃষ্টি রচনা করে, সাতদিনের দিন, সিংহাসনে গিয়ে বিরাজমান হয়েছে। অর্থাৎ সতলোকে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। সেই আল্লাহ (প্রভু) কবীর। এর প্রমান বাইবেলের ভিতর উৎপত্তি গ্রন্থে, সৃষ্টি ক্রমে বাইবেলের প্রারম্ভেই সাতদিন রচনায় ১:২০-২:৫-এ আছে।

সবই সন্ত (সাধু) বা গ্রন্থের সার এই যে কি, পূর্ণগুরু যিনি তার কাছে তিন নাম যদি থাকে, আর নাম দেওয়ার অধিকারও থাকে, সেই নাম নিয়ে জীব জন্ম মৃত্যু রূপী রোগ থেকে ছুটকারা বা ছাড়া পাওয়া দরকার। সেই রকম তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর সন্ধান করে তার কাছ থেকে নাম উপদেশ নেওয়া উচিৎ। এখানে আমাদের সবার আদরের পূজনীয় সৎ গুরু রামপালজী মহারাজ উদ্দেশ্য যে, সবাইকে কালের কারাগার (জেল) থেকে ছুটিয়ে, আমাদের মূল মালিক কর্বিদেব

(কবীরদেব)-এর সত লোক প্রাপ্তি করিয়ে দেওয়া। কর্বিদেব নিজের মুখের বাণীতে বলেছেন, যে যদি একটা জীবকে কাল সাধনা থেকে ছাড়িয়ে পূর্ণ গুরুর কাছে থেকে সৎ উপদেশ দিয়ে নিয়ে, আসলে তার পূণ্য এত হয় যে, কোটি কোটি গায় ও ছাগলকে কসাই খানা থেকে ছাড়ালে, সেই পরিমাণ যতটা হয় (ততটাই) পুণ্য হয়ে থাকে। কেননা এই অবোধ মানব শরীরধারী প্রাণী (জীব) ভুল গুরুর নাম উপদেশ নিয়ে, শাস্ত্র বিরুদ্ধে সাধনা শিখে, কালের জালে ফেঁসে চুরাশী লক্ষ যোনি ভুগে ভুগে এসেছে। যখন এই জীব আত্মা কর্বিদেব (কবীর দেব)-এর শরণে পূর্ণ গুরুর দ্বারা আসে ও নামের সাথে জুড়ে যায়, তখন থেকে তার জন্ম মৃত্যুর কষ্ট চিরদিনের মত সমাপ্ত হতে শুরু করে এবং সৎলোকে তারা বাস্তবিক শান্তি প্রাপ্ত করে। এখন প্রশ্ন এই যে, যেমন আজকাল গুরু অধিক থেকেও বেশী শিষ্য বানিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ দেখায়। এই ধরনের কেউ চার বাক্য শিখে বলে যে, আমিও নাম দিয়ে থাকি। এই রকমের ব্যক্তি সরল সোজা আত্মাকে কালের জালে ফাঁসিয়ে দেয়। কারণ শাস্ত্র বিরুদ্ধে নাম উপদেশ দেওয়া লোক ও জপনেবালা বা নাম নেওয়া ব্যক্তি নিশ্চি তই নরকের অধিকারী হবে এবং নরকে উলটো টাঙিয়ে রাখা হয়। এই কথা শাস্ত্র (গীতা, বেদ ও সর্ব গ্রন্থে) বলেছে। এই কথা প্রমাণ করার জন্য সংক্ষিপ্ত একটা কথা বলছি।

এক সময়ের কথা সবাই জানে যে রাজা পরীক্ষিতকে সাত দিনের দিন সাপে কাটবে এবং তাতেই তার মৃত্যু হবে। এই কথা সবাই জেনে ভাবতে লাগল, তবে কেনো না আমরা পরীক্ষিৎ রাজাকে ভাগবত্ কথা শোনানো হোক, তা কি, এই জগতের মায়া ছেড়ে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। সবাই বলল বেশ অতি উত্তম, কিন্তু ভাগবত কথা শুনাবে কে? ওই সময় সেখানে শ্রীমদ ভাগবত সুধা সাগর রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস ও অন্যান্য মহর্ষিরাও ছিলেন। বেদব্যাস নিজেকে অসমর্থ ভেবে নিল যে আমি এই কথা পরীক্ষিত রাজাকে শোনানোর যোগ্য নই। কেননা তিনি জানতেন যে, তাহার ভিতরে সমর্থন (শক্তি) যখন নেই, তাহলে কিসের জন্য এক জীবকে নষ্ট করে পাপের ভাগীদার হব। কেননা সাতদিনের দিন মৃত্যুর পরিণাম অনিবার্য। এই সাতদিন ধরে কথা বলার বা শোনানো কাহারও সাহস হয় নাই। কারণ সবাই আসল কারণ জানে। স্বর্গ থেকে শুকদেবকে ভাগবদ্ কথা শোনানোর জন্য ডেকে আনা হয়েছে আর তবেই রাজা পরীক্ষিতের এই জগতের মায়া কেটে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছিল। স্বর্গে সুখ কাটার পর আবার নরকে এসে পরে আবার চুরাশী লক্ষ চক্কর কাটাতে হবে। কারণ কালের ব্রহ্মাণ্ডে স্বর্গ মহাস্বর্গের সুখ হতে পারে যতদিন পুণ্য থাকে ততদিনের জন্য পুণ্য শেষ হলে, আবার চক্কর শুরু হয়ে যায়। কেউ ঘোড়া, গাধা, শুকর নানান পশু যোনির পরে ভাগ্যে যদি মানব জনম থাকে, তবেই সে এই বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা চুরাশি লক্ষ চক্করের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। এটাই এখানকার হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল বা নিয়ম অটল। এইসব উপলব্ধিও তিন লোকের পূণ্য গুরু বিনা প্রাপ্ত হতে পারবে না।

ঠিক এই প্রকারে যখন কোনো স্থানে প্রধান মন্ত্রী আসবেন জেনে, আগে থেকে দুটো তিনটে ভাল বক্তা, গায়ক তবলা বাদক, এসে তাদের সুরীলী ও আকর্ষণ আওয়াজে দর্শককে প্রভাবিত করে দেয়। কিন্তু গানের মধ্যে যে ভাষা বা বক্তা যে কথা বলে যাচ্ছে ওর মধ্যে একটা কথা মানা বা পালন করা সক্ষম তাদের নেই শুধু বক্তব্য করে, বা গানের সুরে বুঝিয়ে সবাইকে কাল জালে ফাঁসায়, নিজেরা কিন্তু তা পালন করে না। কিন্তু যখন প্রধান মন্ত্রি আসেন কম থেকে কম শব্দে

বলেন যে, আগরায় ইন্টরনেশনল কলেজ বানিয়ে দাও। চন্ডিগড়ে ইন্টর নেশনল ইউনিভার্সিটি বানিয়ে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু এই টুকু কথা বলে পী.এম. সাহেব চলে যায়। তার বলার পরের দিন কাজ শুরু হয়ে যায় কেননা তার বচনে শক্তি আছে। আর যদি ওই কথা সামান্য ধরনের ব্যক্তি বলে, তাহলে মূর্খতাই হবে, কারণ সামান্য (সাধারণ) ব্যক্তির বচনে শক্তি নেই। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর কাছে এ বাক্য সাধারণ। এই তথ্য প্রমাণ করার জন্য নীচে বাণী কবীর পরমেশ্বরমুখের কথা, গভীর বিচার করে শীঘ্র গুরু মন্ত্র প্রাপ্ত করুন।

কবীর ঃ- পন্ডিত ওর মশালচী; দোনো সুঝে নাহি।
ওরনে করে চাঁদনা, আপ অন্ধেরে মাহি।।

কবীর ঃ- করনী তজ কথনী কথৈ, অজ্ঞানী দিন রাত
কুকুর জিউ ভৌকত ফেরে, সুনী সুনাই বাত।

গরীব ঃ- বীজক কী বাতা কহে কহে, বীজক নাহি হাত
পৃথীবি তোবনে উত্তরে, কহে কহে মিঠি বাত।

গরীব ঃ- বীজক কী বাতা কহে কহে, বীজক নাহি পাস
ওরকো প্রমোধ হি, আপন চলে নিরাশ।।

গরীব ঃ- কথনী কে শুরে ঘনে, কথৈ অটম্বর জ্ঞান
বাহর জবাব আবে নহী, লীদ করে মৈদান।।

কথা শাস্ত্র করা ও নাম উপদেশ দেওয়া, কোন শিশুর খেলনা নয়, যেকি হাতে শাস্ত্র বই নিয়ে বেরিয়ে বলে যে, চলো শাস্ত্র জ্ঞান দিয়ে দিচ্ছি, রামায়ণ ও পাঠ শুনিয়ে দিচ্ছি, গীতা পাঠ করে দিচ্ছি, সতসঙ্গ করে দিচ্ছি, ও মন্ত্র দিয়ে দিচ্ছি। যিনি পূর্ণ (সন্ত) সাধু শুধু উনারই অধিকার আছে, নাম উপদেশ দেওয়ার এবং কথা সমাপ্ত ও তিনি করতে পারেন। কেননা পূর্ণ সন্তর (সাধুর) বাক্যে শক্তি হয়ে থাকে। যেমন শুকদেবের বাক্যে শক্তি ছিল। যদি, কেউ সৎসঙ্গে আমের গুণের মহিমা আলোচনা করছে যে, আম খুব মিষ্টি, ফলের রাজা আম, আমের রঙ হলুদ হয় পাকলে, এবং কাঁচা থাকতে সবুজ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সেই কথা শুনে কেউ যদি বলে আমায় আম দাও। তখন আমের মহিমা গাওয়া ব্যক্তি বলে যে, আমার কাছে তো আম নেই, আর আম চাওয়া ব্যক্তি পরে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহলে আম কোথায় পাওয়া যায়? তার উত্তরে যদি সে ব্যক্তি বলে যে, তা তো জানি না, আম তো নিরাকার আম তো দেখতে পাওয়া যায় না। তখন আম চাওয়া ব্যক্তি বলতেই পারে যে, আরে নাদান (অবুঝ) যখন তোমার কাছে আম-ই নেই আর এটাও জানো না যে আম কোথায় পাওয়া যাবে, আবার আমের রঙ গুণের ব্যাখ্যা দিচ্ছ, আরও জানাচ্ছ, নিরাকার, তাকে কি দেখা সম্ভব, এসব নিরর্থক কথা বলে চেচাচ্ছে বা লোকের ভীড় জমাচ্ছে কেন? এই কথার অভিপ্রায় যে, যিনি আমের সন্ধান জানে, আগে তার সন্ধান করতে হবে। তত্ত্বজ্ঞান রহিত বা বিনা অধিকার ছাড়া কাউকে শুনালে বা যে শোনে দুইজনেই নরকের অধিকারী হয়ে থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি নিজে নিজেই গুরু হয়ে শিষ্য তৈরী করে নেয়, তাহলে বুঝবে নিজের মাথায় নিজেই বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কেননা ঈশ্বরের নিয়ম আছে, যতক্ষণ শিষ্য মোক্ষ লাভ না করে, ততক্ষণ সেই গুরুর বার বার জনম নিতে হয়। অধুরা শিষ্য যাতে সেই গুরুকে ঘৃণা করে, সেইজন্য পূর্ণ গুরু

এই লীলা করে। শিষ্য যদি মোক্ষলাভ না করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই সেই গুরুর প্রতি ঘৃণার প্রতিভাবই জন্ম হয়ে পড়ে। যেমন কবীর সাহেব যখন কাশীতে প্রকট হয়েছিলেন ওই সময় কবীর সাহেবের চৌষট্টি লাখ শিষ্য হয়ে গিয়েছিল। ওদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কবীর সাহেব, কাশী শহরে এক বিখ্যাত নামের বেশ্যার ঘরে সৎসঙ্গ করা শুরু করে দিয়েছিল। যা দেখে ও শুনে শিষ্যদের গুরুর প্রতি ঘৃণা জন্মেছিল, আর বিশ্বাসও উঠে গিয়েছিল, কেবল দুই শিষ্য ছাড়া সব গুরু হারা (বিহীন) হয়ে গিয়েছিল। সতগুরু গরীব দাস জী মহারাজের বাণীতে প্রমাণ ঃ-

গরীব ঃ- চন্ডালী কে চৌক মে, সত গুরু বৈঠ যায়,
চৌষঠ লাখ গারত গই, দোরহে সদ গুরুর পায়।।
ভরবা ভরবা সব কহে, জানত নাহি খোঁজ
দাস গরীব কবীর করম সে, বাঁটত শির কা বোঝ।।"

আমি আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা করছি যে কি ভেবে চিন্তে বিচার করে কেনাকাটা করবেন।

সামবেদ শ্লোক নং ৮২২ শে বলেছে যে, জীবের মুক্তি তিন নাম দ্বারা হবে। প্রথম ওঁ, দ্বিতীয় সতনাম্ (তত্) ও তৃতীয় সার নাম (সত্)। গীতায়ও এর প্রমাণ আছে। ওঁ তত্ সত্ আর এই নাম গুরু গ্রন্থ সাহেবেও সতনাম জপার ইশারা করেছে। সতনাম সতনাম কোনো জপের নাম নয়। এতো শুধু ওই নামের দিকে ইশারা করে বলেছে যেটা হল সত্যিকারের আসল নাম। এই নাম সারনামেও বোঝায়। শুধু ওঁ মন্ত্রে কোনো কাজ হয় না। এ তিননাম ও নাম দেওয়ার আজ্ঞা, আমাকে আমার গুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দজী মহারাজের দ্বারা উপহার। যাহা কিনা কবীর সাহেবের আমল থেকে ধাপে ধাপে চলে এসেছে। আগে আপনারা সৎসঙ্গ কথা শুনুন সেবা করুন। যাতে আপনারা ভক্তি রূপী জমিতে ফসল ভাল হয়।

কবীর, মানুষ জন্ম পায় কর, নহী রটে হরি নাম
জৈসা কূয়া জল বিনা, খুদবায়া কিস কাম।।
কবীর, এক হরি কে নাম বিনা, এ রাজা ঋষভ হো
মাটি ঢোবে কুমোর কি, ঘাস ন জনে কই।।

এবার সবাই নিজের জমি পরিস্কার করে বীজ বুনতে হবে। শাস্ত্র (কবীর সাহেবের বাণী, বেদ, গীতা, পুরান, কোরান, ধর্মদাস সাহেব, আদি আদি সাধুর বাণী) অধ্যয়ন পড়ে কোনো মুক্তি লাভ হয় না। এই সব শাস্ত্রের যে সার অংশ আছে যা মুক্তির জন্য পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের প্রতিনিধি সন্ত, (যিনি তার গুরুর আজ্ঞা দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত) তার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে আত্ম কল্যান করা দরকার। আর যদি নাম না নেওয়া হয়, তাহলে —

"নাম বিনা সুনা নগর, পড়া সকল মে শোর
লুট ন লুটি বন্দগী। হো গয়া হন্সা ভোর।
অদলী আরতী অদল অজুনী, নাম বিনা হে কায়া সুনী
ঝুঠী কায়া খাল লুহারা, জঙ্গলা পিঙ্গলা সুশোমন দ্বারা।
কৃতঘ্নী ভুলে নর লোই, যা ঘট নিশ্চয় নাম ন হই।
সো নর কীট পতঙ্গ ভুজঙ্গা, চৌরাশী মে ধর হে অঙ্গা।।

যদি বীজ না বোনা হয় তো আত্মা রূপী খেত মূল্যহীন অর্থাৎ তৈরী করাও বৃথা। অভিপ্রায় এই যে জ্ঞান হওয়াও খুব আবশ্যক এইজন্য পূর্ণ গুরুদ্বারা আত্মরূপী জমিতে বীজ বুনতে হয়। নাম ওই জপতে হবে যেকি গুরু নানক জী, গরীব দাসজী, ধর্ম দাসজী আদি সন্ত পুরুষ লোক জপেছিলেন, এছাড়া অন্য নামে কোনদিন মুক্তি হবে না।

এইজন্য আপনারা সবাই নাম উপদেশ নিয়ে নিজের ভক্তি রূপী ধন জমা করতে থাকেন এবং অন্য সবাইকেও জানিয়ে দেন, কারণ এই সময় আর ফিরে কে কবে পাবে, সেইটাই চিন্তা বা বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত তাড়াতাড়ি যে এই সময়ের লাভ উঠাতে পারে, তার আত্ম কল্যাণ তত তাড়াতাড়ি হবে। কেননা শ্বাসের কোন ভরসা নেই। সময় কারর জন্য অপেক্ষা করে না।

গুরু নানকজী বলেন ঃ-

না জানে এ কাল কী করে ভারৈ, কিস বিধি চল জা পাসাবে
জিন্দাদে সির তে মৌত খুড়গদী, উন্থানুর কেড়া হনসাবে।।

কবীর সাহেবজী বলেন ঃ-

"শ্বাস শ্বাস মে নাম জপো, ব্যর্থা শ্বাস মত খোয়ে
না জানে ইস শ্বাস কা, আবন হোকে না হোয়ে।
সতগুরু সোই সারনাম দৃঢ়াবে, ওর গুরু কই কাম না আবে।।
সারনাম বিন পুরুষ (ভগবান) দ্রোহী"।।

অর্থাৎ ঃ- যে গুরু সারনাম ও সারশব্দ না দেয় বা তার নিজের গুরু দ্বারা নাম দেওয়ার অধিকার (আজ্ঞা) না হয় অথবা শাস্ত্র অধ্যয়ন পড়ে কোন গুরু নাম দেয়, তাহলে গুরুও শিষ্যকে নরকে পাঠানো হয়ে থাকে। ওই প্রকারের গুরু ভগবানের শত্রু ও বিদ্রোহী। তাকে ভগবানের দরবারে উলটিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

বর্তমান ভক্ত সমাজে নকল গুরুর দ্বারা ভুল ধারণা ছড়িয়ে রেখেছে যেকি, একবার গুরু ধারণ করলে পরে, অন্য কোনো গুরু ধারণ করা যায় না। আপনারা বিচার করে দেখুন। যদি এক ডাক্তার রোগ বা অসুখ বিসুখ হলে, ঠিক না করতে পারলে, কি আপনারা অন্য ভাল ডাক্তারের কাছে যাবেন কিনা? যে ডাক্তার ঠিক ঠিক চিকিৎসা করতে জানে তার কাছে দেখবেন ভিড় লেগেই থাকে। কারণ যদিও কেউ ওই ডাক্তারের ঠিকানা না জানে তবে, অন্য লোকের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেখানেই দৌড়ে যায়। ঠিক এইরূপ গুরু জন্ম-মৃত্যু রূপী রোগ, ভাল করার বৈদ্য (ডাক্তার)। যেখানে গেলে আমরা চির সুখী হব ও জন্ম-মরণের রোগ হয় না। যেমন, ধর্মদাস সাহেবের আগের গুরু ছিলেন, শ্রী রূপদাসজী, যখন ধর্মদাসজী জানতে পারলেন যে ও গুরু পূর্ণ মুক্তি দাতা নয় তিনি সেই সময় ত্যাগ করে, পূর্ণ ব্রহ্মপরমেশ্বর সতপুরুষ কবীর সাহেবকে নিজের গুরু বানিয়ে পূর্ণ মোক্ষ সত্যলোক প্রাপ্ত করেছিলেন। ঠিক ওই রকম অসম্পূর্ণ গুরুকে ত্যাগ করা উচিৎ।

"ঝুঠে গুরুকে পক্ষকো, তজৎ না কীজে বারি।।"

।। গুরু ও নামের মহিমা বাণী।।

গরীব, বিন উপদেশ অচম্ভ হে, কিউ জিবত হে প্রাণ,
বিন ভক্তি কহা ঠৌর হে, নর নাহি পাষান।
গরীব, এক হরি কে নাম বিনা, নারি কুতিয়া হো,
গলী গলি ভৌকত ফিরে, টুক না জনৈ কো।
গরীব, বীবী পড়দে রহে থী, ডয়োটী লগতী বার,
গাত উঘারে ফিরতি হে, বন কুতিয়া বাজার।
গরীব, নকবেসর নক সে বনী, পহরত হার হমেল,
সুন্দরী সে সুনহী (কুতিয়া) বনী, সুনী সাহেবকে খেল।
কবীর, হরি কে নাম বিনা, রাজা ঋষভ হোয়ে,
মাটি লদৈ কুমোর কে, ঘাস না জলে কই।
কবীর, রাম কৃষ্ণ সে কোন বড়া, উন্হে বি গুরু কীন্হ,
তিন লোককে বে ধনী, গুরু আগে আধীন।
কবীর, গর্ভ যোগেশ্বর গুরু বিনা, লাগা হরি কে সেব
কহে কবীর স্বর্গ সে, ফের দিয়া সুখদেব।
কবীর, রাজা জনক সে নাম লে, কিন্হী হরি কে সেব (পূজা)
কহে কবীর বৈকুন্ঠ সে, উল্ট মিলে সুকদেব।
কবীর, সদ গুরু কে উপদেশ কা, লায়া এক বিচার
যে সদগুরু মিলতে নহী, জাতা নরক দ্বার
কবীর, নরক দ্বার সে দূত সব, করতে খেচা তান,
উনতে কবহু না ছুটতা ফির ফিরতা চারো খান।
কবীর, চার খানী সে ভ্রমতা, কবহু না লাগতা পাড়
শো ফেরা সব মিট গয়া সতগুরু কে উপকার।
কবীর, সাত সমুদ্র মসি করু, লেখনী করু বনরায়
ধরতীকা কাগদ করু, গুরু গুন লিখা না যায়।
কবীর, গুরু বড়ে গোবিন্দ সে, মন মে দেখ বিচার,
হরি সুমরে সো রহ গয়ে, গুরু ভজে হয়ে পাড়।
কবীর, গুরু গোবিন্দ দোও ঘড়ে, কাকে লাগু পায়,
বলিহারি গুরু আপনে, জিন গোবিন্দ নে দিয়া মিলায়।
কবীর, হরি কে রূঠতা, গুরু কে স্মরণ মে যায়
কবীর গুরু যেই রুঠজায়, হরি নহী হোত সহায়।।

"নাম কোন রামের জপতে হবে?"

।। গীতায় অধ্যায় ১৫-তে শ্লোক ১৬-তে।।

"দ্বৌ, ইমৌ, পুরষৌ, লোকে, ক্ষরঃ চ, অক্ষরঃ এব, চ
ক্ষরঃ, সর্বানি, ভূতানি, কুটস্থঃ, অক্ষরঃ, উচ্যতে।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ- এই সংসারে দুই প্রকারের ভগবান আছে, এক নাশবান অন্য অবিনাশী। এই সকল সম্পূর্ণ ভূত প্রাণীদের শরীর নাশবান (বিনাশ) হয়ে থাকে। আর জীবাত্মাকে অবিনাশী বলা হয়।

।। গীতা অধ্যায় ১৫-র শ্লোক নং ১৭-তে।।

"উত্তমঃ, পুরুষঃ, তু, অন্যঃ,পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ,
যঃ, লোকএয়ম্ আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ- উত্তম ভগবান অন্য তিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সবার ধারণ পোষন করেন এবং অবিনাশী পরমেশ্বর পরমাত্মা এই প্রকার বলা হয়েছে। উপরের শ্লোক যেমন দুই প্রকারের ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ছাড়া সতন্ত্র যে উত্তম পুরুষ তাকে পরমাত্মা বলা হয়। তাহাকেই গীতায় শ্লোকে বুঝিয়েছে যে ক্ষর অক্ষর ব্রহ্মের উপরে স্বতন্ত্র এক উত্তম পুরুষ আছেন। সবাই তাকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলে থাকেন।

আগেই বোঝানো হয়েছে বা আগের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও এই দুই পুরুষের উপরে যিনি তাকে এই শ্লোকে সতন্ত্র উত্তম পুরুষ নামে চিহ্নিত বা সংকেত করা হয়েছে। তাহলে আমরা যে কৃষ্ণ বা রামকেই আসল ঈশ্বর ভেবেছিলাম এখন বোঝা যাচ্ছে উনাদের উপরেও কেউ আছেন। কাল (ক্ষর ব্রহ্ম)-ই কৃষ্ণের মধ্যে এসে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, আরও এও দেখিয়েছেন যে যারা ঈশ্বরের স্তুতি করচ্ছেন যেমন মহর্ষি, বা অন্যরা, তারাও কালের মুখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন। কারণ এই কালকেই আমরা আসল ভগবান ভেবেছিলাম। আমাদের গুরুদেব তত্ত্বজ্ঞানী রামপাল দাসজী মহারাজের কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি। সত্যকে সাধনা করেও মহর্ষিরা পায়নি, আজ সেই কবীর পরমেশ্বরের পাঠানো অবতারের মুখে সত্যের সন্ধান পেয়েছি। কারণ ব্রহ্মাণ্ডে কতগুলো এই দেবতারা যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের কিভাবে সৃষ্টি, কে তার মাতা পিতা, আজ এই দেবতাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থের সারসরঞ্জাম প্রার্থনা করতাম ও পেয়েও যেতাম তাই ভাবিতাম এ সব দেবতাই ভগবান। কিন্তু এই জ্ঞান গঙ্গা, বইয়ের মধ্যে দূলর্ভ (অনমোল) জ্ঞানের ভান্ডার রয়েছে। একবার কেউ জেনে গেলে সে ঈশ্বর পরমেশ্বর ভিন্ন কাউকে জানতে চেষ্টা করবেন না। এই সব ব্রহ্মাণ্ডের উপরে সতলোকে যিনি পরমেশ্বর সাকার রূপে আছে, যিনি সব ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে সবার ভরণ ও পোষণ করছে তিনি হলেন আমাদের পরম অক্ষর ব্রহ্মকর্বিদেব (কবীর দেব) ক্ষর ব্রহ্মও অক্ষর ব্রহ্মের পিতা। সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে জানবেন। কিন্তু আগের মহাঋষি যে যা বুঝেছেন সেই ভাবে বুঝে চলেও গেছেন, কিন্তু গুঢ় রহস্যের তত্ত্বজ্ঞান তারাও জানতে পারিনি। আজ সেই পরমেশ্বর কবিদের (কবীর সাহেব) আমাদের মাঝে উনারই অবতারকে পাঠিয়েছেন আমাদের অজ্ঞানকে দূরীভূত করে, জ্ঞানের সত্য আলো ভরতে এসেছেন। তিনি হচ্ছেন রামপাল দাস জী মহারাজ আমাদের আদরের পরম পূজ্য গুরুদেব। তার জ্ঞানের তুলনা নেই, ভাবতে আমাদের অবাক লাগে, যে এত সত্য জ্ঞান কোথায় লুকিয়ে ছিল। এই জ্ঞান সম্ভবতঃ মানুষের দেওয়া সম্ভব নয়, মুনি ঋষিরাও এই জ্ঞান জানেন না। এত যুগের পরে আজ সত্য প্রকাশিত হচ্ছে দেখে, নিজেকে খুব ধন্য ও ভাগ্যশালী মনে হচ্ছে। এই জ্ঞান গঙ্গা পুস্তক ও **"ধরতী পর অবতার"** পুস্তক পড়লে জ্ঞানী লোকেরা নিজেকে খুব ধন্য মনে করবেন তবে মূর্খদের কাছে। জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়।

কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হে, নিরঞ্জন বাকী ডার,
ত্রিদেবা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) শাখা ভয়ে পাত ভয়া সংসার।।
কবীর, তিন দেব কো সব কই ধ্যাবে, চৌথা দেব কা মরম না পাবে,
চৌথা ছান্ডি পঞ্চম ধ্যাবে, কহে কবীর সো হমরে আবে।।
কবীর, তিন গুণন কী ভক্তিমে ভুলি পরয়া সংসার,
কহে কবীর নিজ নাম বিন, কৈসৈ উতরে পার।।
কবীর, ওঁকার নাম ব্রহ্মা (কাল) কা, যহ কর্ত্তা মতি জানি,
সাঁচা শব্দ কবীর কা, পরদা মাহি পহিচানি।।
কবীর, তিন লোক সব রাম জপত হে, যান মুক্তি কো ধাম,
রামচন্দ্র বশিষ্ঠ্য গুরুকিয়া তিন কহি , শুনাও নাম।
কবীর, রাম কৃষ্ণ অবতার হে, ইনকা নাহি সংসার
জিন সাহেব সংসার কিয়া, শো কিন্তু ন জন্মা নারি।।
কবীর, চার ভূজাকে ভজন মে ভুলি পরে সব সন্ত,
কবীরা সুমিরৈ অসু কে জাকে ভূজা অনন্ত।।
কবীর, বশিষ্ঠ মুনিসে তত্ত্বেতা জ্ঞানী, শোধকর লগ্ন ধরে
সীতা হরণ মরণ দশরথ কো, বন বন রাম ফিরে।।
কবীর, সমুদ্রপাটি লঙ্কা গয়ে, সীতা কো ভরতার,
তাহি অগস্ত মুনি পীয় গয়ো, ইনমে কো করতার।।
কবীর, গোবর্ধন কৃষ্ণাজি উঠায়া, দ্রোনগিরি হনুমন্ত।
শেষ নাগ সব সৃষ্টি উঠায়া দ্রোনগিরি হনুমন্ত,।
শেষ নাগ সব সৃষ্টি উঠায়ী ইনমে তো ভগবন্ত।।
গরীব, দুর্বাসা কোপে তহা, সমঝ ন আই নীচ,
ছপ্পন কোটি যাদব কাটে, মচী রুধীর কি কীচ।।
কবীর, কাটে বন্ধন বিপতি মে, কঠিন কিয়া সংগ্রাম
চিহ্নরে নর প্রাণীও, গরুড় বড়ো কি রাম।।
কবীর, কহো কবীর চিত চেতহু, শব্দ করো নিরুবার,
শ্রী রাম চন্দ্র কো কর্ত্তা কহত হে, ভুলি পড়ে সংসার।।
কবীর, যিন রাম কৃষ্ণ নিরঞ্জন কিয়া, সো তো করনা ন্যার,
অন্ধা জ্ঞান ন বুঝই, কহে কবীর বিচার।।
কবীর, তিন গুণন কী (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) ভক্তিমে, ভুল পড়ে সংসার,
কহে কবীর নিজ নাম বিনা, কৈ সৈ উতরো পাড়।।

।।শব্দ।। (সন্ত রাম পাল দাস জী মহারাজ দ্বারা রচিত)।।

রামপাল, যুদ্ধ জিৎ কর পান্ডব, খুশী হুয়ী অপার
ইন্দ্র প্রস্ত কি গদ্দীপর, যুধিষ্ঠির কী সরকার।।

একদিন অর্জুন পুছতা, শুন কৃষ্ণ ভগবান
একবার ফির শুনা কৃষ্ণ দিয়ো, বো নির্মল জ্ঞান।।
ঘমাশান যুদ্ধ কে কারণ, ভুল পড়ী এ মোহে
জিউ কা তিউ কহনা ভগবান, তনিক না অন্তর হোয়ে।।
ঋষি মুনি ওর দেবতা, সবকো রহে তুম খায়,
ইনকো ভি নহী ছোড়া আপনে, রহে তুমহারা গুনগায়।।
কৃষ্ণ বলে অর্জুন সে, যহ গলতি কিউ কিনহ
এইসা নির্মল জ্ঞান কো ভুল গয়া বুদ্ধি হীন।।
অব মুঝে ভি কুছ য়াদ নহী ভুল পড়ি নিদান।
জিউ কা তিউ উস গীতা কা, মে ভি নহী কর সকতা গুনগান।
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কো য়াদ নহী ওর অর্জুনকে ধমকাবে
বুদ্ধি কাল কে হাত হে, চাহে ত্রিলোকী নাথ কহলারে।।
জ্ঞানহীন প্রচার কা, জ্ঞান কথৈ দিন রাত কি
জো সর্বকো খানো বালা, কহে উসিকে বাত।।
সব কহে ভগবান কৃপানু হে, কৃপা করে দয়াল।
জিসকি সব পূজা করে, বো স্বয়ং কহে মে কাল।।
মারে খাবে সবকো, বহ কৈসে কৃপাল
কুত্তে গধে, শুয়োর বনাবে হে, ফির ভি দীন দয়াল।।
বাইবেল বেদ কুরান হে, জৈ সৈ চাঁদ প্রকাশ
সুরজ জ্ঞান কবীর কা, করে তিমর কা নাশ।।
রামপাল সাচী কহে, করো বিবেক বিচার
সতনাম ব সারনাম, বহী মন্ত্র হে সার।।
কবীর হমারা রাম হে, বো হে দীনদয়াল
সঙ্কট মোচন কষ্ঠ হরণ, গুণ গাবে রাম পাল।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হে তিন লোক প্রধান
অষ্টঙ্গী ইনকী মাতা হে, ওর পিতা কাল ভগবান।।
এক লাখ কো কাল, নিত খাবে সীনা তান
ব্রহ্মা বনাবে বিষ্ণু পালে, শিব করদে কল্যাণ।।
অর্জুন ডরকে পুছতা হে, এ কোন রূপ ভগবান
কহে নিরঞ্জন সে কাল হুঁ, সবকো আয়া খান।।
ব্রহ্মনাম ইসিকা হে বেদ করে গুনগান,
জনম মরণ চৌরাশী এহে ঈসকা সংবিধান।।
চার রাম কি ভক্তি সে, লগ রহা সংসার
পাঁচবে রাম কা জ্ঞান নহী জো পাড় উতরান হার।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুন হে, দুসরা প্রকৃতিকা জাল
লাখ জীব নিত ভক্ষন করে, রাম তিসরা কাল।।
অক্ষর পুরুষ হে রাম চৌথা জৈসে চন্দ্রমা জান
পাঁচবা রাম কবীর হে, জৈসে উদয় হুয়া ভান।।
রাম দেবানন্দ গুরুজি কর গয়ে নজর নিহাল
সতনাম কা দিয়া খজানা, বরতে রামপাল।।

।।নাম (দীক্ষা) নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য কিছু আবশ্যক বিষয়।।

(১) পূর্ণ গুরুর পরিচয় ঃ- আজ কলিযুগে ভক্ত সমাজের সামনে পূর্ণ গুরুকে চেনা এক জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এর সরল ও সাধারণ উত্তর আছে, যে গুরু শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি করান, নিজের শিষ্যদেরও করান নিজেও করেন, সেই হল পূর্ণ সাধু বা সন্ত। ভক্তি মার্গের ধার্মিক সংবিধান শাস্ত্র যেমন—কবীর সাহেবের বাণী, নানক সাহেবের বাণী, সন্ত গরীব দাসজী মহারাজের বাণী, সন্ত ধর্ম দাসজী মহারাজের বাণী, বেদ, গীতা, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সন্ত শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি সাধনা করায়, ভক্ত সমাজকে মার্গ দর্শন দেখায় উনিই পূর্ণ গুরু। সন্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধে সাধনা করালে তাকে ভক্ত সমাজের দুষ্মন বা শত্রু বলে জানবে। মানুষের এই দূর্লভ মানব আত্মার সঙ্গে খেলা করছে এই ধরনের গুরু বা সাধু (সন্ত) ভগবানের বিচার দরবারে ঘোর নরকে পাঠিয়ে উলটো ঝুলিয়ে রাখে। উদাহরণ -যদি কোন অধ্যাপক সিলেবাস (পাঠক্রম) থেকে বাইরের শিক্ষাদেন তাহলে তিনি বিদ্যার্থীদের শত্রু জানবে।

।। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৫।।

ন, মাং, দুষকৃতিনঃ মুঢ়া প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ
মায়য়া, অপহৃত জ্ঞানা, আসুরং, ভাবম্ আশ্রিতাঃ।।

অনুবাদ ঃ- মায়ার দ্বারা যার জ্ঞান হরণ করা হয়ে গিয়েছে, এইরকম অসুর স্বভাব ধারণ করা মনুষ্য নীচ দূষিত কর্ম করা ব্যক্তি মূর্খ আমাকে ভজে না অর্থাৎ সে তিন গুণ (রজো গুণ ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব্য)-এর সাধনাই করে থাকে।

ভ্জযজুর্বেদ 40 নং অধ্যায় শ্লোক নং 10 (রামপাল দাস দ্বারা ভাষা ভাষ্য)ৰ

অন্যদেবাহু ঃ সম্ভবাদন্য দাহুর সম্ভবাৎ, ইতি শুশ্রুম ধীরানাং য়ে নস্তদ্বি চচক্ষিরে।।

বাংলা অনুবাদ ঃ-

পরমাত্মার বিষয়ে সাধারণত নিরাকার অর্থাৎ কোনদিন জন্ম নেয়নি বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ দ্বিতীয় আকারে জন্ম নিয়ে অবতার রূপে আসেন। পূর্ণ জ্ঞানী সঠিক প্রকারে শুনান, তাকে ঠিকভাবে সমরূপ যথার্থ রূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন রূপে করানো হয়।

।। গীতা অধ্যায় 4 নং শ্লোক নং 34।।

তত্ বিদ্ধি প্রনিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া
উপদেক্ষন্তি, তে, জ্ঞানম্ জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ।।

অনুবাদ ঃ- পরমেশ্বরের জ্ঞান ও সমাধান জানা সন্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে দন্তবাদ করে প্রণাম করলে

বা সেবা ও জিজ্ঞাসা কিংবা সরল হয়ে মনের ছলকপট ছেড়ে নম্র হয়ে প্রশ্ন করলে, সেই তত্ত্বজ্ঞানী পরমেশ্বরর জ্ঞান ও সমাধান জানাবেন।

(২) নেশা বস্তু সেবন করা নিষেধ ঃ-হুঁক্কা, মদ, বীয়ার, তামাক, বিড়ি, সিগ্রেট, নস্যি সুকা, গুটকা, মাংস, ডিম, আফিম, গাঁজা, যত নেশা জাতিয় পদার্থ বস্তু, খাওয়া থেকে দূরে থাকবে। এবং কাউকে এনেও দেওয়া যাবে না। বন্দী ছোড় গরীব দাস মহারাজ জী এই সব নেশা জাতীয় জিনিষকে খুব খারাপ বলেছেন তাহার মুখের বাণীতে বলে গেছেন ঃ-

"সুরাপান, মদ্য মাংসাহারী, গমন করে ভোগে পর নারী
সত্তর জনম কটত হে শীস, সাক্ষী সাহেব হে জগদ্বীশ
পরদ্বারা স্ত্রী কা খোলে, সত্তর জনম অন্ধা হোবে জেলে
মদিরা পীবে কড়বা পাণী, সত্তর জনম শ্বান কে জানি
হুক্কাঁ হরদম পিবতে, লাল মিলাবে ধুর
ইসমে সংশয় হে নহী, জন্ম পিছলে সুর।।
সো নারী জারী করে, সুরা পান শৌবার
এক চিলম্ হুক্কা ভরে, ডুবে কালী ধার।।
সু গউ কু খাত হে, ভক্তি বিহুনে রাড
ভাং তমাকু খা গয়ে, সৌ চাবত হে হাড়।।
ভাঙ তামাকু পীব হি, সুরা পান সে হেত
গৌস্ত মাট্টি খায় কর, জঙ্গলী বনে প্রেত।।
পান তামাকু চাবহি, নাস নাক মে দেত
সো তো ইরানে গয়ে, জিউ ভরভুজে কা রেত।।
ভাঙ তামাকু পীব হী, গোস্ত গলা কবাব
মোর মৃগ কুম্ভখত হে, দেঙ্গে কহা জবাব।।

(৩) তীর্থ স্থানের উপর যাওয়া নিষেধ ঃ-

কোনো প্রকারের কোনো ব্রত করা মানা। কোনো তীর্থ যাত্রা করা মানা, গঙ্গা স্নান অন্যান্য স্থানে স্নান করা মানা কোনো মন্দিরে বা কোনো ইষ্ট ধামে পূজা বা ভক্তি ভাবে যাওয়া মানা, ভগবান কোনো পশু নয় যে পূজারী তাকে বেঁধে রাখবে বা রাখতে পারে। ভগবান কোণে কোণে সুক্ষ্ম রূপে বিস্তার করে আছেন। এই সকল সাধনা কোনো শাস্ত্রে নেই, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে।

একটু বিচার করলে বুঝবে যে এসব তীর্থ (জগন্নাথের মন্দির, বদ্রীনাথ, হরিদ্বার, মক্কা-মদিনা, অমর নাথ, বৈষ্ণবদেবী, বৃন্দাবন, মথুরা, বরসানা, অযোধ্যা রামমন্দির, কাশী ধাম, ছুড়ানিধাম ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে মন্দির মসজিদ, গুরুদ্বারা, গীর্জা, ইষ্টধামে কোনো সন্ত লোক থাকতেন, সে সেখানে নিজে ভক্তি সাধনা করে ভক্তি রূপী ধন সঞ্চয় করে, শরীর ছেড়ে ইষ্ট দেব লোকে চলে গিয়েছেন। তারপরে তার স্মৃতি চিহ্ন প্রমাণিত রাখার জন্য, ওখানে মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, কেউ বা ধর্মশালা বানিয়ে রাখেন। যাতে তার স্মৃতি তাজা থাকে, আর আমাদের মত তুচ্ছ প্রাণীর প্রমাণ মিলতে থাকে। আমাদের এইরকম কর্ম করা উচিৎ যেরকম এই মহান সন্তর আত্মা করে গেছেন।

এই সব ধার্মিক স্থল সবই এই সংবাদ দেয়, যেমন এই সন্তের মতো তোমরাও করো। এই জন্য সবাই এইভাবে সাধনা করা ব্যক্তি বালা সন্তকে খোঁজো পরে তিনি যেমন বলেন তেমন করো। কিন্তু পরে তো এই স্থানেই পূজা আরম্ভ করা শুরু হয়ে যায়, সে একবারে ব্যর্থ এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধে।

এই সবই স্থান ঠিক এইরকম, যেমন এক মিষ্টি বানানোয়ালা উনোন, (উনান) বানিয়ে, জিলিপি, রসগোল্লা, লাড্ডু নানা ধরনের মিষ্টি বানিয়ে নিজে খেতেন ও সাথীদেরও খাওয়াতেন, এই ভাবে একদিন চলেও গেলেন এই লোক থেকে। তারপরে সেখানে না আছে মিঠাইয়ালা, না আছে মিঠাই, কেবল চুলা (উনুন) পড়ে রয়েছে। ওই উনুন ম্নতো মিষ্টি বানিয়ে খাওয়াতে পারবে, না আমাদের মিষ্টি বানানো শিখাতে পারবে। মিষ্টি থাকলে মিষ্টি খেয়ে পেট ভরা যেত, আর মিষ্টি যদি বানানো শেখা হতো তাহলে একটা সংসারে জীবিকার জন্য নির্বাহের রাস্তা খুলতো এই মিঠাই বানানো চুলা (উনুন) দেখে আমাদের কোন লাভ নেই, কারণ উনুন না মিষ্টি বানানো জ্ঞান দিতে পারবে, না পেট ভরাতে পারবে। এখন কেউ যদি এসে বলেন ভাই আসুন, আপনাকে ওই মিষ্টিয়ালার উনুন দেখাচ্ছি, আপনি চারিদিকে চক্কর কাটেন, ঐ মিষ্টিয়ালা এই উনুনে মিষ্টি তৈরী করতেন, আর আপনাদের মিষ্টি খাওয়াতেন। এই কথা শুনে কি আপনি মিষ্টি খেতে পারবেন? না আপনি মিষ্টি বানানোর পদ্ধতি শিখতে পারবেন, না মিষ্টি য়ালাকে দেখতে পাবেন? এই জন্য আপনাদেরও ঐ প্রকারের মিষ্টিয়ালাকে খুঁজতে হবে, যে সবার আগে আপনাকে মিঠাই খাওয়াবেন আর বানানোর পদ্ধতি শেখাবেন। তারপর তিনি যেমন শেখাবেন, সেই রকমই করবেন।

ঠিক এই প্রকারে তীর্থ স্থানে পূজা না করে ওই ধরনের সন্ত সাধুর খোঁজ করেন, যিনি শাস্ত্র অনুসারে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বরের ভক্তি করা শিখাতে পারবেন। তিনি যেমন বলবেন তেমনই করবেন নিজের ইচ্ছামত করবেন না।

।। সামবেদ সংখ্যা নং ১৪০০ উর্ত্তাচিক অধ্যায় নং ১২ খন্ডে ৩ নং শ্লোক নং ৫ (সন্ত রামপাল দাস দ্বারা ভাষা-ভাষ্য)

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যাব্রূবসানো মহান্ কবি নির্বচনানি শংসন
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূযমান্য বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ।।

অনুবাদঃ- চতুর ব্যক্তিরা নিজের বচনের দ্বারা, পূর্ণ পরমাত্মার (পূর্ণ ব্রহ্মের) পূজা সত্যমার্গের দর্শন না করে, অমৃতের স্থানে, বৃথা উপাসনা করে এবং অন্যদের করিয়ে যেমন — ভূত পূজা, শাদ্ধ করে পিতরদের পূজা, কালের (ব্রহ্মের, জ্যোতি নিরঞ্জনের) পূজা, তিনগুণের (ব্রহ্মা, রজোগুণ, বিষ্ণু-সতগুণ তথা শিব শঙ্কর-তমোগুণের) পূজা করান। অতএব মন্দির মসজিদ, গুরুদ্বার ও গীর্জাতে অর্থাৎ এইরকম তীর্থের উপাসনা রূপী ফোঁড়া প্যাচরা, ঘায়ের পূঁচকে, আদরের সাথে আচমন (সেবন) করান। আমাদের পরম সুখদায়ক পূর্ণ ব্রহ্ম(কবীর পরমেশ্বর) সতলোকের শরীরের মতনই তেজপুঞ্জ কিন্তু তার থেকে একটু কম তেজপুঞ্জের শরীর ধারন করে, সাধারণ ব্যক্তির রূপ ধারণ করে, সশরীরে এসে, তাহার নিজের সুখের অমৃতবাণীর মাধ্যমে সত্যজ্ঞান দিয়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যজ্ঞান দ্বারা আমাদের মত অজ্ঞানীদের বা ঘুমন্ত জীবকে জাগ্রত করার মার্গ বলে গিয়েছেন।

।। গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩।।

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য, বর্ততে, কামকারতঃ ন সঃ
সিদ্ধিম, অবাপ্নোতি, ন, সুখম্, পরাম, গতিম্।। ২৩।।

অনুবাদ ঃ- যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে কামের অনুগত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি সুখ ও পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করতে পারে না।

।। গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১৬ ।।

ন, অতি, অশ্রনতঃ, তু যোগঃ, অস্তি, ন, চ, একান্তম্
অনশ্রনতঃ, ন, চ, অতি, স্বপ্নশীলস্য জাগ্রত ন, এব, চ, অর্জুন।। ১৬।।

অনুবাদ ঃ- হে অর্জুন! এ যোগ অর্থাৎ ভক্তি না তো অধিক ভোজনকারী, না তো কম ভোজনকারী, না তো একান্ত স্থানে আসন লাগিয়ে সাধনাকারী, না খুব জাগরনকারী, না তো অতি নিদ্রাকারী ব্যক্তির সিদ্ধ (সমাধী) হয়ে থাকে।

পূজে দেই ধাম কো, শীশ হলাবে জো।
গরীব দাস সচী কহে হদ কাফির হে সো।।

কবীর, গঙ্গা কাঠে ঘর করে পীবে নির্মল নীর
মুক্তি নহী হরি নাম বিন সতগুরু কহে কবীর ।।

কবীর, তীর্থ কর-কর জগ সুবা উড়ে পানী ন্যায়
রাম হি নাম না জপা কাল ঘসিটে যায়।।

গরীব, পিতল হী কা থাল হে, পিতল কা লোট।
জড় মুরত কো পূজতে, আবেগা টোটা ।।

গরীব পিতল চমচ্চা পুজিয়ে জো থাল পরসে
জড় মুরত কিস কাম কি মতি রহো ভরসে।।

কবীর, পর্বত পর্বত সে ফিরয়া, কারণ আপনে রাম
রাম সরিখে জন মিলে জিন সারে সব কাশ

(৪) পিতর পূজা নিষেধ ঃ- কোন প্রকারের পিতর পূজা, শ্রাদ্ধ আদি কিছু করবেন না। ভাগবান শ্রী কৃষ্ণও এই পিতর ও ভূত পূজা করতে পরিস্কার মানা করেছে।

।। গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক নং ২৫।।

যান্তি, দেবব্রতা, দেবান, পিতৃঋণ, যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি, যান্তি, ভূতেজ্যাঃ মদ্যাজিন, অপি, মাম্।। ২৫।।

অনুবাদ ঃ- দেবতাদের পূজা করার ব্যক্তি সকল দেবতাদেরই প্রাপ্ত হয়। পিতৃব্রতকারী পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, ভূতগণকারী ভূতগণকেই প্রাপ্ত হয়। পিতৃব্রতকারী পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, ভূতগণক্রী ভূতগণকেই প্রাপ্ত হয়। আর মতানুসারে পূজনকারী ভক্ত আমার দ্বারাই লাভান্বিত হয়।

অনুবাদ ঃ- হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন! তুমি সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণে যাও। তার কৃপায় পরমশান্তি তথা অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হবে।

।। বন্দীছোর গরীব দাসজী ও কবীর সাহিব জী মহারাজও বলেন ঃ-

গরীব, ভূত রমে সো ভূত হে, দেব রমে সো দেব
রাম রমে সো রাম হে, সুনো সকল সুর ভেব।।

এইজন্য ওই (পূর্ণ পরমাত্মা) পরমেশ্বরের ভক্তি করো, যাতে পূর্ণ মুক্তি মেলে, ওই পরমেশ্বর পরমাত্মা পূর্ণ সৎপুরুষ (সত কবীর) এরই প্রমাণ।।

।। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৪৬-এ আছে ।।

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্
স্বকর্মনা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধি ং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬।।

অনুবাদ ঃ- যে পরমেশ্বর দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে আর সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রয়েছেন, ওই পরমেশ্বরকে নিজের স্বভক্তি কর্ম দ্বারা পূজা অর্চ্চনা করে, মানুষগণ পরম সিদ্ধি লাভ করে।

।। গীতা ১৮ অধ্যায় শ্লোক নং ৬২।।

"তমেব শরনং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসী শাশ্বতম্।। ৬২।।

অনুবাদ ঃ- হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন। তুমি সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণে যাও। তার কৃপায় পরমশান্তি তথা অবিনাশী পরম পদ প্রাপ্ত হবে। সর্বভাবের বা সর্বান্তকরনের অর্থাৎ তাৎপর্য হচ্ছে অন্য কোনো পূজা না করে, মন-কর্ম-ও বচন দ্বারা এক পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস (আস্থা) রাখো।

।। গীতা অধ্যায় নং ৮ শ্লোক নং ২২।।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্তুনন্যয়া
যস্যান্তঃ স্থানি ভুতানি, যেন সর্বমিদং ততম্।।২২।।

অনুবাদ ঃ- হে পার্থঃ সর্ব প্রাণী যার অন্তর্গত আছে বা অবস্থিত, এবং যিনি সর্বগ্র বিশ্বকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করছেন। সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। "অনন্য ভক্তির তাৎপর্য হল এক পরমেশ্বরে (পূর্ণব্রহ্ম)-র ভক্তি করা, অন্য দেব দেবীর অর্থাৎ তিন গুণে (রাজোগুণ ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব)-এর পূজা না করা।"

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ।।

।। গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক ১।।

"উর্দ্ধ মূলম অর্ধশাখম্ অশ্বত্থম্ প্রাহুঃ অব্যয়ম্
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি, যঃ তং বেদ স বেদবিৎ।। ১।।

অনুবাদ ঃ- উর্দ্ধে যার মূল বালা নীচে যে শাখা বালা অবিনাশী বিস্তৃত বৃক্ষ আছে, ঘোড়ার মত মজবুত যার ছোট ছোট পাতা বলে ছন্দ সমন্বিত বেদ সকল এর পাতা সরূপ, এই প্রকার অশ্বত্থকে যে জানতে পারবে বা অবগত আছে, তিনিই পূর্ণ জ্ঞানী বা বেদবিৎ।।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২।।

"অধঃ, চ, উর্দ্ধ ম, প্রসৃতাঃ তস্য, শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয় প্রবালা।।"
অধঃ চ, মূলানি, অনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধিনী মনুষ্য লোকে।। ২।।

অনুবাদ ঃ- ঐ জগৎ বৃক্ষের নীচে ও উপরে তিনগুণ (রজো-গুণ ব্রহ্মা, সত-গুণ বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) বিকার ছড়িয়ে আছে যেমন কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, অহঙ্কার রূপী ডাল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, জীবকে এই তিনগুণ রূপী কর্মতে বেঁধে রাখে তার মূল কারণ হচ্ছে মনুষ্যলোক, স্বর্গলোক, নরকলোক পৃথিবীতে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত্য অবস্থিত হয়ে রয়েছে।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৩।।

"ন, রূপম, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ, ন, চ,
আদিঃ, ন, চ, সম্প্রতিষ্ঠী, অশ্বত্থম্, এনং,
সুবিরূঢ়মুলম্, অসঙ্গশস্ত্রেণ, দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।"

অনুবাদ ঃ- এই সংসার রূপী বৃক্ষের রচনার না প্রথম না শেষ অর্থাৎ না শুরু না শেষ এরকম সরূপ পাওয়া বা বোঝা যাচ্ছে। অতএব আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানের পূর্ণ জ্ঞান (সম্পূর্ণ সঠিক খবর) আমারও জানা নেই। কেননা সর্ব ব্রহ্মান্ড রচনার সঠিক স্থিতির জ্ঞান আমারও জানা নেই। এই দৃঢ়বদ্ধ মূল সংসার রূপ অশ্বত্থকে মজবুত সরূপবালা নির্লেপ তত্ত্বজ্ঞান রূপী দৃঢ় অস্ত্র অর্থাৎ নির্মল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা কেটে, যে পদ পেলে আর পুনর্জনম হয় না, অতএব নিরঞ্জনের (কাল ব্রহ্মের) ভক্তি সাধনাকে সামান্য ভাবা।। ৩।।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪।।

"ততঃ পদং তৎ, পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা, ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরানী।।

অনুবাদ ঃ - তারপরে ওই পরম পদ পরমাত্মার খোঁজ করার দরকার। যা প্রাপ্ত হলে মানুষের আর সংসারে ফিরে না আসতে হয়। আর যারজন্য অনাদি কাল থেকে চলে আসা, এই সৃষ্টি বিস্তার আদি প্রাপ্ত করেছে, ওই আদি পুরুষ পরমাত্মারই আমি শরণে আছি

এই প্রকার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেব-দেবীর রাজা যে ইন্দ্র, তারাও পূজা ছেড়ে ওই পরমাত্মার ভক্তি করতে প্রেরণা দিয়েছেন। যার কারণ শ্রী কৃষ্ণ ইন্দ্রের ক্রোধের কারণে ব্রজবাসীকে রক্ষার্থে গোধর্বন পর্বত উঠিয়েছিলেন।

গরীব, ইন্দ্র চড়া ব্রিজ ডুবোবন, ভীগা ভীত ন লেব
ইন্দ্র কঢাই হোত জগৎ মে, পূজা ঘা গয়ে দেব
কবীর, ইস সংসার কো, সমঝাউ কই বার
পুঁছ জো পকড়ে ভেঢ কী উতরা চাহৈ পার।।

(৫) গুরুর আজ্ঞার পালন ঃ- গুরুর আজ্ঞা ছাড়া ঘরে কোনো প্রকারের ধার্মিক অনুষ্ঠান করবে না। যেমন বন্দী ছোড় নিজের বাণীতে বলেন যে —

"গুরু বিন যজ্ঞ হবন জো করহী, মিথ্যা যাবে কভু নহী ফলহী কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান গুরু বিন দোনো নিষ্ফল হে, পুছো বেদ পুরান।।

(৬) যে কোনো দেবী মাতার পূজা নিষেধ ঃ- মানুষ মারা যাওয়ার পর কেউ কেউ বাড়ীতে সংস্কার করে, স্মৃতি উপলক্ষে মন্ডপের মত বানিয়ে একটা তুলসী গাছ লাগিয়ে পূজা করে ওটাও করা যাবে না। কোন দেবতা বা দেবীর পূজা করা যাবে না। এক পরমেশ্বর কবীর সাহেব ছাড়া কাররই উপাসনা করা যাবে না। এমন কি তিন গুণধারী (রজগুণ, সতগুণ ও তমোগুণি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের পূজাও করা যাবে না। তবে গুরু যা বলবেন সে ভাবে মেনে চলতে হবে।

।। গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ১৫ ।।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরধমাঃ,
মায়য়া অপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ।।

অনুবাদ ঃ- মায়ার দ্বারা জ্ঞান যাদের হরণ করে নেওয়া হয়েছে, সেই পাপপরায়ণ, বিবেকহীন নরাধম অসুর স্বভাব প্রকৃতি মানুষ আমাকে না না ভজে তিন গুণের (রজোগুণি-ব্রহ্মা সতগুণি বিষ্ণু ও তমোগুণী শিবকেই) সাধনা করে থাকে।

কবীর, মাই মসানী শেঢ় শিতলা, ভৈরব ভূত হনুমন্ত
পরমাত্মা উনসে দূর হে, জো ইনকো পূজতে
কবীর, সো বর্ষ তো গুরু কী সেবা, একদিন আন উপাসী
বো অপরাধী আত্মা পরৈ কাল কী ফাঁসি
গুরুকো তজে ভজে জো আনা,
তা পসুবা কো ফোকট জ্ঞানা।।

(৭) সঙ্কট মোচন কবীর সাহেব আছেন ঃ- কর্ম কষ্ট (সঙ্কট) হলে পরে কোনো দেবী, দেবতার পূজা কখনও করবে না। না কোন প্রকারের টোটকা বিধি ও করা নিষেধ। শুধু বন্দী ছোড় কবির্দেব (কবীর সাহেবের) পূজা করবে। উনিই সকল দুঃখ হরণ করার সঙ্কট মোচনকারী।

"(সামবেদ সংখ্যা নং ৮২২ উতার্চিক অধ্যায় ৩ খন্ড নং ৫ শ্লোক নং ৮)"

।। সন্ত রামপাল দাসজি মহারাজের দ্বারা ভাষাভাষ্য।।

"মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নুভির্যতঃ পরি কোশাং অসিষ্যদৎ
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ূং সংখ্যায় বর্ধয়ন্।।

অনুবাদ ঃ- সনাতন অর্থাৎ অবিনাশী কবীর পরমেশ্বরকে হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে চাওয়া, ভক্তাত্মাকে, তিন মন্ত্র উপদেশ দিয়ে পবিত্র করে জীবন ও মৃত্যু রহিত করে, তথা তার প্রাণ অর্থাৎ জীবন সংস্কার বশ আপন মিত্র, ভক্তের মধ্যে গোনা হয় তাকে নিজের ভান্ডার থেকে পূর্ণ রূপে গোনা শ্বাসের আয়ূ বাড়িয়ে দেন। যার কারণ পরমেশ্বরের আনন্দ নিজের আশির্বাদপ্রসাদ দিয়ে প্রাপ্ত করিয়ে থাকে।

কবীর, দেবী দেব ঠাঢে ভয়ে, হমকো ঠোর বতাও,
জো মুঝকো (কবীরকে) পূজে নহী, উনকো লুটো খাও।
কবীর, কাল জো পিসে পিসনা জোরা হে পনিহার
এ দো অসল মজুর হে, সদগুরু কে দরবার।।

(৮) বিনা কারণে দান দেওয়া নিষেধ ঃ- কোনো জায়গায় কাউকে দান রূপে কিছু দেবেন না। না পয়সা, না বিনা সিলাই করা কাপড়, ইত্যাদি। যদি কেউ দান রূপে কিছু চায়, তাকে খেতে দিও, চা, দুধ, লস্সী, জল ইত্যাদি, তবে কিছু দেবেন না। না জানে ওই ভিখারী ওই পয়সা কোন কর্মে দুরূপ যোগ করেন। যেমন উদাহরণ, এক ভিখারী এক ব্যক্তিকে মিথ্যা মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে বলছে, আমার বাচ্চা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর সাথে লড়ছে, কিছু পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন? ভিখারীর কথা শুনে ভাবনাবশে ১০০ টাকা দিয়েছিলেন। ওই ভিখারী আগে ২৫০গ্রাম মদ খেত, ওই দিন আধা বোতল খেয়ে নিয়ে, নিজের পত্নীকে গিয়ে পিটিয়েছে। সেই দুঃখে বাচ্চাদের নিয়ে মা আত্মহত্যা করে। একটু ভাবার বিষয়, যে দান ওই পরিবারের নাশ হওয়ার কারণ, সেইজন্য দান দিতে ইচ্ছা থাকলে দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য কর বা তার বাচ্চার অসুখ হলে, ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ কিনে দাও, কিন্তু পয়সা দেবে না।

কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান
গুরু বিন দোনো নিষ্ফল হে, পুছো বেদ পুরান।।

(৯) এঁঠো খাওয়া নিষেধ ঃ-

যে ব্যক্তি, মদ, তামাক, বিড়ি, সিগরেট, ডিম, অফীম, বিয়র ও গাঁজা মাংস সেবন করে, তাদের এঁঠো কখনও খাবে না।

(১০) মারা গেলে ক্রিয়া কর্ম করা নিষেধ ঃ-

যদি পরিবারের কেউ মারা যায়, চিতাতে আগুন যে কোনো ব্যক্তি দিতে পারবে। ঘরের সদস্য বা অন্য কেউ অগ্নি প্রজ্বলিত করার সময় মঙ্গলাচরণ বললে হবে। আর যেখানে দহন করা হবে সেখানেই সব কিছু ছেড়ে আসবে। আর যদি ওই স্থান একান্তই পরিস্কার করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে ওই অস্থি কোন স্থানের জলে ফেলে দেবে। সেই সময় মঙ্গলাচরণ উচ্চা করে ভাসিয়ে দেবে। এর নামে পিন্ড, এয়োদশী, শ্রাদ্ধ কিছুই করবেন না। কোনো ব্যক্তি দ্বারা, শ্রাদ্ধ , শান্তি, যজ্ঞ কিছুই করাবেন না। যদি কোনো আত্মীয় স্বজন শোক দুঃখ ব্যক্ত করতে আসে সবাইকে এক দিন নির্ণয় করে, প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে সবাইকে খাইয়ে দেবেন। যদি আপনি ওই মরণে বালার নামে কোনো ধর্ম করতে চান তাহলে, আপনার গুরুদেবের আজ্ঞা নিয়ে, বন্দী ছোড় গরীব দাস জী মহারাজের অমৃত বাণী প্রদ্বীপ যতক্ষণ পাঠ করবে ততক্ষণ জ্বালিয়ে রাখবেন। যদি গুরুদেবের আজ্ঞা না হয়, তবে নাম উপদেশ নেওয়া ভক্ত ৪দিন বা ৭ দিন ঘরে সব সময় প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে, দেশী ঘিয়ের যে নাম গুরুদেবের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র প্রতিদিন চার বা তিন ও এক বার মন্ত্রের দান সঙ্কল্প সতলোকবাসীকে করবে। যেমন উচিৎ বুঝবে এক দুই তিন পর্যন্ত্য মন্ত্রের জপের ফল তাকে দান করবে। প্রতিদিনের ন্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি ও নাম স্মরণ করতে থাকবেন। এ মনে রাখবেন ঃ-

কবীর, সাথী হমারে চলে গয়ে, হম ভি চালন হার
কোয়ে কাগজ মে বাকী রহ রহী তাতে লগ রহী বার।

কবীর, দেহ পড়ী তো ক্যা হুয়া, ঝুঠা সভী পটীট
পক্ষী উড়া আকাশ কু, চলতা কর গয়া বীট।।

।। কর্ম কান্ডের বিষয়ে সত্য কথা।।

আমার (সন্ত রামপাল দাসের) পূজ্য গুরুদেব স্বামী রাম দেবানন্দ জী মহারাজের ১৫ বৎসর বয়সে, কোন এক মহাত্মার সৎসঙ্গ শোনার পর বৈরাগ্য ভাব হয়েছিল। একদিন তিনি জমিতে গিয়েছিলেন পাশে এক জঙ্গল ছিল, সেখানের এক জায়গায় মৃত পশুর হাড়ের উপর নিজের কাপড় ছিড়ে ফেলে রেখেছিলেন তারপর মহাত্মার পিছনে চলে গিয়েছিলেন।

যখন তার খোঁজ হল, দেখল কাপড় কোন এক জঙ্গলে, তখন তারা বুঝে নিল্ যে নিশ্চয়ই কোন পশু খেয়েছে এবং হাড়ও পড়ে রয়েছে। ওই কাপড় ও হাড় ঘরে নিয়ে এসে অন্তিম সৎকাজ ও করে দিয়েছেন। এরপর তেরোদিন শ্রাদ্ধ ও বাৎসরিকও শ্রাদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন।

যখন আমার পূজ্য গুরুদেব খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন একদিন ঘরে আসেন। তখন তার ঘরের সদস্য জানলেন যে তিনি জীবিত, ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাকে তার পরিবারের সবাই জানিয়েছেন, আপনার খোঁজ করার পর আমরা হাড় ও আপনার কাপড় ওই জঙ্গলে পেয়ে নিয়ে এসেছিলাম ও শ্রাদ্ধ শান্তিও করেছিলাম।

পরে আমি (সন্ত রাম পাল দাস) আমার পূজ্য গুরুদেবের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে, যখন আমার পূজ্যগুরুদেব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার পরে কি করেছিলেন? তিনি বললেন যখন আমি বউ হয়ে এসেছিলাম, এসে তার শ্রাদ্ধ হতে দেখেছিলাম। আমি আমার হাতেই ৭০ বার শ্রাদ্ধ করেছি। তিনি একথাও বলেছেন যে যখন আমাদের ঘরে কোনো ক্ষতি বা লোকসান হতো, যেমন মহিষ দুধ দিত না, দুধের পালান খারাপ হয়ে যেত, যে কোনো ক্ষতি হত, তখন ওঝা বৈদ্যর কাছে যেতাম, ও তাহারা তখন বলতেন, তোমাদের ঘরে কোনো অবিবাহিত (অনমেরিড) মারা গিয়েছেন, তোমাদের ওই আত্মা দুঃখী করছে। তাই শুনে আমরা তাকে কাপড় ইত্যাদি দান করতাম।

তখন আমি রামপাল বললাম উনিতো দুনিয়ার উদ্ধার করছেন, ইনি কাকে দুঃখ দিচ্ছেন, ইনি তো এখন সুখ দাতা। ফির আমি (রামপাল জী মহারাজ) এই বৃদ্ধাকে বললাম, এখন তো তিনি আপনাদের চোখের সামনে এখনও বৃথা সাধনার মতো শ্রাদ্ধ কেন? এটা বন্ধ করেন। তখন তিনি বললেন এ তো পুরানো নিয়ম এ কি করে ছাড়ব? অর্থাৎ আমরা আমাদের পুরানো নিয়মে এত লীন হয়ে গেছি, যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হওয়ার পরেও ভুল কে ছাড়তে পারছি না। এতে প্রমানিত হয় যে শ্রাদ্ধ করা পিতৃপূজা করা ইত্যাদি ইত্যাদি সব বৃথা।

(১১) বাচ্চার জন্মের সময় শাস্ত্র বিরুদ্ধ পূজা নিষেধ ঃ-

বাচ্চা জন্ম হলে সবাই ছয় ষষ্টি পূজা করে এসব করা উচিৎ নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী রোজ যেমন ঘরে প্রদ্বীপ জ্বালানো, এক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা উচিৎ (যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস থাকতে পারে তাই আরতি প্রদ্বীপ জ্বালানো বন্ধ করবে না।

এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে একটা কথা বলছি, এক ব্যক্তির বিয়ের দশ বৎসর পরে ছেলে হয়েছে। পুত্রর খুশীতে অনেক আনন্দ করেছেন। বিশ পঁচিশ গ্রামের লোককে আমন্ত্রণ করেছেন, গান বাজনা হয়েছে এবং এতে অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়েছে। একবৎসর পরে ছেলেটা মারা যায়। ওই পরিবারের দুঃখের সীমা নেই বা কেমন দুর্ভাগ্য নিজের মনকে সান্তনা দিতে পারছে না। এইজন্য কবীর সাহেব আমাকে বলেন যে ঃ-

কবীর, বেটা জায়া খুশী হুই, বহুত বজায় থাল।।
আনাজনা লগ রহা জিউ কিড়ীকা নাল
কবীর, পতঝড় আবত দেখ কর, বন রোবে মন মাহি।
উঁচি ডালি পাত থে, অব পীলে হো হো জাহি।।
কবীর, পাত ঝড়তা য়ু কহে, সুনভাই তরুবর রায়।
অব কে বিছুরে নহী মিলা নজানে কহা গিরেঙ্গে যায়।।
কবীর, তরুবর কহতা পাতসে, সুনো পাত এক বাত।
যহাঁ কী যাহে রিতী হে, এক আবত একজাত।।

(১২) দেবদেবী ধামে চুল দেওয়া নিষেধ ঃ-

বাচ্চাদের কোনো ধামে চুল দিয়ে আসা মানা। যখন চুল বড় হয়ে যায় দেখবে, কেঁটে ফেলে দেবে। এক মন্দিরে দেখেছি যেকি শ্রদ্ধালু ভক্ত নিজের ছেলে ও মেয়েদের চুল ফেলতে গিয়েছে। ওখানের নাপিত ভাই, বাজারে দাম থেকে তিনগুণ পয়সা নেয় তারপর একটু চুল কেটে মাতা পিতার হাতে দেয়। ওরা শ্রদ্ধার সাথে ওই চুল মন্দিরে চড়ায়। পূজারী সেই চুল এক থলিতে রেখে দেয়। রাত্রে উঠে দূরে একান্ত জায়গায় ফেলে দিয়ে আসে। এসব কেবল নাটক বাজি। কেন না আগের স্বাভাবিক নিয়মে চুল কেটে বাইরে ফেলে দেয় না? পরমাত্মা নাম থেকে প্রসন্ন হয় পাখন্ডদের থেকে নয়।

(১৩) নাম জপেতেই সুখ ঃ- নাম (উপদেশ) কেবল দুঃখ নিবারণ হয় সেটা ভেবো না আত্ম কল্যানের জন্যও নেওয়া হয়ে থাকে। সুমিরনে সুখ আপনা আপনিই এসে থাকে।

কবীর, 'সুমিরন সে সুখ হোত হে, সুমিরন সে দুঃখ যায়।
কহে কবীর সুমিরন কিয়ে, সাই মাহি সমায়।।"

(১৪) ব্যাভিচার নিষেধ ঃ- পরস্ত্রীদের মা বোনের দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ। ব্যাভীচার মহাপাপ। যেমন, —

"গরীব, পরদ্বারা স্ত্রী খোলে, সত্তর জনম অন্ধা হো ডোলে।
সুরাপান মদ্য মাংসাহারী। গবন করে ভোগে পরনারী।
সত্তর জনম কটত হে শীশং।
সাক্ষী সাহিব হে জগদীশং।
পর নারী না পরসিয়ো, মানো বচন হমার।
ভবন চতুর্দ্দশ তাস সির, ত্রিলোকীকী ভার।
পর নারী না পরসিয়ো, সুনো শব্দ শনতন্ত।
ধর্মরায়কে খম্ভ সে, অর্ধমুখী লটকন্ত।।"

(১৫) নিন্দা সুনা ও নিন্দা করা নিষেধ ঃ-নিজের গুরুর নিন্দা ভুল করেও করবে না, ও শুনবেও না। শুনলে অভিপ্রায় যে যদি কেউ আপনার গুরুজীর বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে। তো আপনি লড়াই করবেন না, অতএব ভেবে নেবেন যে বিনা বিচারে বলছে অর্থাৎ এটা মিথ্যা কথা।

গুরু নিন্দা শুনে তো কানা। তাকে নিশ্চয় নরক নিদানা
আপনে মুখ নিন্দা জো করছি। শুকড় শ্বান গর্ভ মে পরহী।।

নিন্দা কাররও করা উচিৎ নয় বা শোনাও উচিৎ নয়। চাহে যেমন তেমন ব্যক্তিরই কেননা হোক। কবীর সাহেব বলেন ঃ-

"তিনকা কবহু ন নিন্দীয়ে জোপাব তলে হো।
কবহু উট আখিন পড়ে পীড় ঘনেরি হে।।"

(১৬) গুরু দর্শন কী মহিমা ঃ- সৎসঙ্গ সময় পেলেই আসার চেষ্টা করবে। সৎসঙ্গে এসে কোনো মান বা বড়াই করবেন না, নিজেকে অসুস্থ ব্যক্তি মনে করেই আসবে না যেমন অসুস্থ ব্যক্তি যতই কড়োর পতি হোক না কেন;চাহে উচ্চপদ বালা ব্যক্তি হোকনা কেন ? যখন হাসপাতালে আসেন, তখন তার তার উদ্দেশ্য কেবল রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার। সেখানে ডাক্তার শুতে বললে শুয়ে পড়েন, বসতে বললে বসে পড়েন বাইরে যাওয়ার নির্দেশ করলে বাইরে চলে যেতে হয় ঠিক তদরূপ সৎসঙ্গে আসার উদ্দেশ্য মনে করতে হবে। এখানে সে লাভ হয়, সেই লাভ শান্তি ও মুক্তির জন্য নিজের আত্মার কল্যান যেভাবে হয় সেই বিষয়ে আসা, নয়তো বৃথা। সৎসঙ্গে যেখানে বসার জায়গা পাওয়া যায়, সেখানেই বসে পড়তে হয়, খাওয়ার যা কিছু মেলে তাহা পরমেশ্বর কবীর সাহেবের কৃপাতে প্রসাদ মনে করে খেয়ে প্রসন্ন চিত্তে থাকবেন। কবীর, সন্ত মিলন কু চালিয়ে, তজ মায়া অভিমান। জো জো কদম আগে রাখে, বো হি যজ্ঞ সমান। কবীর, সন্ত মিলন কু জাইয়ে দিন মে কই কই বার। অসোজ কে মেহ জিউ , ঘনা করে উপকার।। কবীর দর্শন সাধুকা মুখ পর বসে সুহাগ। দর্শ উনহিকো হোতহে, জিনকে পূর্ণ ভাগ।।

(১৭) গুরু মহিমা ঃ যদি কোন স্থানে পাঠ বা সতসঙ্গ শুরু হয়েছে বা গুরুজিকে দর্শনে যাচ্ছেন, তবে সর্বপ্রথম গুরুজিকে দন্তবৎ (লম্বা করে শুয়ে) প্রণাম করা উচি ? ? তারপর সন্ত গ্রন্থ সাহেবের মূর্তি ও কবীর সাহেবের,। গরীব দাসজী ও স্বামী রাম দেবানন্দ জী ও গুরুগির মূর্তিকে প্রণাম করবে। যাতে শুধু ভাবনা হয়ে থাকে। মূর্তি পূজা করতে হবে না। প্রণাম করলে পূজা করার মধ্যে বোঝায় না। এশুধু ভক্তকে শ্রদ্ধা বিশ্বাসে সহযোগ দেয়। পূজা তো গুরু ও নাম মন্ত্রর করা দরকার যাতে এই নামে পাড় হওয়া যায়।

কবীর, গুরু গোবিন্দ দো খড়ে, কাকে লাগু পায়,
বলিহারী গুরু আপনে, জিন গোবিন্দ দিয়ো মিলায়।।

কবীর, গুরু বড়ে এ গোবিন্দ সে, মন মে দেখ বিচার
হরি সুমরে সো রহ গয়ে। গুরু ভজে হোয় পাড়।।

কবীর, হরি কে রুঠতা, গুরু কে স্মরণ মে যায়,
কবীর গুরু যে রুঠ যায়, হরি নহী হোত সহায়

কবীর, সাত সমুদ্র কো মসি করু লেখনি করু বনি রায়
ধরতী কা কাগজ করু তো গুরু গুন লিখা ন জায়।।

(১৮) মাছ মাংস, ডিম, নিষেধ ঃ- ডিম, মাছ, মাংস খেয়ে জীব হিংসা করতে নেই। এতে মহা পাপ হয়, যেমন কবীর সাহেব জী ও গরীব মহারাজ জী বলে গেছেন ঃ-

"**কবীর,** জীব হলে হিংসা করে, প্রকট পাপ সির হোয়া
নিগম পুনি এই সে পাপ হে, ভিরত গয়া নহী কোয়।

কবীর, তিলভর মছলি খায়কে, কোটি গোউ দে দান।

কাশী করত লে মরে, তো ভি নরক নিদান
কবীর, বকরী পাতি খাত হে, তাকি কাঢ়ী খাল।
জো বকরীকো খাত হে, তিনকা কোন হবাল
কবীর, গলা কাটি কলমা ভরে, কীয়া কহে হলাল।
সাহেব লেখা মাংগসী, তব কোন হোসী হবাল
কবীর, দিনকো রোজা রহত হে, রাত হনত হে গায়।
এ খুব বো বন্দগী, কহু কিউ খুশী খুদাই
কবীর, কবীরাতেই পীর হে, জো জানৈ পর পীর।
জো পর পীর ন জানি হে, সো কাফির বেপীর
কবীর, খুব খানা হে খীচরী, মাহী পড়ি টুক লৌন।
মাংস পরায়া খায়কে গলা কটাবে কৌন
কবীর, মুসলমান মারে করদসো, হিন্দু মারে তলবার,
কহে কবীর দোনো মিলি, যে হই জসকে দ্বার
কবীর, মাংস অহারী মানব, প্রতক্ষ রাক্ষস জানি
তাকি সঙ্গতি ক্ষতি করৈ, হই ভক্তি মে হানি
কবীর, মাংস খায় তে ঢেড় সব। মদ পিবে সব নীচ।
কুলকী দূরমতি পর হরৈ রাম কহে সো উচ্চ
কবীর, মাংস মছলিয়া খাত হে, সুরাপান সে হেত।
তে নর নরকে জাহেঙ্গে মাতা পিতা সমেত।
গরীব, জীব হিংসা জো করতে হে, যা আগে ক্যা পাপ।
কন্টক জুনি জিহান মে, সিংহ ভেড়িয়ো ওর সাপ
ঝোটে বকরে সুরগে তাই। লেখা সব হি লেত গোসাই।
মৃগ মোর মারে মহমন্তা।
অচরা চর হে জীব অনন্তা, জিহ্বা স্বাদ হিতে প্রাণা।
নীমা নাশ গয়া হম জানা তীতর লবা বুটেরী চিড়িয়া,
খুনী মারে বড়ে অগড়িয়া। অদলে বদলে লেখে লেখা।
সমঝ দেখ সুন জ্ঞান বিবেকা।
গরীব, শব্দ হমারা মানিয়ো, এর সুনতে হো নর নারী,
জীব দয়া বিন কুফর হে, চলে জমানা হারী।”

অজানা হওয়া হিংসার পাপ হয় না। বন্দী ছোড় কবীর সাহিব বলেন ঃ—

ইচ্ছা কর মারে নহী, বিন ইচ্ছা মর জায়।
কহে কবীর তাস কা, পাপ নহী লগায়।”

(১৯) গুরু নিন্দাকারীর সম্পর্ক নিষেধ ঃ— যদি কোনো ভক্ত গুরু দ্রোহ (গুরু থেকে বিমুখ হয়ে যায়) করে, সে মহাপাপের ভাগী হয়। যদি কাহারও এই
পথ ভাল না লাগে তো নিজের গুরু বদলাতে পারে। যদি সে পূর্ব গুরুর নিন্দা, করে তাকেই

দ্রোহী বলা হয়। এসব ব্যক্তির সঙ্গে ভক্তি চর্চা করলে যে নাম উপদেশ নিয়েছেন। তার দোষ হয়। তার ভক্তিও সমাপ্ত হয়ে যায়।

গরীব, গুরু দ্রোহী কী পেড় পর, যে পগ আবে বীর।
চৌরাশী নিশ্চয় পড়ে, সতগুরু কহে কবীর।
কবীর, জান বুঝ সাচী তজৈ, করে ঝুঠে সে নেহা জাকী।
সঙ্গত হে প্রভু, স্বপন সে ভিন দেহ।

অর্থাৎ গুরু দ্রোহীর কাছে যাওয়া ব্যক্তি ভক্তি ছাড়া হয়ে নরকে লক্ষ্য চুরীশী যোনীতে ভুগতে চলে যায়।

(২০) জুয়া খেলা নিষেধ ঃ- জুয়া ও তাস কখনও খেলবেন না।

কবীর, মাংস খায় ও মদ পিয়ে ধন বেশ্যা সোং খায়,
জুয়া খেলি চোরী করে, অন্ত সমুলা যায়।

(২১) অশ্লীল নাচ গান নিষেধ ঃ- কোনো প্রকার খুশীতে অশ্লীল নাচ গান করা নিষেধ। এসব ভক্তির বিরুদ্ধে কাজ। যেমন এক সময় এক বিধবা বোন, কোনো কে খুশীতে তার রিস্তেদার (কুটুম্বদের) ঘরে গিয়েছিল। সবাই নাচ গান করছিল কিন্তু ওই বিধবা এক কোনায় বসে প্রভুর চিন্তায় মগ্ন ছিল। ফির তার কুটুম্ব এক সদস্য জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি এমন নিরাশ হয়ে কেন রয়েছেন ? আপনিও আমাদের মত নাচ গান করেন এবং খুশী আনন্দ করেন। এর পর বিধবাবোন বলছেন, কিসের খুশী আনন্দ করব ? আমার মত বিধবার একই পুত্র ছিল, সেও ভগবানের কাছে চলে গেছে। এখন আমার আর কি খুশী আছে? ঠিক এই প্রকার এই কালের লোকে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্থিতি এই রূপ। **গুরু নানক দেব জীর বাণী ঃ-**

“না জানি কাল কী কর ডারৈ, কিস বিধি চল পাসা বে
জিনহাদে সির তে মৌত খুড়গদি, উনহানু কেড়া হাসাবে
সাদ মিলে সাড়ি শাদী (খুশী) হোনদী, বিছুড়দা দিল গিরি (দুঃখ) বে।
অখদে নানক গুনো জিহানা মুশকিল হাল ফকিরী হে।।

কবীর সাহেব মহারাজ বলেন ঃ-

কবীর, ঝুঠে সুখ কো সুখ কহে, মান রহা মন মোদ
সকল চবিনা কাল কা, কুছ মুখ যে কুছ গোদ
কবীর, বেটা আয়া খুশী হুই, বহুত বজায়ে থাল
কবীর, আবন জানা লগ রহা, জিউ কিড়ীকা না।।

বিশেষ ঃ- স্ত্রী এবং পুরুষ দুইজনই পরমাত্মা প্রাপ্তির অধিকারী। স্ত্রীদের মাসিক ধর্মের দিনও, দৈনিক নিজের পূজা প্রদ্বীপ জ্বালানো বন্ধ করা উচিৎ নয়। না কেউ মারা গেলে বা জন্ম নিলে পূজা বন্ধ করা উচিৎ ।

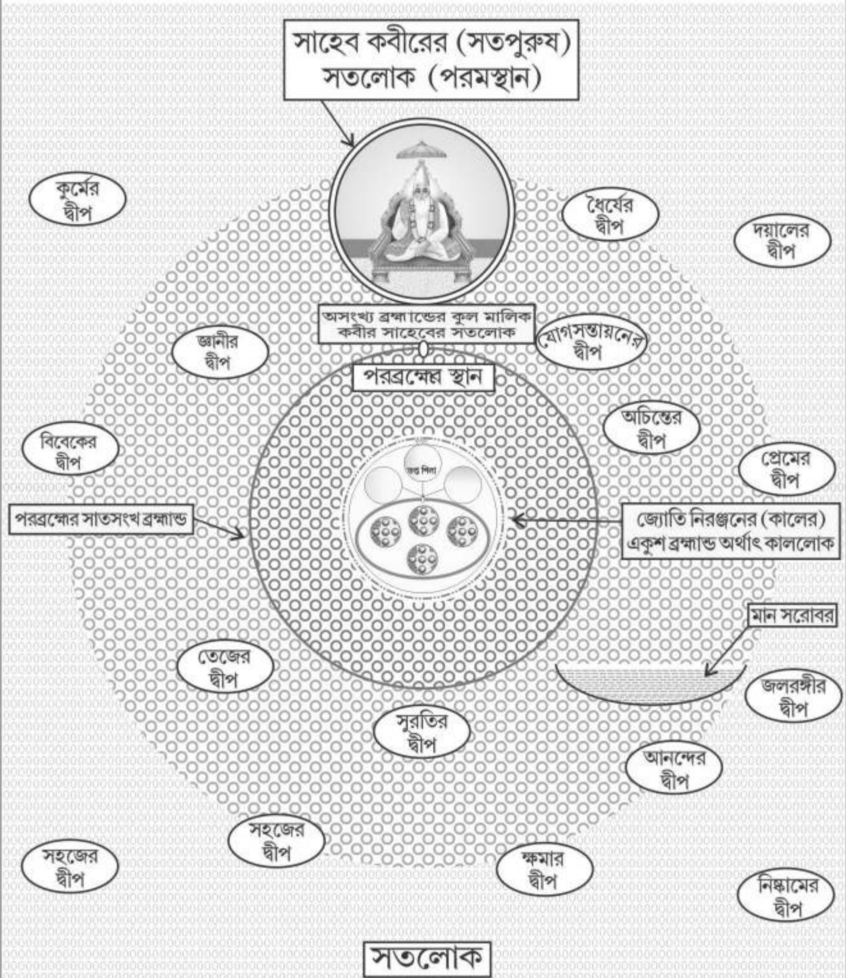
নোট ঃ- যে ভক্তগণ এই একুশ সুত্রের আদেশ পালন না করবে তার নাম উপদেশ সমাপ্ত হয়ে যাবে। যদি অনজানে কোন ভুল হয়ে যায় তবে সেটা মাফ হবে। আর যদি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত করে থাকে তাহলে তাকে যে নাম উপদেশ দেওয়া হয়েছিল সেটার পাবওয়ার (তেজ) শেষ হয়ে সে নাম রহিত হয়ে যাবে। তবে এর সমাধান এই যে, গুরুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দ্বিতীয়বার আবার নাম নিতে হবে।

পরমেশ্বর কবীর পরমেশ্বরের অসংখ্য ব্রহ্মান্ডের লঘু চিত্র

অনামী লোক ঃ- এই লোকে আত্মা ও পরমাত্মা এক রূপে কবীর সাহেবই অনামী রূপে আছেন। যেমন মাটির টুকরো টুকরো হয়ে থাকে, পরে বৃষ্টি হলে এক সাথে মিলে যায়, কোন অস্তিত্ব যেমন থাকে না।

অগম লোক ঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অগম পুরুষ রূপে থাকেন।

অলখ লোক ঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অলখ পুরুষ রূপে থাকেন।



।। সৃষ্টি রচনা।।

।। (সুক্ষ বেদ থেকে নিষ্কর্ষ রূপ সৃষ্টির রচনা)।।

প্রভু প্রেমী আত্মারা প্রথমবার নিম্ন সৃষ্টির কথা পড়লে, এমন ভাববে যে এসব দন্ত কথা। কিন্তু সর্ব পবিত্র গ্রন্থগুলির প্রমাণ পড়ে,দাঁতের ভিতরে আঙুল দিয়ে ভাববে যে, বাস্তবিক অমৃত জ্ঞান কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল? কৃপা করে ধৈর্যের সাথে পড়বেন এবং এই অমৃত জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখবেন। আপনাদের ১০১ পুরুষ পর্যন্ত্য এই জ্ঞান অমৃত, কাজে লাগবে। পবিত্র আত্মারা কৃপা করে সত্য নারায়ণ (অবিনাশী প্রভু/সতপুরুষ) দ্বারা রচিত সৃষ্টি রচনার বাস্তবিক জ্ঞান পড়েন।

পূর্ণ ব্রহ্মঃ- এই সৃষ্টি রচনাতে সতপুরুষ সতলোকের স্বামী (প্রভু), অলখপুরুষ অলোক লোকের স্বামী (প্রভু), আর অগমপুরুষ অগম লোকের স্বামী (প্রভু) ও অনামী পুরুষ অনামী অকহ লোকের স্বামী (প্রভু) তো একই পূর্ণ ব্রহ্মআছেন। যে কিনা বাস্তবে অবিনাশী প্রভু, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, নিজে চার লোকেই থাকেন। যার অন্তরগত অসংখ্য ব্রহ্মান্ড থাকে বা আছে।

পরব্রহ্মঃ- এইপ্রভু কেবল সাত সংখ্য ব্রহ্মান্ডের স্বামী (প্রভু)। ইনাকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়। এই পরব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ) ও তার ব্রহ্মান্ডও বাস্তবে অবিনাশী নয়।।

ব্রহ্মঃ- এইপ্রভু কেবল কেবল একুশ ব্রহ্মান্ডের স্বামী (প্রভু)। ইনাকে ক্ষর পুরুষ, জ্যোতি নিরঞ্জন ও কাল ইত্যাদি নামের উপমাতে জানা যায়। ইনি এবং ইনার একুশ ব্রহ্মান্ড নাশবান।

(উপরোক্ত তিন পুরুষ (প্রভুর)-এর প্রমান পবিত্র শ্রীমদভাগবদ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭ তে ও আছে।

ব্রহ্মা ঃ- ব্রহ্মের জৈষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু দ্বিতীয় মধ্যম পুত্র, এবং শিব অন্তিম তৃতীয় পুত্র। ব্রহ্মের এই তিন পুত্র এক ব্রহ্মান্ডতে এক এক বিভাগ (গুণ)-এর স্বামী (প্রভু)। ইনারাও নাশবান। বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য কৃপা করে পড়েন নীম্নে লিখিত সৃষ্টি রচনা ঃ-

কর্বিদেব (কবীর পরমেশ্বর) সুক্ষ বেদ অর্থাৎ কবির্বাণীতে নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ংই (নিজেই) বলেছিলেন, যা নিম্নলিখিত আছে।

সর্ব প্রথম এক স্থান অনামী (অনাময়) লোক ছিল। যাকে অকহ লোকও বলা হত। পূর্ণ পরমাত্মা ওই অনামী লোকে একলাই থাকতেন। ওই পরমাত্মার বাস্তবিক নাম কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর। সকল আত্মাই ওই পূর্ণ পরমাত্মার শরীরে মিলিত হয়েছিল বা থাকত। এই কবির্দেবের উপমাত্মক (পদবী)-র নাম অনামী পুরুষ (পুরুষের অর্থ হয় প্রভু)। এই প্রভু মানুষকে নিজের স্বরূপেই বানিয়েছেন, এইজন্য মানবের নামও পুরুষই হয়েছে। এই অনামী পুরুষের একটি মাত্র রোম কুপের যে প্রকাশ তা অসংখ্য সূর্যের রশ্মি থেকেও বেশী।

বিশেষ ঃ- যেমন, কোন এক দেশের আদরনীয় প্রধান মন্ত্রির শরীরের নাম অন্য হয়, তথা পদ বা উপমাত্মকের (পদবীর) নাম হল প্রধানমন্ত্রী। কোনবার প্রধানমন্ত্রী নিজের কাছে কিছু বিভাগ রাখেন তখন যে বিভাগের যে সাইন (সহি)-র উপর নিজের হস্তাক্ষর করেন ওর উপর পদের নামও লেখা থাকে। যেমন গৃহমন্ত্রালয়ের সই করবেন নিজে যে গৃহমন্ত্রী সেটাও লিখতে হয়। কিন্তু তার হস্তাক্ষরের (গৃহমন্ত্রীর) তখন কমে যায়। এই প্রকার কবির পরমেশ্বরের রোশনীতে

ব্যবধান ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে লোকে হতে থাকে।

ঠিক এই প্রকার পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) নীচের তিন অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের (অগমলোক, অলখ লোক, সতলোকের) রচনা শব্দ (বচন) দ্বারা করেছেন। ওই পূর্ণব্রহ্মপরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)-ই অগমলোকে প্রকট হয়েছেন, তিনি অগম লোকেরও স্বামী। ওখানে তার পদবীর নাম অগম পুরুষ বা অগম প্রভু। এই অগম প্রভুর মানব শরীর অনেক তেজোময় যার এক রোম কুপের রশ্মি খরব (খর্ব) সূর্যের রশ্মি থেকেও অনেক।

এই পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর দেব -কবীর পরমেশ্বর) অলখ লোকেও প্রকট হয়েছেন, তথা স্বয়ং নিজেই অলখ লোকের স্বামী (প্রভু) তথা পদবীর নাম অলখ পুরুষ। এই পূর্ণ প্রভুর মানব শরীর সদৃশ তেজোময় (স্বজ্যোতি) স্বয়ং প্রকাশিত। এক রোম কূপের রোশনী অরব সূযের থেকেও বেশী।

এই পূর্ণ প্রভু সতলোকে প্রকট হয়েছেন, তথা সতলোকেরও অধিপতি ইনিই। এই সত লোকে ইনার উপমাত্মক (পদবীর)-র নাম সতপুরুষ (অবিনাশী প্রভু) ইনারই নাম অকালমূর্ত্তি শব্দ, সরূপী রাম-পূর্ণ ব্রহ্ম-পরম অক্ষর ব্রহ্মইত্যাদি। এই সতপুরুষ কবির্দেব (কবীর প্রভু)-র মানব সদৃশ শরীরের তেজোময়, যার এক রোম কূপের প্রকাশ কড়োর সূর্য ও চন্দ্রেরও প্রকাশের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশী।

এই কর্বিদেব (কবীর প্রভু) সতপুরুষরূপে প্রকট হয়ে সতলোকে বিরাজমান হয়ে, প্রথম সতলোকে অন্য রচনা করেছেন।

এক শব্দ (বচন) থেকে যোলটা দ্বীপ রচনা করেছেন এবং যোল শব্দ (বচন) থেকে যোল পুত্রের উৎপত্তি করেছেন। এক অমৃত ভরা মান সরোবরও রচনা করেছেন। এখন তার যোল পুত্রের নাম শোনেন ঃ- **(১) কুর্ম (২) জ্ঞানী (৩) বিবেক (৪) তেজ (৫) সহজ (৬) সন্তোষ (৭) সুরতি (৮) আনন্দ (৯) ক্ষমা (১০) নিষ্কাম (১১) জলরঙ্গী (১২) অচিন্ত্য (১৩) প্রেম (১৪) দয়াল (১৫) ধৈর্য্য (১৬) যোগ সন্তায়ন অর্থাৎ যোগজিৎ।**

সতপুরুষ কবির্দেব নিজের এক পুত্র অচিন্ত্যকে সতলোকের অন্য রচনার ভার দিয়েছিলেন এবং শক্তিও প্রদান করেছিলেন। অচিন্ত্য অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) কে শব্দ দ্বারা উৎপত্তি করেছেন এবং বলেছিলেন আমাকে সাহায্য করো। অক্ষর পুরুষ স্নান করতে মানসরোবরে গিয়েছিলেন, ওখানে আনন্দ পেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন অনেক সময় ধরে সরোবর থেকে বাহিরে আসেনি, তখন অচিন্ত্য কবীর পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যে সে তো মানসরোবরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কবীর পরমেশ্বর তখন মানসরোবরের জল নিয়ে একটা ডিম্বকার বানিয়ে, তার মধ্যে এক আত্মা প্রবেশ করে দিয়েছিলেন। তারপর সেই ডিম্বাকারকে মানসরোবরের জলের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিলেন ডিম্বাকারের গড়গড়াট আওয়াজে অক্ষর পুরুষের নিদ্রা ভেঙে যায়। ডিম্বাকারের দিকে ক্রোধে তাকানোর কারনে ডিমটা দুই ভাগ হয়ে যায়। ওর ভিতর থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন (ক্ষর পুরুষ) বেরিয়েছিলেন, যাকে পরে “কাল” বলা হয়েছে। এর বাস্তবিক নাম কৈল। তখন সতপুরুষ (কবির্দেব)-এর আকাশ বাণী হয় যে, দুজনেই বেরিয়ে এসো ও অচিন্তর দ্বীপে থাকো। আজ্ঞা পেয়ে অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষর ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) দুজনেই অচিন্তের দ্বীপে থাকতে

লাগল। কবির্দেব পরমেশ্বর এই বাচ্চাদের বেয়াদপি দেখে ভাবলেন, হয়তো পরে এরা আবার প্রভুত্বের আকাঙ্খা করে না ফেলে? কেননা সমর্থ ছাড়া কার্য্য সফল হয় না। তারপরে কবির্দেব পরমেশ্বর নিজে স্বয়ংই সব কিছু রচনা করেছেন। নিজের শব্দ শক্তিতে এক রাজেশ্বরী (রাষ্ট্রীয়) শক্তি উৎপন্ন করেছিলেন, যার দ্বারা ব্রহ্মান্ড স্থাপিত করা হয়েছে। ইনাকেই পরাশক্তি, পরানন্দনীও বলা হয়। পূর্ণ ব্রহ্ম নিজের ভিতর থেকে বচন শক্তি দ্বারা, নিজের মতই মানব সদৃশ উৎপন্ন করেছেন। প্রত্যেক হাঁস আত্মাকে পরমেশ্বরের মতই শরীর রচনা করেছেন। যার তেজ ১৬ সূর্য যেরূপ মানব সদৃশ আছেন। সরূপ আছেন পরন্তু পরমেশ্বরের শরীরের এক রোম কুপের প্রকাশ যেমন কোটি কোটি সূর্যের থেকেও বেশী। এদিকে অনেক সময় ধরে ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও অচিন্ত একই দ্বীপেই থাকতেন! ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন)-এর মনে ভাবতে লাগল যে, আমরা তিনজন একই দ্বীপে অনেক দিন ধরে রয়েছি, আর অন্যদের এক এক দ্বীপে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, আমারও একটা দ্বীপের দরকার। তার জন্য ক্ষর ব্রহ্ম এক পায়ে খাঁড়া হয়ে ৭০ যুগ তপস্যা করেছিলেন।

।। আত্মারা কেমন করে কালের জালে ফেঁসেছে?।।

বিশেষ ঃ- যখন ব্রহ্ম (কাল, জ্যোতি নিরঞ্জন) তপস্যা করছিলেন আমাদের এইসব আত্মারা অর্থাৎ আজ আমরা যে, জ্যোতি নিরঞ্জনের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে রয়েছি। তার সাধনায় আসক্ত হয়ে, আমাদের অন্তরাত্মা তাকে পেতে চেষ্টা করেছি। আগে আমাদের এই আত্মা সতপুরুষ পরমেশ্বরের কাছেই ছিল। সত পুরুষ পরমেশ্বরকে ভুলে, কাল (জ্যোতি নিরঞ্জনের)-র সাধনা ও মায়াতে আসক্ত হয়েছি। পরমেশ্বরকে ভুলে পতিব্রতা পদ থেকে নীচে নেমে গিয়েছি। পূর্ণ প্রভুর বার বার নিষেধ করার পরেও আমাদের আসক্তি ক্ষর পুরুষ (কাল, জ্যোতি নিরঞ্জন)-এর কাছ থেকে হাটে নি, বা চলে যায় নি। এই প্রভাব আজও কাল সৃষ্টিতে বিদ্যমান আছে। যেমন নৌজবান বাচ্চারা, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের নকল করা ভাব তথা রোজগারের উদ্দ্যেশে করছে, যে সব ভুমিকা বা নাটক , তাহাতে আসক্তি হয়ে গিয়েছে। এ সব করতে মানা করলেও মানা শোনে না। যদি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিকটবর্তী কোন শহরে এসে থাকে, তো দেখবেন, ছোট, বড় জোয়ান বাচ্চাদের ভীড় হয় কেবল দর্শন করার জন্য, বহু সংখ্যায় একত্রিত হয়। রোজি রোটি তো অভিনেতারা কামাই করছে। এদিকে বাচ্চারা পয়সা খরচ করে অভিনেতা অভিনেত্রী দর্শনে নিজেরা লুট হয়ে বাড়ি ফিরছে। মাতা পিতা যতই বোঝাক না কেন, বাচ্চারা মানে না যেমন ভাবে হোক লুকিয়ে ঠিক যাবেই অভিনেতাদের দেখতে।

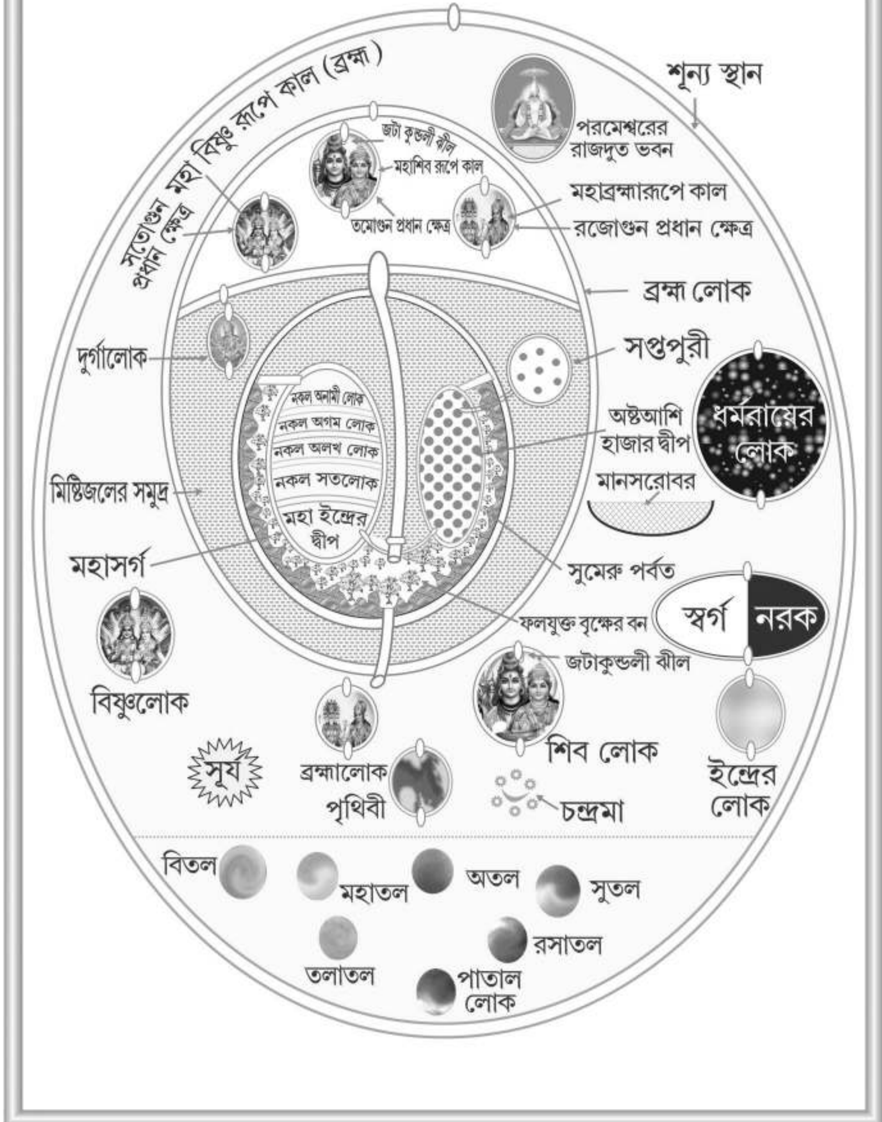
পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর প্রভু) ক্ষর পুরষকে বললেন, বলো কি দরকার? তিনি (ক্ষর, ব্রহ্ম, কাল) বললেন পিতাজি, এ জায়গা আমার জন্য কম পড়ছে। আমাকে আলাদা দ্বীপ দান করুন কৃপা করে। হক্কা কবীর (সত্ কবীর) ক্ষর পুরুষকে ২১ (একুশ) ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করে দিয়েছেন। কিছু সময় উপরান্ত জ্যোতি নিরঞ্জনে ভাবছেব্রহ্মাণ্ডে কিছু রচনা করার দরকার, শূন্য ব্রহ্মাণ্ডে কি লাভ? এসব বিচার করে ৭০ যুগ তপস্যা করেন। পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর প্রভু)-র কাছে প্রার্থনা করে যেকি রচনার জন্য কিছু সামগ্রী যেন দেন। সতপুরুষ, তাকে তিনগুণ ও পাঁচ তত্ত্ব প্রদান করলেন,

যার জন্য, জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) ব্রহ্মান্ডে কিছু রচনা করেছিল। পরে ভাবল এখানে কিছু জীবও হওয়ার দরকার, একলা মন লাগছে না। এ বিচার করে ৬৪ (চৌষট্টি) যুগ তপস্যা করেন। তারপর পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করলেন, আমার এখানে কিছু আত্মা দেন কৃপা করে। এখানে একলা মন লাগছে না। তখন সতপুরুষ কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন ব্রহ্ম, তোর তপস্যার প্রতিফলে আমি আরও ব্রহ্মান্ড দিতে পারি কিন্তু আমার আত্মা গুলো কোনো প্রকারের জপ তপ সাধনার ফল রূপে দিতে পারি না। হাঁ যদি সেচ্ছায় তোমার সাথে কেউ যেতে চায় সে যেতে পারে। যুবা কবীর (সমর্থ কবীর)-এর কথা শুনে জ্যোতি নিরঞ্জন আমাদের কাছে এসেছিলেন আমরা সব হাঁস আত্মারা ওর প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম, আমরা সব হাঁস আত্মরা তাহার প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম, আমরা সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন বলল, আমি পিতাজির কাছ থেকে আলাদা ২১ (একুশ) ব্রহ্মান্ড প্রাপ্ত করেছি, ওখানে রমনীয় আকষর্ণীয় স্থল বানানো আছে তবে কি তোমরা কি আমার সঙ্গে ওখানে যাবে?

এই আজ আমরা সব হাঁস ২১ (একুশ) ব্রহ্মান্ডতে অসন্তুষ্ট ও দুঃখ জন্ম মৃত্যু ভোগ করছি। আমরা বলেছি পিতাজি আজ্ঞা দিলে আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তখন ক্ষর ব্রহ্ম, পূর্ণ ব্রহ্ম মহান কবীর (সমর্থ প্রভু কবীর)-এর কাছে গিয়ে সব কথা বলেছেন। কবিরাগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বলেছেন, যে আমার সামনে যারা স্বীকৃতি দেবে তাদের পাঠাব। এরপর অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষর ব্রহ্ম দুজনে মিলে আমাদের এই হাঁস আত্মার কাছে এসেছিলেন। সত কবির্দেব বললেন, যে যে হাঁস আত্মা ব্রহ্মের সাথে যেতে চাও, হাত উপর করে স্বীকৃতি দাও। নিজের পিতার সামনে হাত উঠাতে সাহস হচ্ছিল না। কিছু সময় নিঃশ্চুপ ছেয়ে রইল, তৎক্ষনাৎ এক হাঁস আত্মা সাহস করে বলল পিতাজি! আমি যেতে চাই। পরে তার দেখাদেখি সব আত্মাই স্বীকৃতি দিল/পরমেশ্বর কবিরজি জ্যোতি নিরঞ্জনকে বললেন আপনি আপনার স্থানে যান, যারা যারা স্বীকৃতি দিয়েছে ওই সব হাঁস আত্মাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। জ্যোতি নিরঞ্জন ২১ ব্রহ্মান্ডে চলে যায়। তার আগে এই ২১ ব্রহ্মান্ড সতলোকেই ছিল।

তার পরে পূর্ণ ব্রহ্ম সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হাঁসকে এক মেয়ে স্বরূপ দিলেন, কিন্তু স্ত্রী ইন্দ্রি রচিত করেননি। যে যে হাঁস জ্যোতি নিরঞ্জনের সাথে যেতে চেয়েছিলাম তাদের কে ওই মেয়ের শরীরে প্রবেশ করে দিলেন তারই নাম অষ্ট্রাঙ্গী (আদি মায়া/প্রকৃতি দেবী/দূর্গা) হয়েছে। তারপর সত পুরুষ বললেন পুত্রী, আমি তোকে শব্দ শক্তি প্রদান করে দিয়েছি, তোকে যত জীব সৃষ্টি করতে ব্রহ্ম বলবে, তুই উৎপন্ন করে দিস। পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেবের ১৬ পুত্রের এক পুত্রের নাম সহজ দাস, আপন পুত্র সহজ দাসের সাথে ওই প্রকৃতি দেবীকে পাঠিয়ে দিলেন। সহজ দাস জ্যোতি নিরঞ্জনকে বলল যে, পিতাজি এই বোনের শরীরের মধ্যে সমস্ত আত্মাকে প্রবেশ করে দিয়েছে, যারা আপনার সঙ্গে যেতে সহমতি ব্যক্ত করেছিল। তথা একে বচন শক্তি প্রদান করে দিয়েছেন, আপনি যত জীব চাইবেন, প্রকৃতি নিজের শব্দ দ্বারা উৎপন্ন করে দেবেন। এই কথা বলে সহজ দাস নিজের দ্বীপে ফিরে গেলেন।

এক ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র



যুবতী হওয়ার কারণে মেয়ের রূপ রং ফুটে উঠেছিল। ব্রহ্মের ভিতরে তখন বাসনা উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতি দেবীর সাথে অভদ্র গতিবিধি প্রারম্ভ করেছেন। তখন তাই দেখে প্রকৃতি দেবী (দূর্গা) বললেন, জ্যোতিনিরঞ্জন, আমার কাছে পিতাজীর প্রদান করা শব্দ শক্তি আছে। আপনি যত জীব চাইবেন শব্দ দ্বারা আমি উৎপত্তি করে দেব। আপনি মৈথুন পরম্পরা শুরু করবেন না। আপনিও ওই পিতার শব্দ থেকে ডিম আকারেই উৎপন্ন হয়েছেন তথা আমিও পরমপিতার শব্দ থেকে পরে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি আমার বড় ভাই, এই ব্যবহার ভাই বোনের সঙ্গে করলে মহাপাপের কারণ হবে। পরন্তু জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর কোনো প্রার্থনা শোনেননি। তথা নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা নখ দিয়ে স্ত্রী ইন্দ্রি (ভগ) চিরে দিয়েছিল এবং বলাৎকার করার ইচ্ছা করেছিল। ওই সময় দূর্গা নিজের ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্য কোন উপায় না দেখে সুক্ষ্ম রূপ ধারণ করেন এবং জ্যোতি নিরঞ্জনের খোলা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পেটে ঢুকে পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর দেবের কাছে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ওই সময় কবীরদেব নিজের আরও এক পুত্র যোগ সন্তায়নকে অর্থাৎ জোগজীৎ রূপ বানিয়ে ওখানে প্রকট হয়ে কন্যাকে ব্রহ্মের উদর (পেট) থেকে বাইরে বের করে বললেন জ্যোতি নিরঞ্জন আজ থেকে তোর নাম 'কাল' হবে। তোর জন্ম মৃত্যু হতে থাকবে, এই জন্য তোর নাম ক্ষর পুরুষ হবে তথা এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রানীদের তুই প্রতিদিন খাবি ও এক লাখ পঁচিশ হাজার লোক উৎপন্ন করবি। তোদের দুইজনকে (কাল ও দূর্গা) এই একুশ ব্রহ্মান্ড দিয়ে নিষ্কাসিত করা হয়েছে। এই কথা বলতেই একুশ ব্রহ্মান্ড বিমানের গতিতে চলতে থাকে পরে। সহজ দাসের দ্বীপের কাছ দিয়ে বেরিয়ে সতলোক থেকে ষোলসংখ্য কোস (এক কোস অনুমান ৩ কিমি) দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বিশেষ বিবরণ — এতক্ষণ তিন শক্তির বিবরণ দেওয়া হল।

১। পূর্ণব্রহ্ম যাকে অন্য উপমাত্মক (পদবী) নাম দ্বারাও জানা যায়, যেমন সতপুরুষ, অকাল পুরুষ, শব্দ স্বরূপী রাম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম/পুরুষ ইত্যাদি। এই পূর্ণ ব্রহ্ম অসংখ্য ব্রহ্মান্ডের স্বামী তথা বাস্তবে অবিনাশী।

২। পরব্রহ্ম যাকে অক্ষর পুরুষও বলা যায়। এ বাস্তবে অবিনাশী নয়। এ হল সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ডের স্বামী।

৩। ব্রহ্ম যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন, কাল, কৈল, ক্ষর পুরুষ ও ধর্মরায় ইত্যাদি নামে জানা যায়। যে কেবল একুশ ব্রহ্মান্ডের স্বামী। এখন প্রথমে এই ব্রহ্মের (কাল)-র সৃষ্টির এক ব্রহ্মান্ডের পরিচয় দেওয়া হবে। যাহাতে তিনটে আরও নাম পড়বেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাতে ভেদ ঃ- এক ব্রহ্মান্ডে বানানো সর্বোপরি স্থানের উপর ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ) সয়ং তিন গুপ্ত স্থানের রচনা করে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে থাকে, তথা নিজের পত্নী প্রকৃতি দেবী (দূর্গা)-র সহযোগে তিন পুত্রের উৎপত্তি করে। তাদের নামও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রাখেন। ব্রহ্মের পুত্র যিনি ব্রহ্মা, সে কেবল তিন লোকে (পৃথিবী লোক, স্বর্গলোক ও পাতাল লোক)-এ এক রজোগুণ বিভাগের স্বামী (অধিকারী) মন্ত্রী। ইহাকে ত্রিলোকের ব্রহ্মা বলা হয়। ব্রহ্ম যে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা রূপে থাকে তাকে মহাব্রহ্মাও ব্রহ্মলোকীয় ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্ম(কাল)-কে সদাশিব মহাশিব ও মহাবিষ্ণুও বলা হয়।

শ্রী বিষ্ণুপুরানে ঃ- চতুর্থ অংশ অধ্যায় ১ পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১ উপর (ভিতরে) শ্রী ব্রহ্মা বলেছেন, যে অজন্মা, সর্বময় বিধাতা পরমেশ্বরের আদি মধ্য ও অন্ত, স্বরূপ, স্বভাব ও সার আমি তা জানতে পারি নি। (শ্লোক-৮৩) যিনি আমার রূপ ধারন করে সংসারের রচনা করেন, স্থিথির সময় যিনি পুরুষ রূপে তথা রুদ্র রূপেতে বিশ্বকে গ্রাস করে যায়, অনন্ত রূপে সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করে। (শ্লোক নং - ৮৬)

।। শ্রী ব্রহ্মা শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি।।

কাল (ব্রহ্ম) প্রকৃতি (দূর্গা)-কে বলছে এখন কে আমাকে কি করতে পারবে? আমি ইচ্ছামত করব কেউ আমায় কোন ক্ষতি করতে পারবে না। প্রকৃতি প্রার্থনা করে বলল, আপনার তো কিছু লজ্জা রাখা বা থাকা উচিৎ। প্রথমে তো আপনি আমার বড় ভাই, কেননা ওই পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব)-এর বচন শক্তিতে আপনি ডিম থেকে উৎপত্তি হয়েছেন, তথা পরে আমার উৎপত্তি, ওই পরমেশ্বরের বচন শক্তিতে হয়েছি। দ্বিতীয় কথা আপনার পেট থেকে আমি বেরিয়েছি, তার কারণ আমি আপনার মেয়ে হয়েছি, আর আপনি আমার পিতা। এই পবিত্র রিস্তায় (সম্বন্ধ) নষ্ট করা মহাপাপ হবে। আমার কাছে পিতার প্রদান করা শব্দ শক্তি আছে। যতগুলো প্রাণী আপনি বলবেন, আমি বচন শক্তির দ্বারা উৎপন্ন করে দেবো। জ্যোতি নিরঞ্জন, দূর্গার একটাও কথা শোনেনি তথা বললেন আমার যা সাজা পাওয়ার পেয়ে গিয়েছি, আমাকে সতলোক থেকে বের করে দিয়েছেন, এখন যা খুশি তাই করব। এই বলে দূর্গার সাথে জবর দস্তী বিয়ে করে তিন পুত্র রজো গুণযুক্ত ব্রহ্মা, সতো গুণযুক্ত বিষ্ণু ও তমোগুণ যুক্ত শিব শঙ্করকে উৎপত্তি করে। যুবকনা হওয়া পর্যন্ত্য তিন পুত্রকে দূর্গার দ্বারা অচেতন করে রাখা হত। পরে যুবা হওয়ার পর শ্রীব্রহ্মাকে পদ্মফুলের উপর, শ্রীবিষ্ণুকে শেষ নাগের বিছানায় তথা শ্রীশিবকে কৈলাস পর্বতে সচেতন করে দিত। তৎপশ্চাৎ প্রকৃতি (দূর্গা) দ্বারা এ-তিনজনকেই বিবাহ দেন। এক ব্রহ্মান্ডে তিন লোকে (স্বর্গলোক, পৃথিবী লোক ও পাতাল লোক) এক এক বিভাগের মন্ত্রী (প্রভু) নিযুক্ত করে দেয়। যেমন শ্রী ব্রহ্মাকে রজোগুণ বিভাগ মন্ত্রী (প্রভু), বিষ্ণুকে সতোগুণ বিভাগ মন্ত্রী (প্রভু), এবং শিবকে তমোগুণ বিভাগ মন্ত্রী (প্রভু)। আর কাল ব্রহ্ম স্বয়ং গুপ্ত (মহা ব্রহ্মা-মহাবিষ্ণু-মহাশিব) রূপে মূখ্য মন্ত্রী পদকে সামলান। এক ব্রহ্মান্ডে এক ব্রহ্মলোকের রচনা করেছেন। ওখানে তিন গুপ্ত স্থান বানিয়েছেন। এক রজোগুণ প্রধান স্থান, যেখানে ব্রহ্ম(কাল) স্বয়ং মহা ব্রহ্মা(মূখ্যমন্ত্রী) রূপে থাকে ও নিজের পত্নী দূর্গাকে মহাসাবিত্রী রূপে রেখেছেন। এই দুইজনের সংযোগে যে সন্তান এই স্থানে উৎপন্ন হয়, সে রজোগুণী হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্থান সতোপ্রধান বানিয়েছে, এখানে ব্রহ্ম(কাল, ক্ষর পুরুষ) স্বয়ং মহাবিষ্ণু রূপে থাকেন, তথা নিজের পত্নী দূর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রেখেছেন। এখানে যে সন্তান হয়েছে তার নাম বিষ্ণু রেখেছেন, এ বালক সতগুনযুক্ত হয়। আর তৃতীয় এই কাল এখানে তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্র বানিয়েছেন। এখানে সে সদাশিব রূপ হয়ে থাকেন তথা নিজের পত্মী দূর্গাকে মহা পার্বতী রূপে রেখেছেন। এই দুইজনের সংযোগে যে বালক উৎপন্ন হয়েছে তার নাম শিব রেখেছেন, একে তমোগুন যুক্ত করে রেখেছেন প্রমানের জন্য দেখবেন পবিত্র শ্রী শিব মহাপুরান, বিদ্যেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ২৪-২৬ যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র (মহেশ্বর) থেকে অন্য সদাশিব আছে। তথা রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬ তথা ৭, ৯, পৃষ্ঠা নং ১০০ থেকে ১০৫ ও

১১০-এ অনুবাদ কর্ত্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, তথা পবিত্র শ্রী মদ দেবী পুরান তৃতীয় স্কন্দে পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত্য, গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, যিনি অনুবাদ কর্ত্তা তিনি হচ্ছেন শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী পরে এদেরকে ঠকিয়ে রেখেছে নিজে খাবেন বলে, জীবের উৎপত্তি শ্রী ব্রহ্মার দ্বারা এবং পালন (একজন আরেক জনের সঙ্গে মায়া মমতা দিয়ে কালের ব্রহ্মান্ডে রেখে দেওয়া) কর্ত্তা বিষ্ণুর কাজ এবং সংহার শিবের দ্বারা করান। কেননা কাল ব্রহ্ম কে অভিশাপের কারণে এক লক্ষ মানব শরীরধারী প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে যে ময়লা বের করে তাহা খেতে হয়, তার জন্য একুশ ব্রহ্মান্ডে এক তপ্তশীলা যাহা সব সময় গরম থাকে। পরে উপর গরম করে ময়লা গলে সেই ময়লা খেতে হয়। জীব মরে না কিন্তু কষ্ট অসহনীয় হয়, ফির প্রাণীকে তার কর্ম অনুযায়ী শরীর প্রদান করে। এ কাজ শ্রীশিবের দ্বারা করানো হয়। যেমন কোন বিল্ডিং-এ তিন রুম আছে। এক রুমে অশ্লীল চিত্র লাগানো আছে, ওই রুমে যেতেই মন ওই প্রকারে মলিন বিচার উৎপন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় রুমে সাধু মহাপুরুষদের ভক্তচিত্র আছে, ওখানে গেলে ভাল বিচার প্রভুর চিন্তন হয়ে থাকে। তৃতীয় রুমে দেশ ভক্তের বা শহীদদের চিত্র লাগানো আছে সেই রুমে গেলে জোশীলে বা বিদ্রোহী বিচার উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঠিক এই প্রকার ব্রহ্ম(কাল/ক্ষরপুরুষ) ভেবে চিন্তে তিন গুণ প্রধান স্থান রচনা করেছেন।

।। তিন গুণ কি কি ? প্রমান সহিত ।।

এই তিন গুণ হল, রজোগুণ ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব। ব্রহ্ম (কাল/ক্ষর পুরুষ) এবং প্রকৃতি (দূর্গা) থেকে উৎপন্ন এবং তিনজনই নাশবান।

প্রথম প্রমাণ ঃ- গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরানের যিনি সম্পাদক, শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪ থেকে ২৬ বিদ্যবেশ্বর সংহিতা তথা পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা" এই প্রকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব তিন দেবতাদের গুণ পরন্তু শিব (ব্রহ্মা-কাল) গুনাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ- গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, শ্রীমদদেবীভাগবত পুরান যার সম্পাদক, শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমনলাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩ ঃ- ভগবান বিষ্ণু দূর্গার স্তুতি করেছিলেন এবং মা দূর্গা কে বলেছিলেন আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শঙ্কর তোমার কৃপাতে বিদ্যমান। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হয়ে থাকে। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য (অবিনাশী) জগৎ জননী আছ। প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী আছো। ভগবান শঙ্কর বললেন - যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমা হইতে উৎপত্তি হয়েছে তবে উনাদের পরে উৎপন্ন হওয়া তমোগুণী লীলা করা বলা এই শঙ্কর কি তোমার সন্তান নই ? অর্থাৎ আমায় উৎপন্ন করেছ তুমিই । এই সংসারে সৃষ্টি স্থিতি সংহারে তোমার গুণ সদা সর্বদা আছে। এই তিনগুণ দ্বারা উৎপন্ন আমরা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর) নিয়মানুসারে কাজে রত বা তৎপর থাকি।

উপরোক্ত এ বিবরণ কেবল হিন্দিতে অনুবাদিত শ্রী দেবীমহাপুরানেই আছে তাতে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। এইজন্য এখানে প্রমান দেখুন যে শ্রী মদ-দেবীভগবদমহা পুরান সভাষটিকম্

সমহাত্যম্ খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রকাশন মুম্বই, এতে সংস্কৃত সহিত হিন্দি অনুবাদ করেছেন। তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক নং ৪২ ঃ-

ব্রহ্মা - অহম্ ঈশ্বর ফিলতে প্রভাবাৎসর্বো বয়ং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা তমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরানা। (৪২)

হিন্দি অনুবাদ ঃ- হে মাত! ব্রহ্মা, আমি ও শিব তোমারই প্রভাবে জন্ম বান, নিত্য নই অতএব আমরা অবিনাশী নই, তাহলে অন্য ইন্দ্রাদি ও অন্য দেবতারা কি করে নিত্য (অবিনাশী) হতে পারে? তুমিই অবিনাশী প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী। (৪২)

পৃষ্ঠা নং ১১-১২ (অধ্যায় ৫, শ্লোক ৪) ঃ- যদি দয়াদ্রমনা ন সদাংভবিকে কথ মহং বিহীতঃ চ তমোগুণঃ কমল জশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্বগুণোং হরিং। (৪)

অনুবাদ ঃ- ভগবান শঙ্কর বলছেন হে মাত! যদি আমার উপর আপনি দয়াযুক্ত থাকেন, তবে আমায় তমোগুণ কেন বানিয়েছেন? পদ্মফুল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ কিসের জন্য বানিয়েছেন? আর বিষ্ণুকে সতোগুণ কেন বানিয়েছেন? অর্থাৎ জীবদের জন্ম মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মতে কেন লাগিয়েছেন?

শ্লোক ১২ ঃ- রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদম্ শিবে। (১২)

বাংলা ঃ- আপনি আপনার পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা ভোগ বিলাস করতে থাকেন। আপনার গতি কেউ জানে না।

নিষ্কর্ষ ঃ- উপরোক্ত প্রমাণ থেকে প্রমাণিত যে রজোগুণ ব্রহ্মা সতোগুন বিষ্ণু তথা তমোগুণ শিব এরা তিনজনই নাশবান। দূর্গার পতি ব্রহ্ম (কাল) আছেন তাহার সঙ্গে ভোগ বিলাস করেন।

।। ব্রহ্ম(কাল)-এর অব্যক্ত থাকার প্রতিজ্ঞা।।

(সুক্ষ্ম বেদ দ্বারা শেষ সৃষ্টি রচনা)

তিন পুত্রের উৎপত্তি হওয়ার পরে ব্রহ্ম নিজের পত্নী দূর্গাকে (পত্নীকে) বলেছিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভবিষ্যতে আমি কাউকে আমার বাস্তবিক রূপে দর্শন দেব না। যার জন্য আমাকে অব্যক্ত মানা হবে। দূর্গাকে বলেছিলেন তুমি আমার ভেদ কাউকে বলবে না। আমি গুপ্ত থাকব। দূর্গা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি আপনার পুত্রকেও দর্শন দেবেন না? ব্রহ্ম বলেছিলেন আমি আমার পুত্র এবং অন্য কাউকে কোন সাধনাতেও দর্শন দেব না। এ আমার অটল নিয়ম থাকবে। দূর্গা বলেছিলেন এ তো আপনার উত্তম নিয়ম নয় যে কি, আপনি নিজের পুত্র সন্তানদের ও কাছে লুকিয়ে থাকবেন? তখন কাল বললেন দূর্গা, এ আমার বিবশতা। আমায় এক লাখ মানবধারী প্রাণীর আহার করার অভিশাপ লেগেছে। যদি আমার পুত্র (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (মহেশ)) এ কথা জেনে যায়, তাহলে এ উৎপত্তি স্থিতি (পালন) ও সংহারের কার্য্য করবে না। এই জন্য এ আমার অনুত্তম (খারাপ) নিয়ম সর্বদা থাকবে। যতক্ষন না এই তিনজন যুবক হবে, তার পূর্ব পর্যন্ত্য এই তিনজনকে অচেতন করেই রাখবে। আমার বিষয়ে বলবে না। নয়তো তোকেও আমি দণ্ড দেব। দূর্গা এই ভয়ে বাস্তবিক কিছু বলতো না। এই জন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ শে বলেছে এ বুদ্ধিহীন জন সমুদয় আমার অনুত্তম নিয়ম থেকে অপরিচিত যেকি আমি কোনো দিনও কাহারও

সামনে প্রকট হই না। আমি নিজের যোগ মায়ার দ্বারা লুকিয়ে থাকি। এই জন্য আমি অব্যক্তকে মনুষ্যরূপে এসেছি তাই আমাকে কৃষ্ণ মানে। (**অবুদ্ধ য়ঃ**) বুদ্ধি হীন (**মম্**) আমার (**অনুত্তমম্**) অনুত্তম অর্থাৎ নিম্ন (**অব্যয়ম্**) অবিনাশী (**পরম ভাবম্**) বিশেষ ভাবকে (**অজানন্তঃ**) না জানতে পেরে (**মাম্ অব্যক্তম্**) আমি অব্যক্তকে (**ব্যাক্তিতম্**) মনুষ্য রূপে (**আপন্নম**) এসেছি (মন্যন্তে) মানে অর্থাৎ আমি কৃষ্ণ নই। (**গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৪**)

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৪৭ তথা ৪৮ তে বলেছে আমার বাস্তবিক কাল রূপ আছে। এর দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি না বেদে বর্নিত বিধি থেকে (দ্বারা), না জপ তপস্যা দ্বারা না কোন কর্মক্রিয়া করে দর্শন হতে পারবে।

যখন তিনপুত্র যুবক হল তখন দুর্গামাতা (প্রকৃতি, অষ্টাঙ্গী, ভবানী) তাদেরকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে) বললেন সাগর মন্থন কর, তাই প্রথমবার মন্থন করে (জ্যোতি নিরঞ্জন শ্বাসের দ্বারা চার বেদ উৎপন্ন করে। তাদের গুপ্তবাণী দ্বারা আজ্ঞা দিলেন যে, সাগরে নিবাস (বাস) কর)। এই চারবেদ ব্রহ্মা নিলেন এবং পরে মাতার কাছে আসলেন, মাতা বললেন তুমি পড় ও তোমার কাছে রাখ।

নোট ঃ- বাস্তবে পূর্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল পাঁচ বেদ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম কাল কেবল চার বেদই প্রকট করেছিলেন পাঁচ নং বেদ লুকিয়ে রেখেছিলেন যে কিনা পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে, কবির্গির্ভীঃ অর্থাৎ কবির্বাণী (কবীর বাণী)-র দ্বারা লোকউক্তি ও দোহার মাধ্যমে প্রকট করেছিলেন।

দ্বিতীয় বার সাগর মন্থন করলে, তিন কন্যা বের হয়। মাতা তিন কন্যাকে ভাগ করে দিয়েছিলেন, প্রকৃতি (দূর্গা) নিজের অন্য তিন রূপ (সাবিত্রী লক্ষ্মী ও পার্বতী) ধারণ করে সমুদ্রে লুকিয়ে দিয়েছিলেন, সাগর মন্থনের সময় বাইরে এসেছিলেন। এটাই হল প্রকৃতির তিন রূপ এবং ব্রহ্মাকে সাবিত্রী, বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ভগবান শঙ্করকে পার্বতী পত্নী রূপে দিয়েছিলেন তিন জনই ভোগ বিলাস করেছেন, তাই সুর ও অসুর ও দুই প্রকারই জন্ম হয়েছে।

যখন তৃতীয় বার সাগর মন্থন করেছিল ঃ চৌদ্দ রত্ন ব্রহ্মাকে তথা বিষ্ণু ও দেবতাদের অমৃত, মদ্য (শরাব) অসুরদের, আর বিষ পরমার্থ শিব নিজের কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। যখন ব্রহ্মা বেদ পড়লেন, তখন জানতে পেরেছেন যে, এই সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচয়িতা করার কুল মালিক অন্য পুরুষ (প্রভু) আছেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর কে বলেছেন যে বেদে লেখা বা বর্ণন করা রয়েছে সেতো অন্য কোনো প্রভু কিন্তু বেদ বলে যে এর ভেদ আমিও জানি না। তার জন্য সংকেত আছে যেকি কোন তত্ত্বদর্শীর কাছে জিজ্ঞাসা কর। তখন ব্রহ্মা মাতার কাছে এসে সারা বৃত্তান্ত্য শোনালেন তবে এর পূর্বে মাতা বলতেন আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। আমিই কর্তা, আমিই সর্বশক্তিমান। কিন্তু ব্রহ্মা বললেন, বেদ বাণী ঈশ্বর কৃত এ মিথ্যা হতে পারে না।

ব্রহ্মার এই কথা শুনে দুর্গা ভাবলেন, এদের পূর্বে জানিয়েছিলাম যে, আমিই সর্বশক্তিমান তবে আজ ব্রহ্মা জেনে গেল যে, আমার উপরে আমার স্বামী (জ্যোতি নিরঞ্জন কালপ্রভু) আছে, (তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমার বিষয়ে কাউকে কিছু বলবে না; আরও বলেছিল আমাকে বেদে বর্নিত বিধি দ্বারা জপ তপস্যা ধ্যান দ্বারা, কোনো কারণে কেউ দর্শন পাবে না)

দূর্গা বললেন তোর পিতা তোদের দর্শন দেবে না, তিনি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন। তখন ব্রহ্মা মাতাকে বললেন আপনার কথার উপর আমার অবিশ্বাস হয়ে গিয়েছে। আমি ওই পুরুষ (প্রভু) -র খোঁজ নিয়েই ছাড়ব। দূর্গা বললেন যদি তিনি তোমায় দর্শন না দেয় তাহলে তুমি কি করবে? ব্রহ্মা বললেন তাহলে আমি আপনাকে আমার চেহারা দর্শন দেব না। আরেক দিকে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমি অব্যক্ত (মায়ার দ্বারা লুকিয়ে থাকা) থাকব, কোনদিন কাউকে দর্শন দেব না। অর্থাৎ ২১ ব্রহ্মান্ডে কোনোদিন নিজের বাস্তবিক কাল রূপ দেখাবো না।

।। গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ২৪।।

"অব্যক্তম, ব্যক্তিম্, আপন্নম্ মন্যন্তে, মাম, অবুদ্ধয়ঃ।
পরম, ভাবম, অজানন্ত, মম, অব্যয়ম্, অনুত্তম্ম" ।।২৪।।

অনুবাদ ঃ- (অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন মানুষ (মম) আমার (অনুত্তমম) অশ্রেষ্ঠ (অব্যয়ম্) অটল (পরম) পরম (ভাবম্) ভাবকে (অজানন্তঃ) না জেনে (অব্যক্তম্) অদৃশ্যমান (কালকে) (মাম্) আমাকে (কালকে) (ব্যাক্তিম্) আকারে কৃষ্ণ অবতার (আপন্নম্) প্রাপ্ত হয়েছে (মন্যন্তে) মেনে থাকে।

।। গীতা অধ্যায় ৭ নং শ্লোক ২৫।।

'ন, অহম, প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়ঃ, অয়ম্, ন, অভিজানাতি, লোকঃ, মাম্, অজম্, অব্যয়ম্" ।।২৫।।

অনুবাদ ঃ- (অহম) আমি (যোগমায়া সমাবৃতঃ) যোগমায়াতে লুকিয়ে থাকা (সর্বস্ব) সবকিছু (প্রকাশঃ) প্রত্যক্ষ (ন) না হয় অর্থাৎ অব্যক্ত থাকি এইজন্য (অজম্) জন্ম না হওয়া (অব্যয়ম্) অবিনাশী (নিত্য) অটল ভাবে (অয়ম) এই (মূঢ়ঃ) অজ্ঞানী (লোক) জনসমুদয় সংসার (মাম্) আমায় (ন) না (অভিজানাতি) জেনে অর্থাৎ আমাকে অবতার রূপে আসা ভেবে নেওয়া। কেননা ব্রহ্ম নিজের শব্দ শক্তিতে অনেক রূপ ধরতে পারত, ইনি দূর্গার স্বামী (পতি) এইজন্য এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, আমি শ্রী কৃষ্ণ ইত্যাদির মত দূর্গা থেকে জন্ম গ্রহণ করি না।

।। ব্রহ্মা তার নিজের পিতা ব্রহ্মাকে প্রাপ্তির প্রয়ন্ত (চেষ্টা)।।

তখন দূর্গা ব্রহ্মাকে বলেলেন, তোমার পিতা অলখ নিরঞ্জন কিন্তু সে তোমাকে দেখা দেবে না। ব্রহ্মা বলেছিলেন আমি দর্শন করেই ফিরব। মাতা জিজ্ঞাসা করেন, তুই দর্শন যদি না করতে পারিস, তাহলে কি হবে? ব্রহ্মা বললেন আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি পিতার দর্শন না করতে পারি তাহলে আপনার সন্মুখে আসিব না। এই বলে ব্রহ্মা উত্তর দিশায় ব্যাকুল হয়ে চলে গেলেন সেখানে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। ওখানে ব্রহ্মা চার যুগ ধরে ধ্যান করেন কিন্তু কিছুই প্রাপ্তি হয় নাই। কাল (ব্রহ্ম) আকাশবাণী করেছেন যে, দূর্গা সৃষ্টি রচনা কেন করোনি? ভবানী বললেন আপনার জৈষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মা জিদ করে আপনার খোঁজে বেরিয়েছে। ব্রহ্ম (কাল) বলল, ওকে ফিরিয়ে নাও। আমি ওকে দর্শন দেব না। ব্রহ্মা ছাড়া জীব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তখন দূর্গা (প্রকৃতি) নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা গায়ত্রী নামের একটি মেয়েকে উৎপন্ন করেন, তাকে দিয়ে খবর পাঠায় যে ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে আনো। গায়ত্রী ব্রহ্মার কাছে গিয়ে দেখে ব্রহ্মা সমাধী লাগিয়ে বসে আছেন। ব্রহ্মা কোন

আভাষই পায়নি যে কি, কেউ তার কাছে এসেছে। তখন আদি প্রকৃতি (দূর্গা) গায়ত্রীকে ধ্যান দ্বারা বলেলেন ওর চরণ স্পর্শ কর। গায়ত্রী ঠিক সেই রকমই করেছে। ব্রহ্মার ধ্যান ভাঙার কারণে বললেন, তুই কোন পাপিন যে আমার ধ্যান ভঙ্গ করেছিস। আমি তোকে অভিশাপ দেব। গায়ত্রী বলতে লাগল আমার কোন দোষ নয়, আগে আমার কথা শুনো, তারপর অভিশাপ দিও। আমাকে মাতা দূর্গা, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। কেননা আপনাকে ছাড়া জীব সৃষ্টি সম্ভব হবে না। ব্রহ্মা বললেন আমি কিভাবে যাব? পিতার দর্শন তো হয়নি, এই সময় গেলে আমার উপহাস হবে। যদি আপনি মাতার সামনে বলেন যে, পিতার দর্শন হয়েছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাহলে আপনার সাথে আসতে বাধা নেই। তখন গায়ত্রী বলল আপনি যদি আমার সাথে সম্ভোগ করেন, তাহলে আমি মিথ্যা সাক্ষী দেব। তখন ব্রহ্মা ভাবল, পিতার (জ্যোতি নিরঞ্জনের) দর্শন হয়নি, মাতার সামনে যেতে লজ্জা লাগবে, অন্য কোন উপায় না দেখে, গায়ত্রীর সঙ্গে রতি ক্রিয়া করলেন।

তখন গায়ত্রী বললেন কেন না, এক সাক্ষী আরও তৈরী করা হোক। ব্রহ্মা বললেন ভাল কথা, তখন গায়ত্রী শব্দ শক্তি দ্বারা একটি কন্যা (পুহপর্বতী) উৎপন্ন করেন, তাকে দুইজনই বললেন, তুমি সাক্ষী দেবে যে, ব্রহ্মা পিতার দর্শন করেছেন। তখন পুহপবতী কন্যা বললেন, আমি কেন মিথ্যা সাক্ষী দেব? হ্যাঁ ব্রহ্মা যদি আমার সঙ্গে রতি ক্রিয়া (সম্ভোগ) করে তাহলে সাক্ষী দিতে পারি। গায়ত্রী ব্রহ্মাকে বলে বোঝালেন, আর কোন পথ নেই। তখন ব্রহ্মা পুহপবতীর সঙ্গেও সম্ভোগ (রতি ক্রিয়া) করেন। তারপর তিনজন মিলে আদি মায়া (প্রকৃতি/দূর্গা)-র কাছে যায়। দুই দেবী (গায়ত্রী ও পুহপবতী) উপরোক্ত শর্ত এইজন্য রেখেছি যদি ব্রহ্মা মাতার সামনে আমাদের মিথ্যা সাক্ষীর কথা বলে দেন তারপর মাতা যদি অভিশাপ দেন। তাই ব্রহ্মাকেও দোষী বানিয়ে নিয়েছেন।

(এখানে মহারাজ গরীব দাস জী বলেন কি— দাস গরীব এ চুক ধুরন্দর ধুর)

।। মাতা (দূর্গা)-র দ্বারা ব্রহ্মাকে শাপ দেওয়া।।

তখন মাতা দূর্গা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, কিরে তোর পিতার সঙ্গে দর্শন হয়েছে? হ্যাঁ আমার পিতার সঙ্গে দর্শন হয়েছে। দূর্গা বললেন, সাক্ষী দেখা। তখন ব্রহ্মা বললেন এরা দুইজনই সাক্ষী আছে, এদের সামনে সাক্ষাৎ হয়েছে। দূর্গা মাতা ওই দুই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের সামনে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হয়েছে? তখন দুজনেই বলেন, আমাদের চোখেই দেখেছি। তখন দূর্গার (প্রকৃতির) সংশয় হল, ব্রহ্ম বলেছিলেন যে কি, আমি কাউকে দর্শন দেব না, পরন্তু এরা বলে দর্শন হয়েছে। ত খন অষ্টাঙ্গী (দূর্গা) ধ্যান লাগিয়ে কাল জ্যোতি নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করেন এ কাহিনী কি? জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) বলে এরা তিনজনই মিথ্যা বলছে। তখন দূর্গা বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো, তখন আকাশবাণী হল যে, এরা কোন দর্শন করেনি। এ কথা শুনে ব্রহ্মা বলে মাতাজি, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি পিতার খোঁজ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পিতার দর্শন হয়নি, আপনার সামনে আসতে লজ্জা পেয়ে, মিথ্যাকথা বলেছি। তখন মাতা (দূর্গা) বলে, এখন তোমায় অভিশাপ দেব।

ব্রহ্মাকে শাপ ঃ- তোর পূজা জগতে হবে না। আগে গিয়ে তোর বংশ অনেক ভন্ডামি করবে। মিথ্যা কথা বলে জগৎকে ঠকাবে। উপর থেকে কর্ম কান্ড করা দেখাবে ভেতরে ভেতরে

বিকার করবে। কথা বা পুরান পড়ে শোনাবে, নিজের (স্বয়ং-এর) জ্ঞান হবে না যে কি, বাস্তবিক কি? তবুও মান বশ, ধন প্রাপ্তির জন্য গুরু হয়ে অনুযায়ী শিষ্যদের লোকবেদ (শাস্ত্র বিরুদ্ধে দন্ত কথা) শুনাবে। দেব-দেবীরা পূজা করাবে ও নিজেও করবে, অন্যের নিন্দা করে কষ্টের পর কষ্ট উঠাবে। যে যে তার অনুযায়ী হবে তাদের পরমার্থ (পরমেশ্বরের মার্গ প্রাপ্তুর কথা) বলতে পারবে না। দক্ষিণার জন্য জগৎকে গুমরাহ (পথ ভুলিয়ে দেওয়া) করাবে। নিজে নিজেকে সব থেকে ভাল মনে করবে এবং অন্যকে নীচু দেখাবে। যখন মাতার কাছ থেকে এসব কথা শুনেলেন। ব্রহ্মা তখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান এসেছিল।

গায়ত্রী কে শাপ ঃ- তোর অনেক ষাঁড় পতি হবে। তুই মৃত্যুলোকে গায় হবি।

পুহপবতি কে শাপ ঃ- তোর জায়গা নোংরাতে হবে। তোর ফুলকে কেউ পূজায় লাগাবে না। এই মিথ্যা সাক্ষীর কারণ তোর এই নরক ভোগ করতে হবে। তোর নাম কেবড়া কেতকী হবে। (হরিয়ানায় কুসন্ধি) বলা হয়। এই গাছ গন্ধ বা নোংরা ফেলানো জায়গায় ও হয়ে থাকে।

এই ভাবে তিন জনকেঅভিশাপ দিয়ে অনেক অনুতাপও করেছিলেন। এই প্রকারেই তো জীব না জেনে (কাল নিরঞ্জন)-এর প্রভাবে ভুল কাজ করে ফেলে। পরে আত্মা (সতপুরুষ অংশ) -র প্রভাবে জ্ঞান হলে পরে পশ্চাতাপ হয় বা অনুতপ্ত হয়ে থাকে। যেরকম মা-বাবা নিজের বাচ্চাকে ছোট্ট ভুলের কারণে ধমকি বা তাড়া দেয় এবং মারও দেয়, কিন্তু পরে অনুতাপ করে। এই প্রক্রিয়া মন (কাল-নিরঞ্জন)-এর প্রভাবে সর্ব জীবের মধ্যে ক্রিয়া বান হতে থাকে। হ্যাঁ তবে এখানে বিশেষ কথা যে কি, কাল নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম)-ও নিজের একটা কানুন বানিয়ে রেখেছেন। যদি কোনো জীব কোনো দুর্বল জীবকে সতায় বা অত্যাচার করে, তবে ওকে ওর বদলা পেতে হয়। যখন আদি ভবানী (প্রকৃতি, অষ্টঙ্গী) ব্রহ্মা গায়ত্রী ও পুহপবতীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন অলখ নিরঞ্জন (ব্রহ্মকাল) বলেছিলেন হে ভবানী, (প্রকৃতি, অষ্টঙ্গী) এটা তুমি ঠিক করোনি এখন আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, যে কি দ্বাপর যুগে তোমার পাঁচটাপতি হবে। (দ্রোপদী-ই আদি মায়ার অবতার) যখন এই আকাশবাণী শুনেছেন, তখন আদি মায়া বলে যে, হে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) আমি তোর বশে আছি যা তোর করতে ইচ্ছা করে নে।

।। বিষ্ণু নিজের পিতা ব্রহ্মকে প্রাপ্তির জন্য প্রস্থান এবং মাতার আশির্বাদ লাভ ।।

এর পরে বিষ্ণুকে প্রকৃতি বলে, পুত্র তুইও তোর পিতার খোঁজ নিয়ে আয়। তখন বিষ্ণু পিতা কাল (ব্রহ্ম)-র খোঁজ করতে করতে পাতাল লোকে চলে যান, সেখানে শেষ নাগ ছিল। শেষনাগ বিষ্ণুকে তার সীমানায় প্রবিষ্ট হতে দেখে, ক্রোধে বিষের ফুয়ারা মেরেছিল। তার বিষের প্রভাবে বিষ্ণুর রং শ্যামলা হয়ে যায়, যেমন-স্প্রে করে পেন্ট করা হয়ে থাকে। তখন বিষ্ণু ভাবল একে এখন মজা দেখাতে হবে। তখন জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) দেখল, বিষ্ণুকে এখন শান্ত করার দরকার। তখনই আকাশবাণী হল বিষ্ণু তুই এখন মাতার কাছে যা, আর সত্য সত্য সব ঘটনা (বিবরণ) বলে দে, তোকে যে কষ্ট শেষ নাগ দিয়েছে, এর প্রতিশোধ দ্বাপর যুগে নিয়ে নিবি। দ্বাপর যুগে তুই কৃষ্ণ অবতার ধারণ করবি আর কালিদহেতে কালিন্দ্রী নামক নাগ, শেষ নাগের অবতার হবে।

উঁচ হোই কে নীচ সতাবে, তাকর ওএল (বদলা) মোহী সোপাবে।
জো জীব দেই পীর পুনী কাহু, হম পুনী ও এল দিবাবেং তাহু।।

তখন বিষ্ণু মাতার কাছে এসে সব সত্য কথা বলে দিলেন যে, আমার সাথে পিতার দেখা হয় নি। মাতা এই কথা শুনে বললেন, পুত্র তুই সত্যবাদী, তোর কথায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। এখন আমি আমার শক্তির দ্বারা তোকে তোর পিতার সঙ্গে মিলাব, তোর মনের সংশয় দূর করব।

কবীর, দেখ পুত্র তোহি পিতা ভীটাউ, তোরে মন কা ধোখা মিটাউ
মন সরূপ কর্ত্তা কহ জানোং, মন তে দুজা ওর না মানো।।
স্বর্গ পাতাল দৌড় মন কেরা, মন অস্থির মন অহে অনেরা,
নিরকার মন হি কো কহিয়ে, মন কী আশ নিশদিন রহিয়ে।।
দেখ হুঁ পলটি সুন্য মোহ জ্যোতি, জহা পর ঝিলমিল ঝালর হোতী।।

এই প্রকারে মাতা (প্রকৃতি, অষ্টঙ্গী, দূর্গা) বিষ্ণুকে বললেন, মন হল জগতের কর্ত্তা, এই হল জ্যোতি নিরঞ্জন। ধ্যানে যে একহাজার জ্যোতি নজরের সামনে আসে ওই তার রূপ। যে শঙ্খ, ঘন্টা ইত্যাদির বাজনা শুনছো ওই মহাস্বর্গ নিরঞ্জনেরই বাজনা হচ্ছে। তখন মাতা (প্রকৃতি, অষ্টাঙ্গী) বললেন পুত্র তুই সবদেবতার সরতাজ (মুকুট), তোর সব কামনা ও কাজ আমিই পূর্ণ করব। তোর পূজা সারা জগতে হবে। তুই আমাকে সত্য সত্য বলেছিস। কালের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের বিশেষ অভ্যাস যে কি নিজে ব্যর্থ মহিমা বানায়। যেমন কি দূর্গা বিষ্ণুকে বলছেন তোর পূজা জগতময় হবে। আমি তোকে তোর পিতার দর্শন করিয়ে দিয়েছি। দূর্গা কেবল প্রকাশ দেখিয়ে বিষ্ণুকে ভুলিয়ে দিলেন। বিষ্ণুও তাই তার অনুযায়ী ভক্তদের বুঝাতে লাগলেন পরমাত্মার কেবল প্রকাশ দেখা যায়, পরমাত্মা নিরাকার। এরপরে আদি ভবানী রূদ্র (মহেশের)-এর কাছে গিয়ে বলে তুই তোর বাবার খোঁজ কর। তোর দুই ভাই তো তোর পিতার দর্শন পাইনি, তাদের যা দেওয়ার তা আমি প্রদান করে দিয়েছি। এখন তুই যা চাওয়ার চেয়ে নে। তখন মহেশ বলে হে মাতা, জননী, আমার দুই ভাইয়েরই পিতার দর্শন হয় নি অতএব আমার প্রয়ন্ত করা বৃথা। কৃপা করে আমায় এমন বর দাও যে আমি অমর (মৃত্যুঞ্জয়) হয়ে যাই। তখন মাতা বলল, এটা আমি করতে পারব না। হাঁ তবে যুক্তি বলতে পারি, যাতে তোর আয়ূ অনেক লম্বা হয়ে যায়। বিধি যোগ সমাধি (এই জন্য মহাদেব বেশী সময় সমাধিতে থাকে) এই প্রকারে মাতা (প্রকৃতি, অষ্টাঙ্গী) তার তিন পুত্রকে বিভাগ ভাগ করে দিলেন।

ব্রহ্মাকে কাল লোকে লক্ষ চুরাশী চোলে (শরীর) রচ-নাতে (বানানো) অর্থাৎ রজোগুণ প্রভাবিত করে সন্তান উৎপত্তির জন্য বিবশ করিয়ে, জীব উৎপত্তি করানোর বিভাগ প্রদান করেন।

বিষ্ণুকে এই সব জীবের পালন পোষণ (কর্মানুসার) করার, ও মোহ মমতা দ্বারা উৎপন্ন স্থিতি বানিয়ে রাখার বিভাগ দিয়েছেন।

শঙ্কর (মহাদেব)-কে সংহার করার বিভাগ প্রদান করেছেন। কেননা এদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) পিতা নিরঞ্জনকে এক লক্ষ মানব শরীর ধারী জীবকে প্রতিদিন আহার করতে হয়।

এখানে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উৎপন্ন হয় যে কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর থেকে উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কিভাবে হয়? এ তিন জন নিজের নিজের লোকে (ধামে) থাকে । আজকাল

যেমন, সঞ্চার প্রণালীকে চালানোর জন্য উপগ্রহসব উপর আকাশে ছোড়া হয় আর সে নীচে পৃথিবীর উপর সঞ্চার প্রণালীকে চালায়। ঠিক ঐ প্রকারে এই তিন দেব যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের শরীরের যে সুক্ষ গুণের তরঙ্গ তিন লোকেই সব প্রাণীর উপর নিজেনিজেই প্রভাব বানতে থাকে।

উপরোক্ত বিবরণ এক ব্রহ্মান্ডের ব্রহ্ম (কাল)-এর রচনা আছে, এইরকম ক্ষরপুরুষের একুশ ব্রহ্মান্ড আছে।

তবে ক্ষর পুরুষ (কাল) স্বয়ং ব্যক্ত অর্থাৎ বাস্তবিক শরীর রূপে সবার সামনে আসে না। ওই ব্রহ্ম(কাল) কে দর্শন ও পাওয়ার জন্য তিন দেবই (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) বেদে বর্ণিত বিধি অনুসারে কঠিন সাধনা করার পরও দর্শন হয়নি, পরে ঋষিরা বেদকে পড়েছিলেন তাতে লেখা আছে, যে, ‘অগ্নেঃ তনুর, অসি। (পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ১ মন্ত্র ১৫) পরমেশ্বর সশরীর আছেন তথা পবিত্র যজুর্বেদে অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১-এ লেখা আছে যেকি, “অগ্নেঃ তনুর্ অসি বিষ্ণবে ত্বা সোমস্য তনুর্ অসি’। এই মন্ত্রে দুই বার বেদ প্রমাণ (সাক্ষী) দিয়েছে যে কি, সর্ব ব্যাপী সর্বপালন কর্ত্তা সতপুরুষ সশরীরে আছেন। পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ৮-এ বলেছে (কবীর মনিষী) যে পরমেশ্বরকে সর্ব প্রাণী চায়, তিনি কবীর্ অর্থাৎ কবীর। তার শরীর বিনা নাড়ী (অস্নাবিরম্)-র (শুক্রম্) বীর্য থেকে বানানো পাঁচ তত্ত্ব থেকে বানানো ভৌতিক (অকায়ম্) কায়া রহিত। তিনি সর্বের মালিক সর্বোপরি সতলোকে বিরাজমান। ওই পরমেশ্বরের তেজপুঞ্জের (স্বর্জ্যোতি) স্বয়ং প্রকাশিত শরীর যিনি কিনা, শব্দরূপ অর্থাৎ অবিনাশী। ওই কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)-ই আছেন, যিনি সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচনা করার মালিক (ব্যদধাতা) সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচয়িতা (সয়ম্ভুঃ) সয়ংপ্রকট হয়ে থাকেন। (যথা তথ্য অর্থান্) বাস্তবে (শাশ্বত) অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭ তেও প্রমান আছে।) ভাবার্থ হয় যে কি, পূর্ণ ব্রহ্মার শরীরের নাম কবীর (কবীর দেব)। ওই পরমেশ্বরের শরীর নুর (তেজ, জ্যোতি, প্রকাশ) তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। পরমাত্মার শরীর অতি সুক্ষ্ম, যে কি সেই সাধকরা দেখতে পাবেন, যাদের দিব্য দৃষ্টি খোলা আছে। এই প্রকার জীবেরও সুক্ষ্ম শরীর আছে। যার উপরে পাঁচ তত্ত্বের খোল (কবার) অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের কায়া চড়ানো হয়েছে। যেকিনা মাতা-পিতার সংযোগ (বীর্য, শুক্রম)-থেকে বানানো রয়েছে। শরীর ত্যাগ হওয়ার পরেও জীবের সুক্ষ্ম শরীর সাথে থাকে। ওই শরীর ওই সাধককে দেখতে পায়, যার দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছেন।

এই প্রকার পরমাত্মা ও জীবের স্থিতিকে বুঝবেন। বেদে ওঁম্ নামের স্মরণের প্রমাণ আছে, যে কেবল ব্রহ্ম সাধনা। এই উদ্দেশ্যে ওঁ নামের জপকে পূর্ণ ব্রহ্মের জপ মেনে নিয়ে ঋষিরা হাজার বছর ধরে হঠযোগ (সমাধী লাগিয়ে) করে প্রভু প্রাপ্তির চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রভু দর্শন হয় নি। শুধু সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ওই ধরনের সিদ্ধি প্রাপ্তি খেলনা দিয়ে খেলা করে ঋষিরা জন্ম মৃত্যুর চক্রতেই রয়ে গিয়েছেন। নিজের অনুভবে শাস্ত্রে পরমাত্মাকে নিরাকার লিখে দিয়েছেন। ব্রহ্ম (কাল) কসম (প্রতিজ্ঞা) খেয়েছিলেন, যে নিজের বাস্তবিক রূপ কাউকে দর্শন দেবেন না। সবাই আমাকে অব্যক্ত ভাববে (কোন আকারে আছে) কিন্তু ব্যক্তিগত রূপ থেকে স্থূল রূপে দর্শন দেয় না। যেমন আকাশে মেঘ ছেয়ে থাকলে দিনে সূর্য অদৃশ্য থাকে বা হয়ে যায়। তিনি দৃশ্যমান নেই কিন্তু বাস্তবে বাদলের ওপাড়ে যেমন সূর্য থাকে, ঠিক তেমনই আছেন, এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়।

(প্রমাণের জন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৪-২৫ অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৩২ -৪৮)

পবিত্র গীতা বলা যে ব্রহ্ম(কাল) শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত হয়ে প্রবেশ করে বলছিলেন হে অর্জুন, আমি বাড়ন্ত কাল বা সমগ্র লোক ক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এখন সবাইকে সংহার (গ্রাস) করতে এসেছি। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৩২) এটাই আমার বাস্তবিক রূপ, এই রূপ তুমি ছাড়া আগে কেউ দেখেনি না দেখতে পারবে। অর্থাৎ বেদে বর্নিত যজ্ঞ-জপ-তপ তথা ওঁ ইত্যাদি বিধি দ্বারাও আমার এই বাস্তবিক স্বরূপের দর্শন হয় না। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৪৮) আমি কৃষ্ণ নই, এই মূর্খ লোক কৃষ্ণ রূপে আমায় অব্যক্তকে ব্যক্ত (মানুষ্য রূপ) রূপ মানছে। কেননা এরা আমার অনুনত্তম্ (নীচ প্রকৃতির নিয়মে) নিয়মে অপরিচিত আছে। আমার এই বাস্তবিক কাল রূপে আমি কাহারও সামনে আসি না। নিজের যোগমায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকি। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৪-২৫) বিচার করো-নিজের লুকিয়ে থাকা নিয়মকে স্বয়ংই অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তম) কেন বলছেন ?

যদি পিতা নিজের সন্তানকেও দর্শন না দেয়, তাহলে তার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি আছে, যার কারণ লুকিয়ে তথা সুবিধাও প্রদান করছেন। কাল (ব্রহ্মের)-এর শাপযুক্ত কারণে এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীকে আহার করতে হয় এবং ২৫ প্রতিশত প্রত্যেকদিন বেশী উৎপন্ন করতে হয়, ওদের ঠিকানা লাগানোর জন্য ও কর্ম ভোগের দন্ড দেবার জন্য, চুরাশী লক্ষ যোনীর রচনা করে রেখেছে। যদি সবার সামনে বসে কাহারওপুত্রী, কাহারওস্ত্রী কাহারও পুত্র, কাহারও মাতা পিতা কে খায়, তাহলে সবাই ব্রহ্ম কে ঘৃণা করবে। আর যখনই কোনদিন পূর্ণ পরমাত্মা কবিরগ্নি (কবির পরমেশ্বর)স্বয়ংই এসে যান, বা তার কোনো সন্দেশবাহককে (দূত) পাঠান্ তাহলে সর্ব প্রাণী সত্য ভক্তি করে কালের জাল থেকে বেরিয়ে যাবে। এইজন্য ধোখায় (ঠকিয়ে) রাখা হয়।

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮-২৪-২৫ কাল ভগবান নিজের সাধনাতে হওয়া গতি বা (মুক্তি) কেও অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তম) বলেছেন, নিজের নিয়ম (বিধি) কেও অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তমাম্) বলেছেন।

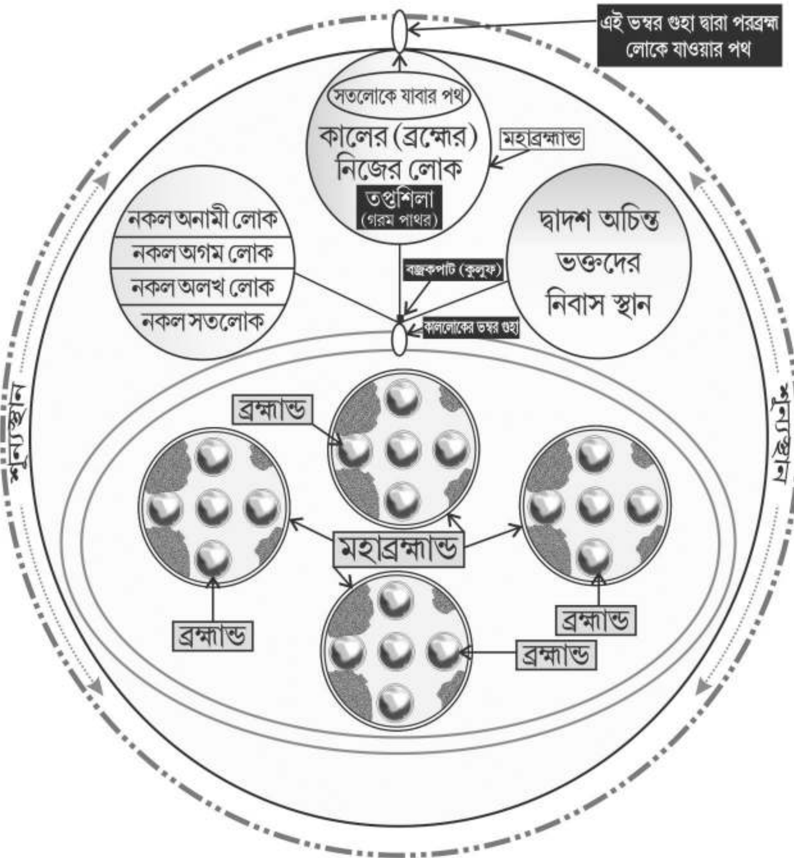
প্রত্যেক ব্রহ্মান্ডে যে ব্রহ্মলোক বানিয়েছেন তাতে একটা মহাস্বর্গও বানিয়েছেন। মহাস্বর্গের এক স্থানে নকলী সতলোক, নকল, অলখ লোক, নকল অগম লোক ও নকল অনামী লোক বানিয়েছেন, প্রাণীদের (জীবদের) ঠকানোর জন্য। এসব প্রকৃতি (মায়া, দূর্গা)-র দ্বারা করিয়ে রেখেছেন। কবীর পরমেশ্বরের এক শব্দ আছেঃ—

কর নৌনং দীদার মহল মে প্যারা হে
মে বাণী হে কি, কায়া ভেদকিয়া নিরবারা
যহ সব রচনা পিন্ড মাঝারা হে
মায়া অবিগত জাল পসারা, সো কারীগর ভাড়া হে
আদি মায়া কিনহী চতুরীই, ঝুঠী বাজী পিন্ড দিখাই
অবিগত রচনা রুচি অন্ত মাহি, বাকা প্রতিবিম্ব ডারা হে।।

এক ব্রহ্মাণ্ডে অন্য লোকও রচনা আছে, যেমন শ্রী ব্রহ্মার লোক, বিষ্ণুর লোক, ও শিবের লোক। সেখানে বসে তিন প্রভু নীচের তিন লোক (স্বর্গলোক অর্থাৎ ইন্দ্রলোক, পৃথিবীলোক ও পাতাল লোক)-এর উপর এক এক বিভাগের মালিক হয়ে প্রভুতা করেন। নিজের পিতা কাল ব্রহ্মের আহার জোগারের জন্য প্রাণী উৎপত্তি। স্থিতি ও সংহার করার কার্য্যভার সামলায়। তিন প্রভুরই জন্ম ও মৃত্যু হয়। তখন কাল এদেরও খেয়ে থাকেন।

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের ২১ লোকের (ব্রহ্মান্ডের) লঘুচিত্র



এই ব্রহ্মান্ডকে ডিম্বও বলা হয়, কেননা ব্রহ্মান্ডের আকার ডিম্বাকারের মত আছে, একে পিন্ডও বলা হয়। কেননা শরীরের এক ব্রহ্মান্ডের (পিন্ডের) রচনা পদ্মফুলেতে টি.ভির মত দেখা যায় একমান সরোবর তথা ধর্মরায়েরও (বিচারপতির) লোক (ধাম) আছে তাছাড়া এক গুপ্তস্থানের উপর পূর্ণ পরমাত্মা অন্য রূপ ধারণ করে থাকেন, যেমন প্রত্যেক দেশের রাজদূত ভবন হয়ে থাকে, সেখানে কেউ যেতে পারেন না। সেখানে এই প্রকারের আত্মারা থাকেন, যাহাদের ভক্তি অধুরী রয়েছে। তবে যখন ভক্তিযুগ আসে, তখন সে সময়ে এই সমস্ত পুণ্য-আত্মাদেরকে পৃথিবীতে মানব শরীর প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং এরা তাড়াতাড়িই সতভক্তিতে জুড়ে যায় তথা পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে। সেই স্থানে থাকা হংস আত্মাদের নিজের ভক্তির কামাই বা পুঁজি খরচ হয় না। কারণ পরমাত্মার ভান্ডারে সমস্ত সুবিধা উপলব্ধ আছে। ব্রহ্মের (কালের জ্যোতি নিরঞ্জনের) উপাসকদের ভক্তির কামাই বা পূঁজি, স্বর্গ ও মহাস্বর্গে গিয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়। কেননা এই কাল লোক বা পরব্রহ্ম লোকের প্রাণীদের। নিজের দ্বারা করা কর্মের ফলই পেয়ে থাকে।

ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) নিজের ২০ ব্রহ্মান্ডকে চার মহা ব্রহ্মান্ডে বিভক্ত করেছেন। এক মহাব্রহ্মান্ডে পাঁচ ব্রহ্মান্ডকে রেখে, তার চারিদিকে গোলাকার করে রেখেছেন। এই রকম চার মহাব্রহ্মান্ডে পাঁচটা করে ব্রহ্মান্ড বানিয়ে রেখেছেন। একুশ নং যে ব্রহ্মান্ডের রচনা এক মহাব্রহ্মান্ডের মত ততটা জায়গা নিয়ে বানিয়েছেন। এই একুশ ব্রহ্মান্ডে প্রবেশ করতে তিন রাস্তা বানিয়েছেন এই একুশ ব্রহ্মান্ডের বাঁদিকে নকল সতলোক, নকল অলখ লোক, নকল অগম লোকও নকল অনামী লোক রচনা করেছে, জীবদের ধোখাতে (ভ্রমের মধ্যে) রাখার জন্য, আদি মায়া (দূর্গার)-র দ্বারা বানিয়েছেন তথা ডানদিকে সব শ্রেষ্ঠ সাধক (ভক্ত) কে রাখা হয়। পরে প্রত্যেক যুগে তাদের নিজের দূত (সন্ত, সাধু গুরু) বানিয়ে, পৃথিবীতে পাঠান। যে কিনা শাস্ত্র বিধির বিরুদ্ধে সাধনা জ্ঞান বলেন, যাতে তারা ভক্তিহীন হয়ে থাকেন এবং তার অনুযায়ী শিষ্যরাও ভক্তিহীন হয়ে নরকে যেতে পারেন। পরে সামনে এক তালা (কুলুফ) লাগিয়ে রেখেছেন। ওই রাস্তায় কাল (ব্রহ্ম) নিজের লোকে প্রবেশ করেন। ওই জায়গায় কাল (ব্রহ্ম) নিজের বাস্তবিক মানব সদৃশ কাল রূপে থাকেন। ওই স্থানের উপর পাথরের টুকরো অর্থাৎ রুটি ভাজা তাওয়ার আকারের গোল প্লেটের মতো সব সময় গরম থাকে। যার উপর এক লাখ মানবশরীর ধারী প্রাণীদের সুক্ষ্ম শরীরকে ভেজে তার ভেতরের যত নোংরা বের হয় তাই খান। ওই সময়ে সব প্রাণীর খুব যন্ত্রণা ভুগতে (অনুভব) হয় এবং হাহাকার ক্রন্দন করে, পরে বেহুঁশ হয়ে পড়েন কিন্তু মরেন না। পরে ধর্মরাজের লোকে গিয়ে কর্মফল অনুযায়ী অন্য অন্য যোনীতে জন্ম পায় ও মৃত্যুর চক্করে লেগেই থাকে। উপরে সামনে যে লাগানো তালা ব্রহ্ম (কাল) কেবল তাহার নিজের আহার করার প্রাণীদের জন্য কিছু সময় খোলে। পূর্ণ পরমাত্মার সত্যনাম ও সারনাম দ্বারা সেই তালা খোলে। এই প্রকারে কালের জালের খবর পরমাত্মা কবিরদের (কবীর সাহেব) নিজেই তার ভক্ত ধর্মদাসকে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

।। পরব্রহ্মের সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ডের স্থাপনা ।।

কবীর পরমেশ্বর (কবীরর্দেব) আগে বলেছিলেন যে, পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) নিজের কার্য্যতে গাফিলতি করেছিলেন যে কি, মানসবোরবে শুয়ে (ঘুমিয়ে) পড়েছিলেন। যখন পরমেশ্বর (কবীরর্দেব) ওই সরোবরে ডিম ছেড়েছিলেন তখন অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) ক্রোধে ডিম্বাকারের দিকে তাকিয়েছিলেন। এই দুই অপরাধের কারণে তাকেও সতলোক থেকে সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ডের সহিত

বের করে দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় কারণ অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) নিজের সাথী ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ) থেকে বিদায় হওয়াতে ব্যাকুল হয়ে পরমপিতা (কবীর পরমেশ্বর)-র কথা ভুলে ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম)-র কথা ভাবতে লাগলেন। ভাবছেন ও তো খুব আনন্দ মানাচ্ছে আমি পিছনে রয়ে গেলাম, তথা অন্য কিছু আত্মারা যারা কিনা পরব্রহ্মের সাথে সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ডোতে জন্ম-

মৃত্যুর কর্মদন্ড ভোগ করছিল। সেই হংস আত্মাদের বিদায়ের স্মৃতি মনে করে হারিয়ে যেত (যারা ব্রহ্ম কালের সাথে একুশ ব্রহ্মান্ডে ফাঁসা আছে) তথা পূর্ণ পরমাত্মা (সুখদায়ী কবির্দেবের স্মৃতি ভুলে যায়) পরমেশ্বর কবির্ দেবের বারংবার বোঝানোর পরেও আস্থা তাদের প্রতি কম হয়নি। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) ভাবলেন আমিও আলাদা স্থান প্রাপ্ত করব তাহলে ভালই হবে। এই কথা ভেবে রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছাতে, সারনাম জপতে শুরু করে। এই প্রকার অন্য আত্মারা যারা পরব্রহ্মের সাত সংখ্য ব্রহ্মান্ডে ফেঁসে আছে)। ভাবল যে, তারা যে ব্রহ্মের সাথে গিয়েছে, তারা তো খুব মৌজমস্তি বা আনন্দ করছে, আমরাই পিছনে রয়ে গেলাম। পরব্রহ্মের মনে এই ধারণা হল যে, ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ব্রহ্ম) আলাদা হয়ে অনেক সুখী আছে। এই বিচার মনে আসার কারণে, সেও পরমপিতার কাছ থেকে অন্য স্থান প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা জাগে।

পর ব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ) হঠ যোগ করেননি, তবে শুধু আলাদা রাজ্য পাওয়ার জন্য সহজ ধ্যান যোগ একান্ত মনে করছিলেন। আলাদা স্থান পাওয়ার জন্য পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন। খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করেছিলেন অন্য কিছু আত্মাদের বৈরাগ্য দেখে, তাকে চাইতে বা ভালবাসতে লাগলেন। পূর্ণ প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, কি চাই? তখন পরব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ) বললেন, আমার আলাদা স্থান ও কিছু হাঁস আত্মা যাঞ্চনা করি। তখন কবির্দেব বললেন, যে আত্মা আপনার সাথে স্বইচ্ছায় যেতে ইচ্ছা তাকেই পাঠিয়ে দেব। এখানেও কিছু সময় সব চুপচাপ, পরে এক হাঁস আত্মা সাহস করে বলে আমি যেতে চাই, পরে তার দেখাদেখি সব স্বীকৃতি দেয়। প্রথম যে আত্মা স্বীকৃতি দেয়, তাঁকে স্ত্রী বানালেন, তার হয় নাম ঈশ্বরী মায়া (প্রকৃতি সুরতি) রেখেছে তথা যে সব আত্মারা তার সাথে স্বীকৃতি দিয়েছিল তাদের সবাইকে ঈশ্বরী মায়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে, অচিন্তের দ্বারা অক্ষর-পুরুষের (পরব্রহ্মের) কাছে পাঠিয়ে দিলেন। (পতিব্রতা পদ থেকে নেমে যাওয়ার সাজা পেয়েছে) কয়েক যুগ ধরে দুজনেই সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ডোতে ছিল, কিন্তু পর ব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ) ঈশ্বরী মায়ার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেনি। ঈশ্বরী মায়া স্বেচ্ছায় তে অঙ্গীকার করেছিলেন আর নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা নখ দিয়ে স্ত্রী ইন্দ্রী যোনী বানিয়েছিল। ঈশ্বরী দেবীর সহমতিতেই সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। এইজন্য পরব্রহ্ম লোক (সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ড)-এর প্রাণীদের তপ্ত শিলার মত কষ্ট ভুগতে হয় না, তাছাড়া পশু পক্ষীদেরও ব্রহ্ম লোকের দেবদের সঙ্গে ভাল স্বভাব যুক্ত হয়ে থাকে। আয়ূও অনেক লম্বা, কিন্তু জন্ম মৃত্যু কর্মের আধারপর কর্মদন্ড ও পরিশ্রম করেই পেট ভরতে হয়। স্বর্গ নরকও বানানো আছে। পর ব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ) সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ড তার ইচ্ছা রূপী ভক্তি ধ্যান ও সহজ সমাধি বিধিতেই করেছে তবে তার কামাইয়ের প্রতিফলে প্রদান করেছিলেন। সতলোক থেকে আলাদা স্থানে গোলাকার পরিধিতে বন্ধ করে, সাত সঙ্খঁ ব্রহ্মান্ড সহিত ঈশ্বরী মায়া ও অক্ষর ব্রহ্মকে নিষ্কাসিত করা হয়েছিল।

পূর্ণ ব্রহ্ম(সতপুরুষ) হলেন যিনি সত্যলোক আদিতে তথা ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মান্ড ও পরব্রহ্মের সাত সঙ্খঁ ব্রহ্মান্ডেরও মালিক (প্রভু) অর্থাৎ পরমেশ্বর কবির্দেব কুলের প্রভু বা (সর্বেশ্বর মালিক)।

শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবাদির চার চার হাত (ভূজা) আর ১৬ কলা আছে। প্রকৃতি দেবী (দূর্গা)-র আট হাত (অষ্টভূজা) আর ৬৪ কলা আছে। ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ)-এর এক হাজার হাত এবং এক হাজার কলা তাছাড়া একুশ ব্রহ্মান্ডের প্রভু। পর ব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ)-এর দশ হাজার হাত (ভূজা) এবং দশ হাজার কলা, তাছাড়া ইনি সাত সঙ্খঁ ব্রহ্মান্ডের প্রভু। পূর্ণ ব্রহ্ম (পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ সতপুরুষ)-এর অসংখ্য হাত (ভূজা) এবং অসংখ্য কলা ও ব্রহ্মের একুশ ও পরব্রহ্মের সাত সঙ্খঁ ব্রহ্মান্ড সহিত অসংখ্য ব্রহ্মান্ডের প্রভু। (প্রত্যেক) প্রভু সব হাত (ভূজা) গুটিয়ে দুই হাত (ভূজা) ও রাখতে পারেন। আবার নিজের ইচ্ছা মত সব ভূজা প্রকট করতে পারে। পূর্ণ পরমাত্মা পরব্রহ্মের প্রত্যেক ব্রহ্মান্ডে আলাদা স্থান বানিয়ে অন্য রূপে গুপ্ত হয়ে থাকেন। উদাহরণ— যেমন ঘুরতে থাকা ক্যামেরা যেমন বাইরে লাগানো হয় এবং টিভি (টেলিভিশন) ঘরের ভেতরে থাকে। টি.ভি. তে বাইরের সব দৃশ্য দেখা যায়। আবার টি.ভি বাইরে রেখে ভিতরে ক্যামেরা রাখলে, তাতে কেবল ভেতরের যারা তাদের চিত্র দেখা যায়, যাহাতে সব কর্মচারী সাবধান থাকে।

ঠিক এই রকম পূর্ণ পরমাত্মা নিজের সতলোকে বসে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তথা প্রত্যেক ব্রহ্মান্ডতে সতগুরু কবির্দেব বিদ্যমান থাকেন। যেমন সূর্য দূরে থাকতেও নিজের প্রভাব সব জায়গায় বানিয়ে রাখে।

।। পবিত্র অথর্ববেদে সৃষ্টি রচনার প্রমান।।

।। কান্ড নং ৪ অনুবাদ নং ১ মন্ত্র ১ ।।

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সিমতঃ সুরূচো বেন আবঃ।
স বুধন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ।। ১ ।।

ব্রহ্ম-জ-জ্ঞানম্-প্রথমম্-পুরস্তাত্-বিসিমতঃ-সুরূচঃ-বেনঃ-আবঃ-সঃ-বুধন্যাঃ-উপমা-অস্য-বিষ্ঠাঃ-সতঃ-চ-যোনিম্-অসতঃ-চ-বি বঃ

অনুবাদ ঃ- (প্রথমম্) প্রাচীন অর্থাৎ সনাতন (ব্রহ্ম) পরমাত্মা (জ) প্রকট হয়ে (জ্ঞানম্) নিজস্ব জ্ঞানের দ্বারা (পুরস্তাৎ) শিখরে অর্থাৎ সতলোক আদিকে (সুরুচঃ) স্বইচ্ছা দ্বারা অনেক রুচী রেখে স্বপ্রকাশিত (বিসিমতঃ) সীমাছাড়া অতএব বিশাল সীমাবালা অন্যান্য লোককে ব্রহ্মান্ড সকলকে ওই (বেনঃ) তাঁতী তানের মত অর্থাৎ কাপড়ের মত বুনে (আবঃ) সুরক্ষিত করেন (চ) তথা (সঃ) সেই পূর্ণ ব্রহ্মই সমস্ত রচনা করেছেন অতএব (অস্য) সেই (বুধন্যাঃ) মূল মালিক (যোণীম্) মূলস্থান সতলোকের রচনা করেন (অস্য) সেই রকমের (উপমা) স্বদৃশ অর্থাৎ একই রকমের প্রায়ই মিলে থাকে (সতঃ) অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের লোক কিছুটা স্থায়ী (চ) তথা (অসতঃ) ক্ষর পুরুষের অস্থায়ী লোক আদি (বি বঃ) আবাস স্থান আলাদা (বিষ্ঠাঃ) স্থাপিত করেছেন।

ভাবার্থ ঃ- পবিত্র বেদ বলা ব্রহ্ম (কাল) বলছে যে, সনাতন পরমেশ্বর স্বয়ং অনাময় (অনামী) লোক থেকে সতলোকে প্রকট হয়ে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে সুঝে কাপড়ের মত রচনা করে উপরের সতলোক আদিকে সীমা ছাড়া স্বপ্রকাশিত অজর-অমর অর্থাৎ অবিনাশী বা চিরস্থায়ী বানিয়ে রেখেছেন আর নীচের পরব্রহ্মের বা অক্ষর পুরুষের সাত সংখ ব্রহ্মান্ড ও ব্রহ্ম বা ক্ষর পুরুষের একুশ ব্রহ্মান্ড এবং তার ভিতরে ছোট থেকেও ছোট রচনাগুলি ওই পরমাত্মাই অস্থায়ী বানিয়েছেন।

।। কান্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ২ ।।

ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্র্যেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ
তস্মা এতং সুরুচং হ্বারমহ্যং ধর্মং শ্রীনন্তু প্রথমায় ধাস্যবে।।২।।

ইয়ম্-পিত্রা-রাষ্ট্রি-এতু-অগ্রে-প্রথমায়-জনুষে-ভুবনেষ্ঠাঃ-তস্মা-এতম-সুরুচম্-হ্বারমহ্যম্-ধর্মম্-শ্রীনান্তু প্রথমায়-ধাস্যবে।।

অনুবাদ ঃ- (ইয়ম্) এই (পিত্র্যা) জগৎপিতা পরমেশ্বরে (এতু) এই (অগ্রে) সর্বাগ্রে (প্রথমায়) প্রথমে মায়া পরনন্দনী (রাষ্ট্রী) রাজেশ্বরী শক্তিকে অর্থাৎ পরাশক্তি, যাকে আকর্ষণ শক্তিও বলা যায় (জনুষে) উৎপন্ন করে (ভুবনেষ্ঠাঃ) লোক স্থাপনা করেছে (তস্মা) ওই পরমেশ্বরে (সরুচম্) খুব রুচী রেখে সেচ্ছাতে (এতম) এই (প্রথমায়) প্রথম উৎপন্ন করা শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তির দ্বারা (হ্বারমহ্যম্) একজন অন্যর দুখে বিয়োগ থামিয়ে রাখতে পারে অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তির সঠিক সাধক আছে (শ্রীনান্তু) গুরুত্ব আকর্ষণকে পরমাত্মা আদেশ দিলেন সদা থাক ইহা কোনোদিন সমাপ্ত হয় না (ধর্মম্) স্বভাবে (ধাস্যবে) ধারণ করে ছড়ানো অর্থাৎ কাপড়ের মতো বুনে রেখে দিয়েছেন।

ভাবার্থ ঃ- জগৎ পিতা পরমেশ্বর নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা রাষ্ট্রিয় অর্থাৎ সবার প্রথম মায়া রাজেশ্বরী উৎপন্ন করেছেন তথা ওই পরাশক্তির দ্বারা একজন আরেকজনকে আকর্ষণ করে ধরে রাখে ইহা এ কখনও সমাপ্ত হবে না এই গুণ দ্বারা উপরোক্ত ব্রহ্মান্ডকে স্থাপিত করেছেন।

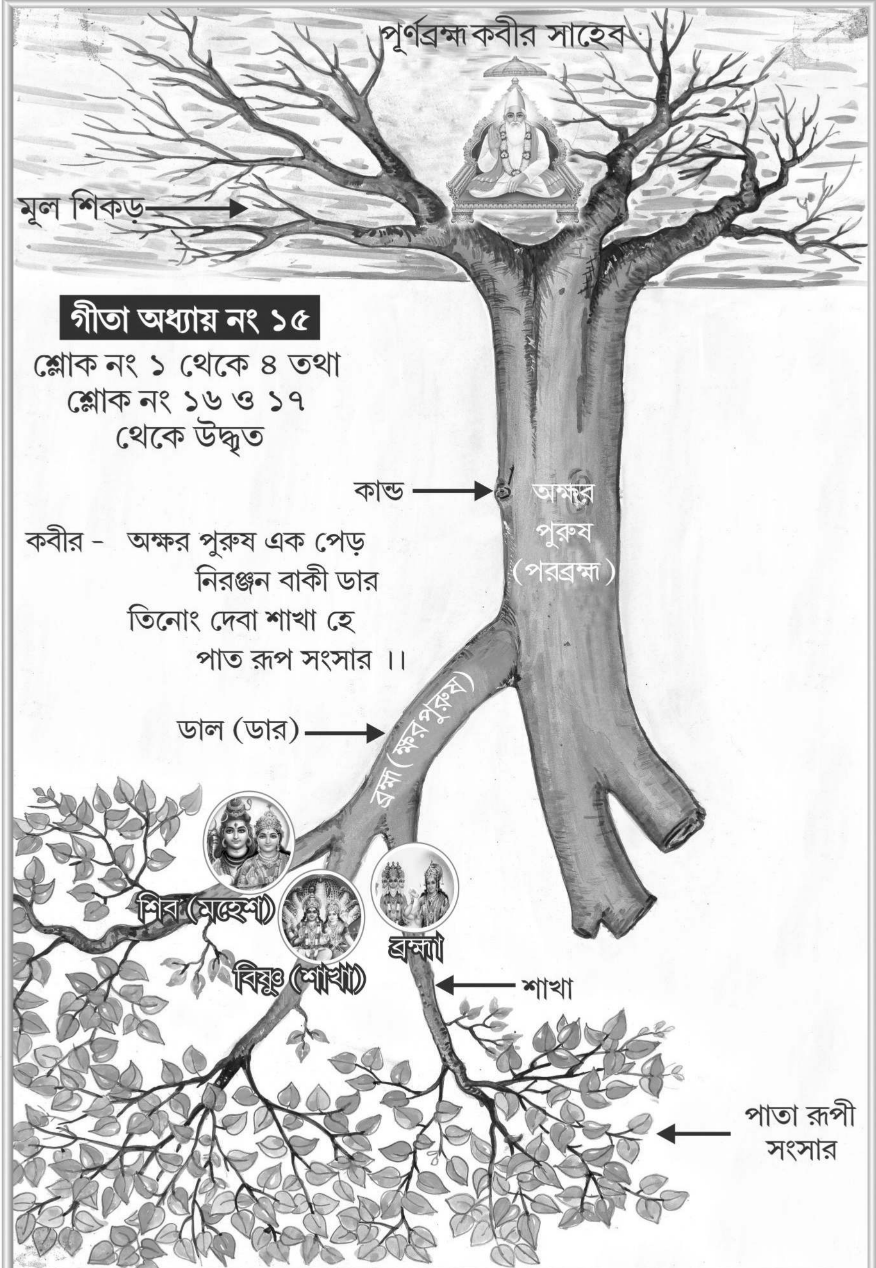
।। কান্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৩ ।।

প্র যো জজ্ঞে বিদ্যানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি
ব্রহ্ম ব্রহ্মন উজ্জভার মধ্যান্নী চৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ।।৩।।

প্র-যঃ-জজ্ঞে-বিদ্যানস্য-বন্ধুঃ-বিশ্বা-দেবানাম্-জনিমা-বিবক্তি-ব্রহ্মঃ ব্রহ্মনঃ-উজ্জভার-মধ্যাৎ-নিচৈঃ-উচ্চৈঃ-স্বধা-অভিঃ-প্রতস্থৌ

অনুবাদ ঃ- (প্র) সর্ব প্রথম (দেবানাম্) দেবতাদের ও ব্রহ্মান্ডগুলির (জজ্ঞে) উৎপত্তি জ্ঞানের (বিদ্যানস্য) জিজ্ঞাসু ভক্ত (যঃ) যে (বন্ধুঃ) বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মার নিজের আপন সাথীকে (জনিমা) নিজের দ্বারা সৃজন (সৃষ্টি) করা (বিবক্তি) স্বয়ং-ই ঠিক ঠিক বিস্তার পূর্বক বলেছেন যে কি (ব্রহ্মণঃ) পূর্ণ পরমাত্মা (মধ্যাৎ) নিজের মধ্য হইতে অর্থাৎ শব্দ শক্তি দ্বারা (ব্রহ্মঃ) ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ কালকে (উজ্জভার) উৎপন্ন করে (বিশ্বা) সারা সংসারকে অর্থাৎ সব লোককে (উচ্চৈঃ) উপর সতলোকে (নিচৈঃ) নীচে পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের সর্ব ব্রহ্মান্ড (স্বধা) নিজে ধারণ করা (অভিঃ) আকর্ষণ শক্তি দ্বারা (প্রতস্থৌ) দুজনকেই ভাল করে স্থিত করেছেন।

ভাবার্থ ঃ- পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান ও সর্ব আত্মার উৎপত্তির জ্ঞান, তার নিজের দাসকে স্বয়ংই ঠিক ঠিক বলেন, যেকি পূর্ণ পরমাত্মা নিজের মধ্য অর্থাৎ নিজের শরীর থেকে নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ কাল)-এর উৎপত্তি করেছেন অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মান্ডের উপর সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক ও অনামি লোকাদি ও নীচে পর ব্রহ্মের সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ড ও ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মান্ডকে নিজে ধারন করা আর্কষণ শক্তি দ্বারা ধরে (দাঁড় করিয়ে) রেখেছেন। যেমন পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) তার নিজের আপন সেবক অর্থাৎ সখা ধর্ম দাসজীকে ও গরীব দাসজী আদিকে নিজের দ্বারা রচনা করা সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ংই বলেছিলেন। উপরের বেদ মন্ত্র ও ওই সমর্থন করছে।



এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন - উপরে মূল (শিকড়)
নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র

।। কান্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৪ ।।

স হি দিবঃ স পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষেমং রোদসী অস্কভায়ৎ।

মহান মহী অস্কভায়দ বি জাতো দ্যাং সম পার্থিবং চ রজঃ ।। ৪।।

হি-দিবং-স-পৃথিব্যা-ঋ তস্থা-মহী-ক্ষেমম্-রোদসী, অকস্ভায়ৎ-মহান্-মহী-অস্কভায়দ্-বিজাতঃ-ধাম্-সদম্-পার্থিবম্-চ-রজঃ

অনুবাদ ঃ- (স) ওই সর্ব শক্তিমান পরমাত্মা (হি) নিঃসন্দেহ (দিবঃ) উপরের চার দিব্যলোক যেমন সত্যলোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক/অকহ লোক অর্থাৎ দিব্য গুণযুক্ত লোক সব (ঋতস্থা) সত্য স্থির অর্থাৎ অজর অমর রূপে স্থির করেছেন (স) ওর সমান (পৃথিব্যা) নীচের পৃথিবী বালা সব লোকের মত পরব্রহ্মের সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ড তথা ব্রহ্ম (কাল)-এর একুশ ব্রহ্মান্ড (মহী) পৃথিবী তত্ত্বে (ক্ষেমম্) সুরক্ষার সাথে (অস্কভায়ৎ) দাঁড় করিয়েছে (রোদসী) আকাশ তত্ত্ব তথা পৃথ্বী তত্ত্ব দুটোর উপর নীচের ব্রহ্মান্ডকে যেমন আকাশ এক সুক্ষ্ম তত্ত্ব, আকাশের গুণ হল শব্দ, পূর্ণ পরমাত্মা উপরের লোক শব্দ রূপ রচেছে যাহা তেজপুঞ্জের বানিয়েছেন। তথা নীচের পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ)-এর সপ্ত সঙ্খ ব্রহ্মান্ড ও ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষের)একুশ ব্রহ্মান্ডকে পৃথিবী তত্ত্ব থেকে অস্থায়ী রয়েছেন)। (মহান্) পূর্ণ পরমাত্মা (পার্থিবম্) পৃথিবীবালার (বি) ভিন্ন ভিন্ন (ধাম) লোক (চ) আর (সদম্) আবাস স্থান (মহী) পৃথিবী তত্ত্ব থেকে (রজঃ) প্রত্যেক ব্রহ্মান্ডতে ছোট ছোট লোক (ধাম) (জাতঃ) রচনা করে (অস্কভায়ৎ) স্থির করেছেন।

ভাবার্থ ঃ- উপরের চারি লোক (ধাম) সত্য লোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক এ তো অজর অমর স্থায়ী অর্থাৎ অবিনাশী রচেছে। তথা নীচের ব্রহ্ম ও পরবহ্মের লোক (ধাম) অস্থায়ী রচনা করে এবং অন্যান্য ছোট ছোট লোক (ধাম) ও পরমেশ্বর রচনা করে স্থির করে রেখেছে।

।। কান্ড নং ৪ অনুবাদ নং ১ মন্ত্র ৫ ।।

স বুধন্যাদাষ্ট্র জনুষোৎভগ্রং বৃহস্পতির্দেবতা তস্য সম্রাট।

অহর্যচ্ছুক্রং জ্যোতিষো জনিষ্টাথ দ্যুমন্তো বি বসন্ত বিপ্রাঃ।। ৫।।

স-বুধম্যাৎ-আষ্ট্র-জনুষেঃ-অভি-অগ্রম-বৃহস্পতিঃ-দেবতা-তস্য-সম্রাট-অহঃ-যৎ-শুক্রম্-জ্যোতিষঃ-জনিষ্ট-অথ-দ্যুমন্ত-বি-বসন্ত-বিপ্রাঃ

অনুবাদ ঃ- (সঃ) ওই (বুধন্যাৎ) মূল মালিক থেকে (অভি-অগ্রম্) সর্ব প্রথম স্থানের উপর (আষ্ট্র) অষ্টঙ্গীমায়া দূর্গা অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী (জনুষেঃ) উৎপন্ন হয়েছে কেননা, নীচের পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের প্রথম স্থান হল সতলোক, একে তৃতীয় ধামও বলা হয় (তস্য) এই দূর্গাও মালিক তিনি (সম্রাট) রাজাধিরাজ (বৃহস্পতিঃ) সবার থেকে বড় পতি বা জগৎগুরু (দেবতা) পরমেশ্বর আছেন। (যৎ) যার কাছ থেকে (অহঃ) সকলেই আলাদা হয়েছে (অথ) এরপর (জ্যোতিষঃ) জ্যোতিরূপ নিরঞ্জন অর্থাৎ কালের (শুক্রম্) বীর্য অর্থাৎ বীজ শক্তি থেকে (জনিষ্ট) দূর্গার পেট থেকে উৎপন্ন হয়ে (বিপ্রাঃ) ভক্ত আত্মা (বি) আলাদা হয়ে (দ্যুমন্তঃ) মানুষ্য লোক ও স্বর্গ লোকে জ্যোতিনিরঞ্জনের আদেশে, দূর্গা বলেছে (বসন্ত) নিবাস করো অর্থাৎ সে নিবাস করতে লেগেছে।

ভাবার্থ ঃ- পূর্ণ পরমাত্মা উপরের চার লোক (ধাম) থেকে যে নীচের সবার প্রথমে অর্থাৎ সতলোকে আষ্টা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গী (প্রকৃতি দেবী/দূর্গা)-র উৎপত্তি করেছিলেন। যিনি উৎপন্ন করেন তিনিই রাজাধিরাজ, জগৎ গুরু, পূর্ণ পরমেশ্বর(সতপুরুষ) আছেন, যার কাছ থেকে সবাই আলাদা হয়েছে। পরে সব প্রাণী জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল)-এর বীর্য (বীজ) থেকে দূর্গার (আষ্ট্রা)-র গর্ভ দ্বারা উৎপন্ন হয়ে স্বর্গলোক ও পৃথিবী লোকে নিবাস করতে লেগেছে।

।। কান্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৬ ।।

নুনং তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূব্যস্য ধাম।

এষ জজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিথ্যা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন নু।। ৬।।

নুনম্-তৎ-অস্য-কাব্যঃ-মহঃ-দেবস্য-পূর্ব্যস্য-ধাম-হিনোতি-পূর্বে-বিষিতে-এষ-জজ্ঞে-বহুভিঃ-সাকম-ইতথা-অর্ধে-সসন্-নু।

অনুবাদ ঃ- (নুনম্) নিঃসন্দেহ (তৎ) ওই পূর্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ তত্ ব্রহ্মই (অস্য) এই (কাব্যঃ) ভক্ত আত্মা, যে পূর্ণ পরমেশ্বরের ভক্তি বিধিমত করে তাকে ফিরিয়ে (মহঃ) সর্বশক্তিমান (দেবস্য) পরমেশ্বরের (পূর্বস্য) আগের (ধাম) লোকে অর্থাৎ সত্য লোকে (হিনোতি) পাঠান। (পূর্বে) পূর্ববালা (বিষিতে) বিশেষভাবে চাওয়া (এষ) এই পরমেশ্বরকেও (জজ্ঞে) সৃষ্টি উৎপত্তির জ্ঞানকে জেনে (বহুভিঃ) অনেক আনন্দ (সাকম)-এর (অর্ধে) অর্ধেক (সসন্) ঘুমানো অবস্থা কিংবা বিভোর হয়ে বা আত্মহারা হয়ে (ইতথা) বিধিমত এই প্রকার (নু) ভালো আত্মা দিয়ে স্তুতি করে।

ভাবার্থ ঃ- ওই পূর্ণ পরমেশ্বর সত্য সাধনা করা সাধককে ওই আগের স্থানে (সতলোকে) নিয়ে যান। যেখান থেকে ভুল করে আসা হয়েছিল। ওখানে ওই বাস্তবিক সুখদায়িক প্রভুকে প্রাপ্ত হয়ে খুশীতে আত্ম বিভোর হয়ে মস্তিতে (আনন্দে) স্তুতি করে এইভাবে অসংখ্য জন্মের ভুলে পথ হারা লোকেদের পরমেশ্বরের বাস্তবিক ঠিকানা মিলে যায়।

আদরণীয় গরীব দাস মহারাজজীকে এই প্রকারে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) স্বয়ং সত্য ভক্তি প্রদান করে সত্য লোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন নিজের অমৃত বাণীতে আদরণীয় গরীব দাসজী নিজের চোখে দেখে বলেছিলেন—

গরীব - অজব নগর মে লে গয়ে, হমকু সদগুরু আন।
ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি সুতে চাদর তান।।

।। কান্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৭ ।।

য়োৎথর্বাণ পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ।

তং বিশ্বেষাং জনিতা জথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ৎ স্বধাবান্।। ৭।।

যঃ-অথর্বানম্-পিত্তরম্-দেববন্ধুম্-বৃহস্পতিম্-নমসা-অব-চ-গচ্ছাৎ-ত্বম্-বিশ্বেষাম্-জনিতা-যথা-সঃ-কবির্দেবঃ-ন-দভায়ৎ-স্বধাবান্।

অনুবাদ ঃ-(যঃ) যে (অথর্বানম) অচল অর্থাৎ অবিনাশী (পিত্তরম্) জগৎপিতা (দেববন্ধুম্) ভক্তের বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ আত্মার আধার (বৃহস্পতিম্) জগৎগুরু (চ) আর (নমস্যা) বিনম্র

পূজারী অর্থাৎ বিধিমত সাধককে (অব) সুরক্ষার সাথে (গচ্ছাৎ) সতলোকে যিনি নিয়ে যান (বিশ্বেষাম্) সর্ব ব্রহ্মান্ড (জনিতা) রচনা করা জগদম্বা অর্থাৎ মায়ের গুণেও যুক্ত (ন দভায়ৎ) কালের মত ধোখা (না ঠকানে বালা) (স্বধাবান) ভাল স্বভাবের গুণযুক্ত গুনবালা (যথা) যেমন (সঃ) স্বয়ং (ত্বম্) (কবির্দেবঃ/কবির্দেবঃ) কবির্দেব আছেন যিনি প্রমাণ ভাষা ভিন্ন ইনাকে কবীর পরমেশ্বরও বলা হয়।

ভাবার্থ ঃ- এই মন্ত্রে এও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ওই পরমেশ্বরের নাম কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর যিনি প্রমান সর্ব রচনা করেছেন। যে পরমেশ্বর অচল অর্থাৎ বাস্তবে অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭ তেও প্রমান আছে) জগৎ গুরু আত্মাধার যিনি পূর্ণ মুক্ত হয়ে সত লোকে গিয়েছেন এবং যাদের সত লোকে নিয়ে যান সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচয়িতা বা রচনহার, কাল ব্রহ্মের মতো ঠকায় না যেমন যেমন হতে হয় তেমনই তিনি স্বয়ং কবির্দেব অর্থাৎ কবীর প্রভু। ওই পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মান্ড ও প্রাণীদের নিজের শব্দশক্তিতে উৎপন্ন করার কারণ (জনিতা) মাতাও বলা হয় তথা (পিতরম্) পিতা তথা (বন্ধু) সখা ও বাস্তবে উনিই তথা (দেব) পরমেশ্বরও তিনিই। এই জন্য এই কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)-এর স্তুতি করি। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রবিনংম ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম দেব দেব। এই পরমেশ্বরের মহিমা, পবিত্র ঋগবেদ, মন্ডল নং ১ সুক্ত নং ২৪ বিস্তৃত বিবরণ আছে।

।। পবিত্র ঋক্‌বেদে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ।।

।। মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১ ।।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত
স ভূমিং বিশ্বতোং বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম।।১।।

সহস্রশীর্ষা-পুরুষঃ-সহস্রাক্ষঃ-সহস্রপাত-স-ভূমিম্-বিশ্বতঃ-বৃত্বা-অত্যাতিষ্ঠৎ-দশাংগুলম্।।

অনুবাদ ঃ- (পুরুষঃ) বিরাট রূপ কাল ভগবান অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (সহস্রশীর্ষা) হাজার মস্তকবালা, (সহস্রাক্ষঃ) হাজার চোক্ষুয়ালা, (সহস্রপাত) হাজার পায়ালা (স) কাল নিজে (ভূমিম্) পৃথিবী বালা একুশ ব্রহ্মান্ড (বিশ্বতঃ) সব দিক থেকে (দশং গুলম্) দশ আঙুল দিয়ে পূর্ণ রূপে কাবু করে (বৃত্বা) গোল আকারে ঘেরা (অত্যাতিষ্ঠৎ) এর থেকেও বড় অর্থাৎ নিজের কাল লোকে সব থেকে আলাদা একুশ ব্রহ্মান্ডে আছেন।

ভাবার্থ ঃ- এই মন্ত্রতে বিরাট (কাল/ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষ/জ্যোতিনিরঞ্জন)-এর বর্ণন আছে। গীতা অধ্যায় ১০-১১ তেও এই কাল ব্রহ্মেরই বর্ণন আছে। অধ্যায় ১১ মন্ত্র নং ৪৬-এ অর্জুন বলেছিল যে, হে সহস্রাবাহু! অর্থাৎ হাজার হাতবালা (ভুজাবালা) আপনি আপনার চতুর্ভূর্জ মূর্ত্তিতে দর্শন দিন।

যার হাজার হাত, পা, হাজার, চোখ কান ইত্যাদি ও বিরাট রূপ কাল প্রভু নিজের অধীনে সর্ব প্রাণী কাবু করে, ২০ ব্রহ্মান্ডকে গোলাকার পরিধিতে দাঁড় করিয়ে রেখে, স্বয়ং তার থেকে উপরে একুশ নং ব্রহ্মান্ডে থাকেন।

।। মন্ডল ১০ সুক্ত নং ৯০ মন্ত্র ২ ।।

পুরুষ এবেদং সর্ব যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।। ২।।

পুরুষ-এব-ইদম্-সর্বম্-যৎ-ভুতম্-যৎ-চ-ভাব্যম্-উত-অমৃতত্বস্য-ঈশানঃ-যৎ-অন্নেন-অতিরোহিত।

অনুবাদ ঃ- (এব) এই প্রকার কিছু ঠিক মত (পুরুষ) ভগবান আছে তিনি অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম(চ) আর (ইদম) এই (ভূতম্) উৎপন্ন হওয়া এই (যৎ) যিনি যে (ভাব্যম্) ভবিষ্যতে হবে (সর্বম) সব (যৎ) প্রয়ন্ততে অর্থাৎ পরিশ্রম করে (অন্নেন) অন্ন দ্বারা (অতিরোহিত) বিকসিত হয়। এই অক্ষর পুরুষও (উত) সন্দেহযুক্ত (অমৃতস্য) মোক্ষের (ঈশাঃ) স্বামী আছে। অর্থাৎ অক্ষরপুরুষ ভগবান তো কিছু ঠিক ঠাক কিন্তু পূর্ণ মোক্ষদায়ক না।

ভাবার্থ ঃ- এই মন্ত্রতে পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ)-এর বিবরণ আছে যিনি কিছুটা ভগবানের লক্ষণের সাথে মিল খায় কিন্তু এর ভক্তিতে পূর্ণ মুক্তি নাই। এই একে সন্দেহ দাতা মোক্ষদাতা বলে। কিছুটা প্রভু গুণযুক্ত, ইনি কালের মত তপ্ত শিলাকে সুক্ষ মানবধারীকে ভেজে খায় না। পরন্তু এই পরব্রহ্ম লোকে প্রাণীকে পরিশ্রম করেই নির্বাহ করতে হয়। তার আধারে কর্মফল প্রাপ্ত হয়। আর অন্ন দ্বারাই সর্ব প্রাণীর শরীর বিকসিত হয়ে থাকে। জন্ম তথা মৃত্যুর সময় যদিও কাল (ক্ষরপুরুষ) থেকে ভাল তথাপি চুরাশি লাখ যোনির যাতনা হয়েই থাকে এবং প্রলয়ও হয়।

।। মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৩ ।।

এ তাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ।
পাদোৎস্য বিশ্বা ভুতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।। ৩।।

এতাবান্-অস্য-মহিমা-অতঃ-জ্যায়ান-চ-পুরুষঃ-পাদঃ-অস্য-বিশ্বা-ভূতানি- ত্রি-পাদ-অস্য-অমৃতম-দিবি।

অনুবাদ ঃ- (অস্য) এই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের তো (এতাবান) এতটাই (মহিমা) প্রভুত্ব আছে। (চ) তথা (পুরুষঃ) ওই পরম অক্ষর ব্রহ্মঅর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মপরমেশ্বর তো (অতঃ) এর থেকেও (জ্যায়ান) বড় আছে (বিশ্বা) সমস্ত (ভূতানি) ক্ষর পুরুষ তথা অক্ষর পুরুষ তথা ইনাদের লোকে বা সতলোকে যতটা প্রাণী আছে (অস্য) এই পূর্ণ পরমাত্মা পরম অক্ষর পুরুষের (পাদঃ) একটা পা মাত্র অর্থাৎ এক অংশ মাত্র আছে। (অস্য) এই পরমেশ্বরের (ত্রি) তিন (দিবি) দিব্য লোক যেমন-সতলোক-অলখলোক-অগমলোক-অনামী লোক (অমৃতম্) অবিনাশী (পাদ্) দ্বিতীয় পা অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মান্ডে যা কিছু উৎপন্ন আছে ওগুলো সত্যপুরুষ পূর্ণ পরমাত্মার অংশ ও অঙ্গ আছে।

ভাবার্থ ঃ- এই উপরের ২ নং মন্ত্রতে বর্ণিত অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)-র তো এতটাই মহিমা আছে কিন্তু পূর্ণ পুরুষ কবির্দেব তো, এর থেকে অনেক বড় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান এবং সব ব্রহ্মান্ড তার অংশ মাত্র স্থির ভাবে রয়েছে। এই মন্ত্রতে তিন লোকের বর্ণন করেছে, কেননা চৌথা (চতুর্থ) হল অনামী (অনাময়) লোক, যা অন্য রচনারও আগের। এই তিন প্রভুরই (ক্ষরপুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও এই দুইজন ছাড়া যে অন্য পুরুষ সে হল পরম অক্ষর পুরুষ) বর্ণনা বা বিবরণ শ্রীমদভাগবদ্

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং সংখ্যা ১৬-১৭ তে আছে (এর প্রমাণ আদরণীয় গরীব) দাস সাহেব বলেনঃ- যাকে অর্ধ রুম পর সকল পসারা, এইসা পূর্ণ ব্রহ্ম হমারা।।

গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড কা, একরতি নহী ভার। সত গুরু পুরুষ কবীর হে, কুল কে সৃজনহার।

এর প্রমাণ আদরণীয় দাদু সাহেব বলতেন ঃ-

জিন মোকুং নিজ নাম দিয়া, সোই সদগুরু হমার
দাদু দুসরা কই নহী, কবীর সৃজন হার।।"

এর প্রমাণ আদরণীয় গুরু নানক সাহেব বলেন ঃ

যক অর্জ গুফতম পেশ, তো দর কুন করতার
হক্কা কবীর করীম তু, বেত্রব পরবরদিগার।।

(শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ৭২১ মহলা ১ রাগ তিলঙ্গ)

কুন করতারের মানে হল সবকিছুর রচনহার, অর্থাৎ শব্দ শক্তিতে রচনা করা শব্দ সরূপী প্রভু ক্কা কবীর-এর অর্থ হল, সত্ কবীর করীমের অর্থ দয়ালু পরবরদিগারের অর্থ পরমাত্মা।

।। মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র নং ৪ ।।

ত্রিপাদুর্দ্ধ উদৈতপুরুষঃ পাদোৎস্যেহাভবৎপুনঃ
ততো বিষ্ব ঙব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি।। ৪।।

ত্রি-পাদ-উর্দ্ধঃ-উদৈৎ-পুরুষঃ-পাদঃ-অস্য-ইহ-অভবৎ-পুনঃ-ততঃ-বিশ্বঙ-ব্যক্রামৎ-সঃ-অশনানশনে-অভি

অনুবাদ ঃ- (পুরুষ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মা (উর্দ্ধঃ) উপর (ত্রি) তিন লোক যেমন— সতলোক, অলখ লোক-অগমলোক রূপ (পাদ) পা অর্থাৎ উপরের অংশে পা (উদৈৎ) প্রকট হওয়া অর্থাৎ বিরাজমান আছে (অস্য) এই পরমেশ্বরের অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মের (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এর এক অংশ জগৎরূপ (পুনর) আবার (ইহ) এখানে (অভবৎ) প্রকট হয় (ততঃ) এইজন্য (সঃ) ওই অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা (অশনানশনে) গ্রাস করনেবালা কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ এবং না গ্রাস করা পর ব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ-এরও (অভি) উপর (বিশ্বঙ্) সর্বত্র (ব্যাক্রামৎ) ব্যাপ্ত আছে অর্থাৎ তার প্রভুতা সব ব্রহ্মান্ডে ও সর্ব প্রভুর উপর আছে উনিই কুলের মালিক। যিনি নিজের শক্তি সর্বময় ফেলে রেখেছেন।

ভাবার্থ ঃ- এই সর্ব সৃষ্টি রচনহার প্রভু নিজের রচনার উপরের অংশতে তিন স্থানে (সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক)-এ তিন রূপে স্বয়ং প্রকট হয় অর্থাৎ স্বয়ংই বিরাজমান আছেন। এখানে অনামী লোকের বর্ণনা এইজন্য করিনি কারণ অনামী লোকে কিছু রচনা করেননি। অকহ (অনাময়) লোক শেষেরগুলো রচনারও করার আগে ছিল। আবার বলা হয়েছে ওই পরমাত্মার সতলোক থেকে আলাদা হয়ে, নীচের ব্রহ্মালোক ও পরব্রহ্ম-এর লোক উৎপন্ন হয়েছে। পূর্ণ পরমাত্মার অভিশাপ ব্রহ্ম (কাল, ক্ষরপুরুষের)-র লেগেছিল যেটা হল প্রতিদিন তাকে একলক্ষ মানবশরীরধারী প্রাণীদের খেতে হবে এবং পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষের)-এর খেতে হয় না। কিন্তু

জন্ম মৃত্যু কর্মদন্ড সেই ভাবেই তৈরী করা রয়েছে। এই পূর্ণ পরমাত্মার প্রভুতা সবার উপরে, কবীর পরমেশ্বরই এই সর্বময় কুলের মালিক। যিনি নিজের শক্তিকে সর্বময় সূর্যের প্রকাশের ন্যায় ছড়িয়ে রেখেছেন। এই রকম পূর্ণ পরমাত্মা আপন শক্তিরূপী রেঞ্জ (ক্ষমতা) সর্ব ব্রহ্মান্ডকে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য ছেড়ে রেখেছে। যেমন মোবাইল ফোনের টাওয়ার এক দেশিয় হয়েও (একস্থানে) থাকে তবুও তার শক্তি চারিদিকে ফেলানো থাকে। এই প্রকার পূর্ণ প্রভু নিজের নিরাকার শক্তি সর্ব ব্যাপক করেছেন যাতে পূর্ণ পরমাত্মা সর্ব ব্রহ্মান্ড একস্থানে বসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

এর প্রমাণ আদরণীয় গরীব দাস মহারাজজী দিয়েছেন (অমৃত বাণী রাগ কল্যান)

তিন চরণ চিন্তামনি সাহেব, শেষ বদন পর ছায়ে
মাতা পিতা কুল ন বন্ধু, না কিনহে জননী জায়।

।। মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৫ ।।

তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভুমিমথো পুরঃ ।। ৫।।

তস্মাৎ-বিরাট্-অজায়ত-বিরাজঃ-অধি-পুরুষঃ-স-জাতঃ-অত্যবিচ্যৎ-পশ্চাৎ-ভূমিম-অথঃ-পুর।

অনুবাদ ঃ- (তস্মাৎ) তারপরে ওই পরমেশ্বরের (সতপুরুষের) শব্দ শক্তি দ্বারা (বিরাট্) বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্ম, যাকে ক্ষর পুরুষ ও কাল বলা হয় (অজায়ত) উৎপন্ন হয়েছে (পশ্চাৎ) এর পরে (বিরাজঃ) বিরাট পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবান থেকে (অধি) বড় (পুরুষঃ) পরমেশ্বরে (ভূমিম্) পৃথিবী বাসী লোক, কাল ব্রহ্মের লোক ও পর ব্রহ্মের লোক (অত্যাবিচ্যত) ভালভাবে রচেছেন (অথঃ) পরে আবার (পুরঃ) অন্য ছোট ছোট লোক (স) ওই পূর্ণ পরমেশ্বরেই (জাতঃ) উৎপন্ন করেন অর্থাৎ স্থাপিত করেন।

ভাবার্থ ঃ- উপরোক্ত ৪ নং মন্ত্রে বর্ণিত তিনলোকের (অগমলোক, অলখলোক ও সতলোক) -এর রচনার পরে পূর্ণ পরমাত্মা, জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্মা)-র উৎপন্ন করেন অতএব ওই সর্ব শক্তিমান পরমাত্মা পূর্ণ ব্রহ্মকবির্দেব (কবীর প্রভু) দ্বারাই বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্ম(কাল)-এর উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৩ মন্ত্র ১৫-তে আছে যে কি, পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ অবিনাশী প্রভু দ্বারা ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েছে। এই প্রমাণ অথর্ববেদ কান্ড ৪ অনুবাক ১ সুক্ত ৩-তে আছে যেকি, পূর্ণ ব্রহ্ম থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে। এই পূর্ণ ব্রহ্মই (ভূমিম্) ভূমি-আদি ছোটো বড় সব লোকের রচনা করেছেন। সেই পূর্ণ ব্রহ্ম এই বিরাট ভগবান অর্থাৎ ব্রহ্ম (কাল) থেকেও বড় অর্থাৎ ইহারও মালিক।

।। মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৫ ।।

সপ্তাস্যাসান পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ
দেবা যদ্যজ্ঞং তনবানা অবধ্নন্-পুরুষং-পশুম্।। ১৫।।

সপ্ত-অস্য-আসন্-পবিধযঃ-ত্রিসপ্ত-সমিধঃ-কৃতাঃ-দেবা-যৎ-যজ্ঞম্-তন্বানা-অবধ্নন্-পুরুষম্-পশুনম্

অনুবাদ ঃ- (সপ্ত) সাত সঙ্খ ব্রহ্মান্ড তো পরব্রহ্মের তথা (ত্রিসপ্ত) একুশ ব্রহ্মান্ড কাল ব্রহ্মের (সমিধঃ) কর্মদন্ড, দুঃখরূপী আগুন থেকে দুঃখী (কৃতাঃ) করার লোক (পরিধয়ঃ) গোলাকারে ঘেরা রূপ সীমাতে (আসন্) বিদ্যমান আছে (যৎ) যে (পুরুষম্) পূর্ণ পরমাত্মার (যজ্ঞম্) বিধিমত ধার্মিক কর্ম অর্থাৎ পূজা করা (পশুম্) বলি দেওয়া পশুরূপী কালের জালে কর্মবন্ধনে বাঁধা (দেবা) ভক্তআত্মাদের (তন্বানাঃ) কালের দ্বারা তৈরী অর্থাৎ ছড়িয়ে রাখা পাপ কর্ম বন্ধন জাল থেকে (অবন্ধন) বন্ধন মুক্ত (রহিত) করে অর্থাৎ বন্দীকে ছাড়ানো বালা তাকে বন্দী ছোড় বলা হয়।

ভাবার্থ ঃ- সাত সংখ ব্রহ্মান্ডবালা পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) ও একুশ ব্রহ্মান্ডের ব্রহ্ম, যে গোলাকার সীমাতে বন্ধ, পাপ কর্মের আগুনে জ্বলতে থাকা প্রাণীদেরকে বাস্তবিক পূজা বিধি বলে সঠিক উপাসনা করায়, যার কারণে বলি দেওয়ার পশুর মত জন্ম-মৃত্যুর কালের আহারের জন্য তপ্তশিলায় কষ্ট পাওয়া পীড়িত ভক্ত আত্মাদের তিনি কালের বিছিয়ে রাখা (কর্ম বন্ধনে বা মায়া বন্ধনে) জালকে ভেঙে বন্ধন কারাগার থেকে মুক্ত করেন অর্থাৎ বন্ধন থেকে ছাড়ানোবালাকে বন্দী ছোড় বলা হয়।

এর প্রমাণ পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ নং মন্ত্রতে ৩২-এতে আছে যেকি, কবিরংঘারিসি (কবীর্) কবির পরমেশ্বর (অংঘ) পাপের (অরি) শত্রু (অসি) আছে অর্থাৎ পাপ বিনাশ কবীর আছেন। বম্ভা-রিসি (বম্ভারি) বন্ধনের শত্রু অর্থাৎ বন্দী ছোড় কবীর পরমেশ্বর (অসি) আছে।

।। মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬ ।।

যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মানি প্রথমান্যাসন

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যা সন্তিঃ দেবাঃ ।। ১৬।।

যজ্ঞেন-যজ্ঞম্-অ-য়জন্ত-দেবাঃ-তানি-ধর্মানি-প্রথমানি-আসন্-তে। হে-নাকম্-মহিমানঃ-সচন্ত-যত্র-পূর্বে-সাধ্যাঃ-সন্তিদেবাঃ।

অনুবাদ ঃ— যে (দেবাঃ) নির্বিকার দেব স্বরূপ ভক্তাত্মা (অয়জ্ঞম) অধুরা ভুল ধার্মিক পূজার স্থানের উপর (যজ্ঞেন) সত্য ভক্তি ধার্মিক কর্মের আধারে (অয়জন্ত) পূজা করে (তানি) সে (ধর্মানি) ধার্মিক শক্তি সম্পন্ন (প্রথমানি) মূখ্য অর্থাৎ উত্তম (আসন) আছে (তে-হ) সেই বাস্তবে (মহিমানঃ) মহান ভক্তি শক্তি যুক্ত হয়ে (সাধ্যাঃ) সফল ভক্তজন (নাকম্) পূর্ণ সুখদায়ক পরমেশ্বরকে (সচন্ত) ভক্তির কারণ অর্থাৎ সদভক্তির কামাইতে প্রাপ্ত হয়, সে ওখানে চলে যায়। (যত্র) যেখানে (পূর্বে) প্রথমে সৃষ্টির (দেবাঃ) পাপমুক্ত (রহিত)দেবসরূপ ভক্ত আত্মারা (সন্তি) থাকে বা আছে।

ভাবার্থ ঃ- যে নির্বিকার (যে মাংস, মদ, তামাক, সিগরেট নেশা জাতীয় বস্তু ত্যাগ করেছে বা অন্যান্য খারাপ কর্ম থেকে মুক্ত) দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা শাস্ত্র বিধি ছাড়া পূজাকে ত্যাগ করে, শাস্ত্রের অনুকুল সাধনা করে সে ভক্তি কামাইতে ধনী হয়ে কালের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সত্য ভক্তির কামাইয়ের কারণে ওই সর্ব সুখদায়ী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে বা সতলোকে চলে যায়। যেখানে সর্ব প্রথম রচনা করা দেব স্বরূপ অর্থাৎ পাপ মুক্ত হাঁস আত্মারা থাকেন।

যেমন কিছু আত্মারা তো কাল (ব্রহ্ম)-এর জালে ফেঁসে এথানে এসে গিয়েছে। কিছু পর ব্রহ্মের সাত সঙ্খ ব্রহ্মাতে আছে। আবার অসংখ্য আত্মারা যাদের পূর্ণ বিশ্বাস পরমাত্মার উপর ছিল,

যারা পতিব্রতা পদ থেকে নীচে নামেনি তারা সেখানে রয়ে গেছে। এইজন্য এখানে ওই বর্ণনা পবিত্র বেদেও সত্য প্রকাশ করে বলেছে। ওই প্রমান গীতা ৪ অধ্যায় শ্লোক নং ৪ থেকে ১০ এতে বর্ণনা আছে যে কি, যে সাধক পূর্ণ পরমাত্মার সত সাধনা শাস্ত্রবিধি অনুসারে করে সে ভক্তির কামাইয়ের বলে ওই পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় বা তার কাছে চলে যায়। এতে প্রমান হয়েছে যে তিন প্রভু আছে যেমন (ব্রহ্ম/কাল/ক্ষর পুরুষ) (পর ব্রহ্ম/অক্ষরপুরুষ) এবং (পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা/পরমেশ্বর/কবির্দেব/ কবির ঈশ্বর) ইনাকে পরম অক্ষর পুরুষ বা পুরুষ ইত্যাদি পর্যায়বাচী শব্দতে জানা যায়।

এই প্রমান ঋকবেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০ তে স্পষ্ট আছে যে কি পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)শিশুরূপ ধারণ করে প্রকট হয় তথা নিজের নির্মল জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান (কবির্গীর্ভি) কবীর বাণীর দ্বারা নিজের অনুযায়ীদের কবিতার মাধ্যমে বলে বলে বর্ণন করে। ওই কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) ব্রহ্ম(ক্ষরপুরুষ)-এর ধাম ও পরব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ)-এর ধাম থেকে ভিন্ন, যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সেই পরম অক্ষর পুরুষের তৃতীয় ঋতধাম (সতলোক) আছো সেখানে আকার রূপে বিরাজ মান আছেন । সতলোক থেকে চতুর্থ হল অনামী লোক, সেখানেও কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) অনামী পুরুষ রূপে মনুষ্য সদৃশ আকারে বিরাজমান আছেন।

।। পবিত্র শ্রীমদ্দেবী মহাপুরানে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু তথা শিবের মাতা-পিতা

(দুর্গা আর ব্রহ্মের যোগে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শিবের জন্ম)

পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরানে তৃতীয় স্কন্দ (গীতাপ্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত অনুবাদ কর্ত্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার তথা চিমনলাল গোস্বামী জী পৃষ্ঠা ১১৪ থেকে, ১১৮ পর্যন্ত্য বিবরণ আছে, যে অনেকই আচার্য, ভবানীকে (দূর্গাকে) সম্পূর্ণ মনোরথ (মনের বাসনা) পূর্ণ করে, এই বলে থাকেন। একে প্রকৃতি বলা হয় তথা ব্রহ্মের সাথে অভেদ সম্বন্ধ আছে। যেমন পত্নীকে অর্ধাগিনীও বলা হয় অর্থাৎ দূর্গা ব্রহ্মকালের পত্নী। এক ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাজা পরিক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করার পর, শ্রী ব্যাসদেব বলেছিলেন, আমি শ্রী নারদজীকে বলেছিলাম, হে দেবর্ষি! এই ব্রহ্মান্ডের রচনা কেমনভাবে হয়েছে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নারদ বলেছিলেন, আমি আমার পিতা শ্রী ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিলাম হে পিতাশ্রী, এই ব্রহ্মান্ডের রচনা আপনি করেছেন নাকি বিষ্ণুজি রচয়িতা, না শিবাজি রচনা করেছেন? সত্যি সত্যি বলে আমায় কৃপা করবেন। তখন আমার পূজ্য পিতা ব্রহ্মাজি বলেলেন যে, কি পুত্র নারদ, আমি নিজেকে পদ্মফুলের উপর বসে থাকা অবস্থাতে পেয়েছি। আমি এ জানি না যেকি, এই অগাধ জলে আমি কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছি। একহাজার বৎসর পর্যন্ত্য পৃথিবীতে ঘুরে অন্বেষণ করেছি। কোথাও জলের কুল কিনারা পায়নি।

পরে আকাশবাণী হল যে তপ করো। এক হাজার বৎসর তপ করেছি, তারপরে সৃষ্টি রচনার জন্য আকাশবাণী হয়েছিল। এর মধ্যে মধু ও কৌটভ নামের দুটো রাক্ষস আসে, তাদের ভয়েতে আমি কমলের (পদ্মফুলের) ডগা ধরে নীচে নেমে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে দেখি, বিষ্ণু ভগবান

শেষনাগের বিছানায় অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে এক স্ত্রী (প্রেতবত প্রবিষ্ট দূর্গা) বের হল। তাকে আকাশে আভূষণ পড়তে দেখলাম, তখন বিষ্ণু হোঁশ হয়েছে, সেখানে আমি ও বিষ্ণু ছিলাম, এর মধ্যে ভগবান শঙ্করও এসে গেল। দেবী আমাদের বিমানে বসিয়ে ব্রহ্ম লোকে নিয়ে যান। সেখানেও এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও এক শিব সাথে এক দেবীও দেখতে পাই। ওদের দেখে বিষ্ণু বিবেক পূর্বক নীচে বর্ণন করেছে (ব্রহ্মকাল ভগবান বিষ্ণুকে চেতনা প্রদান করে দিয়েছিল। তখন তার বাল্য কালের কথা মনে পড়ে। পৃষ্ঠা নং ১১৯ -১২০ মধ্যে বিষ্ণুভগবান, ব্রহ্মা ও শিবকে বলেছিলেন ইনি আমাদের তিনজনেরই মাতা ইনিই জগৎ জননী প্রকৃতিদেবী। আমি এই দেবীকে তখন দেখেছিলাম, যখন আমি বালক ছিলাম, তিনি আমায় পালঙ্কে ঝুলাতেন। তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং ১২৩ মধ্যে বিষ্ণু ভগবান শ্রী দূর্গাকে স্তুতি করে বলছেন, তুমি শুদ্ধ স্বরূপা, এ সারা সংসার তোমার দ্বারা উদ্ভাসিত হচ্ছে, আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা ও শঙ্কর আমরা সবাই তোমার কৃপায় বিদ্যমান হয়েছি। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) আর তিরোভাব (মৃত্যু) হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা তিন দেবই নাশবান, কেবল তুমিই নিত্য (অবিনাশী) আছ, জগৎ জননী ও প্রকৃতি দেবী। ভগবান শঙ্কর বললেন দেবী, যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমা হইতে উৎপন্ন (প্রকট) হয়ে থাকে, তারপরে উৎপন্ন হওয়া ব্রহ্মাও তোমার বালক হল, তবে আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান হলেম কিনা! অর্থাৎ আমাকেও তুমিই উৎপন্ন করেছো।

বিচার করুন ঃ- উপরোক্ত বিবরণ থেকে সিদ্ধ হয় যে কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এরা সবাই নাশবান। মৃত্যুঞ্জয় (অজর-অমর) ও সর্বেশ্বর না তথা দূর্গা (প্রকৃতি) র পুত্র তথা ব্রহ্মা (কাল সদাশিব) ইনাদের পিতা।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং ১২৫ মধ্যে ব্রহ্মা যখন তার মাতাকে জিজ্ঞাসা করল, হে মাতা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা রয়েছে, সে ব্রহ্মকি আপনি? না অন্য কোনো প্রভু? তার উত্তরে তখন দূর্গা বলেছে, ব্রহ্ম আর আমি একই আছি। আবার এই স্কন্দের পৃষ্ঠা ১২৯ সে বলছে, এখন আমার কাজ সিদ্ধ করার জন্য বিমানে বসো, আর শীঘ্র যাও, কোনো কঠিন কার্য্য উপস্থিত হলে, যখন আমাকে মনে করবে আমি তোমাদের সামনে আসব। দেবতাগণ আমার (দূর্গার) ও ব্রহ্মের ধ্যান তোমরা সব সময় করবে বা করা উচিত। আমাদের দুজনের স্মরণ করতে থাকবে, তাহলে কার্য্য সিদ্ধ হতে একটুও সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাতে স্বসিদ্ধ হয় যে দূর্গা (প্রকৃতি) ও ব্রহ্ম(কাল) এ দুইজনই এই দেবদের মাতা ও পিতা, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাশবান তারা পূর্ণ শক্তিযুক্ত নয়। তিন দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) বিয়ে দূর্গা (প্রকৃতি দেবী) দিয়েছে। পৃষ্ঠা নং ১২৮-১২৯ মধ্যে তৃতীয় স্কন্দে।

।। গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ১২ ।।

যে, চ, এব, সাত্বিকা, ভাবাঃ, রাজসা, তামসা, চ, যে
মতঃ, এব, ইতি, তান, বিদ্ধি, ন, তু, অহম্, তেষু, তে, ময়ি।। ১২ ।।

অনুবাদ ঃ- (চ) আর (এব) ওই (যে) যে (স্বত্বিকাঃ) সত্বগুণ বিষ্ণুর দ্বারা স্থিতি, (ভাবাঃ) ভাব আছে আর (যে) যে (রাজসাঃ) রজোগুণ ব্রহ্মারদ্বারা উৎপত্তি (চ) এবং (তামসাঃ) তমোগুণ শিব দ্বারা সংহার হওয়া (তান) ওই সবাই কে তুমি (মতঃ এব) আমার দ্বারা সুনিয়োজিত নিয়মানুসারই

তাহা হয়ে থাকে (ইতি) এইরকম (বিদ্ধি) জানবে (তু) কিন্তু বাস্তবে (তেষু) তাহাতে (অহম্) আমি আর (তে) তারা (ময়ি) আমাতে (ন) নেই।

ভাবার্থ ঃ- আর ওই সতগুণ বিষ্ণু দ্বারা স্থিতির যে ভাব আছে, রজোগুণ ব্রহ্মার দ্বারা উৎপত্তির যে ভাব আছে এবং তমগুণ শিবের দ্বারা যে ভাব আছে, সেই সমস্ত প্রকারের ভাবকে তুমি, আমার দ্বারা সুনিয়োজিত নিয়মানুসারে তাহা হয়ে থাকে এই প্রকার জানবে। তবে বাস্তবে তাহাতে আমি আছি আর তারা আমাতে নেই।

পবিত্র শিব মহাপুরানে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ।।

(কাল ব্রহ্ম ও দূর্গা থেকে বিষুঃ ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি)

এর প্রমাণ পবিত্র শ্রী শিব পুরান গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত অনুবাদ কর্ত্তা শ্রী হনু মান প্রসাদ পোদ্দার, এর অধ্যায় ৬ রুদ্র সংহিতা, পৃষ্ঠা নং ১০০ তে বলা হয়েছে যেকি, মূর্ত্তি রহিত পরব্রহ্ম আছে। তার মূর্ত্তি ভগবান সদাশিব। এর শরীর থেকে এক শক্তি বের হয়। তার নাম অম্বিকা, প্রকৃতি (দূর্গা) ত্রিদেব জননী (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবকে উৎপন্ন করা মাতা। যার আট ভূজা (হাত) আর যার নাম সদাশিব তাকে শিব, শম্ভু ও মহেশ্বর ও বলা হয়।(পৃষ্ঠা নং ১০১) সে তার সারা অঙ্গ ভস্ম মাখিয়ে রাখে। ওই কাল রূপী ব্রহ্মাই একটা শিব লোক নামের স্থান (ক্ষেত্র) বানিয়ে রেখেছে। পরে দুজনে পতি পত্নীর ব্যবহার করে এক পুত্র উৎপন্ন করেছে, তার নাম বিষ্ণু রাখে (পৃষ্ঠা নং ১০২)-তে।

আবার রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং ৭ পৃষ্ঠা নং ১০৩-এ ব্রহ্মা বলেছে আমার উৎপত্তি ভগবান সদাশিব (ব্রহ্মাকাল) ও প্রকৃতি (দূর্গা)-র সংযোগে হয় অর্থাৎ পতিপত্নির ব্যবহার থেকেই হয়েছে। পরে আমাকে বেহুঁশ করে দিয়েছিল।

আবার রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং ৯ পৃষ্ঠা ১১০ তে বলেছে যে, এই প্রকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতার গুণ আছে, কিন্তু শিব (কাল ব্রহ্ম) গুণাতীত মানা হয়েছে। এখানে চারবার সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ সদাশিব (কাল-ব্রহ্ম) ও প্রকৃতি (দূর্গা) থেকেই তিন দেবদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) উৎপন্ন হয়েছে। তিন ভগবানের মাতা, দূর্গা এবং পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম-কাল)। এই তিন গুণ তিন প্রভুরই আছে, তবে এক এক ভগবান এক এক গুণ দ্বারা সম্পন্ন। যেমন ব্রহ্মা-রজোগুণী, বিষ্ণু-সতগুণী এবং শিব (শঙ্কর) তমোগুণী।

।। পবিত্র শ্রী মদ্‌ভগবত গীতাতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ।।

এরই প্রমাণ পবিত্র গীতায় অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫ পর্যন্ত্য আছে। ব্রহ্ম(কাল) বলছে যে কি, প্রকৃতি (দূর্গা) তো আমার পত্নী, আমি ব্রহ্ম(কাল) তার পতি। আমাদের দুজনের সংযোগ থেকে এই সর্ব প্রাণীদের সহিত এই গুণগুলিও (রজোগুণ ব্রহ্মা সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব) উৎপত্তি হয়েছে। আমি (ব্রহ্ম) সব প্রাণীর পিতা, প্রকৃতি (দূর্গা) সবার মাতা। আমিই এর উদরে (পেটে)-বীজ স্থাপনা করে থাকি, যাহাতে সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতি (দূর্গা) থেকে উৎপন্ন তিন গুণ, (রজোগুণ-ব্রহ্মা-সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব)-জীবকে কর্মের আধার থেকে শরীরে বাঁধতে থাকে।

গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং ৩ থেকে ৫ পর্যন্ত্যতে সৃষ্টির প্রমাণ

মম যোনীর্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।। ৩।।

ভাবার্থ ঃ- হে ভরত বংশীয় অর্জুন! আমার উৎপত্তি করার মূলস্থান হল প্রকৃতি (দূর্গা, আদিমায়া, অষ্টাঙ্গী), আমি সেখানে জীব রূপ গর্ভ স্থাপন করি, তাহার কারণে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়।

গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং ৪—

সর্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ।। ৪।।

ভাবার্থ ঃ- হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত প্রকার প্রাণীদেহ উৎপন্ন হয়, এই মূল প্রকৃতিই সকলের মাতা এবং আমিই বীজস্থাপনাকারী পিতা ।। ৪।।

গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং ৫ —

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুনাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।৫।।

ভাবার্থ ঃ- হে মহাবাহো! প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হওয়া যে তিনটি গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব) ইহারা অর্থাৎ এই তিনগুণ অবিনাশী দেহীকে (জীবাত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করে।

।। এই প্রমাণ অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪, ১৬, ১৭ তেও আছে।।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ ।।

উর্দ্ধ মূলম্ অধঃশাখম্, অশ্বত্থম্, প্রাহুঃ, অব্যয়ম্, ছন্দাংসি
যস্য, পর্ণানি, যঃ তম্, বেদ, সঃ, বেদবিত্।।

অনুবাদ ঃ- (উদ্ধ মূলম্) উপরের দিকে পূর্ণ পরমাত্মা আদি পুরুষ পরমেশ্বর রূপী মূল যুক্ত, (অধঃশাখম্) নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট (অব্যয়ম্) অবিনাশী (অশ্বত্থং) বিস্তারিত বৃক্ষ আছে, ঘোড়ার মত মজবুত (যস্য) যার (ছন্দাংসি) ছোট ছোট ভাগে যে ডালগুলি (পর্ণানি) পাতা (প্রাহুঃ) বলছে (তম্) ওই সংসার রূপ বৃক্ষকে (যঃ) যে (বেদ) সর্বঅঙ্গ সহিত জানে (সঃ) সেই (বেদবিত্) পূর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী।

ভাবার্থ ঃ— উর্দ্ধে মূলযুক্ত এবং নিম্নে শাখাবিশিষ্ট যে জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষ আছে (চলতে থাকা প্রবাহ রূপ) একে অব্যয় বলা হয় আর এই বৃক্ষের মূল থেকে পাতা এর মধ্যে যা কিছু যেমন- কান্ড, ডাল-শাখা প্রশাখা ও পাতারূপী জগৎ বৃক্ষকে যিনি জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ জানেন তিনিই বেদবিৎ।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২ ।।

অধঃ, চ, উর্দ্ধম্, প্রসৃতাঃ, তস্য, শাখাঃ, গুণপ্রবৃদ্ধাঃ,
বিষয়প্রবালাঃ, অধঃ, চ, মূলানি, অনুসন্ততানি, কর্মানুবন্ধিনী, মনুষ্যলোকে।। ২ ।।

অনুবাদ ঃ- (তস্য) ওই বৃক্ষের (অধঃ) নীচে (চ) আর (উদ্ধ ম্) উপর (গুণপ্রবৃদ্ধাঃ) তিন গুণসব ব্রহ্মা-রজগুণ, বিষ্ণু সতগুণ, শিব-তমোগুণ রূপী (প্রসৃতাঃ) ছড়ানো, (বিষয় প্রবালাঃ) বিকার কাম ক্রোধ, মোহ, লোভ অহঙ্কার রূপী সঙ্গ (শাখাঃ) ডাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব (কমানুবন্ধিনী) জীবকে কর্মে বাঁধে বা আবদ্ধ করে (অপি) ও (মূলানি) শিকড় মুখ্য কারণ (চ) আর (মনুষ্য লোক) মানবলোক বা পৃথিবী লোকে (অধঃ) নীচে-নরক, অর্থাৎ চুরাশী লাখ যোনিতে (উর্দ্ধ ম্) উপর স্বর্গলোকাদিতে (অনুসন্ততানি) ব্যাবস্থিত করা রয়েছে।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৩ ।।

ন, রূপম্, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ, ন, চ, আদিঃ ন, চ,
সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম, এনম্, সুবিরুঢ়মূলম্, অসঙ্গশাস্ত্রেন, দৃঢ়েন ছিত্বা।।৩।।

অনুবাদ ঃ- (অস্য) এই রচনার বা সৃষ্টির (ন) না (আদিঃ) শুরু (চ) আর (ন) না (অন্তঃ) শেষ আছে (ন) না (তথা) সেইরূপ (রূপম্) স্বরূপ (উপলভ্যতে) পাওয়া যায় (চ) আর (ইহ) এখানে বিচার কালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানের পূর্ণ জানকারী আমারও (ন) জানা নেই (সম্প্রতিষ্ঠা) কেননা সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনার বা সৃষ্টির পূর্ণ জ্ঞান স্থিতি আমার জানা নেই (এনম্) ওই (সুবিরূঢ় মূলম্) ভাল করে বোঝার স্থায়ী স্থিতি বালা (অশ্বত্থম্) শক্ত সরূপবালা সংসার রূপী বৃক্ষের জ্ঞানকে (অসঙ্গশস্ত্রেন) পূর্ণ জ্ঞানরূপী (দৃঢ়েন) দৃঢ় সুক্ষম বেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জেনে (ছিত্বা) কেটে অর্থাৎ নিরঞ্জনের ভক্তিকে ক্ষণিক বা সামান্য অর্থাৎ ক্ষণভুঙ্গর বা পূর্ণ জ্ঞান নয় জেনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মও পরব্রহ্ম থেকেও আদি বা পূর্বের পূর্ণব্রহ্মার তলাশ (খোঁজ) করতে হবে।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ ।।

ততঃ পদম্, তত্, পরিমার্গিতয়ং, যস্মিন্, গতাঃ ন, নিবর্তন্তি, ভুয়ঃ
তম্, এব্, চ, আদ্যম্, পুরুষম্, প্রপদ্যে, যতঃ, প্রবৃত্তিঃ , প্রসৃতা, পুরাণী।।

অনুবাদ ঃ- যখন তত্ত্বদর্শী সন্ত (পূর্ণ গুরু) পেয়ে যাবে (ততঃ) তার পরে (তৎ) ওই পরমাত্মার (পদম) পরমস্থানপদ অর্থাৎ সতলোকের (পরিমার্গিতব্যম্) ভাল করে খুঁজতে হবে (যস্মিন) যেখানে মধ্যে (গতাঃ) পৌঁছানো সাধক (ভূয়ঃ) আবার (ন, নিবর্তন্তি) ফিরে সংসারে আসে না (চ) আর (যতঃ) যে পরমাত্মা-পরম অক্ষর ব্রহ্ম থেকে (পুরাণী) আদি (প্রবৃতিঃ) রচন/সৃষ্টি (প্রসৃতা) উৎপন্ন হয়েছে (তম্) অজ্ঞাত (আদ্যম্) আমি (কাল ক্ষর-পুরুষ জ্যোর্তি নিরঞ্জন)আদি (পুরুষম্) পূর্ণপরমাত্মার (এব) ই (প্রপদ্যে) আমি স্মরণে আছি তথা তারই পূজা করি।

ভাবার্থ ঃ- এই ভাবার্থ হল অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৩-এর-এই অশ্বত্থরূপী জগৎবৃক্ষের রচনার, না শুরু না অন্ত বা শেষ আছে এবং না কোনো সেরকম সরূপ পাওয়া যায়। এখানে বিচারকালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া, গীতা জ্ঞানের সম্পূর্ণ সঠিক জ্ঞান আমারও জানা জানা নেই। এই ভালভাবে স্থায়ী স্থিতিবালা কঠিন (মজবুত) সরূপবালা সংসার রূপী বৃক্ষকে পূর্ণ জ্ঞান (সুক্ষম বেদ) অস্ত্র দ্বারা বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কেটে অর্থাৎ নিরঞ্জনের (কাল ক্ষরপুরুষের অর্থাৎ গীতার জ্ঞানদাতা) ভক্তিকে ক্ষণিক বা পূর্ণ জ্ঞান নয় জেনে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ব্রহ্ম তথা পরব্রহ্ম থেকেও

পূর্বের পূর্ণ ব্রহ্মের খোঁজ করা উচিৎ তাহা তত্ত্বদর্শী সন্তের (পূর্ণ গুরুর বা তত্ত্ববিতের) দ্বারা জানতে বলেছে। তাই একথাও বলেছে, যে আমি এই পূর্ণ ব্রহ্মের শরণে আছি তথা তাহারই পূজা করে থাকি।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬ ।।

দ্বৌ, ইমৌ, পুরষৌ, লোকে, ক্ষরঃ চ, অক্ষরঃ এব, চ,
ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি, কুটুস্থঃ অক্ষরঃ, উচ্চতে।। ১৬ ।।

অনুবাদ ঃ- (লোকে) এই সংসার জগৎ (দ্বৌ) দুই প্রকারের (ক্ষরঃ) নাশবান (চ) আর (অক্ষরঃ) অবিনাশী (পুরুষৌ) ভগবান আছে। প্রভুর লোকে (এব) এই প্রকার (ইমৌ) এই দুই (ব্রহ্মাণ্ডে) (সর্বানি) সম্পূর্ণ (ভূতানি) প্রাণীদের শরীর তো (ক্ষর) নাশবান (চ) আর (কুটস্থঃ) জীবাত্মা (অক্ষর)অবিনাশী (উচ্চতে) বলা হয়ে থাকে।

।। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭ ।।

উত্তমঃ পুরুষঃ, তু, অন্যঃ, পরমাত্মা, ইতি, উদ্যহৃতঃ
যঃ লোক ত্রয়ম্ আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়, ঈশ্বরঃ।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ- (উত্তমঃ) উত্তম (পুরুষঃ) প্রভু (তু) তো (অন্যঃ) উপরোক্ত দুটোই প্রভু "ক্ষর পুরুষ) ও অক্ষর পুরুষ" থেকেও অন্য একজন (ইতি) ইহাকেই বাস্তবে (পরমাত্মা) পরমাত্মা (উদাহৃতঃ)বলা হয়েছে (যঃ) যে (লোকত্রয়ম্)। তিনোলোকে (আবিশ্য) প্রবেশ করে (বিভর্তি) সবার পালন পোষন করে এবং (অব্যয়ঃ) অবিনাশী (ঈশ্বরঃ) প্রভুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সমর্থ প্রভু।

ভাবার্থ ঃ— গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু কেবল এতটাই বলেছেন যে, সংসার হল একটা উল্টো ঝুলানো গাছের তুল্য মনে করবে। উপরে শিকড়ে (মূলে) তো কেবল পূর্ণ পরমাত্মা আছে। নিচে ডালপালা পাতা অন্য অংশ জানবে। এই উল্টো ঝুলানো সংসাররূপী বৃক্ষের প্রতিটি ভাগে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ যে সাধু (সন্ত) জানে, সেই তত্ত্বদর্শী সাধু (সন্ত)। যার বিষয়ে, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ সে বলেছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২-৩ এতে কেবল এতটাই বলেছে যে তিন রূপী গুণ হল শাখা। এখানে বিচারকালে অর্থাৎ গীতাতে আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) পূর্ণ জানাতে পারছি না, কেননা এই সংসার রচনার আদি ও অন্তর (শেষের) জ্ঞান আমার জানা নেই। তারজন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ এতে বলেছে কোন তত্ত্বদর্শী সাধু থেকে পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান জানো। এই গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১-তে ওই তত্ত্বদর্শী সাধুর পরিচয় করে বলেছে কি যে, ওই সংসার রূপী বৃক্ষের প্রতি ভাগের জ্ঞান সে করিয়ে দেবে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করো। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪-এ বলেছে, যে কি ওই তত্ত্বদর্শী মিলে যাওয়ার পরে ওই পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করার দরকার। অর্থাৎ ওই তত্ত্বদর্শী সাধুর কথা অনুসারে সাধনা করা উচিৎ। যাহাতে পূর্ণ মোক্ষ (অনাদি মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কি, তিন প্রভু আছে এক ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) তৃতীয় পরম অক্ষর পুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) । ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বাস্তবে অবিনাশী নয়। ওই অবিনাশী পরমাত্মা তো এই দুজন থেকে অন্য বিশিষ্ট একজন। উনিই তিন লোকে প্রবেশ করে সর্বের পালন পোষণ করেন।

উপরোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ থেকে ৪ ও ১৬-১৭ তে এ প্রমাণিত হয়েছে যে, উল্টো ঝুলানো সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়) তে পরম অক্ষর ব্রহ্ম বা পূর্ণ ব্রহ্ম আছেন যিনি এই পূর্ণ বৃক্ষেরই পালন করে থাকেন, আর বৃক্ষের যে অংশ পৃথিবীর বাইরে জমির সাথে দেখা যাচ্ছে বা গোড়া বা কান্ড আছে, তাকে অক্ষর পুরুষ বা পরব্রহ্ম জানবে। ওই বৃক্ষের কান্ড থেকে মোটা ডাল বেরিয়েছে তার একডাল ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) জানবে, এবং ওই ডাল থেকে অন্য তিনটে ডাল বেরিয়েছে (শাখা) তাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জানবে এবং পরে যত পাতা দেখবে সেই সব সংসারের প্রাণী জানবে। উপরোক্ত গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭তে স্পষ্ট আছে যে, ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) ও অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) অর্থাৎ এই দুই লোকের মধ্যে যত প্রাণী আছে, তাদের স্থুল শরীর তো নাশবান কিন্তু জীবাত্মা অবিনাশী অর্থাৎ উপরের দুই প্রভু বা এদের অন্তর্গত সর্ব প্রাণই নাশবান। যদিও বা অক্ষর পুরুষকে অবিনাশী বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে অবিনাশী পরমাত্মা এ দুজন থেকে আলাদা। উনিই তিনলোকে প্রবেশ করে, সবার পালন পোষণ করেন। উপরোক্ত বিবরণে তিন প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

।। পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কোরাণ শরীফে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ ।।

এর প্রমাণ পবিত্র বাইবেলে ও পবিত্র কোরাণ শরীফেও আছে। কোরাণ শরীফে পবিত্র বাইবেলেরও জ্ঞান আছে। এইজন্য এই দুই পবিত্র সদ্গ্রন্থতে প্রায়ই মিলেজুলে প্রমাণিত লেখা আছে যে, কে এবং কেমন এই সৃষ্টির রচনহার ও তার বাস্তবিক নাম কি ?

পবিত্র বাইবেল (উৎপত্তি গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং -২-পর, অ ১:২০-২:৫ পর)

ছয় দিনের দিন-প্রাণী ও মনুষ্য ঃ

অন্য প্রাণীদের রচনা করে (২৬) পরে পরমেশ্বর বলেছেন, আমি মানুষকে নিজের স্বরূপ অনুসারে আমার সমানতাতে, বানিয়েছি, যাতে সর্ব প্রাণীদের কাবুতে রাখবে। (২৭) তখন পরমেশ্বর মানুষকে নিজের স্বরূপ অনুসারে উৎপন্ন করেছেন, নর ও নারী বানিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (২৯) প্রভু মানুষের খাওয়ার জন্য বীজ বালা ছোট গাছ, তথা যত গাছে বীজ বালা ফল হয়, সে সব ভোজনের জন্য প্রদান করেছিল (মাংস খেতে বলেননি)।

সাত দিনের দিন-বিশ্রাম দিন ঃ

পরমেশ্বর ছয়দিনে সর্ব সৃষ্টি ও উৎপন্ন করেন তথা সাতদিনে বিশ্রাম করেছেন।

পবিত্র বাইবেলে সিদ্ধ করে দিয়েছেন যে, পরমাত্মা মানব সদৃশ শরীরে আছেন, যিনি ছয়দিনে সর্ব সৃষ্টি রচনা করেন সাতদিনে বিশ্রাম করেছেন।

পবিত্র কোরান শরীফ (সুরত ফুর্কানি ২৫, আয়ত নং ৫২-৫৮-৫৯)

আয়ত -৫২ ঃ- ফলা তুতিয়ল-কাফিরন্ ব জহিদহুম বিহীজিহাদন্ কবীরা (কবিরন্) ৫২

ভাবার্থ ঃ— হজরত মহম্মদের ক্ষুদা, (প্রভু) বলছেন হে পৈয়গম্বর! তুমি কাফিরদের (যারা এক প্রভুর ভক্তি ত্যাগ করে নানা দেবী-দেবতাদের বা মূর্ত্তি আদির পূজা করে) কথা মানবে না, কেননা ও লোক কবীর কে পূর্ণ পরমাত্মা মানে না। আমার দ্বারা দেওয়া এই কোরানের জ্ঞানের আঁধারে অটল থাকবে, যেকি কবীরই পূর্ণ প্রভু তথা কবীর আল্লাহের জন্য সংঘর্ষ করবে (লড়বে না) দৃঢ়তা রাখবে।

আয়ত ৫৮ ঃ- ব তবককল অলল্-হরিউল্লজি লা যমুতু ব সবিবহ্ বিহম্দিহীব কফা বিহী বিজুনুবি ইবাদিহী খবীরা (কবীরা)।।৫৮।।

ভাবার্থ ঃ- হজরত মুহম্মদ যাকে নিজের প্রভু মানে, সে অল্লাহ (প্রভু) কোনো অন্য পূর্ণ প্রভুর দিকে ইশারা বা সংকেত করে বলছে, এ পৈগম্বর, ওই কবীর পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখো যে তোমায় জিন্দা মহাত্মা রূপে এসে মিলেছিল। তিনি কোনোদিন মরণে বালা নয় অর্থাৎ বাস্তবে অবিনাশী। তারিফের সাথে তার পাকী (পবিত্রমহিমা) গুণগান করে যা। তিনি কবীর আল্লাহ (কবির্দেব) পূজার যোগ্য তথা নিজের উপাসকের সর্ব পাপকে বিনাশ করনে বালা।

আয়ত ৫৯ ঃ- অল্লজী খলকস-সমাবাতি বল্অর্জ ব মা বৈনহুমা ফী সিত্ততি অয্যামিন্ সুম্মস্তবা অলল্অর্শি অরহ্মানু ফস্অল্ বিহী খবীরন্ (কবীরন্)।।৫৯।।

ভাবার্থ ঃ- হজরত মহম্মদ কে কোরান শরীফ বলা প্রভু (অল্লাহ) বলছেন ওই কবীর প্রভু তিনি আছে যে কিনা আকাশ ও মাটির মাঝখানে যা কিছু বিদ্যমান আছে, সর্ব কিছুর রচনা ছয়দিনেই করেছেন তথা সাত দিনের দিন নিজের সিংহাসনে সতলোকে গিয়ে বিরাজমান হয়েছেন। তার বিষয়ে জানতে হলে, কোনো জানকারী (বা খবর) তত্ত্বদর্শী সাধুর কাছে জিজ্ঞাসা করো।

ওই পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি কিভাবে হবে তথা বাস্তবিক জ্ঞান তো কোনো তত্বদর্শী সাধুর (বা খবর) কাছে জিজ্ঞাসা করো, আমি জানি না।

উপরোক্ত দুই-ই পবিত্র ধর্ম (ইসাই তথা মুসলিম)-র পবিত্র শাস্ত্রও মিলে জুলে প্রমাণ করেছে যে, সর্ব সৃষ্টি রচনহার, সর্ব পাপ বিনাশক, সর্ব শক্তিমান, অবিনাশী পরমাত্মা মানব সদৃশ শরীরের আকারে আছেন তথা সত্য লোকে থাকেন। তার নাম কবীর, তাকে অল্লাহু অকবিরূও বলে।

আদরণীয় ধর্মদাসজি, পূজ্য কবীর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে সর্বশক্তিমান। আজ পর্যন্ত্য এইরকম তত্ত্বজ্ঞান কেউ বলেনি, বেদের মর্মজ্ঞ জ্ঞানীরাও বলেননি। এতে সিদ্ধ হয় যে চারি পবিত্র বেদ তথা চার পবিত্র কতেব (কুরান শরীফ আদি) মিথ্যা। পূর্ণ পরমাত্মা বললেন—

কবীর, বেদ কতেব ঝুঠে নহী ভাই, ঝুঠে হে জো সমঝে নাহি।

ভাবার্থ ঃ- চার পবিত্র বেদ (ঋকবেদ, অথর্ববেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ) এবং পবিত্র চার কতেব (কুরান শরীফ, জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল) ভুল নয়। কিন্তু যারা একে বুঝতে পারেনি তারা নাদান্ অর্থাৎ অজ্ঞানী বা অবুঝ।

।। পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের (কবীর দেবের) অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনা।।

বিশেষ ঃ- নীচের অমৃতবাণী সন্ ১৪০৩ থেকে (যখন পূজ্য কবীর্দেব কবীর পরমেশ্বর) লীলাময় শরীরে পাঁচ বর্ষ থাকাকালিন) সন্ ১৫১৮ যখন কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) ম গহর স্থান থেকে সশরীরে সতলোকে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে, অনুমান ৬০০ বর্ষ পূর্বে পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবীর্দেব) দ্বারা নিজের আপন সেবক (দাস, ভক্ত আদরণীয় ধর্মদাসজীকে শুনিয়েছিলেন, তথা ধনী ধর্মদাস সাহেব জী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ওই সময়ের পবিত্র হিন্দুরা তথা পবিত্র মুসলমানদের নাদান গুরুরা (নীম-হকীমো) বলেছিল যে এ ধানক (জুলাহা, তাঁতী) কবীর মিথ্যাবাদী।

কোনো সদ গ্রন্থে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের মাতা পিতার নাম নেই। এ তিন প্রভু অবিনাশী এবং এদের জন্ম মৃত্যু হয় না। না তো পবিত্র বেদে ও পবিত্র কুরান শরীফ আদিতে কবীর পরমেশ্বরের প্রমাণ আছে। তথা পরমাত্মাকে নিরাকার লেখা আছে আমরা প্রতিদিন পড়ে থাকি। ভোলা আত্মারা এই বিচক্ষণ (চতুর গুরুর) পর বিশ্বাস করে ভেবে নিয়েছে যে, সত্যি তো এই কবীর ধানক (তাঁতী) তো অশিক্ষিত, তথা গুরুরা সব শিক্ষিত এরাই সত্য কথা বলছেন। আজ ওই সত্য প্রকাশে এসেছে এবং আমাদের সর্ব পবিত্র ধর্মের পবিত্র সদ গ্রন্থ সাক্ষী আছে। এতে সিদ্ধ হয় যে কি পূর্ণ পরমেশ্বর, সর্ব সৃষ্টি রচন হার, কুল করতার তথা সর্বজ্ঞ কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)-ই আছেন। যে কিনা কাশী (বেনারস)-তে পদ্মফুলের উপর প্রকট হয়েছিল তথা ১২০ বর্ষ পর্যন্ত বাস্তবিক তেজোময় শরীরের উপর মানব সদৃশ শরীরে হাল্কা তেজপুঞ্জ বানিয়ে থাকতেন এবং নিজের দ্বারা রচনা সৃষ্টির সঠিক (বাস্তবিক তত্ত্ব)-র জ্ঞান দিয়ে সশরীরে সতলোকে চলে গিয়েছিলেন। কৃপা করে প্রেমী পাঠক পড়েন নীচের (**অমৃতবাণী কবীর সাহেব দ্বারা উচ্চারিত**)

ধর্মদাস যহ জগ বৌরানা। কই ন জানে পদ নিরবানা।
যহি কারন মে কথা পসারা। জগ সে কহিয়ো রাম নিয়ারা।
যহি জ্ঞান জগ জীব সুনাও। সব জীবোকে ভরম নশাও।
অব মে তুমসে কহ চিতাই। ত্রয়দেবনকি উৎপত্তি ভাই।
কুছ সংক্ষেপ কহো গুহরাই। সব সংশয় তুমহরে মিট যায়,
ভরম গয়ে জগ বেদ পুরানা। আদি রামকা ভেদ ন জানা।
রাম রাম সব জগৎ বখানে। আদি রাম কই বিরলা জানে,
জ্ঞানী শুনে সো হৃদে লগাই। মূর্খ সুনে সো গম্য না পাই।
মা অষ্টাঙ্গী পিতা নিরঞ্জন। বে জম দারুণ বংশন অঞ্জন,
পহিলে কিন্থ নিরঞ্জন রাই। পিছেসে মায়া উপজাই।
মায়া রূপ দেখ অতি শোভা। দেব নিরঞ্জন তন মন লোভা,
কামদেব ধর্মরায় সত্তায়ে। দেবী কো তুরতহী ধর খায়ে।
পেট সে দেবী করি পুকারা। সাহেব মেরা করো উবারা,
টের সুনি তব হম তহাঁ আয়ে। অষ্টাঙ্গী কো বন্দ ছুরায়ে।
সতলোক মে কীন্হা দুরাচারী, কাল নিরঞ্জন দিন্হা নিকারী
মায়া সমেত দিয়া ভগাই, সোলহ সংঘ কোস দুরী পর আই।
অষ্টঙ্গী আর কাল অব দোই, মন্দ কর্ম সে গই বিগোই,
ধর্মরায় কো হিকমত কীন্হা। নখ রেখা সে ভগকর লীন্হা।
ধর্মরায় কিন্হা ভোগ বিলাসা। মায়া কো রহি তব আশা,
তিন পুত্র অষ্টঙ্গী জায়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে।
তিন দেব বিস্তার চলাযে। ইনমে এই জগ ধোখা খায়ে,
পুরুষ গম্য কৈঁসে কো পাবে। কাল নিরঞ্জন জগভরমাবৈ।
তিন লোক অপনে সুত দীন্হা। সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লিন্হা,
অলখ নিরঞ্জন শুন্য ঠিকানা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেদ ন জানা।

তিন দেব সো উনকো ধাবে। নিরঞ্জন কা বে পার না পাবে,
অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা। তিন লোক জিব কীন্থ অহারা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহী বচায়ে। সকল খায় পুন ধুর উড়ায়ে
তিনকে সুত হে তিনো দেবা। অন্ধর জিব করত হে সেবা।
অকাল পুরুষ কাহু নহী চিন্থা। কাল পায় সবহী গহ লীন্থা
ব্রহ্মকাল সকল জগ জানে। আদি ব্রহ্ম কো না পহিচানে।
তিনো দেব ওর ও উতারা। তাকো ভজে সকল সংসারা।
তিনো গুনকা যহ বিস্তারা, ধর্ম দাস মে কহো পুকারা।
গুণ তিনো কী ভক্তি মে, ভুল পরো সংসার।
কহে কবীর নিজ নাম বিন, কৈ সে উতরে পাড়।

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী নিজের আপন সেবক শ্রী ধর্মদাসজীকে বলেছেন, ধর্মদাস এ সর্ব সংসার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিচলিত। কাররই পূর্ণ মোক্ষের পথ তথা পূর্ণ সৃষ্টির রচনার পূর্ণ জ্ঞান নেই। এইজন্য আমি, তোমাকে আমার রচা সৃষ্টির কথা শুনাচ্ছি। বুদ্ধি মান ব্যক্তি তো তাড়াতাড়ি বুঝে নেবে কিন্তু যে সর্ব প্রমাণ দেখেও না মানবে, সে বুঝবে কালের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রয়েছে, সে ভক্তির যোগ্য নহে। এখন আমি বলছি, তিন ভগবানের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব)-এর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? ইনাদের মাতা তো অষ্টঙ্গী (দূর্গা) এবং পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম/কাল) আছে। প্রথমে ব্রহ্মের উৎপত্তি ডিম থেকে হয়েছে। পরে দূর্গার উৎপত্তি হয়েছে। দূর্গার রূপে আসক্ত হয়ে কাল (ব্রহ্ম) অভদ্র আচরণ করেছিল, তখন দূর্গা (প্রকৃতি) কালের পেটে স্মরণ নিয়েছিল। আমি ওখানে গিয়েছিলাম যেখানে জ্যোতিনিরঞ্জন ছিল, তখন ভবানীকে ওখান থেকে বের করে ২১ ব্রহ্মান্ড সহিত দুইজনকে ১৬ সংখ কোস দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন (ধর্মরায়) প্রকৃতি দেবীর (দূর্গার) সাথে ভোগ বিলাস করেছিল। এই দুইজনের সংযোগে তিন গুণের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব)-এর উৎপত্তি হয়েছে। এই তিন গুণের সাধনা (রজোগুণী-ব্রহ্মা, সতগুণী-বিষ্ণু-ও তমোগুণী শিবের) করে সর্ব প্রাণী কাল জালে ফেঁসে রয়েছে। যত সময় বাস্তবিক মন্ত্র না পাবে তত সময় পূর্ণ মোক্ষ কি করে হবে?

বিশেষ ঃ- প্রিয় পাঠক বিচার করে দেখুন, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবকে স্থায়ী অবিনাশী বলা হয়েছে। সর্ব হিন্দু সমাজ এখনও এই তিন দেবতাকে অজর, অমর এবং জন্ম মৃত্যু হয় না মনে করেন। এরা তিন দেবই নাশবান। এদের পিতা কাল রূপী ব্রহ্মতথা মাতা দূর্গা (অষ্টাঙ্গী/প্রকৃতি)। যেমন আপনারা পূর্বের প্রমাণে পড়েছেন এই জ্ঞান, আপন শাস্ত্রেতেও বিদ্যমান আছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের কলিযুগি গুরুদের, ঋষিদের ও সাধুদের জ্ঞান জানা নেই। যে অধ্যাপকের পাঠ্যক্রম (সিলেবাস) থেকে অপরিচিত সে অধ্যাপক ঠিক নয় (বিদ্যান নয়) বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যতের শত্রু। এই প্রকার যে গুরুরা এখনও জানে না যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা ও পিতা কে? সে গুরু, ঋষি বা সাধুর জ্ঞানহীন। যার কারণের জন্য ভক্ত সমাজকে শাস্ত্র বিরুদ্ধে জ্ঞান (লোকবেদ অর্থাৎ দন্ত কথা) শুনিয়ে অজ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধে ভক্তিসাধনা করিয়ে, পরমাত্মার বাস্তবিক লাভ (পূর্ণ মোক্ষ) থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সবার মানব জনমই নষ্ট করে দিয়েছে, কেননা শ্রীমদভাগবত গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোকে ২৩-২৪-তে এই প্রমাণ আছে যে, শাস্ত্রবিধি

ত্যাগ করে মনমানি আচরণ পূজা যারা করে থাকে, তাতে তাদের কোনো লাভ হবে না। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জী সন্ ১৪০৩ থেকেই সর্ব শাস্ত্রের যুক্ত জ্ঞান নিজের অমৃতবাণীতে (কবীরবাণীতে) বলতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু ওই অজ্ঞানী গুরুরা এই কবীর বাণীর জ্ঞান ভক্তদের সমাজে যেতে দেয় নি। যাহা বর্তমানে স্পষ্ট হচ্ছে এতে প্রমাণ সিদ্ধ হয় যে, কবির্দেব (কবীর প্রভু) তত্ত্বদর্শী সাধু বেশে স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মাই এসেছিলেন।

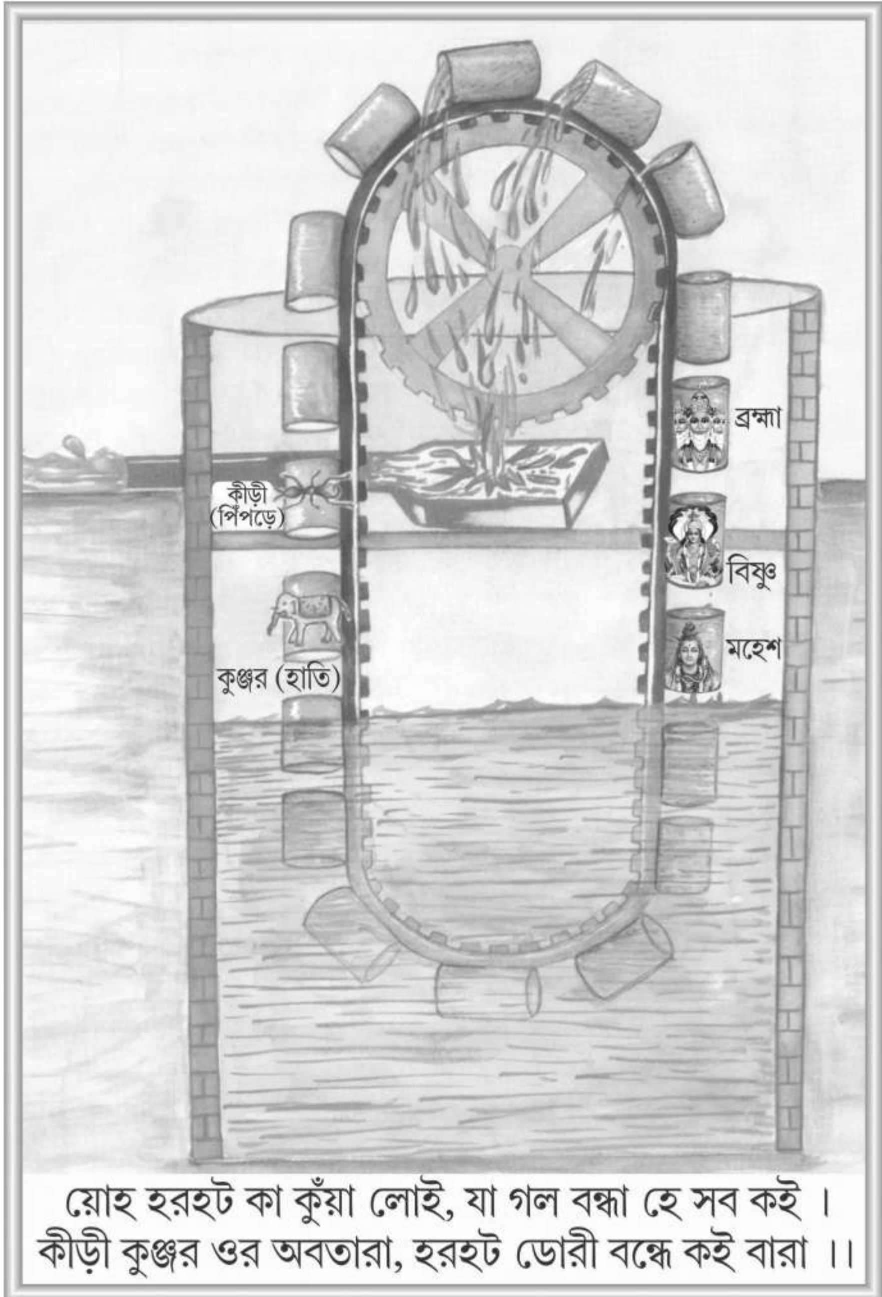
।। আদরণীয় গরীব দাস সাহেবের অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ ।।

(আদি রমৈনী ঃ- সদ গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং 690 থেকে 692পর্যন্ত)

আদি রমৈনী অদলী সারা। জা দিন হোতে ধুনধুকারা, (১)
সত পুরুষ কিন্হা প্রকাশা। হম হোতে তখত কবীর খবাসা (২)
মনমোহিনী সিরজী মায়া। সতপুরুষ এক খেয়াল বনায়া (৩)
ধর্মরায় সিরজে দরবাণী। চৌষ্ঠ যুগতপ সেবাঠানী। (৪)
পুরুষ পৃথিবী যাকু দীন্হি। রাজ করো দেবা আধিনী, (৫)
ব্রহ্মান্ড একুশ রাজ তুমহ দীন্হা। মন কী ইচ্ছা সব জুগ লীন্হা। (৬)
মায়া মূল রূপ এক ছাজা। মোহি লিয়ে জিনহুঁ ধর্মরাজা, (৭)
ধর্ম কা মন চঞ্চল চিৎ ধারয়া। মন মায়া কা রূপ বিচারা। (৮)
চঞ্চল চেরী চপল চিরাগা। যা কে পরসে সরবস জাগা, (৯)
ধর্মরায় কিয়া মন কা ভাগী। বিষয় বাসনা সঙ্গ সে জাগী। (১০)
আদি পুরুষ অদলী অনরাগী। ধর্ম রায় দিয়া দিল সে ত্যাগী, (১১)
পুরুষ লোক সে দিয়া দহাহী। অগম দ্বীপ চলি আয়ে ভাই। (১২)
সহজ দাস জিস দ্বীপ রহতা। কারণ কৌন কৌন কুল পন্থা। (১৩)
ধর্মরায় বোলে দরবাণী। সুনো সহজ দাস ব্রহ্মজ্ঞানী। (১৪)
চৌষ্ঠ যুগ হম সেবা কিন্হী। পুরুষ পৃথিবী হম কু দীন্হি। (১৫)
চঞ্চল রূপ ভয়া মন বৌরা। মনমোহিনী ঠগিয়া ভৌরা। (১৬)
সতপুরুষকে না মন ভায়ে। পুরুষ লোক সে হম চলি আয়ে, (১৭)
অগরদ্বীপ সুনত বড়ভাগী। সহজদাস মেটো মন পাগী। (১৮)
বোলে সহজদাস দিলদানী। হমতো চাকর সত সহদানী। (১৯)
সতপুরুষ সে অরজ গুজারু। জব তোমহরা বিবান উতারু। (২০)
সহজ দাস কো কিয়া পীয়ানা। সত লোক লিয়া প্রবানা, (২১)
সত পুরুষ সাহিব সরবঙ্গী। অবিগত অদলী অচল অভঙ্গী। (২২)
ধর্মরায় তুমহরা দরবানী। অগর দ্বীপ চলি গয়ে প্রাণী, (২৩)
কৌন হুকুম করী অরজ অবাজা। কহাঁ পঠাবৌ ওস ধর্মরাজা। (২৪)
ভাই অবাজ অদলী এক সাচা বিষয় লোক যা তীন্যু বাচা, (২৫)
সহজ বিমান চলে অধিকাই। ছিন মে অগর দ্বীপ চলি আই। (২৬)
হম তো অরজ করি অনুরাগী। তুমহ বিষয় লোক যাব বড়ভাগী, (২৭)
ধর্ম রায় কে চলে বিমানা। মানসরোবর আয়ে প্রাণা। (২৮)

মান সরোবর রহে না পায়ে। দরৈ কবিরা থানা লায়ে, (২৯)
বঙ্কনাল কী বিষমী বাটি। তহাঁ কবীরা রোকি ঘাটি। (৩০)
ইন পাঁচো মিলি জগৎ বন্ধানা। লক্ষ চৌরাশী জীব সন্তানা, (৩১)
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মায়া। ধর্মরায় কা রাজ পাঠায়া। (৩২)
জৌহ খোখা পুর ঝুঠী বাজী। ভিসতি বৈকুণ্ঠ দগাসী সাজী, (৩৩)
কৃতিম জীব ভুলানে ভাই। নিজ ঘর কি তো খবরি ন পাই। (৩৪)
সবা লাখ উজপে নিত হন্না। এক লাখ বিনশে নিত অন্না, (৩৫)
উপতি খপতি প্রলয় ফেরি। হর্ষ শোক জৌরা জম জেরী। (৩৬)
পাঁচো তত্ত্ব হে প্রলয় মাহী। সত্বগুণ রজোগুণ তমোগুণ ঝাঁই (৩৭)
আঠো অঙ্গ হে মিলি হে মায়া। পিন্ড ব্রহ্মান্ড সকল ভরমায়া (৩৮)
যা মে সুরতি শব্দ কী ডোরী। পিন্ড ব্রহ্মান্ড লগী হে খোরী (৩৯)
শ্বাসা পারস মন গহ রাখো। খোলহি কপাট অমিরস চাখো। (৪০)
সুনাউ হন্ন শব্দ সুন দাসা। অগম দীপ হে অগ হে বাসা (৪১)
ভবসাগর যম দন্ত জমানা। ধর্ম রায় কা হে তলবানা। (৪২)
পাঁচো উপর পদ কী নগরী। বাট বিহঙ্গম বঙ্কী ডগরী, (৪৩)
হমরা ধর্মরায় সো দাবা। ভবসাগর মে জীব ভরমাবা। (৪৪)
হম তো কহে অগম কী বাণী। যঁহা অবিগত অদলী আপ বিনানী। (৪৫)
বন্দী ছোড় হমারা নাম। অজর অমর হে অস্থির ঠাম্। (৪৬)
যুগন যুগন হম কহতে আয়ে। যম জৌরা সে হন্ন ছুটায়ে। (৪৭)
জো কই মানে শব্দ হমারা। ভবসাগর নহী ভ্রমে ধারা। (৪৮)
যা মে সুরতি শব্দ কা লেখা। তন অন্দর মন কহ কীন্হি দেখা। (৪৯)
দাস গরীব অগম কী বাণী। খোঁজা হন্নী শব্দ সহদানী।। (৫০)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল, গরীব দাস বলছেন, এই জায়গায় আগে অন্ধকার ছিল, পূর্ণ পরমাত্মা তখন সতলোকের সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। আমরা ওখানে চাকর ছিলাম। পরমাত্মা জ্যোতিনিরঞ্জনকে উৎপত্তি করেছেন। পরে তার তপস্যার ফলে নিরঞ্জনকে একুশ ব্রহ্মান্ড প্রদান করেছিলেন। পরে মায়া প্রকৃতি (দূর্গা) কে উৎপত্তি করেন। যুবতী দূর্গার রূপ দেখে, জ্যোতি নিরঞ্জন বলাৎকার করবার চেষ্টা করে, তাই ব্রহ্মকে (জ্যোতিনিরঞ্জনকে) তার সাজা দিয়েছিলেন, যে কি সতলোক থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ও একলক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের প্রতিদিন আহার করতে হবে ও সোয়া লক্ষ মানব প্রতিদিন উৎপন্ন করতে হবে। এখানে তাই সর্ব প্রাণী জন্ম মৃত্যুর কষ্টভোগ করছে। যদি কেউ পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক শব্দ (সত্যনাম জপ মন্ত্র) আমার দ্বারা প্রাপ্ত করবে, তাকে কালের বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে দেব। আমার নাম বন্দী ছোড়। আদরণীয় গরীব দাসজি, নিজের গুরু ও প্রভু কবীর পরমাত্মার আধার রেখে বলছেন, সত্য, মন্ত্র, সত্যনাম ও সারশব্দ কে প্রাপ্তি করো, তাহলে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে যাবে। নয়তো নকল নাম দাতা সাধু বা মহন্তর মিষ্টি মিষ্টি কথায় ফেঁসে শাস্ত্র বিধি ছাড়া সাধনা করে কাল জালের মধ্যে রয়ে যাবে, তারপরে কষ্টের উপর কষ্ট উঠাতে হবে।



কাল লোকে জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্র (হরকট)

।। গরীব দাসজীর মহারাজের বাণী ।।

(সন্ত গ্রন্থ সাহিব পৃষ্ঠা নং 690 থেকে সংগ্রহ)

মায়া আদি নিরঞ্জন ভাই, আপনে যায়ে আপনে খাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চেলা, ওঁ সোহম কা হে খেলা।
শিখর শুন্য যে ধর্ম অন্যায়ী, জিন শক্তি ডায়ন মহল পঠাই,
লাখ গ্রাস নিত উঠ দুতি, মায়া আদি তক্ত কী কুতি।
সবা লাখ ঘড়িয়ে নিত ভান্ডে, হংসা উৎপতি প্রলয় জন্তে।
এ-তিনো চেলা বটপারী, সিরজে পুরুষ। সিরজী নারী
খোখা পুর মে জীব ভুলায়ে, সপ্না বহিস্ত বৈকুণ্ঠ বনায়ে,
যো হরকঠ কা কুঁয়া লই, যা গল বন্ধা হে সব কই।
কিড়ি কুঞ্জর ওর অবতারা, হরকট ডোরী বন্ধে কই বারা,
অরব অলীল ইন্দ্র হে ভাই, হরকট ডোরী বন্ধে সব আই।
শেষ মহেশ গনেশ্বর তাহি, হরকট তোরি বন্ধে সব আহি
শুক্রাদিক ব্রহ্মাদিক দেবা, হরকট ডোরী বন্ধে সব খেবা।
কৌটিক কর্ত্তা ফিরজা দেখা, হরকট ডোরী কহু সুন লেখা,
চতুভূজী ভগবান কহাবে, হরকট ডোরী বন্ধে সব আবে
য়ো হে খোখাপুর কা কুয়া, যা মে পড়া সো নিশ্চয় মুবা।।

জ্যোতিনিরঞ্জন (কালবলী)-র বশ হয়ে এই তিন দেবতা (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) নিজের মহিমা দেখিয়ে জীবকে স্বর্গ নরক তথা ভবসাগরে (লক্ষ চুরাশী যোনীতে) চক্রলাগাতে থাকে। জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের মায়া থেকে নাগিনীর মত জীবকে উৎপন্ন করে ফির মেরে দেয়। যেরকম নাগিনী নিজের লেজ দিয়ে কুন্ডালী বানিয়ে নিজের ফনা দিয়ে মারে। যাতে ডিম ফেটে যায়। পরে তার মধ্যে থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। পরে নাগিনী খেয়ে ফেলে। ফনা মারার সময় কোনো ডিম ফুটে যায় আর সেই ডিম থেকে যে বাচ্চা বের হয় সে সঙ্গে সঙ্গে যদি সাপের কুন্ডলির বাইরে চলে যায় তো সে বেঁচে যায়। কেননা সাপের অনেক ডিম হয়ে থাকে। কুন্ডলির মধ্যে যারা থাকে সে বাচ্চাদের ফনা মেরে মেরেই খেয়ে ফেলে।

মায়া কালী নাগিনী, অপনেজায়ে খাত।
কুন্ডলী সে ছোড়েনহী, সে বাতে কি বাত।।

এই প্রকার হল এই কালবলীর জাল। এইপ্রকারের এই কালবলীর (জ্যোতিনিরঞ্জনের) জাল আছে। এই নিরঞ্জনের ভক্তি যদি পূর্ণ সন্তের থেকে নাম নিয়েও করে তাহলেও এই নিরঞ্জনের কুন্ডলির (একুশ ব্রহ্মান্ডের) বাইরে যেতে পারবে না।

স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, আদি মায়া দূর্গা শেরাবলী ভবানীও নিরঞ্জনের কুন্ডলিতে ফেঁসে আছেন। এ বেচারা অবতার ধারণ করে আর জন্ম মৃত্যুর চক্কর কাটতে থাকে। এখন বিচার কর, সোহম্ জপ যে কি ধ্রুব প্রহ্লাদ ও শুকদেব ঋষিরা জপেছিলেন, তারাও পাড় হতে পারেননি।

কেননা শ্রী বিষ্ণু পুরাণে প্রথম অংশে ১২ অধ্যায় শ্লোক নং ৯৩ তে পৃষ্ঠা ৫১-তে লেখা

আছে যে ধ্রুব কেবল এক কল্প অর্থাৎ একহাজার চতুর্যুগ পর্যন্ত্যই মুক্ত ছিল। এইজন্য কাললোকের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল। ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় মন্ত্র জপ করেন যে ভক্তরা তারা কৃষ্ণ পর্যন্ত্যই ভক্তি করে, তারাও চুরাশী লাখ যোনিতে চক্কর কাটার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি বা পারবেও না। এই পরম পূজ্য কবীর সাহেব ও আদরণীয় গরীবদাস সাহেব মহারাজের বাণী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে।

অনন্ত কোটি অবতার হে, মায়া কে গোবিন্দ।
কর্ত্তা হো হো অবতারে বহুর পড়ে জগ ফন্দ।।

সত পুরুষ কবির সাহেব পরমেশ্বরের ভক্তিতেই জীব মুক্তি পেতে পারে।

যতক্ষণ জীব সতলোকে ফিরে না যাবে ততক্ষণ কাললোকে এই রকম কর্ম করতে থাকবে আর দান পূর্ণ, ধর্ম, শাস্ত্র বিরোধী পূজা করে যে কামাই হবে, তা কেবল স্বর্গরূপী হোটেলে থেকে, পূর্ণ শেষ হয়ে গেলে, আবার স্বর্গ হোটেল থেকে ফিরে এসে চুরাশী লাখ প্রকারের প্রাণীদের শরীরে জন্ম নিয়ে, কালের লোকে চক্কর কাটাতে হবে। মায়া (দূর্গা) থেকে কোটি কোটি গোবিন্দ (ব্রম্মা বিষ্ণু শিব) উৎপন্ন হয়েছে ও মরেছে। এরা সব ভগবান অবতার হয়ে আসে। ফির কর্ম বন্ধনে বেঁধে কর্ম ভোগ করে চুরাশী লাখ যোনিতে চলে যায়। যেমন ভগবান বিষ্ণুকে নারদের অভিশাপ লেগেছিল। সে রামচন্দ্র রূপে অযোধ্যায় এসেছিল। ফির বালীকে বধ করে, রামের কর্ম দন্ডতে ভোগার ফলে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। পরে বালীর আত্মা শিকারীর আত্মা নিয়ে জন্মে দ্বাপরে কৃষ্ণকে বিষাক্ত তীর মেরে প্রতিশোধ নিয়েছিল। মহারাজ গরীব দাসজী নিজের বাণীতে বলেছেন —

ব্রম্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মায়া,ওর ধর্মরায় কহিয়ে।
এই পাঁচো মিলে পরপঞ্চ বনায়া, বাণী হমারী লহিয়ো।
ইন পাঁচো মিল জীব আটকায়ে, যুগল যুগল হম আন ছুটায়ে,
বন্দি ছোড় হমারা নাম, অজর অমর হে অস্থির ঠাম।
পীর পৈগম্বর কুতুব অলিয়া, সুর নর মুনিজন জ্ঞানী
যেতা কো তো রাহ ন পায়া, যম কে বন্ধে প্রাণী।
ধর্মরায় কী ধূমাধামী, যম পর জঙ্গ চলাউ
জোড়া কো তো জান ন দুঙ্গা, বান্ধ আদল ঘর লাউ।
কাল অকাল দোঁহু কো মোসু, মহাকাল শির মুন্ডু
মে তো তক্ত হুজুরী হুকমী, চোর খোঁজ কে ঢুন্ডু।
মুলা মায়া মগ মে বেঠী, হঁন্সা চুন চুন খাই,
জ্যোতি স্বরূপি ভয়া নিরঞ্জন, মে হি কর্ত্তা ভাই
সহস্র অঠাসী দ্বীপ মুনিশ্বর, বন্ধে মূলা ডোরী,
এত্যা মে জমকা তলবানা, চলিয়ে পুরুষ কিশোরী
মুলা কা তো মাথা দাঙ্গু, সতকি মোহর করূঙ্গা।
পুরুষ দ্বীপ কু হন্স চলাউ, দর ন রোকন দুঙ্গা।

হম তো বন্দী ছোড় কহাবা, ধর্মরাই হে চকবৈ,
সতলোক কী সকল সুনাবা, বাণী হমারী অখবৈ।।
নৌ লখ পট্টন উপর খেলু, সাহদরে কিউ রোকু
দ্বাদশ কোটি কটক সব কাটু, হঁস পাঠাউ মোখু।
চৌদহ ভূবন গমন হে মেরা, জল থল মে সরবঙ্গী
খালিক খলক খলক মে খালিক, অবিগত অচল অভঙ্গী
অগর অলিল চক্র হে মেরা, জিত সে হম চল আয়ে
পাঁচো পর প্রবানা মেরা, বন্দি ছুটাবন ধায়ে।
যহা ওঁকার নিরঞ্জন নাহি, ব্রহ্মা বিষ্ণু বেদ নহী জাহি
জহা করতা নহী জান ভগবানা, কায়া মায়া পিন্ড ন প্রাণা
পাঁচ তত্ত্ব তিনো গুণ নাহি, জোরা কাল দ্বীপ নহী জাহি
অমর করু সতলোক পাঠাউ, তাতে বন্দি ছোড় কহাউ।।

কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) এর মহিমা বলার সময়, আদরণীয় গরীব দাস জী বলতেন, আমার প্রভু কবীর (কর্বিদেব) বন্দী ছোড়। বন্দী ছোড়ের ভাবার্থ হল, কালের কারাগার থেকে ছোড়ানে বালা। কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মান্ডতে সর্ব প্রাণী পাপের কারণ বন্দী হয়ে রয়েছেন। পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর সাহেব পাপের বিনাশ করে দিয়ে থাকেন। পাপীর বিনাশ না ব্রহ্ম, না পরব্রহ্ম, না তো ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও করতে পারে দিতে। কেবল যেমন কর্ম তেমনই ফল পারে। এই জন্য যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ এর মন্ত্র ৩২-তে লেখা আছে, 'কবিরংঘারিরসি, কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) পাপের শত্রু, 'বম্ভারিরসি', বন্ধনের শত্রু অর্থাৎ বন্দি ছোড়।

এই পাঁচো (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-আদিমায়া-ব্রহ্মকাল-ধর্মরায়)-জনের উপরে সতপুরুষ পরমাত্মা কবির্দেব আছেন। যিনি সতলোকের মালিক। অতএব সর্ব ব্রহ্ম-পরব্রহ্ম তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও আদি মায়া নাশবান ভগবান। মহাপ্রলয়ের সময় এ সব তথা এদের লোক সমাপ্ত হয়ে যাবে। সাধারণ জীব থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশী বেশী এদের আয়ু। তবে যে সময় তাদের জন্য নির্ধারিত আছে মহাপ্রলয়ের ওদিন অবশ্যই শেষ হবে।

আদরণীয় গরীব মহারাজজী বলেন ঃ-

শিব ব্রহ্মা কা রাজ, ইন্দ্র গিনতী কহা,
চার মুক্তি বৈকুন্ঠ সমঝ যেতা লমথা সংখ জুগন কী জুনি,
উম্র বড় ধারিয়া, জা জননী কুরবান,
সু কাগজ পারিয়া যেতি উমর বুলন্দ মরে গা।
অন্তরে, সতগুরু লগে না কান, ন ভেটে সন্ত রে।।

সংখ যুগের আয়ূ চায় যতই লম্বা হোক না কেন, একদিন সমাপ্ত অবশ্যই হবে। যদি সতপুরুষ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর সাহেবের প্রতিনিধি, পূর্ণ সাধু (গুরু) যে তিন নামের মন্ত্র (যেমন **ওঁ + তৎ + সৎ সাংকেতিক**) দেন তথা তাহার যদি পূর্ণ গুরু দ্বারা নাম দান করার আদেশ থাকে, তার কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে নামের কামাই করলে, তবে আমরা সতলোকের অধিকারী হাঁস হতে পারব। সত্য সাধনা ছাড়া অনেক লম্বা আয়ূ কোনো কাজে আসে না, কেননা নিরঞ্জন লোকে দুঃখই দুঃখ।

কবীর, "জীবনা তো থোরাই ভালা, জৈ সত সুমরণ হই
লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখৈ ধরে না কই।।"

কবীর সাহিব নিজের (পূর্ণব্রহ্মের) সংবাদ নিজেই দিয়েছেন। যেকি এই পরমাত্মাদের উপরে অসংখ্য হাতয়ালা (ভূজায়ালা) পরমাত্মা সতপুরুষ আছেন, যিনি সত্যলোক (সত্যখন্ড, সতধাম)-এতে থাকেন। তার অন্তরগত সর্বলোক ব্রহ্ম(কাল)-র ২১ ব্রহ্মান্ড, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব শক্তির লোক তথা পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মান্ড এবং অন্য সব ব্রহ্মান্ড আছে। সেখানে সতনাম-সারনামের জপের দ্বারা যাওয়া যায় যে কিনা পূর্ণ গুরুর দ্বারাই সেই নাম প্রাপ্ত হবে। সত্যখন্ড (সতলোক)-এ যে আত্মা চলে যায় তার পুনর্জন্ম হয় না। সতপুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) কবীর সাহেব (কবীর দেব)-ই অন্য লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামেতে বিরাজমান আছেন। যেমন অলখ লোকে অলোক পুরুষ, অগম লোকে অগম পুরুষ, তথা অকহ লোকে অনামীপুরুষ রূপে বিরাজমান। এ তো উপমাত্মক নাম। পরন্তু বাস্তবিক নাম ওই পূর্ণ পুরুষের কবির্দেব (ভাষাভিন্ন হয়ে কবীর সাহেব) হয়েছে।

।। আদরণীয় নানক সাহেবের অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনার সংকেত ।।

শ্রী নানক সাহেবের অমৃতবাণী, মহলা ১ রাগ বিলাবুল অংশ ১ (গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৮৩৯)

আপে সচু কিয়া কর জোড়ি। অন্ডজ ফোড়ি জোড়ি বিছোড়
ধরতী আকাশ কীয়ে বৈসন কউ থাউ। রাতি দিনন্তু কিয়ে ভউ ভাউ।
জিন কিয়ে করি বেখন হারা (৩)
ত্রিতীয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশা, দেবী দেব উপায় বেসা (৪)
পউন পানী অগনী বিসরাউ। তাহি নিরঞ্জন সাচো নাউ
তিসু মহি মনুয়া রহিয়া লিব লাই। প্রনবতি নানকু কানুন খাই।। (১০)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ এই যে, সত্য পরমাত্মা (সতপুরুষ) স্বয়ংই নিজের হাতে সমস্ত সৃষ্টির রচনা করেছেন। তিনি ডিম বানিয়েছিলেন, পরে ভেঙে গিয়েছিল তার থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বেরিয়েছিল। ওই পূর্ণ পরমাত্মা সর্ব প্রাণীদের থাকার জন্য পৃথিবী, অগ্নি আকাশ, পবন, জল আদি পাঁচ তত্ত্ব রচেছেন। নিজের দ্বারা সৃষ্টি রচনার নিজেই সাক্ষী সেই জন্য অন্য কেউই এর সম্পূর্ণ জানকারী (খবর) দিতে পারে না বা পারবেও না। ডিম ভেঙে যাবার পর নিরঞ্জন বেরিয়েছিল, এর পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়েছে, এবং অন্য দেবী দেবতারও উৎপন্ন হয়েছে, আরও অনগিনত (অগণিত) জীবের উৎপত্তি হয়েছে। তারপরে অন্য দেবদের জীবন চরিত্র তথা অন্য ঋষিদের অনুভবের ছয় শাস্ত্র ও আঠারো পুরাণ তৈরী হয়েছে। পূর্ণ পরমাত্মার সচ্চা নাম (সত্যনাম) -এর সাধনা অনন্য ভক্তি মন দিয়ে করলে ও গুরুর মর্যাদা পালন করে চলা (ভক্ত)কে গুরু নানক জী বলে থাকেন, কাল তাকে খায় না।

রাগ মারু (অংশ) অমৃত বাণী মহলা ১(গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ১০৩৭)

সুনহু ব্রহ্মা, বিসনু, মহেসু উপায়া, সুনে বরতে যুগ সবাই
ইসু পদ বিচারে সো জনু পুরা। তিস মিলিয়ে ভরসু চুকাইদা। (৩)
সামবেদু, রগু, জুজরু অথরবনু। ব্রহমে মুখ সাইয়া হে ত্রৈগুন,
তাকি কিমন কহি ন সকে। কো তিন বোলে জিউ বুলাইদা। (৯)

উপরোক্ত অমৃত বাণীর ভাবার্থ হল, যে সন্ত পূর্ণ সৃষ্টি রচনা কথা শোনাবেন তথা বলতে পারবেন যে ডিম দুভাগ হওয়ার পরে কে বেরিয়েছিল, যে পরে ব্রহ্মলোকের শূন্যে অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব-এর উৎপত্তির কথা তথা ও পরমাত্মা কে, যিনি ব্রহ্ম(কাল)-এর মুখ দিয়ে চারি বেদ (পবিত্র ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ) উচ্চারণ করিয়েছিলেন ওই পূর্ণ পরমাত্মা যেমন ইচ্ছা হয়, তেমনই প্রত্যেক প্রাণীকে বলিয়ে থাকেন। এই সমস্ত জ্ঞান সম্পূর্ণ বলতে পারে, যদি তাকে পেয়ে যাও এবং সমস্ত শঙ্কাগুলি নিবারণ করতে পারে, সেই হল পূর্ণ সন্ত (গুরু) অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী।

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৯২৯ অমৃতবাণী শ্রী নানক সাহেবের রাগ রামকলী মহলা ১ দখনী ওঁকার

ওঁ-কারী ব্রহ্মা উৎপত্তি। ওঁকারু, কীয়া জিনি চিত।
ওঁ-কারি সৈল যুগ ভয়ে। ওঁ-কারি বেদ নিরমন।
ওঁ-কারী সবদি উধরে। ওঁ-কারী গুরু মুখে তরে।
ওনম অখর সুনহু বিচারু। ওনম অখরু ত্রিভবন সারু।

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে শ্রী নানক সাহেব বলছেন, ওঁ কার অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে। কয়েক যুগে মস্তি মেরে ওঁ-কার (ব্রহ্ম)-বেদের উৎপত্তি করেছেন, যা কিনা কেবল ব্রহ্মাকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই তিন লোকের ভক্তি কেবল ওঁ মন্ত্রই বাস্তবে জপ করতে হয়। এই ওঁ শব্দ পুরো সন্ত (গুরু) থেকে উপদেশ নিয়ে অর্থাৎ গুরু ধারণ করে জপ করলে উদ্ধার হয়।

বিশেষ ঃ- শ্রী নানক সাহেব তিনই মন্ত্র **(ওঁ + তৎ + সৎ)**-এর স্থানে স্থানে রহস্যাত্মক বিবরণ দিয়েছেন। সেটা কেবল পূর্ণ সন্ত (তত্বদর্শী গুরু)-ই বুঝতে পারবেন এবং তিনো মন্ত্রের জপের সার উপদেশও বুঝিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

(গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ১০৩৮)

উত্তম সতি গুরু পুরুষ নিরালে, সবদি রতে হরি রস মত বালে,
রিধি, বুধি, সিধি, গিয়ান গুরু তে পায়ে, পুরে ভাগ মিলাইদা (১৫)
সতি গুরু তে পায় বীচারা, সুন সমাধি সচে ঘরবারো,
নানক নিরমল নাদু সবদ ধুনি, সচু রামৈ নামি সমাইদা (১৭)।। ৫।।১৭।।

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল যে, বাস্তবিক জ্ঞান দেওয়ার সৎগুরু তো আলাদাই সে কেবল নাম জপকে জপতে থাকে, অন্য হঠযোগ সাধনা বলেন না। যদি কেউ ধন, দৌলত, পদ, বুদ্ধি, ভক্তি, শক্তি যা কিছু প্রয়োজন, তা ওই ভক্তি মার্গের জ্ঞান পূর্ণ গুরুই সম্পূর্ণ প্রদান করে থাকে। এইরকম পূর্ণ সন্ত বড় ভাগ্যের ফলেই পাওয়া যায়। ওই পূর্ণ গুরু বিবরণ বলে দেবে যে উপর শূন্য (আকাশ)-তে আমাদের নিজের বাস্তবিক ঘর (সত্যলোক) পরমেশ্বর রচনা করে রেখেছেন।

সেখানে এক বাস্তবিক সার নামের ধুন (আওয়াজ) হতে থাকে। ওই আনন্দে অবিনাশী পরমেশ্বরের সার শব্দতে সমায়ে যায়। অর্থাৎ ওই বাস্তবিক সুখদাই স্থানে বাস করা যায়, তবে অন্য নাম ও অধুরা গুরু দ্বারা এসব সম্ভব হবে না।

(আংশিক অমৃত বাণী মহলা গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৬০)

সিব নগরী মহি আসনি বেসু কলপ ত্যাগী বাদং (১)
সিঙি সবদ সদা ধুনি সোহৈ অহিনিসি পুরে নাদং (২)
হরি কীরতি রহ রাশি হমারী গুরু মুখ পন্থ অতীত (৩)
সগলি জোতি হমারি সম্মিয়া নানা বরণ অনেকং
বহু নানক শুনি ভরথরী যোগী পারব্রহ্ম লিব একং। (৪)

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে ভাবার্থ বুঝাচ্ছে, নানক সাহেব বলছেন, ভরথরী যোগীজি আপনার সাধনা কেবল ভগবান শিব পর্যন্ত্য, তাহা আছে তারজন্য আপনার শিব নগরী লোকে স্থান হয়েছে, আর শরীরে যে শিঙ্গী শব্দাদি ধবনি হচ্ছে ও তো এই পদ্ম (কমল)-এর। যেমন টিভির মত প্রত্যেক দেবের লোক থেকে শরীরের ভিতরে শোনা যায়।

আমি তো কেবল এক পরমাত্মা পরব্রহ্ম অর্থাৎ যিনি সর্বোচ্চ স্থানের উপরে যে পূর্ণ পরমাত্মা আছেন, সেই পরমাত্মার উপর মনকে লাগিয়ে রাখি। আর আমি তো এক পরমাত্মা যিনি সবার উপরে পূর্ণ পরমাত্মা আছেন তাকে অনন্য মন লাগিয়ে থাকি। আমি উপরী দেখানো, যেমন ভস্ম ডান্ডা লাগিয়ে (লাঠি) কাছে রাখিনা। আমি তো সর্ব প্রাণীকে এক পূর্ণ পরমাত্মার সন্তান মনে করি। কেননা তার দ্বারাই সৃষ্টির সমস্ত শক্তিই চলায়মান। আমার পুঁজি হল সত্য নাম জপ গুরু থেকেই প্রাপ্ত করা আর ক্ষমা করা হল আমার বেশভূষা। আমি তো পূর্ণ পরমাত্মার উপাসক, পূর্ণ সৎ গুরুর ভক্তি মার্গ (পথ) এর থেকে আলাদা।

।। অমৃতবাণী রাগ আসা মহলা ১ (গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৪২০)।।

।। আসা মহলা।।

জিনী নামু বিসারিয়া দুজৈ ভরমি ভুলাই।
মুলু ছোড়ি ডালি লগে কিয়া পাবহি ছাই।।১।।
সাহিবু মেরা একু হে, অবরু নাহি ভাই।
কৃপাতে সুখু পাইয়া সাচে পরথাই।।৩।।
গুর কী সেব সো করে জিসু আপি করায়।
নানক সিরু দে ছুটিয়ে দরগহ পতি পায় ।।৪।।১৮।।

উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ হল, শ্রী গুরু নানক সাহেব বলছেন, যে পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম ভুলে, অন্য ভগবানের নাম জপ ভ্রমেতে জপছে, সে তো এমন করছে যে কি, মূল (পূর্ণ পরমাত্মা)-কে ছেড়ে ডাল রুপী (তিন গুণরূপ রজগুণ-ব্রহ্ম, সতোগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) কে পূজা করছে। কারণ ওই সাধনায় কোন সুখ নেই বা হতে পারে না। যদি মূলে জল না ঢেলে ডালে ঢালা হয় তাহলে সে গাছ শুকিয়ে যায়, অতএব সে গাছ থেকে ছায়া কোনদিন পাবে না। শাস্ত্রবিধির বাইরে সাধনা করা ব্যর্থ প্রয়ন্ত করা এতে কোন লাভ হয় না। এই প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ তে আছে। ওই পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে হলে মনমানী সাধনা বৃথা সাধনা ত্যাগ কর, পূর্ণ গুরুদেবের কাছে সমর্পণ করলে ও সত্যনামের জপেতেই মোক্ষ সম্ভব। নয়তো মৃত্যুর পরে নরকেই যাবে।

।। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৮৪৩-৮৪৪ ।।

।। বিলাবলু মহলা ১ ।।

মে মন চাহু ঘনা সাচি বিগাসি রাম। মোহী প্রেম পিরে প্রভু অবিনাশী রাম।।
অবিগত হরি নাথু নাথহ তিসৈ ভাবৈ সো থীয়ে।
কিরপালু সদা দয়ালু দাতা জিয়া অন্দরী তু জিয়ে।
মে আধারু তেরা তু খসমু মেরা মে তানু তকিয়া তেরয়ো।
সাচি সুচা সদা নানক গুরসবদি ঝগরু নিবেরয়ো।। ৪।। ২।।

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে শ্রী নানক সাহেব বলছেন, অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা নাথেরও নাথ অর্থাৎ দেবদেরও দেব (সব প্রভুদের যেমন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মও পরব্রহ্মেরও নাথ আছেন বা স্বামী আছেন)। আমি তো সত্য নামকে হৃদয়ে সমিয়ে রেখেছি। হে পরমাত্মা! সব প্রাণীদের জীবন আধারও তুমি। আমি আপনার আশ্রিত আছি, আপনি আমার মালিক। আপনি গুরু রূপে এসে সত্য ভক্তির নির্ণায়ক জ্ঞান দিয়ে সমস্ত ঝগড়াই মিটিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সর্ব শঙ্কার সমাধান করে দিয়েছেন।

।। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ৭২১ রাগ তিলঙ্গ মহলা ১ ।।

এক অর্জ গুফতম্ পেশ তো দর কুন করতার
হক্কা কবীর করীম তু বেয়ব পরবরদিগার
নানক বুগোয়দ জন তুরা তেরে চাকরাং পাখাক।।

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, (হক্কা কবীর) আপনি সতকবীর (কুন করতার) শব্দ শক্তিতে রচনা করা শব্দস্বরূপী প্রভু অর্থাৎ সর্ব সৃষ্টির রচন হার আছেন আপনিই বেএব নির্বিকার (পরবরদিগার) সবার পালন কর্ত্তা দয়ালু প্রভু, আমি আপনার দাসেরও দাস আছি।

।। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ২৪, রাগ সীরী মহলা ১ ।।

তেরা এক নাম তারে সংসার। মে ইহা আস এহো আধার
নানক নীচ কহে বিচার, ধানক রূপ রহা করতার।।

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কিনা কাশীতে তাঁতীর ঘরে তাঁতীর বেশে (ধানক/তাঁতী) এই করতার কুলের সৃজনহার আছেন। গুরুনানকজী পরমেশ্বর কবীরের অধীন হয়ে বলছেন যে, আমি সত্যিকরে বলছি ওই তাঁতীর বেশে যিনি ইনিই পূর্ণ ব্রহ্ম, কাশীতে তাঁতীর রূপ ধারণ করে রয়েছেন (সতপুরুষ)।

বিশেষ ঃ- উপরোক্ত প্রমাণে সাংকেতিক জ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয়েছে সৃষ্টি রচনা কেমন ভাবে হয়েছিল? এখন পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি করার দরকার। এই পূর্ণ সন্ত (গুরুর)-র কাছ থেকে নাম নিলেই তাহা সম্ভব।

।। অন্য গুরু (সন্ত)-এর দ্বারা সৃষ্টি রচনার দন্ত কথা।।

অন্য গুরু (সন্ত) দ্বারা সৃষ্টি রচনার জ্ঞান বলেছেন তা কিরকম? কৃপা করে নিম্নে পড়েন ঃ- সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাধা স্বামী পন্থের গুরু ও ধন-ধন-সতগুরুর পন্থের গুরু (সন্ত)-এর **বিচার ঃ-** পবিত্র পুস্তক জীবন চরিত্র পরম সন্ত বাবা জয়মল সিং মহারাজ পৃষ্ঠা নং ১০২-১০৩ থেকে "সৃষ্টি রচনা" (সাবন কৃপাল পবিলকেশন, দিল্লি)

প্রথমে সতপুরুষ নিরাকার ছিলেন তারপর ইজহার (আকার)-এ এসে উপরে তিনি নির্মল মন্ডল (সতলোক, অলখলোক, অগমলোক) হয়ে গিয়েছে তারপর মন্ডল, ও তার ধবনি (নাদ) হয়ে গিয়েছে।

পবিত্র পুস্তক সারবচন (নসর) প্রকাশক ঃ- রাধা স্বামী সতসঙ্গ সভা, দয়াল বাগ আগরা (সৃষ্টির রচনা) পৃষ্ঠা নং ৮১

প্রথম ধুন্ধুকার ছিল। সেখানে পুরুষ শূন্য সমাধে ছিল। তখন কিছু রচনা হয়নি। পরে যখন মৌজ হয়েছে তখন শব্দ প্রকট হয়েছে আর পরে সব সৃষ্টি হয়েছে, আগে সতলোক ও পরে সত পুরুষের কলা থেকে লোক ও সব কিছু হয়েছে। এই জ্ঞান এইরকম, যেমন এক সময় একটা ছেলে চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য সাক্ষাৎকারে গিয়েছে, অধিকারী জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি মহাভারত পড়েছেন ? ছেলে বালক উত্তর দিয়ে বলছে আঙুলের উপর গুণে রেখেছি, অধিকারী ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, পঞ্চ পান্ডবের নাম বলো ? সে উত্তর দিচ্ছে, এক ভীম ছিল, আর তার এক বড় ভাই ছিল, একটা ভাই তার থেকে ছোট ছিল, একটা আরও ছিল, আর এক জনের নাম ভুলে গিয়েছি। উপরের সৃষ্টি রচনার জ্ঞান ঠিক এইরকম।

সতপুরুষ ও সতলোকের মহিমা বলা ও পাঁচ নাম (ওঁ-কার-জ্যোতি নিরঞ্জন-ররকার-সোহং-সত্যনাম) দেওয়া লোক এবং তিন নাম (অকালমূর্ত্তি-সতপুরুষ-শব্দ-সরূপী রাম) দেওয়া গুরু দ্বারা রচনা করা পুস্তক থেকে কিছু নিষ্কর্ষ ঃ-

সন্তমন্ত প্রকাশ ভাগ ৩ পৃষ্ঠা ৭৬-তে লেখা আছে যে 'সচ্চখন্ড বা সতনাম চতুর্থলোকে' আছে। অতএব এখানে সতনামকে স্থান বলছে। আবার এই পবিত্র পুস্তকে পৃষ্ঠা নং ৭৯-তে লেখা আছে যে, একরাম হল দশরথের ছেলে, দ্বিতীয় রাম হল মন, তৃতীয় রাম ব্রহ্মএবং চতুর্থ রাম আছে সতনাম, এইটাই হল আসল রাম। আবার পবিত্র পুস্তক সন্তমন্ত প্রকাশ প্রথমভাগ পৃষ্ঠ নং ১৭-তে লেখা আছে যেকি, ওটাই 'সতলোক আছে, তাকেই সতনাম বলা হয়ে থাকে। পবিত্র পুস্তক 'সার বচন নসর যানি বার্তিক' পৃষ্ঠ নং ৩-তে লেখা আছে যে এখন বোঝা উচিৎ যেকি, রাধাস্বামী পদ সব থেকে উচ্চস্থানে আছে। এখন বিচার করা উচিৎ যাকে কিনা সন্তেরা সতলোক, সচ্চখন্ড, সারশব্দ, সতশব্দ, সতনাম ও সতপুরুষের নাম দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে। 'পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর) আগরা থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠ নং ৪-তেও উপরোক্তের মত বর্ণন করা আছে। পবিত্র পুস্তক 'সচ্চখণ্ডের সড়ক' পৃষ্ঠ নং ২২৬-তে 'সন্তের দেশ সচ্চখণ্ড বা সতলোক আছে; তাকেই সতনাম সতশব্দ ও সারশব্দ বলা হয় এমন বলছে।

বিশেষ ঃ- উপরোক্ত ব্যাখ্যা এমন মনে হচ্ছে, যেন যেমন কোন একব্যক্তি জীবনে কোনদিন শহর দেখেনি, গাড়ীও দেখেনি, পেট্রোলও দেখেনি। ড্রাইভার কাকে বলে তাহাও জানেনা। ওই ব্যক্তি অন্য সাথীদের বলছে আমি শহরে যাই, গাড়ীতে বসে আনন্দ অনুভব করি। এই শুনে সাথীরা বলছে, গাড়ী কেমন ? পেট্রোল, ড্রাইভার ও শহর কেমন ? আবার তখন যাকে বলে ও তাই ওই ব্যক্তি জবাবে বলছে, শহর বলো বা কার (গাড়ী) বলো সব একই রকম কথা। শহর ওই গাড়ি, তথা পেট্রোল ও গাড়িকেই বলে, আর ড্রাইভার ওই গাড়ীকেও বলা যায় এবং রাস্তাকেও গাড়িই বলা হয়।

এখন বিচার করেন ঃ- সতপুরুষ তো পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা আছেন, সতনাম হল দুই মন্ত্রের নাম, যেমন এক **ওঁ + তৎ** সংকেত ভাব তথা এর পরে সারনাম সাধককে পূর্ণ গুরুর দ্বারাই দেওয়া হয়ে থাকে। এ সতনাম ও সারনাম এই দুটোই নাম স্মরণ করতে হয়। সতলোক ওই স্থান আছে যেখানে সতপুরুষ থাকেন। পুণ্য আত্মারা আপনারা স্বয়ংই নির্ণয় করেন সত্য ও অসত্য কোনটা ?

।। কে এবং কিরকম সেই কুলের মালিক?।।

যে যে পুণ্য আত্মারা পরমাত্মাকে পেয়েছেন বা প্রাপ্ত হয়েছেন, উনরাই বলেছেন যেকি কুলের মালিক একই জন। তিনি মানব সদৃশ তেজোময় শরীর যুক্ত। যার এক রোমকূপের প্রকাশ কোটি সূর্য ও কোটি চন্দ্রমায়ের রশ্মি থেকেও অধিক। তার অনেক রূপ, পরমেশ্বরের বাস্তবিক নাম নিজ নিজ ভাষাতে কবির্দেব (বেদেতে সংস্কৃত ভাষায়) তথা হক্কা কবীর (শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ৭২১ পর ক্ষেত্রিয় ভাষাতে) তথা সৎ কবীর (শ্রী ধর্মদাসজীর বাণীতে ক্ষেত্রিয় ভাষায়) তথা বন্দী ছোড় কবীর (সন্ত গরীব দাসজীর সদগ্রন্থে ক্ষেত্রীয় ভাষায়) কবীরা, কবীরন্ ও খবীরা বা খবীরন্ (শ্রী কুরান শরীফ সুরত ফুর্কানি নং ২৫ আয়ত নং ১৯, ২১, ৫২, ৫৮, ৫৯-তে ক্ষেত্রিয় আরবী ভাষাতে) এই পূর্ণ পরমাত্মার উপমাত্মক নাম অনামী পুরুষ, অগম পুরুষ, অলখ পুরুষ, সত পুরুষ, অকাল মূর্তি, শব্দ স্বরূপী রাম, পূর্ণ ব্রহ্ম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম আদি নাম আছে যেমন দেশের প্রধান মন্ত্রির বাস্তবিক শরীরের নাম কিছু হয়ে থাকে তথা উপমাত্মক নাম প্রধান মন্ত্রী/প্রাইম মিনিস্টার এমন হয়ে থাকে। যেমন ভারত দেশের প্রধান মন্ত্রী নিজের কাছে গৃহ বিভাগ রাখেন, যখন ওই বিভাগের নামের অক্ষরের উপর ওই গৃহ বিভাগের স্ট্যাম্প থাকে এই ভাবে গৃহ বিভাগের ভূমিকা করে থাকেন। তার নিজের পদে গৃহমন্ত্রী লিখে বা স্ট্যাম্পের মাধ্যমে পদের পরিচয় হয়ে থাকে। ঠিক ওই রূপ ঈশ্বরের সত্বা বুঝতে হবে।

যে সন্ত বা গুরু ঋষিদের পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়নি, তাদের অন্তিম অনুভব বলেছেন যে কি প্রভুর কেবল প্রকাশ দেখা যেতে পারে প্রভু দেখা যায় না, কেননা তার কোনো আকার নেই, শরীরে ধ্বনি শোনা আদি প্রভু ভক্তির উপলব্ধি।

এখন বিচার করা হোক ঃ- যেমন এক অন্ধ গুরু মনে মনে সিদ্ধ করে ভেবে আর এক অন্ধ শিষ্যকে, বলছে রাতে চন্দ্রমার রশ্মি খুব সুন্দর মনকে একদম্ প্রফুল্ল করে দেবার মত, আমি দেখতে পাচ্ছি। অন্য অন্ধ শিষ্য বলছে গুরুজি চন্দ্রমা কেমন? গুরু অন্ধ বলছে চন্দ্রমা নিরাকার ও কি দেখা যায় নাকি? কেউ বলে সূর্য নিরাকার ও দেখা যায় না, রবি সপ্রকাশিত তাই তার প্রকাশ দেখা যায়। গুরুর কথা শুনে, সেই অনুসারে শিষ্য আড়াই ঘন্টা সকালে ও আড়াই ঘন্টা সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। নিজেই বিচার বিমর্শ করে যে কি গুরু তো ঠিক বলছিল, আমার সাধনা পুরো আড়াই ঘন্টা সকালে সন্ধ্যায় হচ্ছে না। এইজন্য আমি সূর্য ও চন্দ্রমার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি না। চতুর গুরুর ব্যাখ্যার পর আধারিত হয়ে ওই চতুর অন্ধের জ্ঞানহীন ব্যাখ্যা প্রচারক কোটি কোটি ব্যক্তি অন্ধ জ্ঞানহীন হয়ে গিয়েছে। তারপর তাকে আঁখো বালা (সচক্ষে দেখতে পায়) মানে (তত্ত্বদর্শী) গুরু বলেছে যে কি সূর্য আকারে আছে তার থেকেই প্রকাশ বের হয়ে থাকে। এই প্রকার চন্দ্রমা থেকে প্রকাশ বের হচ্ছে নেত্রহীনরা! চন্দ্রমা বিনা রাত্রি প্রকাশ কিভাবে হতে পারে? যেমন কেউ যদি বলে টিউব লাইট দেখেছি, আবার কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে টিউব লাইট কেমন হয় যা আপনি দেখেছেন?

উত্তর মেলে যে টিউব লাইট তো নিরাকার তাই দেখা যায় না। কেবল প্রকাশ দেখা যায় বা যেতে পারে।

বিচার করুন ঃ- টিউব লাইট নিরাকার বলছে তবে প্রকাশ কিভাবে দেবে?

যদি কেউ বলে হীরা স্বপ্রকাশিত হয়ে থাকে। আরও যদি বলে হীরার কেবল প্রকাশ দেখা যেতে পারে কেননা হীরা তো নিরাকার ওকি দেখা যায় নাকি? কেননা সে ব্যক্তি হীরা পরিচিত নাই, ফোকটে স্বর্ণকার হয়েছে। যে পরমাত্মাকে নিরাকার বলে আর প্রকাশ দেখা ও ধবনি শুনে যদি ভগবান প্রাপ্তি মেনে থাকে সে তাহলে বুঝবে পূর্ণ রূপে প্রভু ও ভক্তি থেকে অপরিচিত। যখন এই কথায় ওই গুরুদের সামনে বলা হয়েছে যে, আপনারা কিছুই দেখুননি এই সব অনুযায়ীদের কেনো ভ্রমিত করে নিজে দোষী হচ্ছেন? অনুযায়ীদের বলা হয়েছিল না তো আপনাদের গুরুদেবের তত্ত্বজ্ঞান রূপী নেত্র আছে আর না আছে আপনাদের। এইভাবে দুনিয়াকে ভ্রমিত করোনা। এই কথায়, সর্ব জ্ঞান রূপী নেত্র অন্ধরা বলে উঠেছে, আমরা সব মিথ্যা আর তুমিই এক সত্যবাদী। আজ ওই পরিস্থিতি সন্ত (গুরু) রামপাল জীমহারাজের সাথে হয়েছে।

এই বিবাদের নির্ণয় কিভাবে হতে পারে, কোন্ গুরুর বিচার ঠিক, আর কোন গুরুর বিচার সঠিক নয়? মেনে নেন, কোনো অপরাধের বিষয়ে পাঁচ উকিল নিজের নিজের বিচার ব্যক্ত করছে। একজন বলেন এই অপরাধে সংবিধানে ৩০১ হতে পারে দ্বিতীয় উকিল বলেন ৩০২ , তৃতীয় বলেন ৩০৪ চতুর্থী বলেন ৩০৬ তথা পাঁচ নং উকিল বলেন ৩০৭ই সঠিক হতে পারে।

তবে এই পাঁচ উকিলের কথা ঠিক হতে পারে না। কেবল এক উকিলেরই কথা ঠিক হবে, যদি তার ব্যাখ্যা নিজের দেশের পবিত্র সংবিধানের সাথে মিলে থাকে। যদি তার ব্যাখ্যাও সংবিধানের বিপরীত তাহলে পাঁচটা উকিলই ভুল। এর নির্ণয় পবিত্র সংবিধান করবে, যে সর্ব মান্য যোগ্য হয়ে আছে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বিচার ধারাতে তথা সাধনা থেকে কোন্ শাস্ত্র অনুকূল এবং কোন্ শাস্ত্র অনুকুল এবং কোনটা শাস্ত্রের বিরুদ্ধ? এর নির্ণয় পবিত্র সদ্‌গ্রন্থই করবে, যাহা সবার মান্য যোগ্য শাস্ত্র (এই প্রমাণ পবিত্র শ্রীমদভাগবত গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩-২৪ তে)।

কয়েকজন সন্তেরা যারা সূর্য (পূর্ণ পরমাত্মা) কে দেখেছেন তাদের কয়েক জনের (সন্তের) নাম নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

(ক) আদরণীয় ধর্মদাস সাহেব (খ) আদরণীয় দাদু সাহেব (গ) আদরণীয় মূলুক দাস সাহেব (ঘ) আদরণীয় গরীব দাস সাহেব (ঙ) আদরণীয় নানক সাহেব (চ) আদরণীয় ঘীসা দাস সাহেব আদি।

(ক) আদরণীয় ধর্মদাস সাহেব, বান্ধবগঢ় মধ্যপ্রদেশয়ালা, যাহাকে পরমাত্মা জীবন্ত মহাত্মারূপে মথুরাতে মিলেছিলেন এবং সতলোক দেখিয়ে এনেছিলেন। ওই সতলোকে দুই রূপ দেখিয়ে জীবন্তবালা রূপে পূর্ণ পরমাত্মায়ালা সিংহাসনে বিরাজমান হয়েছিলেন। আদরণীয় ধর্মদাস মহারাজকে বলেছিলেন, আমিই কাশী (বেনারসে)-তে নীরুনীমার ঘরে গিয়েছি। সেখানে ধানকে (তাঁতী)-র কাজ করি, আদরণীয় রামানন্দ আমার গুরু জী। এই বলে শ্রীধর্মদাসজীর আত্মাকে ফিরিয়ে শরীরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রী ধর্মদাসজীর শরীর দুইদিন বেহুঁশ অবস্থায় ছিল, তিনদিনের দিন হোঁশে এসেছিলেন তারপর কাশীতে খোঁজ করে পাওয়া গিয়েছিল। ওই কাশীতে তাঁতীর ঘরে পূর্ণ পরমাত্মা (সতপুরুষ) ছিলেন। আদরণীয় ধর্মদাস সাহেব পবিত্র কবীর সাগর, কবীর সাখী, কবীর বীজক নামক সদগ্রন্থে নিজের চোখে দেখে, পূর্ণ পরমাত্মার পবিত্র মুখ কমলের বচন রূপী শব্দ দ্বারা অমৃত বচন রচনায় প্রমাণ করিয়ে গিয়েছেন।

আজ মোহে দর্শন দিও জী কবীর।। টেক।।
সত্য লোক সে চল কর আয়ে, কাটন যম কী জঞ্জীর।। ১।।
থারে দর্শন সে মোর পাপ কটত হে, নির্মল হৌবে জী শরীর।। ২।।
অমৃত ভোজন স্থারে সদগুরু জী মৈ শব্দ দুধ কী খীর।। ৩।।
হিন্দু কে তুম দেব কহায়ে, মুসলমান কে পীর।। ৪।।
দোনো দীন কা ঝগড়া ছিড় গয়া, টোহে না পায়ে শরীর।। ৫।।
ধর্মদাস কি অর্জ গোসাই, বেড়া লগাইও পরলে তীর।। ৬।।

(খ) আদরণীয় দাদু সাহেব (অমৃত বাণীতে প্রমান) কবীর পরমেশ্বরের সাক্ষী ঃ-

আদরণীয় দাদু সাহেব যখন সাত বৎসরের বালক ছিলেন তখন পূর্ণ পরমাত্মা জীবন্ত মহাত্মা রূপে মিলেছিলেন, এবং সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনদিন পর্যন্ত দাদু সাহেব বেহুঁশ ছিলেন। হোঁশে এসে পরমেশ্বরের মহিমা নিজের চোখে দেখে অমৃত বাণীতে অনেক কিছু উল্লেখ করে গেছেন ঃ—

জিন মোকু নিজ নাম দিয়া, সোই সতগুরু হমার।
দাদু দুসরা কই নহি, কবীর সৃজনহার।।
দাদু নাম কবীর কী, জৈ কই লেবে ওট।
উনকো কবহু লাগে নহী, কাল বজ্র কী চোট।।
দাদু নাম কবির কা সুনকর কাপে কাল।
নাম ভরসা জো নর চলে, হোবে ন বক্তাঁ বাল।।
জো জো স্মরণ কবীর কী, তব গয়ে অনন্ত অপার।
দাদু গুণ কীতা কহে, কহতন আবে পাড়।।
কবীর কর্ত্তা আপ হে, দুজা নাহি কই।
দাদু পুরণ জগৎ কো ভক্তি দৃঢ়াবত সোই।।
ঠেকা পুরণ হোই জব, সব কই তজে শরীর।
দাদু কাল গঁজে নহী, জপে জো নাম কবীর।।
আদমি কি আয়ূ ঘটে, তব জম ঘেরে আয়।
সুমিরন কিয়া কবীর কা, দাদু লিয়া বচায়।।
মেটি দিয়া অপরাধ সব, আয় মিলে ছন্ন মাই ।
দাদু সঙ্গ লে চলে, কবির চরণকী ছাই।।
সেবক দেব নিজ চরণ কা, দাদু আপনা জান।
ভৃঙ্গী সত্য কবীরনে, কীন্হা আপ সমান।।
দাদু অন্তরগত সদা, ছিন ছিন সুমিরন ধ্যান।
বারু নাম কবীর পর, পল, পল মেরা প্রাণ।।
সুন সুন সাখী কবীরকী, কাল নবাবৈ ভাথ।
ধন্য ধন্য বো তিন লোকমে, দাদু জোড়ে হাত।।
কেহরী নাম কবীর কা, বিষমকাল গজরাজ।

দাদু ভজন প্রতাপতে, ভাগে শুনত আবাজ।।
পল এক নাম কবীর কা, দাদু মনচিৎ লায়।
হস্তী কে অশ্বার কো, শ্বান কাল নহী খায়।।
সুমরত নাম কবীরকা। কটে কাল কী পীর।
দাদু দিন দিন উঁচে পরমানন্দ সুখ সীর।।
দাদু নাম কবীরকী, জো কই লেবে ওট।।
তিনকো কবহুঁ না লগই, কাল বজ্র কী চোট।।
ওর সন্ত সব কুপ হে, কেতে ঝরিতা নীর।
দাদু অগম অপার হে, দরিয়া সত্য কবীর।।
অবহী তেরী সব মিটে, জন্ম মরণ কী পীর।
শ্বাস উশ্বাস সুমি বলে, দাদু নাম কবীর।।
কই সগুন সে রীঝ রহা, কই নির্গুণ ঠহরায়ে।
দাদু গতি কবীর কী, মৌতে কহী না জায়।।
জিন মোকু নিজ নাম দিয়া, সোই সদগুরু হমার।
দাদু দুসরা কই নহী, কবীর সৃজন হার।।

(গ) আদরণীয় মুলুকদাস সাহেব জী কবির্দেব সাক্ষী ঃ-

৪২ বর্ষ আয়ূতে মুলুক দাস সাহেব জীকে পূর্ণ পরমাত্মা মিলেছিলেন তথা দুই দিন ধরে অচেতন ছিলেন। নিচের বাণী উচ্চারণ করেছ্নে ঃ-

জপোরে মন সতগুরু নাম কবীর ।। টেক।।
জপোরে মন পরমেশ্বর নাম কবীর।
এক সময় গুরু বংশী বাজায় কালিন্দ্রী কে তীর।।
সুর নর মুনি থক গয়ে, রুক গয়ে দরিয়া নীর।
কাশী তজ গুরু মগহর আয়ে, দোনো দীন কে পীর।।
কই গাঢ়ে কই অগ্নি জরাবৈ, ঢুন্ডা ন পায়া শরীর।
চার দাগ সে সদগুরু ন্যারা, অজরো অমর শরীর।।
দাস মুলুক সুলুক কহতে হে, খোঁজো খসম কবীর।।

(ঘ) আদরণীয় গরীব দাস সাহেব জী ছুড়ানী জিলা-ঝজ্জর, হরিয়ানা বালা (অমৃত বাণীতে প্রমাণ) প্রভু কবীর (কবির্দেব)-র সাক্ষী ঃ-

আদরণীয় গরবীদাস সাহেবের আবির্ভাব সন্ ১৭১৭ সতেরো শো সতেরো তে হয়েছিল তথা কবীর সাহেবের দর্শন দশ বর্ষ আয়ূতে সন্ ১৭২৭ তে নলা নামক মাঠে হয়েছিল। সতলোক বাস ১৭৭৮ তে হয়েছিল। আদরণীয় গবীর সাহেব জীকেও পরমাত্মা সশরীরে জীবন্ত রূপে মিলেছিলেন। আদরণীয় গরীব সাহেব জি নিজের নলা নামক ক্ষেতে অন্য গোয়ালা সাথীর সঙ্গে গরু চড়াতে গিয়েছিলেন। কবালানার গ্রামের সীমানায় লাগানো ক্ষেত ছিল গরীব দাস সাহেবের। গোয়ালারা খেতে বসবে তখন পরমাত্মা সাধুর বেশে তাদের কাছে গিয়েছিলেন তারা বলল মহাত্মা,

আপনিও খাবার খান্। তিনি বললেন আমি সতলোক থেকে খেয়ে এসেছি, খাওয়াতে ইচ্ছা হলে দুধ খাওয়াও তাও কুমারী বাছুরের দুধ। বালক গরীব দাস এক কুমারী গায় বাছুর কবীর পরমাত্মার সামনে এনে দিয়েছেন। আর বলেছেন বাবা এই যে কুমারী বাছুর (অধন্যা ধেনু) কিন্তু একুমারী বাছুর কি করে দুধ-দেবে? তখন কবীর পরমেশ্বর কুমারী বাছুরের কোমড়ে থপ্ থপ্ করে দুটো চড় আস্তে করে দিয়েছেন, তার আগে বাসন আনতে বলেছিলেন। তারা মাটির কলসও এনেদিয়েছিল, আর পরমেশ্বর কোমড়ে চড় মারতে-ই দুধ নালী বেয়ে পড়তে লাগল এবং বাসন ভরে যেতেই দুধ বন্ধ হয়ে গেল। ওই দুধ কবীর পরমেশ্বর খেলেন আর কিছু প্রসাদ গরীব ছোট্ট গরীব দাসকে খাইয়ে সতলোক দর্শন করিয়েছেন। সতলোকে গিয়ে নিজের দুই রূপ দেখিয়ে ফির জিন্দা বালা রূপে কুল মালিক রূপে সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে গিয়েছেন আর বলেছেন, আমিই ১২০ বর্ষ কাশীতে তাঁতীর সন্তান রূপে জুলাহের (তাঁতীর) ঘরে বাস করে এসেছি। তার আগে হজরত মহম্মদের সঙ্গেও মিলেছিলাম। পবিত্র কুরান শরীফে যে কবীরা, কবীরন, খবীরা, খবীরন, অল্লাহ অকবর আদি শব্দ আছে, সে সব শব্দ আমারই বোধ করায়, তথা আমিই শ্রী নানককে বেই নদীর উপর জিন্দা মহাত্মা রূপে মিলেছিলাম। (মুসলমানদের জিন্দা মহাত্মা হয়ে থাকে, ওই কালা চৌগা (ওবর কোট মতন) হাটুর থেকে নীচে পর্যন্ত্য বা মাথায় কালা টুপি চোটে বালা পড়ে আমিই বলখ শহরে নরেশ শ্রী অব্রাহীম সুলতান অধমজী তথা দাদুকেও মিলেছিলাম, চারি বেদে যে কবীর অগ্নী, কবির্দেব (কবিরংধারীঃ) আদি নাম আছে সে বোধ আমাকেই বোঝায়।

কবীর, বেদ হমারা ভেদ হে, মে মিলু বেদো সে নাহী। জৌন বেদ সে মে মিলু, বো বেদ জানতে নাহি।

আমিই বেদের আগেই সতলোকে বিরাজমান ছিলাম। (গ্রাম ছুরাণী জিলা-ঝজ্জর (হরিয়ানা) -তে আজও ওই জঙ্গলে যেখানে পূর্ণ পরমাত্মার ও সন্ত গরীব দাসের মানব শরীরে সাক্ষাৎকার হয়েছিল, এক স্মৃতি আজও আছে আদরণীয় গরীব দাসের আত্মা, নিজের পরমাত্মা কবীর বন্দী ছোড়ের সাথে চলে যাওয়ার পর তাকে মৃত ভেবে চিতায় উঠিয়ে, আগুন ধরাতে বাকী ছিল। ওই সময় গরীব দাসের আত্মাকে পরমেশ্বর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দশবর্ষীয় বালক গরীব দাস জীবিত হয়ে গিয়েছিলেন। **ওই সময় পূর্ণ পরমাত্মার নিজ চোখে দেখা বিবরণ নিজের অমৃতবাণী "সন্তগ্রন্থ" নামের গ্রন্থে রচনা করেছেন। ওই অমৃত বাণীতে প্রমাণ ঃ-**

অজব নগর মে লে গয়া, হমকু সদগুরু আন।
ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি, সুতে চাদর তান।।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডকা এক রতি নাহি ভার।
সতগুরু পুরুষ কবির হে কুল কে সৃজনহার।।
গৈবী খেয়াল বিশাল সদগুরু, অচল দিগম্বর থীর হে।
ভক্তি হেত কায়াধর আয়ে, অবিগত সত কবীরহে।।
হরদম খোঁজ হনোজ হাজর ত্রিবেণীকে তীর হে।
দাস গরীব তবীব সতগুরু, বন্দী ছোড় কবীর হে।।
হম সুলতানি নানক তারে, দাদু কু উপদেশ দিয়া।

জাত জুলাহা ভেদ নহী পায়া কাশী মাহে কবীর হুয়া।।
সব পদবীকে মূল হে, সকল সিদ্ধি হে তীর।
দাস গরীব সতপুরুষ ভজো, অবিগত কলা কবির।।
জিন্দা যোগী জগৎগুরু মালিক মুর শব্দ পীর।
দঁহু দীন ঝগড়া মন্ডয়া, পায়া নহী শরীর।।
গরীব জিস কুম কহেতা কবীর জুলাহা।
সব গতি পূর্ণ অগম অগাহা।।

উপরোক্ত বাণীতে আদরণীয় গরীব দাসজি স্পষ্ট করে বলেছেন, কাশীর ধানক/জুলাহে (তাঁতী) আমাকে নাম দিয়ে পাড় করেছেন ওই কাশীর জুলাহা (তাঁতি)-ই (সতপুরুষ) পূর্ণব্রহ্ম।

পরমেশ্বর কবীরই সতলোক থেকে জিন্দা মহাত্মার রূপে এসে আমাকে অজব নগর (অদ্ভূত নগর/সতলোক)-এ নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে আনন্দই আনন্দ, কোনো চিন্তা, দুঃখ নেই, জন্ম-মৃত্যু, অন্য প্রাণীদের শরীরে কষ্ট আদি কিছুই নেই। এই কাশীতে তাঁতী রূপে এসে সতপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকট হয়ে, আদরণীয় শ্রী আব্রাহীম সুলতান অধম সাহেব, তথা আদরণীয় দাদু সাহেব, আদরণীয় নানক সাহেব কেও শতনাম দিয়ে পাড় করেছেন ওই কবির্দেব যার এক রোম কূপে কোটি সূর্যের প্রকাশ আছে। তিনি মানব সদৃশ অতি তেজোময়, নিজের বাস্তবিক শরীরের উপর হল্কা তেজপুঞ্জের চোলা (ভদ্রা বস্ত্রা) পড়ে আমাদের মৃত্যুলোক (মনুষ্য লোক)-এ মেলেন। কেননা ওই পরমেশ্বরের বাস্তবিক স্বরূপের প্রকাশ চর্ম চক্ষু সহ্য (সহন) করতে পারে না।

আদরণীয় গরীব দাস সাহেব নিজের অমৃতবাণীতে বলেছেন, **"সর্ব কলা সতগুরু সাহেবের হরি আয়ে, হরিয়ানে নুঁ"।** ভাবার্থ হল, পূর্ণ পরমাত্মা কবির হবি (কর্বিদেব) যে ক্ষেত্রতে এসেছেন তার নাম হরিয়ানা। অর্থাৎ পরমাত্মার আসার পবিত্র স্থান, যার কারণ আসে পাশের ক্ষেত্রকে হরিআনা (হরয়ানা) বলতে লেগেছে।

সন্ ১৯৬৬ তে পঞ্জাব প্রাপ্ত থেকে বিভাজন হওয়ার পর এ ক্ষেত্রের নাম হরিয়ানা (হরয়ানা) পড়েছে। কমপক্ষে ২৩৬ বর্ষ পূর্বে বলা হয়েছিল যে বাণী ১৯৬৬ তে সিদ্ধ হয়েছে যে কি সময় আসলে এ ক্ষেত্রের নাম হরিয়ানা তে বিখ্যাত হবে। যা আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

।। আদরনীয় নানকের দ্বারা গুরু গ্রন্থ সাহেবে কবীর পরমেশ্বরের প্রমাণ ।।

এইজন্য গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৭২১-তে নিজের অমৃতবাণী মহলা ১-এ শ্রী নানক সাহেব বলেছেন ঃ-

"হক্কা কবীর করীম তু, বেএব পরবর দীগার
নানক বুগোয়দ জনু তুরা, তেরে চাকরাং পাখাক।"

এরপ্রমাণ গুরু গ্রন্থ সাহিবের রাগ সিরী মহলা ১ পৃষ্ঠা নং ২৪ শব্দ নং ২৯ শব্দ ঃ-

এক সুয়ান দুই সুয়ানী নাল, ভলকে ভৌকহী সদা বিয়াল
কুড় ছুড়া মুঠা মুরদার ধানক রূপ রহা করতার।। ১।।
মে পতি কী পন্‌দি ন করনী কী কার।
উহ বিগড়ে রূপ রহবিকরাল।।

তেরা এক নাম তারে সংসার, মে এহো আস এহো আধার।
মুখ নিন্দা আখা দিনরাত, পর ঘর জোহি নীচ মনাতি।।
কাম ক্রোধ তন বসহ চন্ডাল, ধানক রূপ রহা করতার।।২।।
ফাহি সুরত মলুকি বেশ, ওহ ঠগবারা ঠগিদেশ
খরা সিয়ানা বহুতা ভার, ধানক রূপ রহা করতার।। ৩।।
মে কীতা ন জাতা হরামখোর, উহ কিয়া মুহ দেশা চোর
নানক নীচ কহ বিচার, ধানক রূপ রহা করতার।। ৪।।

গুরু গ্রন্থ সাহিব, রাগ আসাবরী, মহলা ১-এর কিছু অংশ ঃ-

সাহিব মেরা একই হে। এক হে ভাই এক হে
আপে রূপ করে বহু ভান্তি নানক বপুড়া এক কহ ।।পৃঃ ৩৫০।।
জো তিন কিয়া তো সচু থীয়া, অমৃত নাম সদগুরু দিয়া।। পৃঃ ৩৫২।।
গুরু পুরে তে গতি মতি পাই (পৃঃ ৩৫৩)
বুড়ত জগু দেখিয়া তউ ডরি ভাগে,
সতিগুরু রাখে সে বড় ভাগে, নানক গুরু কি চরণে লাগে (পৃঃ ৪১৪)
যে গুরু পুছিয়া আপনা সাচা বিচারী রাম (৪৩৯)

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে শ্রী নানক সাহেব জী স্বয়ংই স্বীকার করছেন যে, সাহিব (প্রভু) একজনই আছেন, তথা তার (শ্রী নানক সাহেবের) কোন মনুষ্য রূপে ব্যক্ত গুরুও ছিলেন, যার বিষয়ে বলেছেন পূর্ণ গুরুর থেকেই তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে এবং আমার গুরু আমাকে (অমৃত নাম) অমর মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ করনে বালা উপদেশ নাম মন্ত্র দিয়েছেন, ওই আমার গুরু, নানা রূপ ধারণ করে থাকেন এবং উনিই সৎপুরুষ তিনি জিন্দা রূপও হয়ে যান। উনিই ধানক (তাঁতী) রূপে কাশী নগরে বিরাজমান হয়ে, সাধারণ ব্যক্তি রূপে, ভক্তের ভূমিকা করছেন। শাস্ত্র বিরুদ্ধ পূজা করে সারা জগৎকে জন্ম-মৃত্যু ও কর্মফলের আগুনে জ্বলতে দেখে, জীবন ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে পালিয়ে, আমি সদগুরুর চরণে শরণ নিয়েছি।

বলিহারী গুরু আপনে দিউহারী সদবার
জিন মানস তে দেবতে কিয়ে করত ন লাগি বার।
আপিনে আপ সাজিয়ো আপনিয়ে রচিয়ো নাও
দুযি কুদরতি সাজিয়ে করি আসনু জিঠা চাও।
দাতা করতা আপি তুং তুমি দেবহি করহি পসাউ,
তুং জানই সভসে দে লেসহি জিন্দ কবাউ করি আসনু জিঠা চাউ।। পৃঃ ৪৬৩।।

ভাবার্থ হল, পরমাত্মা জিন্দা রূপ হয়ে বেই নদীর কাছে এসেছিলেন, নিজে স্বয়ংই দুই দুনিয়ার উপর (সতলোকাদি) তথা নীচে (ব্রহ্ম ওপর ব্রহ্মলোকাদি) রচনা করে উপর সতলোকে আকার রূপে আসনে বিরাজমান হয়ে, নিজের দ্বারা রচনা করা দুনিয়াকে দেখুন। তিনি স্বয়ংই প্রকট হয়ে থাকেন, কোন মাতার গর্ভে জন্ম নেন না। এই প্রমাণ পবিত্র যজুর্বেদের অধ্যায় ৪০ম. ৮-এ আছে যে, কবির মনীষি সয়ম্ভুঃ পরিভু ব্যবধাতা, ভাবার্থ হল যে, কবীর পরমাত্মা সর্বজ্ঞ আছেন

(মনিষীর মানে সর্বজ্ঞ) তথা নিজে নিজেই প্রকট হন, তিনি (পরিভু) সনাতন অর্থাৎ সর্ব প্রথমবালা প্রভু। তিনি সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের (ব্যবধাতা) ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সর্ব লোকের রচনহার।

এহু জিউ বহুতে জনম ভরমিয়া, তা সতিগুরু শবদ সুনাইয়া (পৃঃ ৪৬৫) **ভাবার্থ হল যে,** গুরু নানক সাহেব বলছেন, আমার এই জীব অনেক সময় ধরে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রতে ঘুরছিল, এখন এই পূর্ণ সতগুরু, বাস্তবিক নাম প্রদান করেছেন।

শ্রী নানকজীর পূর্ব জনম সত্যযুগে রাজা অমরিষ, ত্রেতা যুগে রাজা জনক, আর এই কলিযুগে গুরু নানক হয়েছেন তথা অন্য জন্মের তো গোনা গাঁথা নেই।

।। প্রভু কবীর জী স্বামী রামানন্দজীকে তত্ত্বজ্ঞান বুঝিয়েছিলেন।।

পন্ডিত স্বামী রামানন্দজী এক বিদ্যান পুরুষ ছিলেন। বেদও গীতার মর্মজ্ঞ জ্ঞাতা মানা হত।

।। পাঁচ বর্ষ বয়সে রামানন্দজীকে গুরু ধারণ করেছিলেন।।

যে সময় কবির পরমেশ্বর (কবির্দেব) নিজের লীলাময় শরীরের বয়স পাঁচ বৎসর হয়েছিল, তখন গুরু মর্যাদা বানিয়ে রাখার জন্য লীলা করেছিলেন। একদিন কবির পরমেশ্বর পাঁচ বৎসরের জায়গায় আড়াই বৎসরের রূপ ধারণ করে ভোর বেলায় একটু অন্ধকার ছিল পঞ্চগঙ্গা ঘাটের সিড়িতে শুয়ে পড়েছিলেন যে ঘাটে স্বামী রামানন্দজী প্রতিদিন স্নান করতে যেতেন। শ্রী রামানন্দজী চারি বেদের জ্ঞাতা ও পবিত্র গীতার বিদ্যান মানা হত। তখন তার বয়স ১০৪ হয়ে গিয়েছিল। কাশীতে যে পাখন্ড পূজা অন্য পন্ডিতরা চালাতো সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল। রামানন্দজী শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করাতেন ও সবাইকে বলতেনও। পুরো কাশীতে নিজের ৫২ দরবার লাগাতেন। রামানন্দজী পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদের আধার পর বিধিবত সাধনা সবাই বলতেন। তিনি ওঁম নাম জপ উপদেশ দিতেন।

ওই দিনও যখন রামানন্দ স্বামী স্নান করার জন্য পঞ্চগঙ্গা ঘাটে গিয়েছিলেন, সেই ঘাটের সিঁড়িতে কবির সাহেব আড়াই বৎসরের বালক রূপে শুয়ে ছিলেন। সকাল ব্রহ্মমূহুর্তের অন্ধকারে কবির পরমেশ্বরকে দেখতে পাননি। কবীর সাহেবের মাথায় রামানন্দজির খড়ম লেগে গিয়েছিল। কবির্দেব বালকের কান্নার মত কান্না করছিলেন রামানন্দজী তাড়াতাড়ি করে নীচে ঝুঁকে বালককে দেখছিলেন যে চোট বেশী লাগেনি তো? বালককে উঠানোর সময় তার গলা থেকে কণ্ঠী মালা বালকের গলায় পড়ে গিয়েছিল। রামানন্দজী উঠাতেই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। রামানন্দজী বললেন খোকা, রাম বলো, রামের নামে দুঃখ দূর হয়ে যায়। খোকা রাম রাম বোলো এই বলে কবীর পরমেশ্বরের মাথায় হাত রেখলেন। শিশু তো চুপ হয়ে গেছে। ফির রামানন্দ স্নান করছেন আর ভাবছেন বাচ্চাকে আশ্রমে নিয়ে যাব, আর যার হবে তার কাছে পাঠিয়ে দেব। রামানন্দজী স্নান করে এসে আর বাচ্চাকে দেখতে পারেননি, কবির সাহেব অন্তর্ধান হয়ে গেল, পরে নিজের ঝোপড়ীতে ফিরে এসেছিলেন। রামানন্দজী ভাবলেন বাচ্চা চলে গেছে, এখন তাকে কোথায় বা খোঁজ করব?

।। কবীর প্রভু দ্বারা রামানন্দজীর আশ্রমে দুই রূপ ধারণ করেছিলেন।।

একদিন স্বামী রামানন্দের কিছু শিষ্য কোনো এক স্থানে সৎসঙ্গ শোনাচ্ছিলেন। কবীর সাহেব ওখানে চলে গেলেন। ওই সন্ত শ্রী বিষ্ণু পুরানের কথা শুনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন সারা সৃষ্টির

রচনহার শ্রী বিষ্ণু, উনিই পালন কর্তা, উনিই রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতার হয়ে আসার পরম শক্তি ও অজন্মা আছেন এবং তার কোন মাতা পিতা নাই। কবীরীশ্বর সব চর্চা শুনছিলেন, সৎসঙ্গের মধ্যে কবীর পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, ঋষিজী, আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি? ঋষি বললেন বলো বেটা, কি বলবে? সেখানে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন, কবীর্দেব বললেন, আপনি বিষ্ণুপুরাণ থেকে সৎসঙ্গ শুনাচ্ছেন যে কি, শ্রী বিষ্ণু পরমশক্তি আছেন, ইনার থেকে ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি হয়েছে। ঋষি বললেন, আমি যা শুনাচ্ছি, বিষ্ণুপুরাণে এটাই লেখা আছে। কবীর্দেব বললেন, ঋষিজি আমি আপনার কাছে সংশয় নিবারণের প্রার্থনা করেছি, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। একদিন আমি শিব পুরাণ শুনেছিলাম/ওখানে মহাপুরুষ শুনাচ্ছেন ভগবান শিব থেকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়েছে (প্রমাণ পবিত্র শিব পুরাণ, রুদ্র সংহিতা, অধ্যায় ৬ তথা ৭ -এতে গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত) আর দেবী ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দেতে লেখা আছে যে, দেবী এই তিন দেবের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) মা। এ তিনজনই নাশবান, অবিনাশী নয়। ঋষিজি এই কথা শুনে নিরুত্তর হলেন, এবং ক্রোধিত হয়ে বলেন তুমি কে? কার পুত্র? কবীর সাহেব কিছু বলার আগেই এক দুইজন ভক্ত বলে, এ তো নিরু জুলাহের (তাঁতীর)-র ছেলে (পুত্র)। স্বামী রামানন্দের শিষ্য বললেন, তুই গলায় কি করে কণ্ঠীমালা দিয়ে রেখেছিস্? (বিষ্ণু সাধুরা তুলসীমালা গলায় দিতেন, তাতে প্রমাণিত হত, এ বিষ্ণু পরম্পরার উপদেশ নিয়েছেন)। তোর গুরুদেব কে? কবীর সাহেব বললেন, আমার গুরুদেব উনিই, যিনি আপনার গুরুদেব। সেই ঋষি আরও ক্রোধিত হয়ে বলল, দাঁড়া পাঁজি! তুই অছুত জুলাহের (তাঁতীর) বাচ্চা, আমার গুরুদেবকে নিজের গুরুদেব বলছিস্। আমার গুরুদেব কে? এ জানিস তিনি কে? শ্রী শ্রী ১০০৮ পন্ডিত রামানন্দ জী আচার্য। তুই তাঁতীর ছেলে, উনিতো তোর মত অছুতকে দর্শনও করেন না, আর বলছিস্ ওনার কাছ থেকে নাম নিয়েছি। দেখো ভাই ভক্তজন এই মিথ্যাবাদী, কপটি, এখনই গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি, আর তোর সব কথা বলব। কবিরগ্নি বললেন, ঠিক আছে গুরুদেবকে বলে দাও। ওই ঋষি গিয়ে রামানন্দজিকে বললেন এক তাঁতীর ছেলে ও তো আমাদের ও আপনার নাকই কেটে দিয়েছে, ও বলছে স্বামী রামানন্দ মহারাজ নাকি ওর গুরুদেব। হে ভগবান আমাদের তো বাইরে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে, তিনি স্বামী রামানন্দ বললেন, সকালে ওকে ডেকে আনবো। কাল দেখবে তোমাদের সামনে ওকে কেমন দন্ড দিই।

।। স্বামী রামানন্দজীর মনের কথা বলে দিয়েছিলেন।।

পরের দিন সকাল সকাল কয়েক জন অজ্ঞানী অবুঝ ব্যক্তি লোক কবীর সাহেবকে রামানন্দজীর সামনে উপস্থিত করলেন। রামানন্দজী সবাইকে দেখাচ্ছে আমি কোনদিন, ছোট জাতি লোকের মুখ দর্শন করি না। তাই তিনি পর্দা নিজের হাতে লাগিয়ে, কবির সাহেবকে ডেকে পর্দার পিছনে থেকে বলছেন, তুই মিথ্যাকথা বলছিস, যে আমার কাছে তুই দীক্ষা নিয়েছিস, বল তুই কোন জাতির? তোর কোন পন্থ অর্থাৎ কোন পরমাত্মার তুই পূজা করিস? রামানন্দ অধিকার শুনি, জুলাহ অক জগদীশ,

দাস গরীব বিলম্ব না তাহি নবাবত শীশ।। ৪০১।।

রামানন্দকো গুরু কহে, তন সে নহী মিলাত।

দাস গরীব দর্শন ভয়ে, পৈড়ে মাগি জুলাত।। ৪০৯।।
আজ পরদা লাই করি, রামানন্দ বুঝত।
দাস গরীব কুলঙ্গ ছবি, অধর ডাক কুদন্ত।। ৪১০।।
কোন জাতি কোন পন্থ হে, কোন তুমহারা নাম।
দাস গরীব অধীন গতি, বোলত হে বলি জাব।। ৪১১।।

উত্তর কবিরের ঃ-

"জাতি হমারী" জগৎগুরু, পরমেশ্বর পদ পন্থ।
দাস গরীব লিখতি পরৈ রামনিরঞ্জন কন্ত।। ৪১২।।

রামানন্দজী বললেন ঃ—

রে বালক শুন দুর্বুদ্ধি, ঘট মঠ তন আকার।
দাস গরীব দরদ লগা, হো বোলে সিরজনহার।। ৪১৩।।
তুম মোমন কে পালবা জুলহে কে ঘর বাস।
দাস গরীব অজ্ঞান গতি, এতা দৃঢ় বিশ্বাস।। ৪১৪।।
মান বড়াই ছাড়ি করি, বোলো বালক বৈন।
দাস গরীব অধম মুখী, এতা তুম ঘট ফৈল।। ৪১৫।।
তর্ক তলুসৈ বোলতে, রামানন্দ সুরজ্ঞান।
দাস গরীব কুজাতি হে, আখর নীচ নিদান।। ৪২৩।।

।। পরমেশ্বর কবীর সাহেব (কবির্দেব) প্রেমপূর্বক উত্তর দিলেন।।

মহকে বদন খুলাস কর, সুনী স্বামী প্রবীন।
দাস গরীব মনী মরৈ, সে আজিজ আধিন।। ৪২৮।।
মে অবিগত গতি সে পরৈ, চারি বেদ সে দূর।
দাস গরীব দশৌ দিশা, সকল সিন্ধ ভরপুর।। ৪২৯।।
সকল সিন্ধ ভরপুর হুঁ, খালিক হমরা নাম।
দাস গরীব অজাতি হুঁ তৈ জুঁ কহ্যা বলি জাঁব।। ৪৩০।।
জাতি পাতি মেরে নহী, নহী বস্তী নহী গাম।
দাস গরীব, অনিন গতি, নাই হমারে নাম ।। ৪৩১।।
নান্দ বিন্দ মেরে নহী, নহী গুদা নহী গাত।
দাস গরীব শব্দ সজা, নহী কিসিকা সাথ।।৪৩২।।
সব সঙ্গী বিছরু নহী, আদি অন্ত বহু জাহি।
দাস গরীব সকল বন্ধু বাহর ভীতর মাঁহি।। ৪৩৩।।
এ স্বামী সৃষ্টা মে, সৃষ্টি হমারে তীর।
দাস গরীব অধর বসু। অবিগত সত্য কবীর।। ৪৩৪।।
পৌহমী ধরনী আকাশ মে, মে ব্যাপক সব ঠোর।
দাস গরীব ন দুসরা হম সমতুল নহী ওর।। ৪৩৬।।

হম দাসন কে দাস হে, করতা পুরুষ করীম।
দাস গরীব অবধুত হম, হম ব্রহ্মচারী সীম।। ৪৩৯।।
সুনি রামানন্দ রাম হম, মে বাবন নরসিংহ।
দাস গরীব কলী কলী, হমহি সে কৃষ্ণ অভঙ্গ।। ৪৪০।।
হমহী সে ইন্দ্র কুবের হে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ।
দাস গরীব ধরম ধবজা ধরণী রসাতল শেষ।। ৪৪৭।।
শুনি স্বামী সতি ঝুঠ ন হমরে রিচ।
দাস গরীব হম রূপ বিন, ওর সকল প্রপঞ্চ ।। ৪৫৩।।
গোতা লাট স্বর্গ সে, ফিরি পেঠু পাতাল।
গরীব দাস ঢুঢ়ত ফিরু, হীরে মানিক লাল।। ৪৭৬।।
ইস দরিয় কঙ্কর বহুত, লাল কহী কহী ধাবা।
গরীব দাস মানিক চুগেঁ, হম সুর জীবা নাব।। ৪৭৭।।
মুরজীবা মানিক চুঁগে কঙ্কর পাথর ডোরী।
দাস গরীব ডোরী আগম, উতরো শব্দ উধার।। ৪৭৮।।

যদি আমার জাতের কথা জিজ্ঞাসা কর তো আমি জগৎ গুরু ঃ (বেদে লেখা আছে জগৎ গুরু সারা সৃষ্টির জ্ঞান প্রদান করে থাকা কবীর প্রভু আছেন) আমার পন্থ কোনটা? (কোন পরমেশ্বরের মার্গ দর্শন করি?) এর উত্তরে কবির সাহেব বলছেন, পন্থ আমার পরমেশ্বরের। ইশ ঈশ্বর, পরমেশ্বর (ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পূর্ণ ব্রহ্ম তথা ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ, পরম অক্ষর পুরুষ) আমি ওই সর্বোচ্চ শক্তি (সুপ্রিমপাবর) পরমেশ্বরের মার্গ দর্শন করতে এসেছি, যে কিনা অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের রচয়িতা, ধারণ-পোষণ করে। এই বেদেতে যাকে কবির্দেব, কবিরগ্নি আদি নামে সম্বোধিত করা হয়েছে।

ঈশ, ক্ষর পুরুষ, জ্যোতি নিরঞ্জন ও কাল ইহাকেই তো ব্রহ্ম বলা হয়ে থাকে, ইনি কেবল একুশ ব্রহ্মান্ডের স্বামী (মালিক) বা প্রভু আছেন আর পর ব্রহ্ম কে অর্থাৎ অক্ষর পুরুষকেও ঈশ্বর বা প্রভুও বলা হয়ে থাকে, তবে ইনি কেবল সাত সংখ ব্রহ্মান্ডের স্বামী (মালিক) ঈশ্বর আছেন। অতএব পরম অক্ষর পুরুষকে পূর্ণব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বলা হয়। যিনি হলেন অসংখ্য ব্রহ্মান্ডের স্বামী (মালিক) পরমেশ্বর আছেন অর্থাৎ সমস্ত কুলের মালিক। এই জন্য কবীর সাহেব (পরমেশ্বর) রামানন্দ স্বামীকে বলেছিলেন যেকি, আমার পন্থ হল পরমেশ্বরের পন্থকে প্রাপ্তি করে থাকে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭ তে লেখা আছে। বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর তো অন্য একজন, আর উনিই তিন লোকে প্রবেশ করে সর্ব জীবের ভরণ-পোষণ করেন, আর তাহাকেই অবিনাশী পরমাত্মা পরমেশ্বর নামে সকলে জানে। ওই পরমেশ্বর আমিই আছি। এই কথা শুনে, স্বামী রামানন্দ বহুত (খুব) রেগে গিয়ে বলছেন রে নিকম্মা! তুই ছোট জাতের, আর ছোটমুখে বড় কথা। তুই নিজেকে ভগবান মেনে বসেছিস! কবীর সাহেব বললেন হে গুরুদেব! আপনি আমার গুরুদেব, আপনি আমায় গালি দিলেন তাতেও আমি আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু আমি যা কিছু বলছি, এটাই সত্য যেকি আমিই পূর্ণ ব্রহ্ম আছি, এতে কোনো সংশয় নাই। এই কথা শুনে রামানন্দ বললেন, দাঁড়া তোর তো এখন লম্বা কাহিনী হবে, তুই এই ভাবে মানবি না। আগে আমি আমার

পূজা করে নিই, শিষ্যদের বললেন একে বসিয়ে রাখো, আমি আমার ক্রিয়া করে নিই পরে এর সঙ্গে বোঝা পড়া করব। স্বামী রামানন্দ কি ক্রিয়া করতেন? ভগবান বিষ্ণুর এক কাল্পনিক মূর্ত্তি বানাতেন, সামনে মূর্ত্তি দেখা যেত (যেমন কর্ম কান্ড করা হয়, ভগবানের মূর্ত্তির সমস্ত কাপড় খুলে, তাকে জল দিয়ে স্নান করায়, পরে পরিস্কার কাপড় পড়িয়ে গলায় মালা দিয়ে, তিলক লাগিয়ে মুকুট পরায়)। আসেন, সেই রামানন্দ পরে। কল্পনা করে ভগবানের কাল্পনিক মূর্ত্তি বানিয়েছিলেন। শ্রদ্ধাতে যেমন খালি পায়ে গিয়ে গঙ্গা জল নিয়ে আসেন, সেই রকম ভাবনা বানিয়ে ঠাকুরের মূর্ত্তির কাপড় খুলছে পরে স্নান করিয়েছে পরে নতুন বস্ত্র পরিয়েছে। তিলকও লাগিয়েছে মুকুটও মাথায় দেওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু গলায় কণ্ঠী মালা দিতে ভুলে গিয়েছে। যদি মালা না পরায় তো পূজা অধুরী থেকে যাবে আর মুকুট পরিয়ে দেওয়ার পর খুলে ফেলা যাবে না। যদি মুকুট খোলে তাহলেও পূজা খন্ডিত হয়ে যাবে মানা হয়। স্বামী রামানন্দ নিজে খুব অনুতপ্ত হতে লাগল, ভাবছেন, এত জীবন হল কোনদিন এইরকম ভুল হয়নি, প্রভু আজ ভুল হয়ে গিয়েছে এই পাপী থেকে? যদি মুকুট খোলা হয় তো পূজা খন্ডিত। তিনি ভাবলেন চলো মুকুটের উপর দিয়ে কণ্ঠী মালা দিয়ে দিই। (কল্পনা থেকে করছিল যে কি সামনে কিন্তু কোনো মূর্ত্তি নেই তবে 'পর্দা লাগানো' আছে পর্দার অপর দিকে কবীর সাহেব রয়েছেন। মুকুটে পরাতে গিয়ে মালা মুকুটে ফেঁসে যাচ্ছে। রামানন্দ ভাবছেন, এখন কি করি? হে ভগবান, আজ আমার সারা দিন ব্যর্থ গেল, আজ আমার ভক্তির কামাই ব্যর্থ গেল (কেননা যার পরমাত্মার উপর টান থাকে, তার যদি এক নিত্য নিয়ম বাদ পরে তখন তাহার খুব দুঃখ হয়ে থাকে) যেমন কোন ব্যক্তির পকেট কাটা হলে কত আফসোস করে। এই রকমই প্রভুর সাচ্চা (সত্যিকারের) ভক্তের লগন হয়ে থাকে। পর্দার পিছনে কবীর অন্তরযামী, স্বামী রামানন্দকে বললেন গুরুদেব, মালার গাঁঠ খুলে পরিয়ে দেন, মুকুট খুলতে হবে না। এই কথা শুনে রামানন্দ কোথাকার মুকুট আর কোথাকার মালার গাঁঠ খোলা, কবীর সাহেবের সামনে পর্দা লাগানো সেই পর্দা নিজের হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে কবীর পরমেশ্বরকে বুকে টেনে নিলেন সব সমাজের সামনে, ব্রাহ্মণও অনেক ছিল সেখানে। রামানন্দ বলছেন, ভগবান, আপনার শরীর ফুল বা তুলোর মত নরম আমার হাত ও শরীর তো পাথরের মত। একদিকে প্রভু আরেকদিকে জাতির দেওয়াল। প্রভুকে ভালবাসে যে পুণ্যাত্মা ধর্মের নকল দেওয়াল ভেঙে দেওয়াই শ্রেয়কর মনে করেন। সেই রকমই করলেন রামানন্দ মহারাজজী। সামনে পূর্ণ পরমাত্মাকে পেয়ে না জাতি দেখেছে না ধর্ম, না ছুয়াছুত কেবল আত্ম কল্যাণই দেখেছে। একেই ব্রাহ্মণ বলে।

বোলত রামানন্দজী, হম ঘর বতা সুকাল।
গরীব দাস পূজা করে, মুকুট ফহি যদি মাল।। ৪৭৯।।
সেবা করো সম্ভাল করি, সুনি স্বামী সুরজ্ঞান।
গরীব দাস সির মুকুট ধরি মালা অটকি জান।। ৪৮০।।
স্বামী খুন্তি খোলি করি, ফিরি মালা গলভার।
গরীব দাস ইস ভজন কো, জানত হে করতার।। ৪৮১।।
ডিউটি পর্দা দূর করি, লিয়া কণ্ঠ লাগায়।
গরীব দাস গুজরী বহৌত, বদনে বদন মিলায়।। ৪৮২।।

“স্বামী রামানন্দ জী বললেন কবীর প্রভু ! আপনি মিথ্যা কেন বললেন ? কবীর সাহেব বললেন কেমন মিথ্যা কথা বললাম স্বামীজী ? স্বামীজী বললেন আপনি বললেন যে আমার কাছ থেকে নাকি দীক্ষা নিয়েছেন ? আপনি আমার কাছ থেকে কবে উপদেশ নাম নিয়েছেন ? একসময় আপনি পঞ্চঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন, আমি ঘাটের সিঁড়িতে শুয়ে ছিলাম, আপনার পায়ের খড়ম আমার মাথায় লাগলে, আপনি বলেছিলেন বেটা রাম নাম বলো। রামানন্দ স্বামী বললেন হাঁ, এখন কিছু মনে পড়ছে। কিন্তু ও তো খুব ছোট বাচ্চা ছিল। (কেননা ওই সময় পাঁচ বছরের বাচ্চা ভাল বড় হয়ে থাকে তথা পাঁচ বছর আর আড়াই বছরে শরীর দুইগুণ অন্তর হয়ে থাকে। কবীর সাহেব স্বামীকে বলছেন, দেখো আমি এমন আড়াই বছরের ছিলাম। স্বামী রামানন্দজী দেখছেন সেই বাচ্চা পাশে এক সেবকের খাটিয়াতে গিয়ে বসে গেছে। স্বামীজী চোখ বার বার মুছছে ভাবছে ৫ বছরের বাচ্চা আবার আড়াই বছর একি ব্যাপার আমি ভুল তো দেখছি না। তিন চার বার ভাল করে চোখ ঘুরিয়ে একবার এদিন একবার ওদিক। ওই ভাবতে ভাবতে ওই কবীর সাহেবের আড়াই বছরের বাচ্চা পাঁচ বছরের মধ্যে মিলে গিয়েছে। ফির আগের মত পাঁচ বছর বালা কবির সাহেবকে দেখতে পান।

মনকী পূজা তুম লিখি, মুকুট মাল পরবেশ। গরীব দাস গতিকো লখে, কোন বরণ ক্যা ভেষ।। ৪৮৩।।

যহ তো তুম শিক্ষা দই, মানি লই মন মোরে। গরীব দাস কোমল পুরুষ, হমরা বদন কঠোর।। ৪৮৪।।

তখন রামানন্দজী বললেন, আমার সংশয় মিটে গেল। হে পরমেশ্বর আপনাকে কেমন করে চিনব। আপনি কোন জাতিতে বা কোন বেশে কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি অবুঝ প্রাণী আপনার সাথে বাদ-বিবাদ করে আমি দোষী হয়ে গিয়েছি, ক্ষমা করবেন, পূর্ণ পরমেশ্বর কবির্দেব, আমি আপনার অনজান (অপরিচিত) বাচ্চা আছি।

।। স্বামী রামানন্দজীকে সতলোক দর্শন করালেন।।

সুনি বচ্চা মে স্বর্গ কী কৈসৈ ছান্তৌ রিতী।
গরীব দাস গুদরী লগী, জনম জাত হে বীত।।৪৮৬।।
চ্যারি মুক্তি বৈকুণ্ঠ মে, জিন কি মৌরে চাহ।
গরীব দাস ঘর অগমকী, কৈসৈ পাউ যাহ।।৪৮৭।।
হেম রূপ যহা ধরণী হে, রতন জড়ে বৌহ শোভ।
গরীব দাস বৈকুণ্ঠ কুঁ, তন মন হমরা লোভ।। ৪৮৮।।
শঙ্খঁচক্র গদা পদ্ম হে, মোহন মদন মুরারী।
গরীব দাস মূরলী বাজে, সুরজ লোক দরবারি।। ৪৮৯।।
দুধৌ কি নদীয়া বহে, সেত বৃক্ষ সুভান।
গরীব দাস মন্দল মুক্তি, সুরগাপুর অস্থান।। ৪৯০।।
রতন জড়াউ মনুষ্য হে, গন গন্ধর্ব সব দেব।
গরীব দাস উসধাম কি, কৈসৈ ছাড়ু সেব।। ৪৯১।।

ঋগ্ যুজ সাম অথর্বনং, গাবে চারোং বেদ।
গরীব দাস ঘর অগম কী, কৈসে জানো ভেদ।। ৪৯২।।
চারি মুক্তি চিৎবন লাগি, কৈসে বচু তাহি।
গরীব দাস গুপ্তারগতি, হমক দ্যৌ, সমঝায়।। ৪৯৩।।
সুরগ লোক বৈকুণ্ঠ হে, যাসৈ পরে ন ওর।
গরীব দাস ষট্শাস্ত্র, চারি বেদ কো দৌড়।। ৪৯৪।।
চারি বেদ গাবে তিসৈ, সুরনর মুনি মিলাপ।
গরীবদাস ধ্রুব পোর জিস, মিটি গয়ে তিন তাপ।। ৪৯৫।।
প্রহ্লাদ গয়ে তিস লোককুঁ, সুরগাপুরী সমুল।
গরীব দাস হরি ভক্তি কি, মে বচত হুঁ ধূল।।৪৯৬।।
বৃন্দাবন গয়ে তিস লোককুঁ সুরগাপুরী সমুল।
গরীব দাস উস মুক্তি কুঁ, কৈসে জাউ ভুল।।৪৯৭।।
নারদ ব্রহ্ম তিস রটে, গাবে শেষ গণেশ।
গরীব দাস বৈকুণ্ঠ সে ওর পরে কো দেশ।। ৪৯৮।।
সহস্র অঠাসী জিস জপে, ওর তৈতিশো সেব।
গরীব দাস জাসৈ পরে, ওর কোন হে দেব।।৪৯৯।।
সুনি স্বামী নিজ মূলগতি, কহি সমঝাউ তোহি।
গরীব দাস ভগবান কুঁ রাখ্যা জগৎ সমোহি।। ৫০০।।
তীনি লোককে জীব সব, বিষয় বাস ভরমায়।
গরীব দাস হমকুঁ জপে, তিসকুঁ ধাম দিখায়।। ৫০১।।
জো দেখেগা ধাম কো সো জানত হে মুঝ।
গরীব দাস তোসে কহু সুনি গায়ত্রী গুঞ্জ।। ৫০২।।
কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান কৃ, জহড়ায়ে জীব।
গরীব দাস ত্রিলোক মে, কাল কর্ম শির শিব।। ৫০৩।।
সুনি স্বামী তৌসে কহু অগম দ্বীপকী সৈল।
গরীব দাস পুঠে পরে, পুস্তক লাদে বৈল।। ৫০৪।।
পহমী ধরণী অকাশ থম্ভ, চলসী চন্দর সুর।
গরীব দাস রজবিরজ কী, কহা রহেগী ধুর।।৫০৫।।
তারায়ন তিলক সব। চলসী ইন্দর কুবের।
গরীব দাস সব জাত হে, সুরগ পাতার সুমের।।৫০৬।।
চারি মুক্তি বৈকুণ্ঠ বট, ফনা হুঁয়া কইবার।
গরীব দাস অলপ রূপ মঘ, ক্যা জটেন সংসার।। ৫০৭।।
কহো স্বামী কিও রহোগে, চৌদ্দা ভুবন বিহন্ত।
গরীব দাস বীজক কহা, চলত প্রাণ ওর পীন্ড।।৫০৮।।

সুন স্বামী এক শক্তি হে, অর্ধাঙ্গী ওঁ-কার।
গরীব দাস বীজক তহাঁ, অনন্তলোক সিংঘার।। ৫০৯।।
জৈসেকা তৈসা রহে, পরলো ফলা প্রাণ।
গরীব দাস ঔস শক্তি কুঁ, বার বার কুরবান।। ৫১০।।
কোটি ইন্দ্র ব্রহ্মা যহাঁ, কোটি কৃষ্ণ কৈলাশ।
গরীব দাস শিব কোটি হে, করৌ কৌনকী আশ।। ৫১১।।
কোটি বিষ্ণু জহা বসত হে উস শক্তি কে ধাম।
গরীব দাস গুল বহুত হে, অলফ বস্ত নিহকাম।। ৫১২।।
শিব শক্তি জাসে হুঁয়ি, অনন্ত কোটি অবতার।
গরীব দাস উস অলক ফুঁ লখৈ সো হোয় করতার।। ৫১৩।।
অলফ হমারা রূপ হে, দম দেহী নহী দন্ত।
গরীব দাস গুলমৈ পরে, চলনা হেবিন পন্থ।। ৫১৪।।
বিনা পন্থ উস কন্ত কৈ, ধাম চলল হে মোর।
গরীব দাস গতি না কিসি, সংঘ সুরগ পর ডোর।। ৫১৫।।
সংখ সুরগ পর হম বসে, সুনি স্বামী যহ সৈন।
গরীব দাস হম অলফহে যৌহ গুল ফোকট ফৈন।। ৫১৬।।
জো তে কহয়া সো মে লহয়া, বিন দেখে নহীধীজ।
গরীব দাস স্বামী কহে, কহা অলফ বো বিজ।। ৫১৭।।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড ফন, অনন্ত কোটি উদগার।
গরীব দাস স্বামী কহে, কহী অলফ দীদার।। ৫১৮।।
হদ বেহদ কহীনা কহী, মা কহী থরপী ঠোর।
গরীব দাস নীজু ব্রহ্ম কি, কৌন ধাম বহ পৌর।। ৫১৯।।
চল স্বামী সর পর চলে, সঙ্গ তীর সুনজ্ঞান।
গরীব দাস বৈকুণ্ঠ বট, কোটি কোটি ঘট ধ্যান।। ৫২০।।
তহা কোটি বৈকুণ্ঠ হে, নক সরোবর সঙ্গীত।
গরীব দাস স্বামী সুনে জাত অনন্ত যুগ বীত।। ৫২১।।
প্রাণপিন্ড পুরমৈ ধসৈ গয়ে রামানন্দ কোটি।
গরীবদাস সরসুরগমে রহৌ শব্দকী ওট।। ৫২২।।
তহা বহা চিৎ চক্রিত ভয়া, দেখি ফজল দরবার।
গরীব দাস সিজদা কিয়া, হম পায়ে দিদার।। ৫২৩।।
তুম স্বামী মে বাল বুদ্ধি, ভর্ম কর্ম কিয়ে নাশ।
গরীব দাস নিজ ব্রহ্মতুম, হমরে দৃঢ় বিশ্বাস।। ৫২৪।।
সুন বেসুন সঁ তুম পরৈ, উরৈ সে হমরে তীর।
গরীব দাস সরবঙ্গমে, অবিগত পুরুষ কবীর।। ৫২৫।।

কোটি কোটি সিজদে করে, কোটি কোটি প্রণাম।
গরীব দাস অনহদ অধর হম পরসৈ তুমধাম।। ৫২৬।।
সুনি স্বামী এক গল গম, তিন তারি পল জোরি।
গরীব দাস সর গগন মে, সুরজ অনন্ত করোরী।। ৫২৭।।
শহর অমান অনন্তপুর রিমঝিম রিমঝিম হোয়ে।
গরীবদাস উসনগর কা মর্মনা জানে কই।। ৫২৮।।
শুনি স্বামী কৈসে লখৈ, কহি সমঝাউ তোহি।
গরীব দাস বিনপর উড়ে, তন মন শিষ ন হোই।। ৫২৯।।
রবনপুরী এক চক্র হে, তহাঁ ধনজয় বায়।
গরীব দাস জিতে জন্ম যাঁকু লেত সমায়।। ৫৩০।।
আসন পদম লগায় কর, ভিরঙ্গ নাদ কো খৈঁচি।
গরীব দাস অচবন করে, দেবদত্ত কো এচি।। ৫৩১।।
কালী উন কুলীন রঙ্গ, জাকে জো ফুন ধার।
গরীবদাস কুরভ শির, তাস করে উদগার।। ৫৩২।।
চিস্মে লাল গুলাল রঙ্গ, তিনি গিরহ নভ পেঞ্চ।
গরীবদাস বহ নাগনী কুঁ, হোনে ন দেবে রেঢ।। ৫৩৩।।
কুম্ভক রেচক সব করে। উন করত উদগার।
গরীব দাস ঔস নাগনী কুঁ, জী তে কই খিলার।। ৫৪৪।।
কুম্ভক ভরৈ রেচক করৈ, ফির টুটত হে পৌন।
গরীব দাস গগন মন্ডল, নহী হোত হে রৌন।। ৫৪৫।।
আগে ঘাটি বন্ধ হে, ইঙ্গলা পিঙ্গলা দোয়।
গরীবদাস সুকোমল খোলে, তাস মিলাবা হোয়।। ৫৪৬।।
জিউকা তিউহি বেঠি রহো, তজি আসন সব যোগ।
গরীব দাস পল বীচ পদ, সর্ব সেল সব ভোগ।। ৫৪৭।।
কোটি কোটি বৈকুণ্ঠ হে, কোটি কোটি শিব শেষ।
গরীব দাস উস ধামমে, ব্রহ্মা কোটি নরেশ।। ৫৫৩।।
অবাদান অমানপুর, চলি স্বামী তহাঁ চাল।
গরীব দাস পরলো অনন্ত, বৌহরী ন ঝম্পে কাল।। ৫৫৪।।
অমর চির তহাঁ পহরি হে, অমর হংস সুখ ধাম।
গরীব দাস ভোজন অজর, চল স্বামী নিজধাম।। ৫৫৫।।
বোলত রামানন্দজী, সুন কবীর করতার।
গরীব দাস সব রূপমে, তুমহি বোলন হার।। ৫৫৬।।
তুম সাহিব তুম সন্ত হো, তুম সদগুরু তুম হংসা।
গরীবদাস তুম রূপবিন, ওর ন দুজা অংশ।। ৫৫৭।।

মে ভক্তা মুক্তা ভয়া, কিয়া কর্ম কুনা নাশ।
গরীব দাস অবিগত মিলে, মেটি মন কি বাস।। ৫৫৮।।
দোঁহু ঠৌর হে একতু, ভয়া এক সে দোয়।
গরীব দাস হম কারণে উতরে হে মগ জোয়।। ৫৫৯।।
গোষ্ঠী রামানন্দ সে কাশী নগর মনঝার।
গরীব দাস জিন্দ পিরকে, হম পায়ে দীদার।। ৫৬২।।
বোলে রামানন্দজি সুনো কবীর সুভান।
গরীব দাস মুক্তা ভয়ে উধরে পিন্ড গুরু প্রাণ।। ৫৬৭।।

কবীর সাহেব (কবির্দেব) স্বামী রামানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজি, আপনি কিসের পূজা করেন? স্বামী বললেন, আমি বেদ ও গীতা অনুসারে সাধনা করি। কবীর ভগবান বললেন, বেদ ও গীতা সাধনা করে আপনি কোন লোকে যাবেন? স্বামী বললেন স্বর্গে যাব? কবীর পরমেশ্বর বললেন, স্বর্গে কি করবেন দাতা? স্বামী বললেন, ওখানে খুব প্রেম বালা ভগবান বিষ্ণু আছেন। তাকে দর্শন করব, আর ওখানে দুধের নদী আছে, ওখানে কোনো চিন্তা নেই কোন ভাবনা নেই, আমি ওখানে আনন্দে থাকব। কবীর প্রভু বললেন, কতদিন স্বর্গে থাকবেন? (তিনি বিদ্যান পুরুষ ছিলেন এবং জ্ঞানী দুই মিনিটে বুঝে গেছে)। স্বামী বললেন আমার ভক্তির কামাই যতদিন থাকবে ততদিন থাকব। পরে প্রভু কবীর বললেন তারপর কোথায় যাবেন? রামানন্দ স্বামী বললেন, কর্মধার অনুযায়ী না জানি কোন যোনীতে জন্ম হয়? কবীর প্রভু বললেন, এই ধরনের সাধনা আপনি অসংখ্য বার করেছেন। এইভাবে মুক্ত হওয়া যায় না। আপনি বিষ্ণুর সাধনা করে স্বর্গ লোক যেতে চান। যে সাধক ব্রহ্ম সাধনা করে ব্রহ্মলোকে যায়, সেও জন্ম মৃত্যুর চক্রতেই থাকে। কেননা, ব্রহ্মলোকে যে মহাস্বর্গ বানানো আছে একদিন ও মহাস্বর্গও নষ্ট হয়ে যাবে। গীতা ৮ অধ্যায় শ্লোক ১৬ বলা হয়েছে। স্বামী রামানন্দ বিদ্যান পুরুষ ছিলেন তার শ্লোক আঙুলে মুখস্থ ছিল। স্বামী বললেন আপনি ঠিক বলেছেন, এইরকমই লেখা আছে। কবীর প্রভু বললেন, বলেন পরে কোথায় থাকবেন? তখন না আপনার বিষ্ণু না কৃষ্ণ মুরারী, না ব্রহ্মলোক না বিষ্ণু লোক না শিবলোক না এই সব প্রাণী এইসব ও তিন দেবতাও একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। পরে আপনি কোথায় থাকবেন গুরুদেব? এই শুনে স্বামী বিবশ হয়ে চিন্তা করলেন। পরমেশ্বর কবীর সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন গীতার জ্ঞান কে বলেছে? স্বামী উত্তর দিলেন কৃষ্ণ। পরমেশ্বর কবীর বললেন, স্বামীজি সংক্ষিপ্ত মহাভারত দ্বিতীয় খন্ড (পৃষ্ঠ ১৫৩। পুরাণে বালা এবং নতুন বালায় ৬৬৭ পৃষ্ঠায়) লেখা আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুন ও গীতা বালা জ্ঞান মনে নেই, আমি দ্বিতীয় বার ওই গীতাবালা জ্ঞান শুনাতে পারব না। কবীর প্রভু সব প্রমাণ দিযে দিয়েছে।

।। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১৩ গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম) বলছে যে ।।

ওম্ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরণ্,
যঃ প্রয়াতি ত্যজন দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্ ।। ১৩।।

এই শ্লোকের শব্দার্থ হল, গীতা বলা ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল বলছে, (মাম্ ব্রহ্ম) আমার ব্রহ্মের তো (ইতি) এই (ওঁ) একাক্ষরম্) আমঙ্গওম্ এক অক্ষর আছে (ব্যাহরন্) উচ্চারণ করে (অনুস্মরণ)

স্মরণ করার (যঃ) যে সাধক (ত্যজন্ দেহম্) শরীর ত্যাগ করা পর্যন্ত (প্রয়াতি) স্মরণ সাধনা করে (সঃ) ওই সাধকই আমার (পরমাম্ গতিম্) পরমগতিকে (যাতি) প্রাপ্তি হয়ে থাকে। **ভাবার্থ ঃ-** শ্রীকৃষ্ণের শরীরে ব্রহ্ম প্রেতবশরূপে প্রবেশ করেন। এই ব্রহ্মের হাজার হাত, একে আবার মহাকাল বা জ্যোতি নিরঞ্জনও বলে। এই কালই শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে ঢুকে বলছে, ওঁ আমার সাধনা। এই নাম মৃত্যুর সময় করলে আমাকেই লাভ করবে। অন্য কোন মন্ত্রতে আমার ভক্তি হয় না অর্থাৎ এই ওঁ নাম হল কালের জপ।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৫, ৭ তথা তে গীতা জ্ঞান দাতা, নিজের বিষয়ে সাধনা করার কথা বলেছে, পরমেশ্বরের সাধনার কথা বলে নি। সে এই বলছেন, যে আমার এই এক অক্ষর অহম্ (ওঁ) নাম অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত বলবে, সে আমাকেই পাবে। এই জন্য তুই যুদ্ধ ও কর আর আমার এক অক্ষর নামও স্মরণ কর। কেননা যুদ্ধ হল্লা (উচ্চ স্বরে) করে হয়ে থাকে। এই জন্য বলছেন ওঁ নাম উচ্চারণ করে স্মরণ কর আর যুদ্ধও কর।

আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৬ তে বলা হয়েছে, যে যে প্রভুকে অন্ত সময় (শেষ সময়)-এ স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করে সে তাকেই প্রাপ্ত হয়। গীতা জ্ঞান দাতা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত ব্রহ্মছাড়া অন্য পূর্ণ পরমাত্মার (পরমদিব্য পুরুষ পরমেশ্বর/পূর্ণব্রহ্ম)-র বিষয়ে বলছে, যদি ওই পূর্ণ পরমেশ্বরের সাধনা শেষ সময় পর্যন্ত্য করে, তবে সে পূর্ণ পরমাত্মা (পরমেশ্বর) -কেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তার কাছেই পূর্ণ মোক্ষ বা সতলোক প্রাপ্তি ও পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই জন্য ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা, আমিও তার স্মরণে আছি। (গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে এই কথা) গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-৬৬ ও অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪)।।

রামানন্দ স্বামী সর্ব প্রমাণ চোখে দেখে দাঁতের তলে আঙুল দিয়েছেন তথা সত্য স্বীকার করে নিয়ে বললেন, বেটা কথা তো শাস্ত্রের তুই ঠিক বলছিস এ কথা সত্য। আজ পর্যন্ত কেউ আমায় এইরকম জ্ঞান দেয়নি, এখন আমি কি করব? কবীর প্রভু বললেন পবিত্র গীতাতেই লেখা আছে, অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮-৯ আর ১০ তে তথা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২ তে পড়ে দেখো।

পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদে বোলনে বালা ব্রহ্ম(কাল) বলছিল যে, ওই পরমাত্মার স্মরণে যা অর্জুন, তোর আর মরণ হবে না। তার জন্য (অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪)-তে বলেছে ওই গুরুকে খোঁজো যে কিনা ওই পরমাত্মার পরম তত্ত্বজ্ঞান জানেন। তাকে দন্ডবৎ প্রণাম করো এবং বিনম্রভাবে তাকে সৎকার করবে। যখন সেই তত্ত্বদর্শী গুরু প্রসন্ন হবে পরে তাহার কাছ থেকে দীক্ষা (নাম) চাইবে। পরে তোর আর পুণরজনম ও মরন হবে না। পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৫ মন্ত্র ১ ও ৪-এতে বলছে এই উলটো ঝুলানো সংসার রূপী বৃক্ষের (গাছ) উপরের মূলে তো আদি পুরুষ অর্থাৎ সনাতন পরমাত্মা আছেন, নীচে তিন প্রকারের গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতো গুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব)-রূপে ডালপালা আছে। এই পূর্ণ সংসার রূপী বৃক্ষ (গাছ)-কে ব্রহ্ম কাল বলছে পূর্ণ সৃষ্টি রচনার আমি কিছু জানি না। এই গীতা জ্ঞান পূর্ণ রূপে দিতে পারছি না। তারজন্য কোনো তত্ত্বদর্শী সন্ত (গুরু)র খোঁজ কর। (গীতা অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৩৪) পরে তোমাকে সর্ব সৃষ্টির রচনার জ্ঞান ও প্রভু পরমেশ্বরের খোঁজও তিনি বলে দেবেন। তারপর পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিৎ যার কাছে পৌঁছলে, সাধকের আর জন্ম মৃত্যু হয় না অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ পাওয়া যায়। যে পরমেশ্বর সংসার

রূপী বৃক্ষের (গাছ) অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছেন। আমি (ব্রহ্ম/কাল)-ও সেই পরমেশ্বরের শরণে আছি। এই জন্য ঐ পরমেশ্বরের পূজা কর। স্বামী রামানন্দ বললেন লেখা তো তাই আছে। কিন্তু বেটা, সতলোকের কথা না তো কেউ শুনেছে, যার কারণ আমার মনে বিশ্বাস হচ্ছে না যে কি এ সত্যিই হতে পারে। কবীর রূপ ৫ বৎসরের তখন, যখন এই সব কথা হচ্ছিল্ কবির বেশে প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেমন সাধনা করেন?

স্বামী রামানন্দ বললেন যে, আমি সমস্ত শরীর সেধে রেখেছি। যোগ অভ্যাসের দ্বারা আমি শরীরের কমলের (পদ্মফুলের) থেকে হয়ে ত্রিকুটি (ত্রিবেণী) পর্যন্ত্য পৌঁছিয়ে যাই। কবীর পরমেশ্বর বললেন যে কি, তাহলে আপনি একবার ত্রিবেণীতে গিয়ে পৌঁছান। যখন রামানন্দ স্বামীজী সমধিস্থ হলেন (কেননা স্বামীজির তো এই অভ্যাস করা প্রতিদিনেরই কর্ম ছিল) ত্রিবেণীর উপর পৌঁছতেই তিন রাস্তা হয়ে যেত। প্রত্যেক ব্রহ্মান্ডতে বানানো ব্রহ্ম লোকে প্রবেশ করতেই তিনরাস্তা হয়ে যেত। এই প্রকার কুড়ি (বিশ) ব্রহ্মান্ডের উপরে একুশনম্বর ব্রহ্মান্ডেও ঠিক এই প্রকার ব্যাবস্থা করা রয়েছে। একরাস্তার অর্থাৎ তিনরাস্তার মধ্যে একরাস্তার সামনে বানানো রয়েছে তিনগুপ্ত স্থানে যেতে হয় অতএব যেখানে জ্যোতি নিরঞ্জন তিন রূপ ধারণ করে থাকে আর সামনে যে ব্রহ্মরুন্ধ্র সেইটা তোমার এই নাম জপের দ্বারা কোনদিনও খুলবে না। এই ব্রহ্ম রুন্ধ্র কেবল সতনামের দ্বারাই খুলবে।

আমি (কবীর পরমেশ্বর) আপনাকে এখন সেই ব্রহ্ম নিরাকার রূপী কালকে বা জ্যোতিনিরঞ্জনকে (যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পিতাকে) দেখাচ্ছি। প্রথম দেখাব যে, এক ব্রহ্মাণ্ডে বানানো রয়েছে ব্রহ্ম লোকের যে গুপ্তস্থান সেই ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্ম লোক থেকে সামনে যাওয়ার রাস্তা অতএব যেটা জটাকুন্ডলি সরোবরের উপর আছে। সেইস্থান নিজের চোখের নজরে রেখেছে কারণ হল যে, কেউ যেন এখান থেকে না বেরিয়ে যায়। এই যে শেষ একুশ নম্বরের ব্রহ্ম াণ্ড (লোক) আছে এটাই কাল ব্রহ্মের (ক্ষরপুরুষ জ্যোতিনিরঞ্জনের) নিজস্ব স্থান। এইখানে কাল ব্রহ্ম ভয়ঙ্কর আসল রূপে বসে আছে। এটাই তার বাস্তবিক রূপ।

কবীর সাহেব বললেন, ওই দেখো তোমাদের নিরাকার ভগবান, যাকে তোমরা নিরাকার বলে থাকে।

(কেননা যোগী ঋষিরা বেদের আধারে ওঁম্ নামের সাধনা করেছে। পরমাত্মা তারা পায়নি, তবে সিদ্ধি এসে যায় এবং তার কারণে স্বর্গ মহাস্বর্গে চলে যায়। পরে আবার পশু যোনীতে ফিরে আসতে হয়। এইজন্য প্রভুকে সকলে নিরাকার মেনে নিয়ে বলত যে তিনি নিরাকার। তবে বেদে লেখা আছে যে ভগবান কিন্তু আকারে আছে।) যখন কালের কাছে স্বামী রামানন্দের সুক্ষ আত্মাকে নিয়ে গেলেন, তখন কবীর সাহেব নিজের সারনামের সাথে সতনাম উচ্চারণ করলেন। তক্ষনি কালের মাথা নীচুতে ঝুঁকে গেল, কারণ কালের মাথার উপরে সেই দরজা আছে যেকি, যে দরজা দিয়ে বেরোলে সতলোকে যাওয়া যায় আর পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের ব্রহ্মাণ্ডে) লোকে প্রবেশ হওয়া যায়। পরে এক ভ্রম্বর গুহা শুরু হয় (একটা ভ্রম্বর গুহা কালের লোকেও আছে)। কালের মাথার উপরে পা রেখে কবীর পরমেশ্বরের হংস আত্মাদের (নির্বিকারী সাধকদের) উপরে নিয়ে যান, এই কাল তাই সিঁড়ির ধাপের কাজ করে। এরপর পরব্রহ্মের ব্রহ্মান্ডকে (লোককে) পাড় করে কবীর সাহেব, স্বামী রামানন্দের আত্মাকে সতলোকে নিয়ে গেলেন (সেখানেও একটা ভ্রম্বর

গুহা (গুফা) আছে)। সতলোকে গিয়ে স্বামী রামানন্দ দেখলেন যে, কবির সাহেব (কবির্দেব) নিজের আসল রূপে বসে আছেন। ওখানে বসে থাকা কবীর সাহেবের শরীরের এতই তেজ যেমন কি, একটা রোমকূপের (পশমের) ছিদ্র থেকে কোটি সূর্য ও কোটি চন্দ্রের মিলন হলে যেমন প্রকাশ (কিন্তু গরম হয় না) তার থেকেও অধিক প্রকাশ আছে। কবীর সাহেব সেখানে গিয়ে, তাহার নিজেরই অন্য রূপ ধারণ করা সরূপকে (কবির্দেব যিনি সিংহাসনে বিরাজমান রয়েছেন) চম্বরের দ্বারা বাতাস দিতে লাগলেন। শ্রী রামানন্দ ভাবলেন যে ভগবান তো ইনি আছেন। যিনি সিংহাসনে বসে আছেন আর এই ছোট্ট পাঁচ বছরের কবীর কোনো সেবক হয়তো হবে কিন্তু এই সতলোক তো একদম অন্যান্য ব্রহ্মান্ড থেকেও আলাদা রকমের, এই পরমাত্মার অত্যাধিক তেজ দেখতে পাচ্ছি, এইরকম স্বামী রামানন্দ ভাবছিলেন, এরমধ্যে সিংহাসনে বসা পরমাত্মার তেজোময় রূপ সিংহাসন থেকে উঠলেন আর পাঁচ বর্ষীয় বাচ্চা রূপী কবীর পরমেশ্বর সিংহাসনের উপরে বিরাজমান হলেন। পূর্বের বিরাজমান কবির্দেবের (পরমেশ্বরের) যে বাস্তবিক (আসল) তেজোময় রূপ দেখা যাচ্ছিল আর ছোট্ট বালক রূপী পাঁচ বর্ষীয় কবীর সাহেব যে চম্বর দিয়ে সেই তেজোময় রূপী কবির্দেবকে (পরমেশ্বরকে) বাতাস করছিলেন সেই তেজপুঞ্জ প্রকাশ, সেই বালক রূপীর মধ্যে মিলে গেল এবং সেই স্থানে বালক কবীর সাহেবকে তেজোময় রূপে বসে থাকতে দেখলেন শুধু তাই নয়, এখন দেখছেন চম্বর আপনা-আপনি বাতাস হতে লাগল। এরমধ্যে স্বামী রামানন্দের আত্মাকে তার শরীরে পাঠিয়ে দেওয়া হল তারপরেই তাহার (স্বামী রামানন্দের) সমাধী ভেঙে যায়, সামনে দেখলেন কবীর সাহেব পাঁচবর্ষীয় সেই বালক বসে রয়েছেন। তখন স্বামী রামানন্দ সতলোকের দৃশ্য দেখে যাহা বলেছিলেন তাহা গরীবদাসজি মহারাজ নিজের কবিতার মাধ্যমে পরমেশ্বরের লীলাময় মহিমা বললেন—

তঁহা বহাঁ চিত চক্রিত ভয়া, দেখি ফজল দরবার।
গরীবদাস সিজদা কিয়া, হম পায়ে দিদার।। ৫২৩।।
তুম স্বামী মে বাল বুদ্ধি, ভর্ম কর্ম কিয়ে নাশ।
গরীব দাস নিজব্রহ্ম তুম, হমরে দৃঢ় বিশ্বাস।। ৫২৪।।
সুন-বেসুন সে তুম পরৈ ওরং সে হমরে তীর।
গরীব দাস সরবঙ্গমে, অবিগত পুরুষ কবির।। ৫২৫।।
কোটি কোটি সিজদে কর, কোটি কোটি প্রণাম।
গরীব দাস অনহদ অধর, হম পর সৈ তুম ধাম।। ৫২৬।।
বোলত রামনন্দজী, সুন কবীর করতার।
গরীবদাস সব রূপসে তুমহি বোলন হার।।৫৫৬। ৫৫৬।।
তুম সাহিব তুম সন্ত হো, তুম সদগুরু তুম হংস।
গরীবদাস, তুম রূপ বিন ওর ন দুজা অংশ।। ৫৫৭।।
মে ভগতা মুক্তা ভয়া, কিয়া কর্ম কুন্দ নাশ।
গরীব দাস অবিগত মিলে, মেটি মনকি বাস।। ৫৫৮।।
দোঁহু ঠোর হে এক তু, ভয়া এক সে দোয়।

গরীব দাস, হাম কারণে, উতরে হে মগ জোয়।। ৫৫৯।।
বোলত রামানন্দজী, সুন কবীর করতার।
গরীব দাস সব রূপ মে; তুহি বোলন হার।। ৫৬০।।

রামানন্দ স্বামী বললেন হে পরমেশ্বর! হে কবীর পরমাত্মা! হে কবীর করতার (সর্ব সৃষ্টি রচনহার) আপনিই সর্বব্যাপক পূর্ণ পরমেশ্বর।

দঁহু ঠোর হে এক তু, ভয়া এক সে দো।
গরীব দাস হম কারণে, আয়ে মগ জো।।

হে পরমেশ্বর কবীর! আপনি দুই জায়গায় সত লোকে ও আমার সন্মুখে কেবল আপনিই এক থেকে দুই রূপ বানিয়ে আমাদের মত তুচ্ছ জীবের জন্য এখানে এসেছেন।

মে ভক্তা মুক্তা ভয়া, কর্ম কুন্দ ভয়ে নাশ।
গরীব দাস অবিগত মিলে, মিট গই মনকে বাস।।

রামানন্দ স্বামীর বয়স ১০৪ বৎসরের মহাপুরুষ, আর পাঁচ বৎসরের কবীর পরমেশ্বরকে বলছেন, আমি আপনার দাস মুক্ত হয়ে গিয়েছি। আমার মনের ভ্রম ও ভটকানো না সব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমার পরমেশ্বরের বাস্তবিক রূপ দর্শন হয়ে গিয়েছে। হে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর, সাহেব (কবির্দেব)! চারি পবিত্র বেদ ও পবিত্র গীতায় আপনারই গুণগাণ গেয়েছেন। **স্বয়ং কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) বলছেন ঃ-**

বেদ হমারা ভেদ হে, মে না বেদন কি মাহি।
জিস বেদ সে মে মিলু, বেদ জানতে নহী।।

ভাবার্থ হল, চারি পবিত্র বেদে জ্ঞান পূর্ণ পরমাত্মার। বিধি পরন্ত পূজাবিধি কেবল ব্রহ্ম জ্যোতি নিরঞ্জন পর্যন্ত সীমিত। পরমেশ্বর কবীরের পূজা বিধির জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের জন্য পবিত্র বেদে ও পবিত্র গীতায় বলেছেন; ওই সম্পর্কে তো কোনো তত্ত্বদর্শী (গুরু) সন্তই বলতে পারবে। হয়তো স্বয়ং পরমেশ্বর বা তার পাঠানো কোনো প্রতিনিধি বাস্তবিক বলতে পারবেন। তার কাছ থেকে নাম (দীক্ষা) উপদেশ প্রাপ্ত করলেই পরম শান্তি ও মোক্ষ হবে।

।। পবিত্র শাস্ত্রতেও কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)-এর সাক্ষী আছে।।

এই প্রকার কবির পরমেশ্বর মুসলমানদের খারাপ বলেনি, পবিত্র কুরানকেও কোনো দিন খারাপ বলেনি। বা ভুল বলেনি। কেবল সেই মুল্লা ও কাজীকেই বলেছে যেকিনা কুরান শরিফের বাস্তবিক জ্ঞান সমাজকে না দিয়ে, তার বিপরীত সনমানী সাধনা করিয়েছেন। যেমন পবিত্র বেদে বোলনে বালা ব্রহ্ম বলেছিলেন, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেবের বিষয়ে, কেউ জন্ম নিয়ে অবতার রূপে আসে মানে, কেউ কোনদিন জন্ম নেয় না নিরাকার মানে, তবে তার জানকারী (পরিচয়) একমাত্র তত্ত্বদর্শী গুরুই দিতে পারবেন, আমিও জানি না (ব্রহ্মবলছে)। যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০-এ-এর প্রমাণ আছে, পবিত্র গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ তথা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪-এ আছে। যতক্ষণ না ওই তত্ত্বদর্শী মিলবে ততক্ষণ জীবের কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। এই সন্ত (গুরু) আপনাদের সামনে এসে গিয়েছেন ইনিই সেই গীতায় লেখা আছে সেই তত্ত্বদর্শী জগৎ গুরু রামপাল দাসজী, তাকে চেনো।

।। পবিত্র কুরান শরীফে প্রমাণ।।

পবিত্র কুরান শরীফ অধ্যায় সুরত ফুর্কানি সঃ ২৫, আয়ত ৫২ থেকে ৫৯-তে বলা হয়েছে, যে কি, বাস্তবে (ইবাদই কবীরা) পূজার যোগ্য কবীর অল্লাহ। এ কবীর ওই পূর্ণ পরমাত্মা, যিনি ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে, সাতদিনের দিন সিংহাসনে বিরাজমান হয়েছিলেন। তার খবর কোনো বাখবরয়ালার কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

পবিত্র কুরান শরীফ বোলনে বালা আল্লাহ স্বয়ং কোনো একজন কবীর নামক প্রভুর দিকে সংকেত করে, বলেছিলেন যেকি পূর্ণ পরমাত্মা কবিরের বিষয়ে আমিও জানি না। তারজন্য কোনো তত্ত্বদর্শী সন্ত (বা খবরয়ালা)-র কাছ জানো। তিনিই পরমাত্মার খবর সঠিক বলতে পারবেন। কবির্দেব এই বলেছিলেন, আমি স্বয়ং পরমাত্মা (আল্লাহ কবীর অকবিরু) আছি। আমার সুস্থ জ্ঞানের সংবাদ বাহক হয়ে আমি স্বয়ংই এসেছি, আমায় চেনো। তবে এই রকম আচার্য্য আগেও পরমেশ্বরের বাস্তবিক জ্ঞান জনতা পর্যন্ত্য পৌঁছতে দেয়নি। তারা বলে বেরাতো কবির অশিক্ষিত ও তো সংস্কৃত জানে না, আমরা তো শিক্ষিত, এই কথাটাই ভক্তগণকে প্রথমেই ভ্রমের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তবে এখন আর কেউ জনগন বা ভক্তগণকে ভ্রমের মধ্যে ফেলতে পারবে না কারণ আগে শুধু ব্রাহ্মণ ও ধনী লোকই শিক্ষিত ছিল, এখন সর্ব সমাজই প্রায়ই শিক্ষিত। সঠিক ব্যাপারটা ঠিক বুঝে নিতে পারবে, সত্যকে কখনও চেপে রাখা যায় না। এই ভক্তগণকে মূর্খ মনে করে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে পূজা পাঠ করা শিখিয়েছে তাছাড়া সময়ও নষ্ট হয়েছে কর্মেও বাধা করে রেখেছে। শাস্ত্রে যে পরমেশ্বর একই জনকে বুঝিয়েছেন, যে ওই একজনকে ভক্তি করলে আর কাউকে ভক্তি না করলেও হয়, সরল ভাবে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। যদি কেউ শাস্ত্র অনুযায়ী সাধনা করেন, তাহলে তার কোন দুঃখ থাকে না, সেই পরমেশ্বরই তার দুঃখ কষ্ট নিবারণ করে থাকেন। এখন এই আচার্য্যরা ভ্রষ্ট মার্গে আর কাউকে নিতে পারবে না কারণ সবাই শিক্ষিত হতে চলেছে। সল্লি অলাঃ-জ-স-দি মুহম্মদিন ফিল্ অজসাদি অল্লাহুম ম সল্লি অলা কবির্ (কবীর) মুহস্মিদ কুবুরি ফজাইলে জিক্র।

٥ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا
قَالَ عَبْدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَآءِ حَتّٰی یُفْضِیَ اِلَی الْعَرْشِ
مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَآئِرُ۔ رواه الترمذی وهكذا فی المشكوٰة لكن لیس فیها
حسن بل غریب فقط قال القاری و رواه النسائی وابن حبان وعزاه
السیوطی فی الجامع الی الترمذی و رقم له بالحسن وحكاه السیوطی فی
الدر من طریق ابن مردویه عن ابی هریرة ولیس فیه ما اجتنبت الكبائر
وفی الجامع الصغیر بروایة الطبرانی عن معقل ابن یسار لكل شی مفتاح
ومفتاح السموات قول لآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ورقم له بالضعف۔

হুজুরে অকদশ সল্লল্লাহু অলৈহী ব সল্লমের ইর্শাদ আছে যে, কোন বন্দা (ভক্ত) এমন নেই যেকি, সে যদি লাইলা-হ-ইল্লল্লাহহ বলার পরে আকাশের অর্থাৎ আসমানের দরজা তারজন্য না খোলে, এমন কি এই কলিমা সোজা অর্শ পর্যন্ত্য গিয়ে পৌঁছায়, তার কারণ এই, কবীরা যেন তাদের দোষের (পাপের) হাত থেকে বাঁচাতে থাকে।

ফ — কতটা ব ফজিলত আছে আর কুবুলিয়তের ইন্তিহা আছে যে, এই কলিমা (দোয়া শ্লোক) বরাহে রাস্ত অর্শে মুয়ল্লা পর্যন্ত্য পৌঁছায় আর এটা এখন জানা গিয়েছে যে, যদি কবীরা শব্দ গুনাহের (দোষের) সাথেও বলা হয় তাহলেও লাভ (নফা) ছাড়া সে সময়টাও খালি যায় না।

মুল্লা অলী কারী রহ ফরমাতে (আদেশ) আছে যে কি, কবাইর থেকে বাঁচার শর্ত স্বীকারের (কুবুলের) শীঘ্রতা আর আসমানের (আকাশের) সমস্ত দরজা খোলার এতাবরের (প্রতীক্ষায়) আছেনয়তো সবাব (পবিত্র পাক) আর কুবুলের (অনুগত স্বীকারের) দ্বারা কবাইরেরও (কবীরেরও) সাথ খালি যাবে না।

বাজ উলেমা এই হদীসের (গ্রন্থের) মানে ব্যক্ত (বয়ান) আদেশ (ফরমায়া) করেছেন যে, এমন ব্যক্তির বাস্তে (জন্যে) মরার পরে তার রুহের (আত্মার) এজাজে আকাশের (আসমানের) সমস্ত দরজা খুলে যাবে।

আরেক হদীসে আছে যে, দুটো কলিমে (শ্লোক বা দোয়া) এমন আছে যে, তার মধ্যে একের জন্য অর্শের নীচে কোনো মুন্তহা নেই। দ্বিতীয় হল আসমান (আকাশ) আর জমীনকে (পৃথিবীকে) ভরিয়ে দেয় —

এক 'লাইলা-হ-ইল্লল্লাহ আছে, দ্বিতীয় 'অল্লাহু আকবর' (কবীর) আছেন।

।। পবিত্র বেদেতে প্রমাণ।।

কবির্দেব নিজে স্বয়ংই নিজের জ্ঞানের দূত হয়ে এসে থাকেন, তথা নিজের স্বস্থ জ্ঞান (বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞান) স্বয়ংই করিয়ে থাকেন। কবির পরমেশ্বরের অমৃতবাণীঃ-

শব্দ ঃ— অবিগত সে চল আয়ে, কই মেরা ভেদ মর্ম নহী পায়া। (টেক) না আমার জন্ম না গর্ভ বসেরা, বালক হো দিখলায়া। কাশী নগর জল কমল পর ডেরা, বহা জুলাহে নে পায়া মাতা পিতা মেরে কুছ নহী, না মেরে ঘর দাসী, (পত্নী) জুলাহা কা সুত আন কহায়া, জগৎ করে মেরী হাসি। পাঁচ তত্ত্ব কা ধর নহী মেরা, জানু জ্ঞান অপারা। সত্য সরূপী (বাস্তবিক) নাম সাহেব (পূর্ণ প্রভু) কা সই নাম হমারা। অধর দ্বীপ (উপর সতলোকে) গগন গুফা মে তহা নিজ বস্তু সারা জোত সরূপী অলখ নিরঞ্জন (ব্রহ্ম)-ভী ধরতা ধ্যান হমারা, হাড় চাম, লহু না মেরে কই জানে সত্য নাম উপাসী। তারণ তোরণ অভয় পদ দাতা, মে হুঁ কবীর অবিনাশী।

উপরোক্ত শব্দে কবির পরমেশ্বর বলছেন, না তো আমার কোনো পত্নী আছে, নাহি মেরা পাঁচ তত্ত্ব (হাড়, চামড়া, রক্ত অর্থাৎ নাড়ির সঙ্গে জোড়ানো কায়া)-র শরীর আছে, আমি সয়ম্ভু, (নিজের ইচ্ছায় যেখানে সেখানে যে কোনো বয়সে প্রকট হতে পারি) কাশী লহরতারা নামক পুকুরের জলে পদ্মফুলের উপর স্বয়ং প্রকট হয়ে বালক রূপে ছিলাম। ওখান থেকে আমাকে

নীরু নামক জুলাহা (তাঁতী) উঠিয়ে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। যে বাস্তবিক নাম পরমেশ্বরের (বেদে আছে কবির্দেব) গুরু গ্রন্থতে হক্কা কবীর, কুরান শরীফে অল্লাহ কবীরন্, ওই নাম আমারই আছে, আমি উপরে ঋতুধামে (সতলোকে) থাকি। অতএব সবার ভগবান জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) -ও আমার পূজা করে থাকে। এর প্রমাণ সত্যার্থ প্রকাশ সাত সমুল্লাস (পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩ দীনানগর পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত)-তেও আছে। স্বামী দয়ানন্দ জী যজুর্বেদ অধ্যায় ১৩ মন্ত্র ৪ তথা ঋগবেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৪৯ মন্ত্র ১-তে অনুবাদ করেছে। যা বেদ বলা ব্রহ্ম বলছে (৫ঋঋগবেদ ম. ১০ থেকে ৪৯ ম. ১ তথা ৬ ঋ যজুর্বেদ অধ্যায় ১৩ ম. ৪-এতে) আছে যে, হে মানব (মনুষ্য) যিনি সৃষ্টির আগে সর্ব কিছু উৎপত্তি করেছেন এবং সর্বের স্বামী ছিলেন ও আছেন, পরেও থাকবেন তিনি সর্ব সৃষ্টি বানিয়ে ধারণ করে রয়েছেন। ওই সুখ স্বরূপী পরমাত্মার ভক্তি যেমন আমি (ব্রহ্ম, অন্যান্য দেবদেবী-রা সাধনা করে)- করি সেই রকম তোমরাও ভক্তি করো।

।। প্রমান ঃ- ১ পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ২৯ মন্ত্র ২৫ ।।

সমিদ্ধোৎঅদ্য মনুষ্য দুরোণে দেবো দেবান্যজসি জাত বেদঃ।
আ চ বহ মিত্র মহশ্চিকিত্বান্ত্বং দুতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ।।২৫।।

সমিদ্ধঃ-অদ্য-মনুষঃ-দুরোণে-দেবঃ-দেবান-যজ্-অসি-জাত-বেদঃ-আ-চ-বহ-মিত্র মহঃ-চিকিত্বান্-ত্বম্-দুতঃ-কবির্-অসি-প্রচেতাঃ।

অনুবাদ ঃ- (অদ্য) আজ বা বর্তমানে (দুরোণে) শরীর রূপ মহলে দুরাচার পূর্বক (মনুষ্যঃ) মিথ্যা পূজাতে লীন মননশীল ব্যক্তিদের (সমিদ্ধঃ) লাগানো আগুন অর্থাৎ শাস্ত্র বিধির বাইরে বর্তমান পূজা যা হানিকারক হয়ে থাকে, আগুন যেমন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় এই রকম সাধকের জীবন শাস্ত্রবিরুদ্ধ সাধনার দ্বারা নষ্ট করে দেয়। ওই স্থানে (দেবান্) দেবতাদের (দেবঃ) দেবতা (জাতবেদঃ) পূর্ণ পরমাত্মা সতপুরুষের বাস্তবিক (যজ্) পূজা (অসি) আছে। (আ) দয়ালু (মিত্রমহঃ) জীবের বাস্তবিক সাথী পূর্ণ পরমাত্মার (চিকিত্বান) স্বস্থ জ্ঞান বা যথার্থ ভক্তি (দূতঃ) সংবাদবাহক রূপে (বহ) নিয়ে আনে যিনি (চ) তথা (প্রচেতাঃ) বোধ করিয়ে থাকেন (ত্বম্) আপনি বা নিজেই (কবির্দেব বা কবির পরমেশ্বর) কবির (অসি) আছেন।

ভাবার্থ ঃ- বর্তমানে এই শরীর রূপ মহলে দূরাচার পূর্বক মিথ্যা পূজাতে (শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে) লীন মননশীল ব্যক্তিদের ভিতরে লেগে রয়েছে যে আগুণ অর্থাৎ এই শাস্ত্রবিধির বাইরে বর্তমানের (আজকালের) যে হানিকারক পূজা হচ্ছে অতএব এমন হানি যেমন আগুণ লাগিয়ে ভস্ম করে দেয়, ঠিক এই রকম শাস্ত্রবিরুদ্ধ সাধনা করলে সাধকের জীবনকে নষ্ট করে ভস্ম করে দিচ্ছে। সেই (শাস্ত্রবিধির অনুযায়ী) স্থানে দেবতাদেরও দেবতা, পূর্ণ পরমাত্মা সত পুরুষের সঠিক (বাস্তবিক) পূজা করতে হয়। জীবের বাস্তবিক দয়ালু সাথী পূর্ণ পরমাত্মার সাস্থ্য বাস্তবিক সত্য জ্ঞান বা সঠিক ভক্তি সংবাদ বাহক রূপে নিয়ে আসেন আর বোধ (জ্ঞান) করিয়েছেন যে তিনিই স্বয়ং (কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর) কবীর আছেন। অতএব যে সময় ভক্ত সমাজকে অত্যাধিক শাস্ত্রবিধি ছেড়ে (ত্যাগকরে) মনমত আচরণ (পূজা) করানো হয়ে থাকে। সেই সময় কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) তত্ত্বজ্ঞানকে প্রকট করেন।

।। প্রমাণ ২. পবিত্র সামবেদ সংখ্যা ১৪০০ তে ।।

সংখ্যা নং ৩৫৯ সামবেদ অধ্যায় নং ৪-এর খন্ড নং ২৫-এর শ্লোক ৮-এতে —

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবির মিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মনো ধর্তা বজ্রী পুরষ্টুতঃ।। ১৪।।

পুরাম্-ভিন্দুঃ-যুবা-কবীর-অমিত-ঔজা-অজায়ত-ইন্দ্রঃ-বিশ্বস্য-কর্মণঃ ধর্তা বজ্রী-পুরুষ্টুতঃ।

শব্দার্থ ঃ- (যুবা) পূর্ণ সমর্থ (কবির্) কবির্দেব বা কবির পরমেশ্বর (অমিতঔজা) বিশাল শক্তি যুক্ত বা সর্ব শক্তিমান (অজায়ত) তেজপুঞ্জর শরীর মায়াবয়ী বানিয়ে (ধর্তা) প্রকট হয়ে বা অবতার ধারণ করে (বজ্রী) নিজের সত্যশব্দ ও সত্যনাম রূপী শস্ত্র (অস্ত্র) দিয়ে (পুরাম্) কাল-ব্রহ্মর পাপ রূপী বন্ধন রূপী কেল্লাকে (প্রাচীর) (ভিন্দুঃ) ভেঙে থাকেন যিনি বা খন্ড খন্ড যিনি করে (ইন্দ্রঃ) সর্ব সুখ দায়ক পরমেশ্বর (বিশ্বস্য)সর্ব জগতের সব প্রাণীদের (কর্মণঃ) মন দ্বারা সত্য ভক্তি কর্ম বা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে অনন্য মন দ্বারা ধার্মিক কর্মের দ্বারা সত্য ভক্তিতে (পুরুষ্টুতঃ) স্তুতি উপাসনা করার যোগ্য আছে।

যেমন বাচ্চা ও বৃদ্ধের সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা হয় না। যুবা ব্যক্তিই সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা রাখতে পারে। এমনই পরব্রহ্ম-ব্রহ্ম-ত্রিলোকের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং অন্য দেবী দেবতাদেরকে বাচ্চা ও বৃদ্ধ জানবে ভেবো, কবীর পরমেশ্বরকে যুবার উপমা বেদেতেই দিয়েছে।

ভাবার্থ ঃ- যে কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে সংসারে আসেন তিনি সর্বশক্তিমান আছেন, তথা কাল ব্রহ্মরূপীর দেওয়াল (প্রাচীর) ভাঙনে বালা, তিনিই সর্ব সুখদাতা ও সর্ব ব্যক্তির ও দেবতাদেরও পূজার যোগ্য।

সংখ্যা নং ১৪০০ সামবেদ উতাচিক অধ্যায় নং ১২ খন্ড নং ৩ শ্লোক নং ৫

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যারু বসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচস্য চম্বোঃ পুযমানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ।। ৫।।

ভদ্রা-বস্ত্রা-সমন্যা-বসয়নঃ-মহান্-কবির্-নিবচনানি-শংসন্-আবচস্ব-চম্বোঃ পুয়মানঃ-বিচক্ষণঃ-জাগৃবিঃ-দেবঃ-বীতৌ।

অনুবাদ ঃ- (বিচক্ষণঃ) চতুর ব্যক্তিরা (আবচ্যস্ব) নিজের বচন দিয়ে পূর্ণ ব্রহ্মের পূজার কথা না বলে, অন্য উপাসনার পথ দর্শন করায়ে, অমৃতের স্থানে (পুয়মানঃ) অন্য উপাসনা ল যেমন ভুত-প্রেত পূজা, পিত্র- পূজা, তিন গুণের পূজা (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতোগুণ-বিষ্ণু-ও তমোগুণ-শিব-শঙ্কর, ব্রহ্ম-কালের পূজা) রূপকে (চম্বোঃ) আদরের সঙ্গে আচমন করে থাকে অর্থাৎ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ভুল জ্ঞানকে সমাপ্ত করার জন্য (ভদ্রা) পরমসুখদায়ক (মহান কবির্) মহান কবির অর্থাৎ পূর্ণ-পরমাত্মা কবীর (বস্ত্রা) সশরীর সাধারণ বেশভূষাতে 'অর্থাৎ বস্ত্রের অর্থ হল বেশভূষা, সাধুভাষায় একে চোলাও বলে থাকে, চোলার অর্থ শরীর। যদি কোন সাধুর মৃত্যু হয় তখন বলে চোলা ছেড়ে চলে গিয়েছে (সমন্যা) নিজের সতলোক বালা শরীরের সদৃশ ছাড়া অন্য শরীর তেজপুঞ্জ ধারণ করে (বসানঃ) সাধারণ ব্যক্তির মত, জীবন কাটিয়ে কিছু দিন সংসারে অতিথীর মত থেকে (নিবচনানি) নিজের শব্দবলী কবির বাণী আদির মাধ্যমে সত্য জ্ঞান (শংসন্) বর্ণন করে (দেব) পূর্ণ পরমাত্মার (বিতৌ) লুকানো সর্গুণ-নির্গুণ জ্ঞান রূপী ধনকে (জাগৃবিঃ) জাগ্রত করেন।

ভাবার্থ ঃ-শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ সাধনা রূপী পুঁজ (ঘা পেচরা হলে যে ময়লা বের হয়) ঘাতক সাধনার উপর আধারিত ভক্ত ঐ রূপ পুঁজের আচমন করে থাকে। কারণ তাতে আত্মার ভীষণ ক্ষতি হয়।

সমাজের কল্যাণে কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তত্ত্বজ্ঞান বোঝাবার জন্য নিজেই প্রকট হয়ে থাকেন। ওই নিজের তেজোময় শরীরের উপর অন্য শরীর রূপী বস্ত্র (হল্কা তেজের) পড়ে আসেন, (কেননা পরমেশ্বরের বাস্তবিক তেজোময় শরীরকে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না)। কিছুদিন সাধারণ ব্যক্তির মত জীবনধারণ করে লীলা করেন তথা, পরমেশ্বরকে পাওয়ার জ্ঞান উজাগর করেন।

।। ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ ।।

শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজন্তি শুভন্তি বহ্নি মরুতো গনেন।
কবির্গীভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্তসোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্।। ১৭।।

শিশুম্ জজ্ঞানম্ হর্য তম্ মৃজন্তি সুম্ভন্তি বহিন মরুতঃ গনেন্। কবির্গিভি কাব্যে না কবির সন্ত্ সোমঃ পবিত্রম্ অত্যেতি রেভন।।

অনুবাদ ঃ- পূর্ণ পরমাত্মা (হর্য শিশুম্) বিলক্ষণ মানুষের বাচ্চা রূপে (জজ্ঞানম্) জেনে বুঝে প্রকট হন তথা নিজের তত্ত্বজ্ঞানকে (তম্) ওই সময় (মৃজন্তি) নির্মলতার সাথে (শুম্ভন্তি) উচ্চারণ করেন। (বহ্নি) প্রভু পাওয়ার বিরহ অভিলাষা (মরুতঃ) ভক্ত (গনেন)সবার জন্য (কাব্যেনা) কবিতার দ্বারা (পবিত্রম্ অত্যেতি) অত্যধিক বাণী নির্মলতার সাথে (কবীর গীর্ভি) কবীর বাণী দ্বারা (রেভন্) উচ্চস্বরে সম্বোধন যিনি বলেন (কবির্ সন্ত্ সোমঃ) তিনি অমর পুরুষ সতপুরুষ অর্থাৎ ঋষি রূপে স্বয়ং কবিরদেবই আছেন। পরন্তু ওই পরমাত্মাকে না চিনে কবি বলতো কিন্তু তিনি পূর্ণ পরমাত্মা তার নাম বাস্তবিক কবির্দেব।

ভাবার্থ ঃ- ঋগ্‌বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত নং ৯৬ মন্ত্র ১৬ তে বলা হয়েছে, এসো পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম জানি এই মন্ত্র ১৭ তে ওই পরমাত্মার নাম পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়েছে। বেদ বলা ব্রহ্মবলছেন, পূর্ণ পরমাত্মা বিলক্ষণ মনুষ্যের বাচ্চার রূপে প্রকট হয়ে কবির্দেব নিজের বাস্তবিক জ্ঞান নিজের কবির বাণীর দ্বারা নির্মল জ্ঞান নিজের হংস আত্মাদের অর্থাৎ পুণ্যাত্মা অনুযায়ীদের, কবিতা, লোকোক্তির দ্বারা সম্বোধন করে থাকেন অর্থাৎ উচ্চারণ করে বর্ণনা করে থাকেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে, ওই সময় প্রকট হওয়া পরমাত্মাকে না চিনে, কেবল ঋষি, সাধু বা কবি মেনে নিতেন, ওই পরমাত্মা স্বয়ংই বলেন যে আমিই পূর্ণ ব্রহ্ম। কিন্তু লোকবেদের আধারে পরমাত্মাকে নিরাকার ভেবে, প্রজাগণ চিনত না। গরীব দাস মহারাজ কাশীতে প্রকট হওয়া পরমাত্মাকে চিনে তার মহিমা করেছিলেন আর ওই পরমেশ্বর দ্বারা নিজের মহিমা গরীব দাস মহারাজ নিজেই বর্ণনা করে গিয়েছেন বাণীর মাধ্যমে —

গরীব, জাতি হমারী জগৎ গুরু, পরমেশ্বর হে পন্থ।
দাস গরীব লিখ পড়ে নাম নিরঞ্জন কন্ত।।

গরীব, হম হি অলখ অল্লাহ হে, কুতুব গোস ওর পীর।
গরীব দাস খানিক ধনী, হমরা নাম কবীর।।

গরীব, এ স্বামী সৃষ্টা মে, সৃষ্টি হমরে তীর।
দাস গরীব অধর বসু, অবিগত সত কবীর।।

কবিতায় এত স্পষ্ট বলার পরও তাহাকে কবি, সাধু, ঋষি ভক্ত ও তাঁতী বলে জানতো। কিন্তু তিনি হলেন পূর্ণ ব্রহ্ম(পূর্ণ পরমাত্মা)। তাহার বাস্তবিক নাম কবির্দেব। তবে তত্ত্বজ্ঞানহীন ঋষিরা ও সাধু গুরুদের অজ্ঞান সিদ্ধান্তের আধারের উপর আধারিত প্রজাগন ওই সময়, অতিথি রূপে প্রকট হওয়া পরমাত্মাকে চেনেনি। ওই অজ্ঞানী ঋষি, সাধু, গুরুরা পরমাত্মাকে নিরাকার, এই কথা বলে বুঝিয়েছিল।

।। ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৮ ।।

ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
তৃতীয়ং ধাম্ মহিষঃ সিষাসন্তসোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ।। ১৮।।

ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ সহস্রানীথঃ পদবীঃ কবীনাম। তৃতীয়ম্ ধাম মহিষঃ সিষা সন্ত্ সোমঃ বিরাজমানু রাজতি স্টুপ্।

অনুবাদ ঃ- বেদ বলা ব্রহ্ম(কাল) বলছে যেকি, (য) যে পূর্ণ পরমাত্মা বিলক্ষণ বাচ্চা রূপে এসে (কবীনাম্) প্রসিদ্ধ কবির (পদবীঃ) উপাধি প্রাপ্ত করে অর্থাৎ এক সন্ত বা ঋষির ভূমিকা করে তিনি (ঋষিকৃতা) সাধু রূপে প্রকট হয়, প্রভু দ্বারা রচিত (সহস্রানীথঃ) হাজার হাজার বাণী (ঋষিমনা) সাধু স্বভাব বালে ব্যক্তিদের জন্য অর্থাৎ ভক্তদের জন্য (স্বর্ষাঃ) স্বর্গ তুল্য আনন্দ দায়ক হয়ে থাকে। (সোম) ওই অমর পুরুষ অর্থাৎ সতপুরুষ (তৃতীয়া) তৃতীয় (ধাম) মুক্তি লোকে বা সতলোকে (মহিষঃ) সুদৃঢ় পৃথিবীকে (সিষা) স্থাপিত করার (অনু) পরে (সন্ত) মানব সদৃশ সন্ত রূপে হয়ে থাকেন (স্টুপ) গুবন্দ বা গুম্বজের মত উঁচুতে সিংহাসনের পর (বিরাজমনু রাজতি) উজ্জ্বল স্থুল আকারে বা মানব সদৃশ তেজোময় শরীরে বিরাজমান আছেন।

ভাবার্থঃ- মন্ত্র ১৭-তে বলা হয়েছে, কর্বির্দেব শিশু রূপ ধারণ করে নেন, লীলা করতে করতে বড় হয়। কবির মতো কবিতা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করে থাকেন, সেই জন্য কবির পদবী প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ তাকে কবি, ঋষি, সাধু বলে থাকে, বাস্তবে তিনি পূর্ণ পরমাত্মা কবির-ই আছেন। তাহার দ্বারা রচিত অমৃত বাণী কবীর বাণী (কবির্বাণী) বলা হয়ে থাকে যিনি কিনা ভক্তদের জন্য স্বর্গের তুল্য সুখদায়ী হয়ে থাকে। ওই পরমাত্মা তৃতীয় মুক্তিধাম বা সতলোক স্থাপনা করে এক গুম্বজের মতো সিংহাসনে তেজোময় মানব সদৃশ শরীরের আকারে বিরাজমান আছেন। এই মন্ত্রে তৃতীয় ধাম সতলোককে বলা হয়েছে। যেমন এক ব্রহ্মের লোক হল, একুশ ব্রহ্মান্ড নিয়ে, দ্বিতীয় পরব্রহ্মের লোক হল সাত সংখ ব্রহ্মান্ড ক্ষেত্র নিয়ে, তৃতীয় পরম অক্ষর ব্রহ্ম বা পূর্ণ ব্রহ্মের সতলোক আছে, কেননা পূর্ণ ব্রহ্ম, সতলোকে সতপুরুষ রূপে বিরাজমান হয়ে নিচের লোক রচনা করেছিলেন। এই জন্য নীচের লোক (ধাম)-এরও গননা করা হয়েছে।

কবীর পরমেশ্বরকে বা তাহার তৃতীয় ধাম সতলোকে গিয়ে স্ব-চোক্ষে দেখে প্রমানের সহিত গরীব দাস বলেছেনঃ-

অর্স কুর্স পর সফেদ গুম্বজ হে, জহাঁ সদগুরু কা ডেরা।

ভাবার্থ ঃ- আকাশের উপরের স্তরের উপর কবীর পরমেশ্বর এক সাদা গুবন্দ (গুম্বজ)-এর মধ্যে থাকেন।

।। ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৯ ।।

চমুষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপস আয়ুধানী বিভ্রত্।
অপামুর্ভি সচমাণাঃ সমুদ্রং তুরিযং ধাম মহিষো বিবক্তি।। ১৯।।

চমুসৎ শ্যেনঃ শকুনঃ বিভৃত্বা গোবিন্দুঃ দ্রপ্স আয়ুধানী বিভ্রৎ। অপামুর্ভি সচমানাঃ সমুদ্রং তুরীয়ম্ ধাম মহিষঃ বিবক্তি।।

অনুবাদ ঃ- (চমুসৎ) পবিত্র (গোবিন্দুঃ) কামধেনু রূপী সর্ব মনোকামনা পূর্ণ করে থাকা পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (বিভৃত্বা) সমস্তকে বা সর্বস্বকে পালন করে থাকে (শ্যেনঃ) সাদা রং যুক্ত (শকুনঃ) শুভ লক্ষণ যুক্ত (চমুস্য) সর্বশক্তিমান হয়ে থাকে (দ্রপ্র) যেমন দুধ থেকে দই বানানো পদ্ধতি হয়ে থাকে, ঠিক সেই রূপ শাস্ত্রানুকুল সাধনা থেকে দই রূপী পূর্ণ মুক্তি দাতা (আয়ুধানী) তত্ত্বজ্ঞান রূপী কাল জাল বিনাশক ধনুষ যুক্ত, সারঙ্গপাণী প্রভু আছে (সচমানঃ) বাস্তবিক (বিভ্রৎ) সর্বকে পালন পোষণ করেন। (অপমুর্ভিঃ) গভীর জলযুক্ত (সমুদ্রম্) সাগরের মত গহরা গভীর বা বিশাল (তুরীযম) চতুর্থ (ধাম) লোক বা অনামী লোকে (মহিষঃ) উজ্জল সুদৃঢ় পৃথিবীর উপর (বিবক্তি) আলাদা স্থানে ভিন্ন ভাবে থাকে এর খবর (সংবাদ)কবির্দেব স্বয়ংই ভিন্ন ভিন্ন করে বিস্তার ভাবে দেন।

ভাবার্থ ঃ- মন্ত্র ১৮-তে বলা হয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তৃতীয় মুক্তিধাম অর্থাৎ সতলোকে এক গুম্বজে থাকেন। এই মন্ত্র ১৯ তে বলা হয়েছে যে, অত্যধিক সাদা রং বালা পূর্ণ প্রভু যিনি, কামধেনুর মত সব মনের কামনা পূরণ করে থাকেন, উনিই বাস্তবে সর্বের পালন কর্ত্তা। এই কবির্দেব যিনি মৃত্যুলোকে শিশুরূপ ধারণ করে এসেছিলেন, যেমন দুধ থেকে দই হয় ঠিক এইভাবে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা বলে থাকে, পূর্ণ মোক্ষ রূপী দই প্রদান করে থাকা তত্ত্বজ্ঞান রূপী শাস্ত্র বা ধনুষ যুক্ত হওয়াতে সারঙ্গবাণী অতএব সমুদ্র জলের স্রোত হয় তেমনই পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা সর্বের উৎপত্তি হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৩ এতে বলা হয়েছে, সংসার রূপী বৃক্ষকে, তত্ত্বজ্ঞান রূপী শস্ত্র বা অস্ত্র দ্বারা কেটে এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সংশয় সমাপ্ত করার পরে, ওই পরম পদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিৎ। যেখানে যাওয়া পর সাধক ফিরে আর সংসারের ৮৪ লক্ষ যোনিতে আসতে হয় না পূর্ণ সুখ লাভ করে থাকে। যে পরমেশ্বরের দ্বারা সর্ব সংসার রূপী বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তারের প্রাপ্ত হয়েছে। ওই পূর্ণ প্রভু চতুর্থ ধাম অর্থাৎ অনামীলোকে থাকেন, যেমন প্রথম সতলোক, দ্বিতীয় অলখ লোক, তৃতীয় অগম লোক, চৌথা (চতুর্থ অনামী লোক আছে। এই জন্য এই মন্ত্র ১৯ শে স্পষ্ট করেছে যে, কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)-ই অনামী পুরুষরূপে চতুর্থ ধাম বা অনামীলোকেও অন্য তেজোময় রূপ ধারণ করে থাকেন।

।। ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ২০ ।।

মর্যো ন শুভ্র স্তন্বং মৃজানোৎত্যো ন সৃত্বা সনযে ধনানাম্।
বৃষেব যুথা পরি কোশমর্ষনকনিক্রদচ্চম্বোরুরা বিবেশ।।২০।।

মর্যঃ ন শুভ্রস্তন্বম্ মৃজানঃ অত্যঃ ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্। বৃষেব যুথা পরিকোশম্ অর্ষন কনিক্রদৎ চম্বো ইরা বিবেশ।

অনুবাদ ঃ- পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব যে চতুর্থ ধাম বা অনামী লোকে ও তৃতীয়ধাম সতলোকে থাকেন, ওই পরমাত্মা (ন মর্যঃ) মানুষের মত পরন্তু নাশরহিত অর্থাৎ অমর (মৃজনঃ) নির্মলমুখমন্ডল যুক্ত আকারে (অত্যঃ) অত্যাধিক (শুভ্র স্তন্বম্) বিশাল শ্বেত (সাদা) শরীর ধারণ করে উপরের লোকে বিদ্যমান আছেন তথা ওখান থেকে (সৃত্বা) দ্রুত বেগে বা হেঁটে, যেমন কেউ না জানতে পারে সেই সমরূপ পরমাত্মা (ইরা) পৃথীবি উপর (বিবেশ) অন্য বেশভূষা বা অন্য রূপ (চম্বোঃ) ধারণ করে আসেন। সতলোক ও পৃথিবী লোকে লীলা করেন (যথা) অনেক বড় সমুহের বাস্তবিক (সনয়ে) সনাতন পূজার (বৃষেব) বর্ষা করেন (ন ধনানাম্) ওই রাম নামের কামাইয়ের নির্ধনকে (কনিক্রদৎ) হাল্কা আওয়াজে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা মনে মনে উচ্চারণ করে পূজা করান, যাতে অসংখ্য অনুযায়ীদের সমস্ত সংঘ পূর্ব বালা সুখ সাগর রূপ অমৃত খাজানা অর্থাৎ সতলোকের প্রাপ্তি হওয়া যায় পূজা করে।

ভাবার্থঃ- পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) উপর তৃতীয়ধাম মানে সতলোকে থাকেন আবার তাকেই মুক্তিধামও বলা হয়। আবার ওই পরমেশ্বর অন্য মনুষ্য রূপ ধারণ করে, চতুর্থ ধাম বা অনামী লোকেও থাকেন। ওই পরমাত্মা ওই রকম মানুষ বালা সমরূপ সুন্দর মুখমন্ডল যুক্ত শ্বেত শরীর যুক্ত আকারে এই পৃথিবীতেও আসেন। আর বাস্তবিক পূজাবিধির জ্ঞান করিয়ে অনেক অনুযায়ী সমুহকে পুরা সংঘ সত্য ভক্তির ধনী বানিয়ে দেন। অসংখ্য অনুযায়ীর পুরো সংঘ সত্য ভক্তির কামাইতে পূর্ব বালা সুখময় লোক পূর্ণ মুক্তির খাজানা সতলোককে সাধনা করিয়ে প্রাপ্তি করান।

।। অথর্ববেদ কান্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৭ ।।

(সন্তরাম পাল দাস দ্বারা ভাষা ভাষ্য)

যোৎথর্বান পিত্তরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ।
ত্বং বিশ্বেষাং জনিতা য়থাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ৎ স্বধাবান্।। ৭।।

যঃ-অথর্বানম্-পিত্তরম্-দেববন্ধুম্-বৃহস্পতিম্-নমসা-অব-চ-গচ্ছাৎ-ত্বম-বিশ্বেষাম্-জনিতা-যথা-সঃ-কবিদেবঃ-ন-দভায়ৎ-স্বধাবান।

অনুবাদ ঃ-(যঃ) যে (অথর্বানম্) অচল বা অবিনাশী (পিত্তরম্) জগৎপিতা (দেববন্ধুম্) ভক্তের বাস্তবিক সাথী বা আত্মার আধার (বৃহস্পতিম) সবার বড় স্বামী অর্থাৎ জ্ঞান দাতা জগৎগুরু (চ) তথা (নমসা) বিনম্র পূজারী বিধিমত সাধক (অব) সুরক্ষার সাথে (গচ্ছাৎ) যারা সতলোকে চলে গিয়েছে, তাদের সতলোকে নিয়ে গিয়ে থাকেন। (বিশ্বেষাম্) সর্ব ব্রহ্মান্ডকে (জনিতা) রচয়িতা কালের মত ধোখা (ঠকায়না) (স্বধাবান)স্বভাব বা গুণবালা (যথা) যেমন হয় তেমনিই (সঃ) তিনি (ত্বম) মোদের (কবিদেবঃ কবির/দেব) কবীর পরমেশ্বর বা কবিরদেব।

ভাবার্থ ঃ- যে পরমেশ্বরের বিষয়ে বলা হচ্ছে ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রবিণম্, ত্বমেব সর্বম্ মম্ দেব দেব। ওই যিনি অবিনাশী সবার মাতা পিতা, তথা ভাই, সখা, ও জগৎগুরু রূপে সবাইকে সত্য ভক্তি প্রদান করে সতলোকে নিয়ে যাওয়াবালা, কাল, (ব্রহ্মের)-এর মত ঠকায় না। সর্ব ব্রহ্মান্ড রচনা করনে বালা কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর)।

।। কবির সাহেব চারি যুগেই আসেন।।

সতগুরু পুরুষ কবীর হে, চারো যুগ প্রবান।
ঝুঠে গুরবা মর গয়ে, হো গয়ে ভূত মসান।।

(সত্যযুগে কবির্দেব (কবির সাহেব) সতসুকৃত নামে প্রকট হয়েছিলেন)

তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে শ্রদ্ধালু শঙ্কা ব্যক্ত করতে যে, জুলাহ (তাঁতী) রূপে কবীর সাহেব তো বি.সঁ.১৪৫৫ (সন্ ১৩৯৮গ্ন-তে কাশীতে এসেছিলেন। বেদে যে কবির্দেব তিনি কাশীতে জুলাহ (তাঁতী) কি করে পরমাত্মা হতে পারে?

এই বিষয়ে আমি তার দাস (সন্ত রামপাল দাস)-এর প্রার্থনা যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবীর দেব (কবীর পরমেশ্বর) বেদের জ্ঞানের পূর্বে সতলোকেই বিদ্যমান ছিলেন। তথা নিজের বাস্তবিক জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) দেওয়ার জন্য চারি যুগে স্বয়ং প্রকট হয়ে থাকেন। সত্যযুগে সতসুকৃত নামে, ত্রেতা যুগে মুনিন্দ্র নামে, দ্বাপর যুগে করুণাময় নামে এবং কলিযুগে বাস্তবিক কবির্দেব (কবীর প্রভু) নামে প্রকট হয়েছেন। এ ছাড়া অন্য রূপ ধারণ করে যে কোনো সময়ে প্রকট হয়ে নিজের লীলা করে অন্তর্ধান হয়ে যেতেন। ওই সময় লীলা করতে আসা প্রভুকে, প্রভুর শ্রদ্ধালুরাও চিনতে পারেনি। কেননা সর্ব মহর্ষি ও সাধুরা প্রভুকে নিরাকার বুঝিয়েছিল। বাস্তবে যে তিনি আকার তা এই মহর্ষিরা বা সাধুরা জানতেন না। পরমেশ্বর মনুষ্য সদৃশ্য শরীর যুক্ত। কিন্তু পরমেশ্বরের শরীর পাঁচ তত্ত্ব নাড়ী যোগ দিয়ে বানানো নয়। এক নুর তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। পূর্ণ পরমাত্মা যখন তখন প্রকট হয়ে থাকেন কোন মায়ের গর্ভে জন্ম নেন না, কেননা তিনি সর্বকে উৎপত্তি করার কর্ত্তা।

পূর্ণ প্রভু কবীর (কবির্দেব) সত্যযুগে সতসুকৃত নামে স্বয়ং প্রকট হয়েছিলেন। ওই সময় গরুড়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু তথা শিব আদিকে সতজ্ঞান বুঝিয়েছিলেন। শ্রী মনুকেও তত্বজ্ঞান বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনু পরমেশ্বরের জ্ঞানকে সত্য না জেনে ব্রহ্মার কাছ থেকে শুনে বেদের জ্ঞানের উপর আধারিত হয়ে তথা নিজের দ্বারা বেদের নিষকর্ষর উপরই আরুঢ় ছিলেন। এরপরে মনু পরমেশ্বর সতসুকৃত জীকে উপহাস করতে লাগলেন বলতেন আপনি বিপরীত জ্ঞান বলছেন বলতে লাগলেন। এই জন্য পরমেশ্বর সতসুকৃতের উর্ফ নাম বামদেব বের করে নিয়েছেন (বামের অর্থ হল উল্টো যেমন বিপরীত হাত মানে বাম হাত অর্থাৎ উল্টো হাতও বলা হয়, যেমন ডান হাতকে সোজা হাত বলা হয়।

এই প্রকার সত্যযুগে পরমেশ্বর কবির্দেব, যিনি সতসুকৃত নামে এসেছিলেন ওই সময়ের ঋষিদেরও সাধকদের বাস্তবিক জ্ঞান বুঝাতেন। কিন্তু ঋষিরা স্বীকার করেনি। সতসুকৃত নামের স্থানে পরমেশ্বরকে "বামদেব বলতে লাগলেন।

এই জন্য যজুর্বেদে অধ্যায় ১২ মন্ত্র নং ৪-এতে বিবরণ আছে, যজুর্বেদের বাস্তবিক জ্ঞানকে বাসদেব ঋষিই ঠিক জেনেছেন এবং অন্যকেও বুঝিয়েছেন। পবিত্রবেদের জ্ঞান বোঝার জন্য কৃপা করে বিচার করেন, যেমন যজুর্বেদ এক পবিত্র গ্রন্থ (পুস্তক)। এর বিষয়ে সংস্কৃত ভাষাতে বিবরণ করেছে যেমন, যেখানে যজুঃ বা যজুম্ আদি শব্দ লিখলেও, তবুও পবিত্র পুস্তক যজুর্বেদেরই বোধ বোঝায়। এই প্রকার পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম কবির্দেব। একে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কবীর সাহেব,

কবীর পরমেশ্বর বলা হয়েছে। কোন এক শ্রদ্ধালু শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে, কবির্ কে কবীর কেমন করে সিদ্ধ করে দিয়েছেন। ব্যাকরণ দৃষ্টিকোণ থেকে কবিঃ-র অর্থ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে যিনি বোঝেন ও জানেন হয়ে থাকে। দাসের প্রার্থনা যে, প্রত্যেক শব্দের কোন না কোনো অর্থ তো হয়ে থাকে। থাকল ব্যাকরণের কথা, ভাষা প্রথম হয়েছে , কেন না বেদ বাণী প্রভু দ্বারাই বলা হয়েছে তথা ব্যাকরণ পরে ঋষিদের দ্বারা হয়েছে। এটা ত্রুটি যুক্ত হতে পারে। বেদের অনুবাদ (ভাষা-ভাষ্য) তে ব্যাকরণ ব্যতিরিক্ত আছে অর্থাৎ অসংগত বা বিরুদ্ধ ভাব আছে। কেন না বেদ বাণী মন্ত্র দ্বারা পদ্যতে আছে। যেমন পলবল শহরের আশে পাশের ব্যক্তি পলবলকে পরবর বলে। যদি কেউ বলে পলবলকে কি করে পরবর সিদ্ধ করে দিয়েছেন? এখানে কবীর্ কে কবীর কি করে সিদ্ধ করা হয়েছে । যেমন ক্ষেত্রিয় ভাষাতে পলবলকে পরবর শহরই বলে থাকেন। এই প্রকার কবীর-কে কবীর বলা হয়, প্রভু ইনিই আছেন। মহর্ষি দয়ানন্দ "সত্যার্থ প্রকাশ" সমুল্লাস ৪ পৃষ্ঠা ১০০উপর (দয়ানন্দ মঠ দীনানগর পঞ্জাব থেকে প্রকাশিত) পর "দেবৃকামা"র অর্থ দেবরের কামনা অর্থাৎ দেওরের কামনা করা হয়েছে, দেবৃকে পুরা "র" লিখে দেবর করে দিয়েছেন। কবীর্ কে কবীর, তাহলে ভাষা ভিন্ন কবীর লিখতে বা বোলতে কোনো আপত্তি বা ব্যাকরণের ত্রুটি হতে পারে না।

পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব আছেন এইপ্রমাণ যজুর্বেদ অধ্যায় ২৯ মন্ত্র নং ২৫ ও সামবেদে সংখ্যা ১৪০০ তে ও আছে যা নীচে এই প্রমাণে ঃ-

।। যজুর্বেদে অধ্যায় নং ২৯ শ্লোক নং ২৫ ।।

(সন্ত রাম পাল দাস দ্বারা ভাষাভাষ্য)

সমিদ্ধ্যেঅদ্য মনুষো দুরোনে দেবো দেবা ন্যজোসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্র মহশ্চি কিত্বান্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ।। ২৫।।

সমিদ্ধ ঃ-অদ্য-মনুষঃ-দুরোনে-দেবঃ-দেবান-যজ্-অসি-জাতবেদঃ। আ-চ-বহ-মিত্রমহঃ-চিকিত্বান-ত্বম্-দূতঃ-কবির্-অসি- প্রচেতাঃ।

অনুবাদ ঃ- (অদ্য) আজ বা বর্তমানে (দুরোনে) শরীর রূপ মহলে দুরাচার পূর্বক (মনুষঃ) মিথ্যা পূজাতে লীন মননশীল ব্যক্তিগনের (সমিদ্ধঃ) লেগে যাওয়া আগুন বা শাস্ত্রবিধি ছাড়া বর্তমান পূজা যে হানিকারক হয়ে থাকে, সেই স্থানে (দেবন্) দেবতাদের (দেবঃ) দেবতা (জাতবেদঃ) পূর্ণ পরমাত্মা সতপুরুষের বাস্তবিক (যজ) পূজা (অসি) হয়। (আ) দয়ালু (মিত্রমহঃ) জীবের বাস্তবিক সাথী পূর্ণপরমাত্মা নিজেই (চিকিত্বান) স্বাস্থ্য জ্ঞান বা যথার্থ সত্য সঠিক কিংবা ভক্তিকে (দুতঃ) সংবাদবাহক রূপে (বহ) যিনি নিয়ে আসেন (চ) তথা (প্রচেতাঃ) যিনি বোধজ্ঞান করিয়ে থাকেন (ত্বম্) তুমিই (কবিরসি) কবির্দেব বা কবীর পরমেশ্বর।

ভাবার্থ ঃ- যে সময় পূর্ণ পরমেশ্বর প্রকট হন ওই সময় সব ঋষিরা ও সাধুরা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমানী অচরণ বা পূজার দ্বারা সর্ব ভক্ত সমাজকে মার্গ দর্শন করাতেন। তখন পরমেশ্বর নিজের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বাস্থ্য জ্ঞানের সন্দেশবাহক হয়ে স্বয়ংই কবির্দেব বা কবীর প্রভুই এসে থাকেন।

।। সংখ্যা নং ১৪০০ সামবেদ উতার্চিক অধ্যায় নং ১২ খন্ড নং ৩ শ্লোক নং ৫।।
(সন্ত রামপাল দাস দ্বারা ভাষা ভাষ্য)

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যরুবসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পুযমানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ।।৫।।

ভদ্রা-বস্ত্রা-সমন্যা-বসানঃ-মহান্-কবীর্-নিবচনানি-শংসন্। আবচ্যস্ব-চম্বোঃ-পুযমানঃ-বিচক্ষণঃ-জাগৃবিঃ-দেব-বিতৌ।

অনুবাদ ঃ- (বিচক্ষণঃ) চতুর ব্যক্তিরা (আবচ্যস্ব) নিজের বচন দ্বারা বলেন যে আমি যে প্রবচন করি তাহা অনুসরন করো ওই চতুর ব্যক্তিরা পূর্ণ ব্রহ্মের পূজা না করিয়ে অন্য উপাসনার মার্গ দর্শন করিয়ে, অমৃত স্থানের জায়গায় (পুযমানঃ) আন উপাসনা রুপি মবাদ (পূঁজ) যেমন ভূত প্রেত পূজা, পিতৃ পূজা, তিনগুণের পূজা (রজো গুণ-ব্রহ্মা, সতো গুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব, (শঙ্কর), কাল (ব্রহ্ম)-এর পূজা পর্যন্ত) কে (চম্বোঃ) আদরের সাথে আচমন করাচ্ছে অর্থাৎ এই শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভুল জ্ঞান কে সমাপ্ত করার জন্য (ভদ্রা) পরম সুখ দায়ক (মহান্ কবীর্) মহান কবীর বা পূর্ণ পরমাত্মা কবীর (বস্ত্রা) সশরীর সাধারণ বেশভূষাতে অর্থাৎ বস্ত্রের অর্থ বেশভূষা, সাধু ভাষায় একে চোলাও বলা হয় চোলার অর্থ শরীর। যদি কোন সাধু বা গুরু দেহত্যাগ করে তাহলে বলা হয় যে চোলা ছেড়ে গিয়েছে (সমন্যা) নিজ সতলোক বালা শরীরের সদৃশ অন্য শরীর হাল্কা তেজপূঞ্জ ধরে (বসানঃ) সাধারণ মানুষের মতো জীবন ধারণ করে, কিছুদিন সংসারে অতিথি রূপে বসবাস করে (নিবচনানি) নিজের শব্দাবলী কবীর বাণী আদির মাধ্যমে সত্যজ্ঞান (শংসন) বর্ণন করে (দেব)পূর্ণ পরমাত্মার (বিতৌ) লুকানো স্বর্গুণ-নির্গুণ জ্ঞানরূপী ধনকে (জাগৃবিঃ) জাগৃতি করেন।

ভাবার্থ ঃ- যেমন যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১ তে বলেছে। অগ্নেঃ ১৩ নং অসি গুঃ পরমেশ্বর সশরীরে আছেন। বিষ্ণবে ত্বা গোমস্য তনুঃ অসি গুঃ ওই অমর প্রভু পালন পোষণ করার জন্য অন্য শরীর আছেন যা অতিথি রূপে কিছুদিন সংসারে এসে থাকেন। তত্বজ্ঞান দিয়ে অজ্ঞান ঘুমানো প্রভু প্রেমিদের নিদ্রা ভাঙিয়ে জাগিয়া তোলেন। ঐ প্রমাণ এই মন্ত্রে আছে । কিছু সময়ের জন্য পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব বা কবীর প্রভু নিজের আপন রূপ বদলিয়ে, সাধারণ ব্যক্তির মত রূপ বানিয়ে পৃথিবী মন্ডলে প্রকট হয়। কবি র্নিবচনানি শংসন্ অর্থাৎ কবীরবাণী বলে থাকেন, যার মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞানকে জাগিয়ে তোলেন, ওই সময়ে যাদের মহর্ষি বলা হতো, সেই চতুর প্রাণী মিথ্যাজ্ঞান আধারের উপর, শাস্ত্রবিধি অনুসার সত্য সাধনা রূপী অমৃত স্থানের উপর, শাস্ত্রবিধি রহিত পূজারূপী মবাদ (পুঁজ)কে শ্রদ্ধার সাথে আচমন বা পূজা করিয়ে থাকে। ওই সময় পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ংই প্রকট হয়ে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শাস্ত্র বিধি অনুসারে সাধনার জ্ঞান প্রদান করেন।

।। ঋক্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯ তথা সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭-১৮ ।।

।। ঋক্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯ ।।

অভী ইমং অধন্যা উত শ্রীনন্তী ধেনবঃ শিশুম্। সোম মিন্দ্রায় পাতবে।।৯।।
অভী-ইমম্-অধন্যা উত শ্রীনন্তি ধেনবঃ শিশুম্ সোমম্ ইন্দ্রায় পাতবে ।।৯।।

অনুবাদ ঃ- (উত) বিশেষ করে (ইমম্) এই (শিশুম্) মানুষের বাচ্চার রূপে বা বালক রূপে প্রকট (সোমম্) পূর্ণ পরমাত্মা অমর প্রভুর (ইন্দ্রায়) সুখ সুবিধা দ্বারা বা খাওয়া-দাওয়া দ্বারা শরীর

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া তাহা (পাতবে) বৃদ্ধির জন্য (অভি) পূর্ণভাবে (অধন্যাঃ ধেনবঃ) যে গাইয়ের কুমারী বাছুরকে, ষাঁড় দ্বারা কোনদিন না নষ্ট না হয়রান হয়েছে সেই কুমারী গায় দ্বারা (শ্রীনন্তি) পালন হয়ে থাকেন।

ভাবার্থ ঃ- পূর্ণ পরমাত্মা অমর পুরুষ যখন বালক রূপ ধারণ করে স্বয়ং প্রকট হয়ে লীলা করতে করতে বড় হতে থাকে, ওই সময় কুমারী গায় আপনাআপনিই দুধ দেয়। যাহার কারণ ওই পূর্ণ পরম পুরুষ ভাল ভাবে প্রতিপালিত হয়।

।। ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ ।।

শিশুম্ জজ্ঞানম্ হর্য তম্ মৃজন্তি শুম্ভন্তি বহিন মরুতঃ গনেন
কবির গির্ভি কাব্যেনা কবির্ সন্ত্ সোমঃ পবিত্রম্ অত্যেন্তি রেভন্।। ১৭।।

অনুবাদ ঃ- পূর্ণ পরমাত্মা (অর্য শিশুম্) মনুষ্য বাচ্চা রূপে (জজ্ঞানম্) জেনে বুঝে প্রকট হয় তথা নিজের তত্ত্বজ্ঞানকে (তম্) ওই সময় (মৃজন্তি) নির্মলতার সাথে (শুম্ভন্তি) উচ্চারণ করে। (বহিন) প্রভু পাওয়ার বিরহ অগ্নিবালা (মরুতঃ) বায়ুর মতন শীতল ভক্ত (গনেন) সবার জন্য (কাব্যেনা) কবিতার দ্বারা কবিত্ব থেকে (পবিত্রম্ অত্যেতি) অত্যাধিক নির্মলতার সাথে (কবির গীর্ভি) কবীর বাণী দ্বারা (রেভন্) উচুস্বরে সম্বোধন করে বলা (কবির্ সন্ত্ সোমঃ) তিনি অমর পুরুষ বা সতপুরুষই সন্ত অতএব ঋষি রূপে স্বয়ং কবির্দেবই আছেন। কিন্তু ওই পরমাত্মাকে না চিনতে পেরে কবি বলতে লাগলেন।

ভাবার্থ ঃ- বেদ বলা ব্রহ্ম (কাল) বলছেন বিলক্ষণ মনুষ্য বাচ্চার রূপে প্রকট হয়ে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব নিজের বাস্তবিক জ্ঞানকে নিজের কবিরবাণী দ্বারা নির্মল নিজ জ্ঞান আপন হংসআত্মাদের অর্থাৎ পুন্যাত্মা অনুযায়ীদের কবি রূপে কবিতা, লোকক্তি দ্বারা সম্বোধন করে বা উচ্চারণ করে বর্ণনা করতেন। তিনি স্বয়ং সতপুরুষ কবির্দেবই আছেন।

।। ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৮ ।।

ঋষিমনা য ঋষিকৃত স্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবিনাম্।
তৃতীয় ধাম্ মহিষ্;সিষা সন্ত্ সোমঃ বিরাজমানু রাজতি স্টুপ।। ১৮।।

অনুবাদ ঃ- বেদ বলা ব্রহ্মবলছে যেকি (য) যে পূর্ণ পরমাত্মা বিলক্ষণ বাচ্চার রূপে এসে (কবিনাম্) প্রসিদ্ধ কবির (পদবীঃ) উপাধি প্রাপ্ত করে বা একসন্ত (সাধু) বা ঋষির ভূমিকা করে (ঋষিকৃত) ঋষি রূপে প্রকট হয়ে প্রভুর দ্বারা রচিত (সহস্রননীথঃ) হাজার বাণী (ঋষিমনা) ঋষি স্বভাব বালা ব্যক্তিদের বা ভক্তদের জন্য (স্বর্ষাঃ) স্বর্গ তুল্য আনন্দ হয়ে থাকে। সন্ত্ সোমঃ ঋষি সন্তরূপে প্রকট ওই অমর পুরুষ অর্থাৎ সৎপুরুষই হয়ে থাকে। তিনি পূর্ণ প্রভু (তৃতীয়া) তৃতীয় (ধাম) মুক্তি লোক বা সতলোক (মহিষঃ) সুদৃঢ় পৃথিবীকে (সিষা) স্থাপিত করে (অনু) পরে মানব সদৃশ সন্ত রূপে (স্টুপ) গুবন্দ বা গুম্বজের উঁচু টিল রূপী সিংহাসনের উপর (বিরাজমনু রাজতি) উজ্জ্বল স্থুল আকারে বা মানব সদৃশ শরীরে বিরাজ মান।

ভাবার্থ ঃ- মন্ত্র ১৭ তে বলা হয়েছে যে, কবির্দেব শিশুরূপ ধারণ করে নেন। লীলা করতে করতে বড় হয়ে যায় পরে কবিতার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বর্ণন করার কারণে কবির পদবী প্রাপ্ত করেন।

এইজন্য কবি বলতে লাগত। বাস্তবে তিনি পরমাত্মা কবীর্ (কবীর প্রভু। তার দ্বারা রচিত অমৃতবাণী কবীর বাণী (কবির্গিরঃ অথবা কবিরবাণী) বলা হয়। যাহা ভক্তের জন্য স্বর্গ তুল্য সুখদায়ী হয়ে থাকে। ওই পরমাত্মা তৃতীয় মুক্তি ধাম অর্থাৎ সতলোকের স্থাপনা করে এক গুম্বজে সিংহাসনের উপর তেজোময় মানব শরীরের আকারে বিরাজমান আছেন।

এই মন্ত্রের তৃতীয় ধাম সতলোককে বলা হয়েছে। যেমন এক ব্রহ্মের লোক হয় একুশ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র নিয়ে, তৃতীয় পরব্রহ্মবা অক্ষর ব্রহ্ম, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মার ঋতধাম, বা সতলোক আছে।

।। ত্রেতাযুগে কবির সাহেব (কবির্দেব) মুনিন্দ্র নামে প্রকট হয়েছিলেন।।

(নল ও নীল কে শরণে নিয়েছিলেন)

ত্রেতা যুগে স্বয়ম্ভু (স্বয়ং প্রকট হয়ে থাকে) কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) রূপান্তর করে মুনিন্দ্র ঋষি নামে এসেছিলেন। অনল মানে নল তথা অনিল মানে নীল। দুইজন মাসতুতো ভাই ছিল। মাতা পিতা মারা গিয়েছিলেন। নল ও নীল শারীরিক ও মানসিক রোগে অত্যাধিক পীড়িত ছিলেন। সব ঋষি মুনিদের কাছে কষ্ট নিবারণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। সব ঋষি মুনিরা বলতেন, আগের জন্মের পাপের জন্য এই দন্ড ভোগ, এই কর্ম ভোগ ভুগতেই হবে এর কোন সমাধান নেই। দুই ভাই জীবন থেকে নিরাশ হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

একদিন এই দুইজনের ভাগ্যে মুনিন্দ্র নামের পূর্ণ পরমাত্মার সৎসঙ্গ শোনার অবসর প্রাপ্ত হয়েছিল। সৎসঙ্গ শোনার সময় দুই ভাইয়ের মাথায় পরমেশ্বর মুনিন্দ্র হাত রাখেন। অমনি দুই ভাইয়ের অসাধ্য রোগ ছু মন্ত্র হয়ে গেল অর্থাৎ নল ও নীল সুস্থ হয়ে গিয়েছে। এই রকম অদ্ভূত চমৎকার দেখে, দুইজনই প্রভুর চরণে পড়ে ঘন্টা খানিক চোখের জল ফেলেছিল আর বলল আজ আমরা প্রভু মিলে পেয়েছি যার তলাশ ছিল, দুইজন মুনিন্দ্র প্রভুতে প্রভাবিত হয়ে, তার কাছ থেকে দীক্ষা নাম নিয়ে তথা তার সেবা করতে লাগল। প্রথমে সাধুদের সমাগম দেখে জলের ব্যবস্থার জন্য নদীর কিনারায় সতসঙ্গের ব্যবস্থা হত। নল ও নীল খুব প্রভু প্রেমী ও সরল ভোলা আত্মার মানুষ ছিল। পরমাত্মার খুব শ্রদ্ধা ভক্তি রাখত, খুব সেবা করত। সমাগম লোকের মধ্যে রোগী, কেউ বৃদ্ধ, কেউ বিকলাঙ্গ ভক্তজনও আসত তাদের কাপড় ও থালা বাসন পরিস্কার করে দিত। তাদের ঘটি গ্লাস মেঁজে দিত। কিন্তু ভোলা স্বভাবের বুদ্ধি ছিল তাদের। কাপড় ধুতে যেত সেই সময় সতসঙ্গে প্রভুর শোনা কথার চর্চা করত, চর্চায় এত ব্যস্ত থাকত যে, কোনদিন নদীতে বাসন ডুবে যেত কোন দিন কাপড় ডুবে যেত। তার খোঁজ পেত না। যদি কাহারও চারটে জিনিষ নদীতে ধুতে নিয়ে যেত তাহলে চারের জায়গায় দুই বস্তু ফিরিয়ে আনত। ভক্তজন বলতো ভাই তোমরা সেবা তো খুব কর কিন্তু আমাদের জিনিষের সর্বনাশ করে ছাড়। এই হারানো জিনিষ আমরা কোথায় থেকে আনব? তোমরা আমার সেবা করা ছেড়ে দাও। আমরা নিজের সেবা নিজেই করে নেব। এই শুনে নল ও নীল কান্না শুরু করে বলতো আমাদের সেবা ছিনিয়ে নিও না এবার আর হারাবে না। আবার কাজ শুরু করে দিয়ে পুনরায় প্রভুর চর্চায় লেগে যেত আর পরেও বস্তু নদীর জলে ডুবে যেত। ভক্তজন মুনিন্দ্র প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে আবার বলল নল ও নীলকে বোঝান। এরা কিছু মানে না সেবা করতে মানা করলে কান্না শুরু করে দেয়। আমাদের অর্ধেক জিনিষ নদীর জলে রেখে আসে, ফিরিয়ে আনে না। এরা দুইজন সতসঙ্গ চর্চা নদীর ধারে করে আর এত উন্মাদ

হয়ে যায় যে, বস্তু জলে ডুবে যায়। মুনিন্দ্র প্রভু এক দুইবার বুঝিয়েছেন ওরা দুইজন বলতো প্রভু সাহেব আমাদের সেবা ছিনিয়ে নেবেন না। একদিন মুনিন্দ্র সাহেব বললেন, বেটা খুব সেবা কর, আজ থেকে তোমাদের দুই জনের হাত থেকে পাথর লোহাও যদি হয়, তাহাও জলে ডুববে না। মুনিন্দ্র সাহেব দুইজনকে এই আশীর্বাদ দিলেন।

আপনারা রামায়ন শুনেছেন, যেকি, যখন সীতাকে রাবণ উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভগবান রাম জানে না যে, কে সীতাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে? রামচন্দ্র এধার ওধার খোঁজ করেছিলো পরে, হনুমান খবর দিল যে, সীতামাতাকে রাবণ লঙ্কায় বন্দী করে রেখেছে। খোঁজ লাগার পর ভগবান রাম রাবণের কাছে দূত পাঠিয়ে জানায় প্রার্থনা করে যে, সীতাকে ফিরিয়ে দেয় যেন। কিন্তু রাবণ তা মানেনি, যুদ্ধে র তৈরী শুরু হয়েছিল, সমস্যা হয়েছিল যে, এই সমুদ্র সেনারা কিভাবে পাড় করবে?

ভগবান রামচন্দ্র তিনদিন হাঁটু জলে প্রার্থনা করেছিলেন সমুদ্রের কাছে যে রাস্তা দাও, কিন্তু সমুদ্রদেব টস্ থেকে মস্ হয়নি। যখন সমুদ্রদেব মানেনি তখন শ্রী রাম সমুদ্রকে অগ্নিবান মেরে জ্বালাতে চেয়েছিলেন ভয়ে সমুদ্র এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে বললেন্ ভগবান সবার নিজ নিজ মর্যাদা আছে, আমাকে জ্বালাবেন না, আমার ভিতরে অর্থাৎ সমুদ্রের জলে কত জীব জন্তু রয়েছে, তারাও মারা যাবে। আর আপনি আমাকে জ্বালালেও তবুও আমাকে পাড় হতে পারবেন না, কারণ এখানে অনেক গহরা বা গর্ত্ত আছে সেই স্থান আপনি কোনদিন পাড় হতে পারবেন না।

সমুদ্র বললেন ভগবান তুমি এক কাজ কর, সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। আমার মযার্দাও থাকবে আর আপনার পুল (ব্রীজ) ও হয়ে যাবে। তখন ভগবান রাম সমুদ্রকে বলছেন, সেটা কোন বিধি? সমুদ্র বললেন আপনার সেনার মধ্যে নল ও নীল নামে দুই সৈনিক আছে, তাদের কাছে গুরুদেবের প্রাপ্ত শক্তি আছে, ওদের হাতের পাথর বা লোহা জলে ডুববে না। রামচন্দ্র নল ও নীলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন, তোমাদের কাছে কোন শক্তি আছে? তারা বলল ঠিক বলেছেন তাই শ্রীরাম বললেন তাহলে পরীক্ষা করা হোক।

ওই অবুঝ নীল ও নল ভাবছে, আজ সবার সামনে আমাদের খুব মহিমা হবে। ওই দিন ওরা নিজের গুরুদেবকে (ভগবান মুনিন্দ্র) কে এই ভেবে স্মরণ করেনি। যে, শ্রীরাম ভাববেন, এদের কাছে কোন নিজ শক্তি নেই অন্য কাহারও কাছ থেকে শক্তি চেয়ে নেয়। এই সব কথা ভেবে পাথর উঠিয়ে জলে ফেলতেই পাথর ডুবে গেল। বার বার চেষ্টা করার পরও পাথর ভাসল না, তখন রামচন্দ্র সমুদ্রের দিকে মনে মনে ভেবে বলতে চাইলেন, তুমি মিথ্যা কথা বলেছো এদের কাছে তো শক্তি নেই। তখন সমুদ্র নল ও নীলকে বললেন তোমরা দুইজন গুরুদেব কে স্মরণ করোনি, অবুঝ এখন তোমাদের গুরুদেবকে স্মরণ করো। ওরা দুইজন বুঝে যায় যে তারা ভুল করেছে, তারপর সদ্গুরু মুনিন্দ্র (কবীর সাহেব) কে স্মরণ করে। তখন মুনিন্দ্র (কবীর সাহেব) ওখানে পৌঁছে গেলেন। ভগবান রামচন্দ্র বললেন হে ঋষিবর! আমার দুভার্গ্য যে আপনার সেবকদের হাতে পাথর ভাসছে না। এই কথা শুনে মুনিন্দ্র ঋষি বললেন এখন আর কোন দিন এদের হাত থেকে ভাসবেও না। কেনোনা এদের খুব অভিমান হয়ে গিয়েছে। সত গুরুর বাণী প্রমাণ করছে-

গরীব, যেমন মাতা গর্ভে, রাখে জতন বনায়
ঠেস লগে তো ক্ষীণ হোবে, তেরী এইসে ভক্তি যায়।

ওই দিন থেকে নল ও নীলের শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। তখন শ্রী রামচন্দ্র পরমেশ্বর মুনিন্দ্র সাহেবকে বললেন, হে ঋষিবর! আমার উপর অনেক বিপদ আপত্তি এসেছে, দয়া করেন, যাতে সেনারা পাড় হতে পারে। যখন আপনার সেবককে শক্তি দিতে পারেন, তো কিছু কৃপা করেন। মুনিন্দ্র সাহেব বললেন ওই যে সামনে যে পাহাড় দেখছো, ওর চারিদিকে আমি রেখা টেনে দিয়েছি, ওর মাঝখানের পাথর নিয়ে এসো, ওটা ডুববে না। শ্রীরাম পরিক্ষণের জন্য পাথর আনালেন তাকে জলে ফেলতেই ভাসতে শুরু হল। নল ও নীল কারিগর (শিল্প) ছিল আর হনুমান প্রত্যেকদিন ভগবানের স্মরণ করতো এবং দৈনিক যে ক্রিয়া তাহাও করত এবং রাম রাম ও লিখতে বা জপতে থাকত এবং পড়ে পাহাড় উঠিয়ে নিয়ে আসে। নল ও নীল পাথর জুড়ে জুড়ে রাস্তা বেঁধে যেত। এই ভাবে পুল (ব্রিজ) রাস্তা হয়েছিল। **ধর্মদাস মহারাজ তাই বলেছিলেন ঃ-**

রহে নল নীল যতন কর হার, তব সদগুরু সে করি পুকার
জা সত রেখা লিখি অপার, সিন্ধু পর শিলা তিরানে বালে
ধন-ধন সদগুরু সত কবীর, ভক্তকে পীর মিটানে বালা।।

কেহ কেহ বলে হনুমান পাথরের উপরে রামের নাম লিখে দিয়েছিল সেইজন্য পুল (ব্রিজ) তৈরী হয়েছিল। কেউ বলে নল ও নীল পুল তৈরী করেছিল। কেউ বলে শ্রীরাম পুল বানিয়েছিল। কিন্তু সেই কথা উপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেইটা এই ভাবেই হয়েছিল অর্থাৎ উপরোক্ত ঘটনাই সত্য, সেবাণী ধর্মদাস মহারাজ (যিনি বিষ্ণুর ভক্ত ছিল তাহাকে পরমেশ্বর (কবির্দেব) কবীর সাহেব সন্ত রূপে ৬০০ বছর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন। এই সেই কবীর বাণী

।। সতকবীরের সাখী - পৃষ্ঠা ১৭৯ থেকে ৮২ পর্যন্ত।।

-ঃ পীব পিছানো অঙ্গ ঃ-

কবীর - তিন দেব কো সব কই ধ্যাবে, চৌথে দেবকা মরম ন পাবে
চৌথা ছাড় পঞ্চম কো ধ্যাবে, কহে কবীর সো হম পর আবে।। ৩।।

কবীর - ওঁম-কার (ওঁ) নিশ্চয় ভয়া, যহ কর্ত্তা মত জান
সাচা শব্দ কবীর কা, পরদে মাহী পহচান।। ৫।।

কবীর রাম কৃষ্ণ অবতার হে, ইনকা নাহি সংসার
জিন সাহেব সংসার কিয়া, সো কিন্থু না জন্মা নার।।

কবীর - চার ভূজা কে ভজন মে, ভুলি পরে সব সন্ত
কবিরা সুমিরো তাসু কো, জাকে ভূজা অনন্ত।। ২৩।।

কবীর - সমুদ্র পাট লঙ্কা গয়ে, সীতা কো ভরতার
তাহি অগস্ত মুনি পীয় গয়ে, ইন মে কো করতার।। ২৬।।

কবীর - গোবর্ধন গিরী ধারয়ো কৃষ্ণজি, দ্রোনাগিরী হনুমন্ত
শেষ নাগ সব সৃষ্টি সহারী, ইন মে কো ভগবন্ত।। ২৭।।

কবীর- কাটে বন্ধন বিপত্তি মে, কঠিন কিয়া সংগ্রাম
চিহ্নো রে নর প্রাণীয়ো, গরুড় বড় কী রাম।। ২৮।।

কবীর- কহ কবীর চিত চেতহু, শব্দ করো নিরুবার

শ্রী রাম হি করতা কহত হে, ভুলি পরয়ো সংসার।। ২৯।।
কবীর - জিন রাম কৃষ্ণ ব নিরঞ্জন কিয়ো, সো তো করতা ন্যার
অন্ধা জ্ঞান ন বুঝই, কহে কবী বিচার।। ৩০।।

।। দ্বাপর যুগে কবীর্দেব (কবীর সাহেব) করুণাময় নামে প্রকট হয়েছিলেন।।

পরমেশ্বর কবীর (কর্বিদেব) দ্বাপর যুগে করুণাময় নামে প্রকট হয়েছিলেন, ওই সময় বাল্মিকী জাতিতে উৎপন্ন হয়েছিল নাম সুদর্শন সুপচ, (অনুসুচিৎ জাতির) করুণাময় প্রভুর শিষ্য ছিলেন। এই সুদর্শন পাণ্ডবদের যজ্ঞ সফল করেছিলেন? না কি কৃষ্ণের ভোজন করাতে সফল হয়েছিল? না তেত্রিশ কোটি দেবতাদের কারণে নাকি, আঠাশ হাজার ঋষিদের? না বারো কোটি ব্রাহ্মণদের জন্য? না নয় নাথের দ্বারা, না চৌরাশি আদি ঋষিদের ভোজন খেয়ে সফল হয়েছিল? ভক্ত সুদর্শন বাল্মিক পূর্ণ (জাতি) গুরুজি করুণামায়ের কাছ থেকে বাস্তবিক তিনমন্ত্র প্রাপ্ত করে, গুরু মর্যাদা রেখে সত সাধনা করেছিল।

।। দ্বাপর যুগে ইন্দ্রমতিকে স্মরণে নিয়েছিলেন।।

দ্বাপর যুগে চন্দ্র বিজয় নামে এক রাজা ছিলেন তার পত্নী ইন্দ্রমতি খুব ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। সন্ত (সাধু) ও মহাত্মাদের খুব সেবা সৎকার আদর করতেন। তিনি একটি গুরুদেব বানিয়ে রেখেছিলেন সেই গুরুদেব বলতেন, পুত্রী! সাধু মহাত্মাদের, খুব সেবা যত্ন করতে হয়। সাধু মহাত্মাদের ভোজন খাওয়ালে খুব লাভ হয়। একাদশী ব্রত, মন্ত্র সাধনা করতে হয়। যদি তুই সাধু মহন্তদের ভোজন করাস তাহলে আগের জন্মেও রানীই হবি, এবং স্বর্গ প্রাপ্তি লাভ করবি। রাণী ভাবলেন তিনি প্রতিদিন একটা সাধুকে ভোজন করাবেন। মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন তিনি তারপরে খাবেন, আগে সাধুকে খাওয়াবেন। এইভাবে প্রতিদিন এক সাধু ভোজন করাতেন, এইভাবে এক বর্ষ দুই বর্ষ কেটে যায়। এক সময় হরিদ্বারে কুম্ভ মেলার সংযোগ চলছিল। যত ত্রিগুণ মায়ার সাধু ছিলেন সব গঙ্গা স্নানের জন্য গিয়েছিলেন তাই রাণী ওই দিন কোন সাধুকে ভোজনের জন্য পাননি, এইজন্য প্রতিজ্ঞা বশে নিজেও খেতে পারছে না। চারদিনের দিন তার দাসীকে বললো দেখতো কোন সাধু পাওয়া যায় নাকি? নয়তো আজ তোদের রাণী জীবিত বাঁচবে না। আমার প্রাণ চলে গেলেও খাব না। এই দীন দয়াল কবীর এই পূর্বের ভক্তকে শরণে নেওয়ার জন্য কি কি লীলা করেন? দাসী রাজমহলের উপরে চড়ে গিয়ে দেখে যে সামনে থেকে এক সাধু আসছেন, তাহার পরনে ছিল সাদা কাপড় দ্বাপর যুগে কবীর করুণাময় হয়ে এসেছিলেন। দাসী নীচে এসে রাণীকে বলল, একজন সাধুর মত দেখতে সাদা বস্ত্র পরা মনে হল, সাধুই হতে পারেন। রাণী বললেন যা তাড়াতাড়ি সাধু মহাত্মাকে ডেকে নিয়ে আয়। দাসী মহলের বাইরে গিয়ে সাধুকে প্রার্থনা করে বলছে আমাদের রাণী আপনাকে মনে করছেন। করুনাময় সাহেব বললেন, রাণী আমাকে কেন মনে করছেন, রাণীর সাথে আমার কি সম্পর্ক? দাসী এই কথা গিয়ে রাণীকে বললো। করুণাময় (কবীর সাহেব) প্রভু বললেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, রাণীর দরকার হলে সে যেন এখানে আসেন, তুমি দাসী সে রাণী। আপনাকে আর আমি যদি ওখানে যাই রাণী যদি বলেন, তোমাকে কে ডেকেছে? আর রাজাও যদি কিছু বলে দেন, আর বেটী সাধুদের অনাদর করা খুব পাপদায়ক হয়। দাসী পরে রাণীকে সব কথা বললে, রাণী তখন বললেন দাসী, তুই

আমার হাত ধরে তার কাছে নিয়ে চল, সেখানে গিয়ে রাণী দন্ডবৎ প্রণাম করে বলছেন, হে পরবরদিগার ! ইচ্ছা তো হচ্ছে আপনাকে কাঁধে করে বসিয়ে অন্দর মহলে নিয়ে যাই। কিন্তু আমি দুর্বল। করুণাময় (কবীর সাহেব) বললেন বেটি, আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তোর ভিতরে কোন শ্রদ্ধা ভক্তি আছে কি নেই ? তুই ক্ষুদাতে এমনিই মরছিস্। তবুও রাণী ভিতরে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে রান্না করেন, করুণাময় রূপী কবীর সাহেবকে ভোজন করাতে চেয়েছিলেন। করুণাময় সাহেব বললেন, আমি খাই না। আমার এই শরীরে অন্ন খায় না। তখন রাণী বললেন, তাহলে তিনিও খাবেন না। তাই শুনে করুণাময় সাহেব বললেন ঠিক আছে যাও, খাবার নিয়ে এসো। করুণাময় সাহেব খাবার খেয়ে নিয়েছেন। করুণাময় রূপী (কবিরগ্নি) কবীর সাহেব রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন বেটি, তোমাকে এই বিধি সাধনা কে বলেছেন ? রাণী বললেন তার গুরুদেব। আবার করুণাময় (কবীর পরমেশ্বর) বললেন আর কি কি আদেশ দিয়েছেন ? রাণী ইন্দ্রমতী বললেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের পূজা, একাদশী ব্রতপালন, তীর্থ ভ্রমণ, দেবী পূজা, কেউ মারা গেলে তার শ্রাদ্ধ শান্তি করা, রোজ মন্দির দর্শন ও সাধুদের সেবা সৎকার করে ভোজন করানো। করুণাময় সাহেব বললেন, যে নিয়ম তোর গুরুদেব দিয়েছেন, এতে তোর জনম মরণের চক্রতেই থাকতে হবে আর চুরাশী লক্ষ যোনিতে ঘুরে ঘুরে কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু এর হাত থেকে মোক্ষ (মুক্ত) হতে পারবি না তখন রাণী বললেন মহারাজজী, যত সাধু সন্ত আছেন সবাই সবার প্রভুত্ব নিজে নিজেই বানায়, তবে আমার গুরুদেবের নামে আপনি কিছু বলবেন না। তাতে আমার মুক্তি হোক বা না হোক।

এখন করুণাময় (কবীর)সাহেব ভাবছেন, এই ভোলা জীবকে তিনি কি বোঝাবেন এ যে লেজ ধরে বসেছে একে ছাড়তেও চায় না, মরবে কিন্তু ছাড়বে না। করুণাময় সাহেব বললেন বেটি আমি নিন্দা করছি না, আমি কি তোর গুরুদেবকে গালি দিয়েছি? না কোনো খারাপ কথা বলছি? আমি তো ভক্তি মার্গের কথা বলছি তুই যা করছিস সেটা ভক্তি মার্গের শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম। তোকে পাড় হতে তো দেবেই না তাছাড়া তোর পাপের যে কর্মদন্ড সেটাও কাটবে না, আর শোন আজ থেকে তিনদিন পরে তোর মৃত্যু হবে, তখন না তোর গুরু তোকে বাঁচাতে পারবে আর না তোর নকলী সাধনা বাঁচাতে পারবে। (মানুষ এমনি এমনি কিছু মানে না যখন মরার কথা শোনে তখন ভয় লাগে আর তখনই মানে) রাণী ভাবলেন সন্ত (গুরু) ব্যক্তি মিথ্যা বলেন না। এমন না হয় যে পরশু আমি মরেই না যাই। এই ভয়ে রাণী বলছেন সাহেব, তাহলে আমি কোন ভাবে বাঁচতে পারি ? করুণাময় (কবীর) সাহেব বললেন হ্যাঁ বাঁচতে পারবে যদি তুমি আমার কাছ থেকে নাম (উপদেশ) নিয়ে আমার শিষ্য হও, এবং যত পূজা করতে, সব ত্যাগ করবে, তবেই তোমার জীবন বেঁচে যাবে। ইন্দ্রমতী বললেন যে, শুনেছি যে গুরুদেব নাকি বদলাতে নেই, তাতে পাপ হয়। আবার করুণাময় (কবীর) সাহেব বললেন, পুত্রী এটা তোমার মনের ভুল ভ্রম, যেমন এক বৈদ্যের (ডাক্তারের) ঔষধে কাজ না হলে কি, আরেক বৈদ্যর ঔষধ কাজে লাগাও কিনা ? এক ব্যক্তি চতুর্থ কক্ষার অধ্যাপক ও এক উচ্চ কক্ষার অধ্যাপক হয়ে থাকে। তাহলে বেটি সামনের উচ্চ কক্ষে যাবে; নাকি সারা জীবন চতুর্থ ক্লাশেই পড়ে থাকবে? তোর আগের কক্ষায় (শ্রেণীতে) যেতে হবে আগের কক্ষের (শ্রেণীর) পড়া পড়তে হবে, আমি তোকে পড়াতে এসেছি। এমনিতো ইন্দ্রমতী মানতো না, যখন মৃত্যুকে সামনে দেখেছে, তাই দেখে বলল আপনি যে ভাবে বলবেন আমি সেই ভাবে সেইরকমই মেনে চলব। তিনি পরে ইন্দ্রমতী রাণীকে উপদেশ নাম দিলেন ও

বললেন, তৃতীয় দিনে আমার এই রূপে, কাল (যমদূত) ব্রহ্ম আসবে। তুই তার সাথে কথা বলবি না। আর যে নাম উপদেশ আমি তোকে দিয়েছি সেটা দুই মিনিট পর্যন্ত্য জপ করবি। দুই মিনিট পরে তাকে দেখবি, তার সৎকার করবি, তবে গুরুদেব আসলে স্বাভাবিক তাড়াতাড়ি করে চরণ ছুঁতে হয়। তবে এবার কেবল এই আদেশ রইল রাণী বললেন "ঠিক আছে।"

তখন রাণীর তো চিন্তা বেড়ে গেল। শ্রদ্ধাতে জপ করছিলেন তখন। করুণাময় (কবীর সাহেব) সাহেবের রূপ ধরে কাল (ব্রহ্ম) এসে ডাকলেন ইন্দ্রমতি, ইন্দ্রমতী। এমনিতে পূর্বেই রাণীর ভয় ছিল। নাম জপ স্মরণ করছিল তখনও কালের দিকে তাকাননি, দুই মিনিট পরে দেখুন কালের স্বরূপ বদলে গিয়েছে। তখন কালের আসল রূপ বেরিয়ে গেল, কাল নিজের বদলানো রূপ দেখে ভাবল, এই রাণীর কাছে মনে হয় কোনো শক্তিযুক্ত মন্ত্র আছে। কারণ হল কাল যে করুণাময়ের রূপ ধরে এসেছিল, সেই রূপ ইন্দ্রমতীর জপের কারণে বদলে যায় তাই কাল বুঝে নিয়েছিল যেকি কোন মন্ত্র এর কাছে আছে। কাল তখন রাণীকে বলে গেল যে, তোকে পরে দেখে নেব, এই বলে কাল ব্রহ্ম চলে গেলরাণী তো বেঁচে গিয়ে খুব খুশী অনুভব করছে, আনন্দে বুক ভরে যাচ্ছে। সে তার দাসীকে বলল আমার মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল, আমার গুরুদেব আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। রাজার কাছে গিয়ে বললেন আজকে আমার মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। আমার গুরুদেব আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাল এসেছিল। রাজা বললেন, তুই এইরকমই নাটক করে থাকিস্ কাল (যমদূত) আসলে কি তোকে ছেড়ে দিত?

এই সমস্ত গুরু বা সন্তেরা সব সময় আজগুবি কথা বলে বেড়ান অতএব রাণীর কথা রাজা কোনমতেই মানতে পারেনি, এদিকে রাণী খুশীর আনন্দে ঘরের পালঙ্কেতে গিয়ে শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বড় ধরনের সাপের রূপ ধরে কাল এসে রাণীকে দংশন করে, দংশন করতেই রাণী খুব জোরে চিৎকার করে বললেন, আমাকে সাপে কেটেছে। বাড়ীর চাকর দৌড়ে এসে দেখল ঘরের মধ্যে জল বের করার ছিদ্র দিয়ে সাপ বেরিয়ে গেল। নিজের গুরুদেবকে স্মরণ করেই রাণী বেহুঁশ (অজ্ঞান) হয়ে যান। গুরুদেবজি সামনে প্রকট হয়ে মন্ত্র জপেন যাতে অন্যান্য ব্যক্তিরা ভাববেন যে, মন্ত্রের সাহায্যেই হয়তো বেঁচে গিয়েছে। (তিনি তো বিনা মন্ত্রেই জীবিত করতে পারেন, তাহার যন্ত্র বা মন্ত্রের কোন প্রয়োজন হয় না, লীলা করতেই তিনি এই পৃথিবীর উপরে আসেন প্রিয় ভক্তদের উদ্ধার করতে) ইন্দ্রমতি রাণীকে করুণাময়ী পরমেশ্বর জীবিত করেছিলেন, রাণী ধন্যবাদ জানালেন যে কি, বন্দীছোড় আজ যদি আমি আপনার শরনে এসে নাম (জপ) দান না গ্রহণ করতাম, তাহলে আজ আমার মৃত্যু অনিবার্য্য হত। কবীর পরমেশ্বর (করুণাময়ী) বললেন যে, ইন্দ্রমতী! এই কালকে তোর ঘরে ঢুকতেও দিতাম না, তোর উপরে হামলাও হতে দিতাম না, তবে তোর বিশ্বাস হত না আর তুই ভেবে নিতি যেকি, তোর উপর কোনো বিপদ আপত্তি আসতই না, গুরুদের আমাকে ভুলিয়ে নাম প্রদান করেছেন। এইজন্য তোকে একটু ঝটকা দেখালাম, তাহা নাহলে পুত্রী, তোর বিশ্বাস আসত না।

ধর্মদাস, যঁহা ঘনা অন্ধেরা, বীন পরিচয় জীব যমকা চেরা।।

তখন কবীর সাহেব (করুণাময়) বললেন এখন আমি যখন ইচ্ছা করব তখনই তোর মৃত্যু হবে। তাই গরীব দাস বলছেন —

কাল ডরে করতার সে, জয় জয় জয় জগদ্বীশ।
জৌরা জৌরি ঝারতি, পগ রজ ডারে শিশ।।

কবীর ভগবান (কবীর পরমেশ্বর) থেকে এই কাল ভয় পায়। এই কাল (মৃত্যু) কবীর সাহেবের জুতোর ধুলো ঝাড়ে। অর্থাৎ চাকরের সমান। ফির ওই ধুলো নিজের মাথায় লাগিয়ে বলে আপনার ভক্তের কাছে, আমি কখনও যাব না।

গরীব – কাল জো পিসে পিসনা, জৌরে হে পনিহার
যে দো আসল মজুর হে, মেরে সাহেব কে দরবার।

এই কাল এখানকার ২১ ব্রহ্মান্ডের ভগবান (ব্রহ্ম) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবেব পিতা এবং দূর্গা (প্রকৃতির) স্বামীর এতো আমার কবীর সাহেবের আটা পেসে বা পাক্কা চাকর। আমার কবীর পরমেশ্বরের জল ভরে এক প্রকার চাকরাণী এই মৌত (মৃত্যু) এই আসল দুই মজদুর পরমেশ্বরের দরবারে। কিছুদিন পরে সাহেব কবীর এসে রাণীকে সতনাম প্রদান করলেন।

আবার সতনাম প্রদান করার কিছুদিন পরে করুণাময় সাহেব, রাণীর শ্রদ্ধা দেখে সারনাম দিয়ে। শব্দের উপলব্ধি করালেন। কবীর পরমেশ্বর কখনও কখনও ইন্দ্রমতীকে দর্শন দিতে যেতেন আর ইন্দ্রমতী প্রার্থনা করতেন, আমার স্বামী রাজাকেও আপনি বোঝান, যাতে আপনার চরণে স্থান পায় এর সাথে আমার জীবনও সফল হয়ে পরে আবার চন্দ্র বিজয় রাজাকে কবীর পরমেশ্বর বলতেন, আর নাম উপদেশ নিয়ে নে, তোর কাছে যে রাজপাট আছে এ দুদিনের ঠাট বাট ফির চুরাশী লক্ষ যোনিতে প্রাণীতে চলে যাবি। চন্দ্র বিজয় রাজা বলতেন, গুরুদেব আমি তো নাম নেবই না তবে রাণীকে আমি মানা করব না। তাতে ও এ সম্পত্তি রাণী দানেও যদি দিয়ে দেয় বা কোন প্রকার সৎসঙ্গ করাক না কেন আমি তাকে মানা করব না। করুণাময় (কবীর) পরমেশ্বর বললেন, আপনি নাম কেন নেবেন না? রাজা বলতেন, আমার তো বড় বড় রাজার পার্টিতে যেতে হয়। কবীর প্রভু বললেন, পার্টিতে যাবে, তারজন্য নাম কিসে বাধা পড়ছে। সভায় যাও, দুধ কাজু খাও, শরবত, জুস খাও কিন্তু মদ প্রয়োগ করবে না। মদ খেলে মহাপাপ হয়।

তবে রাজা মানেননি, রাণীর প্রার্থনায় করুণাময় (কবীর সাহেব) রাজাকে বললেন, নাম উপদেশ বিনা এই জীবনই বৃথা হয়ে যাবে, তুমি নাম উপদেশ নিয়ে নেও। রাজা বললেন, গুরুদেবজি! নাম উপদেশ নেবার জন্য আমাকে কোনোদিন বলবেন না, তবে আপনার শিষ্যা রাণীকে আমি কিছুতে বাঁধা দেব না, তাতে যদি রাণী সতসঙ্গ করতে বা দান করতে যতই খরচ করুক না কেন? করুণাময় পরমেশ্বর তখন রাণীকে বললেন পুত্রী! রাজা এই দুই দিনের জীবনের সুখকে দেখে, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তুই প্রভুর চরণে লেগে থাকিস। আর নিজের আত্ম কল্যাণ কর। এখানে কেউ কাহারও স্বামী নেই, কেউ কাহারও পত্নী নেই। পূর্ব জন্মের সংস্কারে এই দুইদিনের সম্বন্ধ নিজের কর্ম তৈরী কর। আজ ইন্দ্রমতী ৮০ বৎসরের বুড়ী হয়ে গিয়েছে, কবে ৪০ বৎসর বয়সে মরার কথা ছিল। যখন শরীর একদম চলতে না পারা অবস্থায় তখন করুণাময় সাহেব বলছেন, এখন বল কি চাস্? সতলোকে যেতে চাস? ইন্দ্রমতী বললেন পরমেশ্বর আমি তৈরী আছি, একদম তৈরী আছি দাতা। তোর নাতি নাতনীর জন্য কোন মমতা তো নেই? রাণী বললেন বিলকুল নেই পরমেশ্বর। আপনি

জ্ঞানই এমন দিয়েছেন নির্মল যে এই গন্ধ লোকে কি ইচ্ছা রাখব ? কবীর (করুণাময়) বললেন চল বেটী, রাণী প্রাণ ত্যাগ করেছেন। পরমেশ্বর কবীর (করুণাময়) রাণীর আত্মা উপর নিয়ে গিয়েছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এক মান সরোবর আছে, ঐ মান সরোবরে আত্মাকে স্নান করান, এই প্রাণীকে কবীর বন্দী ছোড় পরমেশ্বর পুরো গুরু স্বরূপে প্রকট হয়ে কিছু সময় পর্যন্ত্য এই সরোবরে রাখেন। বন্দী ছোড় কবীর পরমেশ্বর ইন্দ্রমতীকে ফির জিজ্ঞাসা করলেন, এই সংসারে যদি তোর কোন ইচ্ছা থাকে, তাহলে দুইবার জন্ম নিতে হবে। যদি মনে কিছু ইচ্ছা থাকে তাহলে সৎলোকে যেতে পারবে না। ইন্দ্রমতী বললেন সাহেব আপনি তো অন্তর্যামী, কোন ইচ্ছা নেই, আপনার চরণের ইচ্ছা আছে। কিন্তু একটু শঙ্কা আছে, আমার যে পতিদেব, তিনি ধার্মিক কাজে আমাকে কোনদিন মানা বা বাঁধা দেয়নি। আজকালকার স্বামীরা তো মানা করে দেয়। তিনি যদি আমাকে কোনদিন মানা করতেন, তাহলে আমি আপনার চরণে আসতে পারতাম না এবং আমার কোনোদিন কল্যাণও হত না। তার এই শুভকর্মের কোন ফল সহযোগ কিছু লাভ হয়ে থাকে তো, তার উপরও দয়া করবেন দাতা। পরমেশ্বর দেখলেন এই অবুঝ সরল আবার রাজার পিছনে ঝুলে রয়েছে। সাহেব বললেন ঠিক আছে বেটী, আরও দুই চার বছর ওখানে থাক। দুই বৎসর পর রাজাও মরতে লেগেছেন। কেননা নাম নেয়নি, যমের দূত এসেছে রাজা তাই উঠানে চক্কর খেয়ে পড়ে যায়, যমের দূত রাজার গলা দিতেই রাজার পায়খানা পেশাব বেরিয়ে যায়। করুনাময় কবীর সাহেব রাণীকে বলছেন দেখ্ তোর রাজার কি দশা ? ওখানের মানসরোবর থেকে পরমেশ্বর দেখাচ্ছেন। এই সব কৌতুক দেখে রাণী বললেন, দাতা যদি তার ভক্তির সহযোগের কোন ফল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে দয়া করে নেও। রাণীর তখনও একটু মায়া রয়ে গিয়েছিল। প্রভু কবীর করুণাময় ভাবছেন, আবার এ কালের জালে ফাঁসবে। এই ভেবে মান সরোবর থেকে ওখানে গিয়েছেন, যেখানে রাজা অচেতন হয়েছিল। যমদূত রাজার প্রাণ বের করছিল।

কবীর সাহেব কে দেখে, যমদূত ছেড়ে চলে গেল। চন্দ্র বিজয় রাজার হোঁশ আসাতেই। সামনে করুণাময় সাহেবকে শুধু রাজাই দেখতে পারছেন। রাজা। প্রভুর চরণে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন দাতা আমায় ক্ষমা কর, আমার প্রাণ বাঁচাও। কেননা রাজা বুঝতে পারছেন যে তার প্রাণ এখন চলেই যাবে। (যখন) মানুষের আসল জ্ঞান বা চোখ খোলে, তত সময় তো সারা খেলাই নষ্ট হয়ে যায়।) তখন বলে ক্ষমা কর দাতা, প্রাণ বাঁচাও মালিক, কবীর সাহেব বললেন, আজও এই কথা বলছি, ওই দিনও এই কথা বলেছিলাম, নাম নিতে হবে। তখন রাজা বলে আমি নাম নেব প্রভু এখনই নেব। কবীর সাহেব নাম উপদেশ দিয়ে, বললেন, এখন তোকে দুই বছরের আয়ু দিচ্ছি, এর মধ্যে যদি কোন শ্বাস নাম নিতে। খালি থেকে যায় তাহলে কর্মদন্ডতে রয়ে যাবে।

কবীর — জীবন তো থোরা ভালা, জৈ সত সুমরন হো
লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখে ধরে না কো ।।

শুভ কর্মতে সহযোগ দেওয়া এবং পূর্বের কর্ম আর সাথে শ্রদ্ধাতে দুই বর্ষ স্মরণে রয়েছিলেন এবং তিন নাম প্রদান করে, কবীর সাহেব চন্দ্রবিজয় রাজাকেও পাড় করে নিয়ে গিয়েছেন বলো (কবীর পরমেশ্বর) কবির্দেব কী জয়। জয় বন্দী ছোড় কী জয়। পরমেশ্বর কবীর সত্যিকারের দয়ালু। তিনি শ্রদ্ধালু ভক্তদের আয়ু তো বাড়িয়ে দেন এবং সেই পরিবারকে সব সময় রক্ষা করেন।

উপরের বিবরণ থেকে সিদ্ধ হয়েছে। এই প্রমাণ দ্বাপর যুগে। বর্তমানে সাধারণ ব্যক্তিবিশ্বাস করে না। বর্তমানে পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শক্তিতে সতগুরু রামপাল মহারাজ দ্বারা কষ্ট নির্বান হয়েছে বা আয়ু বৃদ্ধি র অনেক প্রমাণ এই পুস্তকে পড়বেন "মার্গ হারাকে মার্গের বিষয়ে" নামক লেখায়।

।। কলিযুগে কবীর সাহেব (কবির্দেব) প্রকট হয়েছিলেন।।

বিক্রমী সনবত্ ১৪৫৫ (সন্ ১৩৯৮) জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় সকাল সকাল ব্রহ্মমুহুর্তে ওই পূর্ণ পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব) স্বয়ং নিজের মূল স্থান সতেলোক থেকে এসেছিলেন। কাশীতে লহর তারা নামের সরোবর (পুকুর)-রের ভিতর পদ্মফুলের উপর বালক রূপ ধারণ করেছিলেন। প্রথমে আমি আপনাদেরকে নীরু ও নিমার কিছু পরিচয় দিচ্ছি, যে এরা কে? দ্বাপর যুগে এরা মানে নীরু ও নিমার কিছু পরিচয় দিচ্ছি, যে এরা কে? দ্বাপর যুগে এরা মানে নীরু ও নিমা সুপচ সুদর্শনের মাতা পিতা ছিল। এরা দ্বাপর যুগে কবীর সাহেবের কথা শোনেননি বা স্বীকার করেননি। এই সুদর্শন পান্ডবদের যজ্ঞ দ্বাপর যুগে সফল করেছিলেন। এই কলিযুগের নীরু নিমা দ্বাপরে সুদর্শনের মাতা পিতা ছিলেন। সুদর্শন তখন করুণাময় (কবীর) সাহেবের শিষ্য ছিলেন, সুদর্শনের মাতা পিতা কিন্তু করুণাময় প্রভুকে স্বীকার করেনি। এই সুদর্শন করুণাময় প্রভু(কবীর) সাহেবকে প্রার্থনা করে বলেছিলেন। প্রভু আপনি আমায় নাম উপদেশ দিয়েছেন, সব কিছু দিয়েছেন। আপনার কাছে আজ পর্যন্ত কিছু চাইনি বা আবশ্যকতা মনে হয় নি, কেননা আপনি সব মনোকামনা পূর্ণ করেছেন। বাস্তবিক আসল যে ধন, তাও পরিপূর্ণ ভক্তিতে হয়েছে। দাসের এক প্রার্থনা যদি উচিৎ বুঝলে, স্বীকার করে নেবেন। আমার মাতা পিতা যদি কোনো জন্মে মানব শরীর প্রাপ্ত হয় তাহলে তাদের সামলিয়ে নেবেন প্রভু। ইনারা খুব পুণ্যাত্মা কিন্তু ইনাদের বুদ্ধি বিপরীত হয়ে গিয়েছে, এরা আপনার বাণী মানেন না। কবীর সাহেব বললেন চিন্তা করো না, মাতা পিতার চক্করে উলঝো না, আসতে দে সময় সামলিয়ে নিয়ে। কাল জাল থেকে পাড় করে নেব। তুই নিশ্চি ন্তে সতলোকে যা। কলিযুগে নীরু নীমা , আগের দুটো জন্মেও ব্রাহ্মণ ছিলেন, যে দুই জন্ম পূর্বে হয়েছিল সেই সময়ও নিঃসন্তান ছিলেন। এইটা তাদের তৃতীয় জন্ম কাশীতে হয়েছিল। এই সময়ও ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী (গৌরী শঙ্কর আর সরস্বতী)-র নামে এই কলিযুগেও সন্তান ছিল না এরা শিবের উপাসনা করতেন। ভগবান শিবের মহিমা, শিবপুরাণ থেকে নিঃস্বার্থে ভক্তদের পাঠ করে শুনাতেন। কাহারও কাছ থেকে টাকা কড়ি নিতেন না। যদি কেউ কোন দান তার নিজের ইচ্ছায় দিত, সেখান থেকে নিজে খাওয়ার মত রেখে, অন্যকে খাইয়ে দিতেন। একদম পরিস্কার আত্মার লোক ছিলেন। অন্য স্বাথী ব্রাহ্মণরা গৌরীশঙ্কর ও সরস্বতীর উপর হিংসা করতেন। কেননা কাহারও কাছ থেকে টাকা পয়সা তিনি (গৌরি শঙ্কর) না নিয়ে সৎসঙ্গ শোনাতেন। তার কথা শোনার জন্য খুব ভীড় হত। অন্য ব্রাহ্মণ এই দেখে হিংসা করতেন। উনাদের সবাই ভালবাসতেন শ্রদ্ধাও করতেন। ওদিকে মুসলমানরা জেনে গিয়েছে যে বেশীরভাগই ব্রাহ্মণ এদের পক্ষে নেই, সেই সুযোগ বুঝে, সেই লাভ নিতে চেয়েছে। বলপূর্বক উনাদের মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে। মুসলমানের এঁঠো জল তাদের জবরদস্তি খাইয়ে দিয়েছে। তাদের এঁঠো জল সারা কাপড় ও ঘরে ছিটিয়ে দিয়েছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণরা বলল, আজ থেকে এ মুসলমানরা এদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

।। নীরু নীমা জুলাহে অর্থাৎ তাঁতীর উপাধি এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তি ।।

বেচারা গৌরী শঙ্কর ও সরস্বতী বিবশ হয়ে যান। মুসলমানরা গৌরী শঙ্করের নাম নীরু এবং সরস্বতীর নাম নীমা রেখেছে। আগে যা পূজা পাঠ করে কিছু পেত, তাতে তাদের সংসার চলে যেত। আর কিছু বেচে যেত সেই পয়সা দিয়ে গরীব দুখীকে ভোজন করে দিতেন। পূজা বন্ধ এখন কি কাজ করবে? উনরা কাপড় বুননো তাঁত নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাপড়ের পয়সাও যদি কিছু বাঁচত তাও লোককে খাইয়ে দিতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণরা নিরু নিমাকে গঙ্গাঘাটে স্নান করাও বন্ধ করে দিয়েছিল। বলতো এখন তুমি মুসলমান হয়ে গিয়েছ।

অন্যদিকে গঙ্গার জল ভেসে এক সরোবর কখনও কখনও এসে ভরে যেত। সেই সরোবরের (পুকুরের) নাম লহর তারা। অনেক বড় সেই পুকুর। সুন্দর পরিস্কার জল; তাতে পদ্মফুল ফুটে থাকত। সন্ ১৩৯৮ (বিক্রমী সবত্ ১৪৫৫) জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষ পূর্ণমাসীর ব্রহ্ম মুহুর্ত্তে (সূর্য উদয়ের দেড়ঘন্টা আগে) সতলোক থেকে সশরীরে পরমেশ্বর কবীর (কর্বিদেব) বালক রূপে লহর তারা সরোবরের পদ্মফুলে বিরাজমান হলেন। ঐ সরোবরে নীরু, নীমা ও ব্রহ্মমুহূর্ততে স্নান করতে যেতেন প্রতিদিন। সূর্য উঠার দেড়ঘণ্টা আগে এক তেজপুঞ্জ জ্যোতির গোলা (বালক রূপে পরমেশ্বর কবীর সাহেব তেজোময় শরীর যুক্তে এসেছিলেন, দূর থেকে প্রকাশপুঞ্জের মতোই দেখাচ্ছিল) উপর (সতলোক) থেকে এসেছিলেন আর পদ্মফুলে বালকবেশে প্রকট হন। যার কারণে সারা সরোবর আলোময় হয়ে উঠেছিল। তারপর সরোবরের এককোনায় গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দৃশ্য স্বামী রামানন্দজীর এক শিষ্য ঋষি অষ্টানন্দ নিজের চোখে দেখেছিলেন, অষ্টানন্দ প্রতিদিন স্নান করতে এই লহর তারা সরোবরেই আসতেন। সরোবরে একান্ত জায়গায় বসে তার গুরুদেব রামানন্দের দেওয়া মন্ত্র জপ করতেন ও প্রকৃতির আনন্দ অনুভব করতেন। তিনি যখন দেখলেন এত তেজ প্রকাশ, চোখে ধাঁধা লাগছে। ঋষি অষ্টানন্দ মনে মনে ভাবলেন, হয়তো তার ভক্তি বা মনের কোনো মতি, ভ্রমই হবে। এই ভেবে এর কারণ জানবার জন্য তার গুরুদেবের কাছে গিলেন।

আদরণীয় রামানন্দজিকে শিষ্য অষ্টানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন হে গুরুদেব। আমি আজ এমন জ্যোতি দেখেছি, জীবনে কোনদিন এইরূপ দেখি নাই। আকাশ থেকে এক প্রকাশ সমুহ এসেছিল, সারা বৃত্তান্ত শোনালেন। আমার চোখে সে দৃশ্য সইতে পারছিল না। এইজন্য চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বন্ধ চোখে এক শিশু রূপ দেখতে পেয়েছিলাম। (যেমন সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখার পরে সূর্যের গোলা দেখায়, সেই রূপ আমি এক বালককে দেখেছিলাম। সেটা কি আমার ভক্তি বা উপলব্ধি না দৃষ্টির দোষ ছিল? স্বামী রামানন্দজী বললেন, পুত্র এইরকম লক্ষণ তখনই হয় যখন, উপরের লোক থেকে কোন অবতার গণ আসেন। তিনি ঐ স্থানে প্রকট হয় কোন মায়ের ওখানে জন্ম নিয়ে পরে লীলা করেন। (কেননা এই ঋষিদের এতটাই জ্ঞান ছিল বা জানতেন যে কি সব অবতার মা থেকেই জন্ম হয়ে থাকে।) তার যতটা জ্ঞান ছিল শিষ্যকে তাই শুনিয়ে সমাধান করেদিলেন।

নীরু নিমা প্রতিদিনের মতন ওই সরোবরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। রাস্তায় নীমা মনে মনে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন, হে ভগবান শিব (কেননা ওরা যদিও মুসলমান হয়ে থাকুক না কেনো

কিন্তু তাদের সাধনা? হৃদয় থেকে ভুলি নি কারণ এত বছরের সাধনা জন্ম তো ব্রাহ্মণ হিন্দু বংশে) তোমার ঘরে কি আমাকে দেওয়ার মত কোন বাচ্চা কম পড়েছে? আমাকেও একটা লাল (বাচ্চা) দিতে তো আমাদের জীবন সফল হয়ে যেত। এই ভেবে কাঁদতো। নীরু নিমাকে বলতো প্রভুর ইচ্ছায় খুশী হওয়া উচিৎ। যদি এমনভাবে কাঁদতে থাকিস্ তাহলে তোর শরীর তো দূর্বল হয়ে যাবে ও চোখে কম দেখবি। আমাদের ভাগ্যে সন্তান লেখা নেই। এই বলতে বলতে পুকুরের ধারে এসে স্নান করতে নামল তখন আসল একটু একটু অন্ধকার ছিল। নীমা স্নান করে বাইরে এসেছেন তার নিজের কাপড় বদলেও নিয়েছেন। নীরু স্নান করতে পুকুরে নেমেছেন, ঘন ঘন ডুব দিচ্ছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় বার যখন নিমা ভিজা কাপড় ধুতে গিয়েছেন তো অন্ধকার সরে সূর্য উদয় হবে, নীমা দেখে পদ্মফুলে কিছু নড়চড় করছে। কবীর সাহেব বাচ্চা রূপে এক পায়ের এক আঙুল মুখে দিয়ে এক পা হিলাচ্ছে। প্রথমে নীমা ভাবল হয়তো সাপ হবে, তার পতির কাছে আসছে, আবার ধ্যান দিয়ে তাকিয়ে দেখুন এক শিশু, বাচ্চা, তাও পদ্মফুলের উপর। সে তার স্বামীকে বললেন, দেখো দেখো ওই বাচ্চা জলে ডুবে যাবে। নীরু বলে বাচ্চার জন্য তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস্। জলের মধ্যে কি তোকে বাচ্চা দেখাচ্ছে? নীমা বললে সামনে পদ্মফুলের দিকে তাকিয়ে দেখো। নীমার জোরে আওয়াজে প্রভাবিত হয়ে যেদিকে নিমা আঙুল দিয়ে ইশারা করেছিলেন। নীরু এধার ওধার তাকানোর পর সেই দিকে তাকিয়ে দেখুন সত্যি করে, পদ্মফুলের উপর নবজাত শিশু শুয়ে রয়েছেন।

নীরু ওই বাচ্চাকে ফুল সমেত তুলে নিয়ে আনলেন। পরে নীমার কাছে দিলেন। তারপরে নীরু স্নান করে বাইরে আসলেন। নীমা বাচ্চা পেয়ে খুব খুশী এবং মনে মনে ভগবান শিবকে স্তুতি করে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করলেন। আর বলছেন, প্রভু তুমি আমার অনেক বৎসরের মনোকামনা পূর্ণ করেছো। (কেননা সে শিবের পূজারী ছিল) তাই বললেন হে প্রভু আজই হৃদয় থেকে ডেকেছি, আজই শুনেছো।

সেই কবীর পরমেশ্বর যার নাম নিলে হৃদয়ে এক বিশেষ হলচল শুরু হয় তাহার প্রেমে রোম রোম দাঁড়িয়ে যায়, যাকে দর্শন ও পাওয়ার ইচ্ছায় চোখে নদীর মত অশ্রুধারা বইতে থাকে, যার কথা ভাবলে হৃদয় ভরে ওঠে আর এই পরমেশ্বরকে যে পুত্র রূপে বুকে জড়িয়ে ধরে যে আনন্দ হয় তাহলে সে কেমন উপভোগ করতে পারেন, সে তো সেই মা-ই বলতে পারেন বা অনুভব করতে পারেন। সে দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। যেমন কেউ মিষ্টির স্বাদ বোঝার পর কাউকে বর্ণনা করতে সম্ভব হয় না, সে ভাব শুধু যে খায় সেই বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। যেমন মা নিজের বাচ্চাকে প্রাণ ভরে আদর করে, শিশু রূপধারী পরমেশ্বরকেও ঠিক তেমন ভাবে আদর করছেন, কখনও চুমো খাচ্ছেন, কখনও বুকে জড়িয়ে ধরছেন, বার বার শিশুর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে পেলে মা কি ভাবে তার বাচ্চাকে আদর করবেন, সে কথা সেই মাই জানেন। এর মধ্যে নিরু স্নান করে বেরিয়ে এসেছেন। নীরু বিচার করছে, না তো মুসলমানের সাথে আমার বিশেষ প্যার (ভালবাসা) আছে, না তো ব্রাহ্মণের সাথে বিশেষ ভালবাসা, হিন্দু ব্রাহ্মনরা তো আমাদের হিংসা করে। অতএব মানুষ সমাজকে বেশী দেখে। নীরু এটাও জানালেন যেকি আমাদের কোন সাথী নেই হিন্দুরা হিংসা করতো বলে সেই সুযোগ মুসলমানরা নিয়ে আমাদের মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে। এখন এই বাচ্চা যদি আমরা নিয়ে যাই তাহলে জিজ্ঞাসা

করবে, কোথা থেকে এনেছো ? এর মাতা পিতা কে ? তুমি কারর বাচ্চা উঠিয়ে নিয়ে এসেছ। এর মা হয়তো কান্না করছে। এই সব কথার জবাব আমরা কি করে দেব ? পদ্মফুলের মধ্যে পেয়েছি বললে কেউ বিশ্বাস করবে না এই সব ভেবে চিন্তে নিরু নিমাকে বলছে, এই বাচ্চা এখানে ছেড়ে দে, নীমা বলল এ বাচ্চা আমি কিছুতেই ছাড়ব না, আমি তরপ করে সরে যাব কিন্তু এ বাচ্চা ছাড়তে পারব না। না জানি এ বাচ্চা আমায় কি জাদু করেছে? নীরু সব কথা বুঝিয়ে বললেও নীমা কোন কথা শুনতে রাজি না, বলে একে নিয়ে আমি এই দেশ ছেড়ে অন্যস্থানে যেতে রাজি। নীরু ভাবল এ পাগল হয়ে গিয়েছে কেননা এ সমাজের কথাও ভাবছে না। নীরু নীমাকে বলছে, আজ পর্যন্ত্য তোর সব কথা আমি মেনেছি, কোনদিন কিছু তোকে মানা করিনি, আজ তুই একটা কথা রাখ। তোর এই কথা বাচ্চা ঘরে নিয়ে যাবার আমি মানব না। হয়তো এই বাচ্চা এখানে রাখ আর তা নাহলে তোকে থাপ্পর মার। নীরু কোনদিন তার পত্নীর গায়ে হাত দেয়নি আজ দিয়েছেন। তাই দেখে বাচ্চা বলছেন, নীরু আমায় ঘরে নিয়ে চল্ তোদের উপর কোন আপত্তি আসবে না। শিশুর বাক্য শুনে নীরু ঘাবরিয়ে গিয়েছেন, ভাবলেন এ বালক কোনো ফরিস্তা, বা সিদ্ধ পুরুষ হবে আর এদিকে আমার উপর কোন আপত্তি না আসে তাই চুপকরে হাটা শুরু করে, যখন বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে গিয়েছে, তখন সবাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছে যে বাচ্চা কোথা থেকে নিয়ে এসেছো ? কাশীর স্ত্রী পুরুষ সবাই ওই শিশুকে দেখতে এসেছে আর কেউ বলছে এ তো দেবতা, এত সুন্দর শরীর, এমন তেজময় বাচ্চা, আগে কোনোদিন দেখিনে কেউ বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের মধ্যে যে কোন প্রভু, কেউ বলে এতো উপর থেকে এসেছে মনে হচ্ছে কোন শক্তি।

গরীব- চৌরাশী বন্ধন কাটন, কীনী কলপ কবীর।
ভবন চতুর্দশ লোক সব টুটে যম জঞ্জির।। ৩৭৬।।

গরীব- অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড সে, বন্দী ছোড় কহায়।
সো তো এক কবীর হে, জননী জন্যা ন মায়।। ৩৭৭।।

গরীব- শব্দ স্বরূপ সাহিব ধনি, শব্দ সিন্ধ সব মাহি।
বাহর ভিতর রমি ব্রহ্মা, জঁহা তঁহা সব ঠাহি।। ৩৭৮।।

গরীব- জল থল পৃথিবী গগন মে, বাহর ভিতর এক।
পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর হে অবিগত পুরুষ অলেখ।। ৩৭৯।।

গরীব- সেবক হোয় কড়ি উতরে, ইস পৃথিবীকে মাহি।
জীব উধারন জগৎগুরু বার বার বলি যাই।। ৩৮০।।

গরীব- কাশী পুরী কস্ত কিয়া, উতরে অধর উধার।
মোমন কু মুজরা হুবা, জঙ্গল মে দিদার।। ৩৮১।।

গরীব-কোটি কিরন শশী ভাল সুধী, আসন অধর বিমান।
পরসত পূরণব্রহ্ম কু শীতল পিন্তরু প্রান।। ৩৮২।।

গরীব- গোদ লিয়া মুখ চুম্বি করি, হেমরূপ ঝলকন্ত।
জগর মগর কায়া করে দমকে পদম অনন্ত।। ৩৮৩।।

গরীব- কাশী উমটি গুল ভয়া, মোমন কা ঘর ঘের।
কই কহে ব্রহ্মা বিষ্ণু হে কই কহে ইন্দ্র কুবের।। ৩৮৪।।

গরীব- কই কহে ছল ঈশ্বর নহী, কই কিংনর কহলায়ে।
কই কহে গকান ঈশ, জিউ জিউ মাত রিসায়।। ৩৮৫।।
গরীব - কই কহে বরুন ধর্মরায় হে, কই কই কহতে ঈশ।
ষোলহ্ কলা সুভানন গতি, কই কহে জগদীশ।। ৩৮৬।।
গরীব- ভক্তিমুক্তি লে উতরে, মেটন তিনু তাপ।
মোমমন কে ডেরা লিয়া কহে কবিরা বাপ।। ৩৮৭।।
গরীব-দুধ ন পিবে না অন্ন ভখৈ, নহী পলনে ঝুলন্ত।
উধর উমান ধিয়ান মে, কমল কলা ফুলন্তা।। ৩৮৮।।
গরীব- কাশীমে অচরজ ভয়া, গই জগৎ কী নীন্দ।
এইসে দুলহে উতরে জিউ কন্যা বর বীন্দ। ।৩৮৯।।
গরীব-খলক মুলক দেখন গয়া রাজা প্রজা রীত।
জম্মুদ্বীপ জিহান মে, উতরে শব্দ অতীত।। ৩৯০।।
গরীব- দুনি কহে যোহ দেবহে দেব কহত হে ঈশ।
ঈশ কহে পারব্রহ্ম হে, পুরণ বীসবে বিশ।। ৩৯১।।

পরমেশ্বর কবিরই অনাদি পরম গুরু। উনিই রূপান্তর করে সাধু ঋষি বেশে সময় সময় পর স্বয়ং প্রকট হন। কালের অজ্ঞান সাধনাকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্বাস্থ্য করতে তিনি বা তার প্রতিনিধি মন্ডলির দ্বারা পরিস্কার করতে আসেন। কবীর সাহেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব অন্য দেবতা ঋষি মুনিও সাধুদের সময় সময় পর নিজের সতলোক থেকে এসে

নাম উপদেশ দিয়ে থাকেন। আদরণীয় গরীব দাস মহারাজ কবীর সাহেবের মুখের বাণী যা কবীর সাহেব স্বয়ং মুখে গরীব দাসকে বলেছিলেন গরীব দাস তাই লিপিবদ্ধ করে বলেছ্নে যে ঃ-

আদি অন্ত হমরা নহী, মধ্য মিলাবা মুল।
ব্রহ্মাজ্ঞান সুনাইয়া ধর পিন্ডা অস্থুল।।
শ্বেত ভূমিকা হম গয়ে, যহা বিশ্বম্ভর নাথ।
হরিয়ম হীরা নাম দে, অষ্টকমল দল স্বাতি।
হম বৈরাগী ব্রহ্মপদ সন্ন্যাসী মহাদেব।
সোহম্ মন্ত্র দিয়া শঙ্করকু, করত হমারী সেব।।
হম সুলতানী নানক তারে, দাদু কু উপদেশ দিয়া।
জাতি জুলাহ ভেদ না পাইয়া কাশী মোহে কবীর হুয়া।।
সতযুগমে সত সুকৃত কন্ট তেরা ত্রেতা নাম মুনিন্দ্রমের।
দ্বাপর মে করুণাময়, কলিমে নাম কবীর ধরায়া।।
চারোযুগ সে হম পুকারে,কুক কহে হম হেলরে।
হীরামানিক মতি বরষে এ জগ চুগতা ঢেলরে।।

উপরোক্ত বাণীতে সিদ্ধ হয় যে কি, কবীর পরমেশ্বরই অবিনাশী পরমাত্মা আছেন। অজর অমর এই পরমাত্মা চারিযুগে স্বয়ং অতিথী রূপে কিছু সময়ের জন্য এসে এই সংসারে সতভক্তি মার্গ দেখাতে আসেন, বা বলতে আসেন।

।। পূর্ণ সন্তের (গুরুর) পরিচয় (পবিত্র সদগ্রন্থ পূর্ণ সন্তের (গুরুর) পরিচয়)।।

বেদ গীতা আদি পবিত্র সদগ্রন্থতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখন যখন ধর্মের হানি হয়, বা অধর্মের বৃদ্ধি হয় এবং বর্তমানের নকল সাধু মহন্ত ও গুরু দ্বারা ভক্তি মার্গের স্বরূপকে নষ্ট করে দেয়। সেইজন্য পরমেশ্বর স্বয়ং এসে বা নিজের পরমজ্ঞানী সাধু (সন্ত)কে পাঠিয়ে সত্য জ্ঞানের দ্বারা ধর্মের পুনঃ স্থাপনা করান। সেই ভক্তিমার্গকে শাস্ত্রের অনুসার বুঝান। তিনি জানেন যে, বর্তমান ধর্ম গুরু তার বিরোধ করার জন্য আসবে মন্ত্রি ও প্রজাকে মিথ্যা কান ভরে তার উপর অত্যাচার করাবে বা করাতে পারে এবং করিয়েছে। কারণ সত্যকে তারা ঢাকতে চায় সত্য প্রকাশ হলে তাদের স্বার্থে আঘাত আসবে। সেইজন্য এমনটি তারা করে থাকে। তবে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। সত্য ঠিক সবার প্রকাশে এসে যায়। **কবীর বাণীতে বলেছেন ঃ-**

জোমম সন্ত সৎ উপদেশ দৃঢ়াষৈ (বঁতাবৈ) বাকে সঙ্গ সভি রাড় বড়াবৈ।
যা সব সন্ত মহন্তন কী করণী, ধর্মদাস মে তো সে বর্নী।।

কবীর সাহেব তার প্রিয় শিষ্য ধর্ম দাসকে এই বাণীতে বোঝাচ্ছেন যে আমার গুরু সত ভক্তি মার্গ সবাইকে বলবেন তার সাথে সব সাধু মহন্তরা গুরু ঝগড়া করবে। এটাই তার পরিচয় হবে।

দ্বিতীয় পরিচয় সেই গুরুর সব গ্রন্থের পূর্ণ জ্ঞান জানা থাকবে। **প্রমাণ সদগুরু গরীব দাসের বাণীতে—**

"সতগুরুর লক্ষণ কঁহু, মধুরে বেন বিনোদ, চারবেদ ষটশাস্ত্র, কহে আঠার বোধ।" সতগুরু গরীব দাস, নিজের বাণীতে পূর্ণ গুরুর পরিচয় বলেছেন যে ওই চারিবেদ ছয় শাস্ত্র, আঠারো পুরাণ আদি সব গ্রন্থের পূর্ণ বিষয়ে জানবেন অর্থাৎ তার সার তত্ত্ব বের করে বলবেন। যজুর্বেদে অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ২৫-২৬-তে লিখা আছে, যে বেদের অধুরে বাক্য বা সাংকেতিক শব্দ ও এক চতুর্থ ভাগ শ্লোককে পুরা করে বিস্তারভাবে বলবেন ও তিন সময়ের পূজা বলবে। যেমন সকালে পূর্ণ পরমাত্মার পূজা, দুপুরে বিশ্বের দেবতাদের তাদের সৎকার ও সন্ধ্যায় আরতি আলাদা করে বলবেন যা জগতের উপকারে সন্ত এই রকম হয়ে থাকেন।

।। যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ২৫।।

সন্ধিচ্ছেদ ঃ- উর্দ্ধ ঋচৈঃ উক্থানাম্ রূপম্ পদৈঃ আপোনতি নিবিদঃ।
প্রণবৈঃ শস্ত্রানাম্ রূপম্ পয়সা সোমঃ আপ্যতে।। ২৫।।

অনুবাদ ঃ- যে গুরু (উদ্ধ ঋচৈঃ) বেদের অর্ধেক বাক্য অর্থাৎ সাংকেতিক বাক্যকে পূর্ণ করে (নিবিদঃ) অধরাকে সম্পূর্ণ করে (পদৈঃ) শ্লোকের চতুর্থ ভাগের অর্থাৎ আংশিক বাক্যকে (উক্থানম্) স্ত্রোত্রের (রূপম্) রূপে (আপ্লোতি) প্রাপ্ত করে বা আংশিক বিবরণকে পূর্ণ রূপে বোঝেন ও বোঝান (শস্ত্রানাম্) শস্ত্রকে চালানো জানা ব্যক্তি তাকে (রূপম্) পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেন এই রকম পূর্ণ গুরু (সন্ত) (প্রণবৈঃ) ওঁ-কার অর্থ্যাৎ সোম্-তৎ-সত্ মন্ত্র কে পূর্ণ রূপের জ্ঞান ও বুঝায়ে থাকে (পয়সা) দুধ-জল যেমন ছাঁকা হয়ে থাকে অর্থাৎ দুধ জল মিশে থাকার পরে যেমন জল থেকে দুধ আলাদা হওয়ার মত তত্বজ্ঞান প্রদান করেন, যাতে (সোমঃ) অমর পুরুষ অর্থ্যাৎ অবিনাশী পরমাত্মাকে (আপ্যতে) প্রাপ্ত করা হয়। ওই পূর্ণ গুরু বেদকে জানে তাকে বলা হয়।

ভাবার্থ ঃ- তত্বদর্শী সন্ত (গুরু) সেই হয়, যে বেদের সাংকেতিক শব্দকে বিস্তার ভাবে বর্ণনা করতে পারেন। যে বর্ণন শুনে পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়, তাকেই বেদ জানলে বালা বলা হয়ে থাকে।

।। যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ২৬।।

সন্ধিচ্ছেদ ঃ- অশ্বিভ্যাম্ প্রাতঃ সবণম্ ইন্দ্রেন এন্দ্রম্ মাধ্যন্দিনেম্
বৈশ্বদৈবম্ সরস্বত্যা তৃতীয়ম আপ্তম্ সবনম্।।(২৬)

অনুবাদ ঃ- ওই পূর্ণ সন্ত (গুরু) তিন সময় সাধনা করতে বলেছেন। (অশ্বিভ্যাম্) সূর্যের উদয় ও অস্ত হতে যে টুকু দিন, সেই আধারে (ইন্দ্রেন) প্রথম শ্রেষ্ঠতা থেকে সর্ব দেবতাদের যে মালিক পূর্ণ পরমাত্মার (প্রাতঃসবনম্) পূজা তো প্রাতকালের কথা বলা হয়েছে যে (এন্দ্রেম্) পূর্ণ পরমাত্মার জন্য করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় (মাধ্যন্দিনম্) ওই দিনে মাঝখানে করতে বলা হয়েছে যে (বৈশ্বদৈবম্) সর্ব দেবতাদের সৎকারে সম্বন্ধিত (সরস্বত্যা) অমৃত বাণী দ্বারা করার কথা বলছে তথা (তৃতীয়ম্) তৃতীয় (সবনম্) পূজা সন্ধ্যাতে (আপ্তম্) প্রাপ্ত করে অর্থাৎ যিনি তিন সময়ের সাধনা ভিন্ন ভিন্ন করে করার কথা বলেন তিনিই জগতের উপকারক গুরু।

ভাবার্থ ঃ- যে গুরুর বিষয়ে মন্ত্র ২৫তে বলা হয়েছে তিনি দিনে তিন বার (প্রাতঃ দিনের মধ্য ও সন্ধ্যাতে) সাধনা করতে বলেন। সকালে তো পূর্ণ পরমাত্মার পূজা মধ্যাহ্নে (দুপুরে) সর্ব দেবতার সৎকার সন্ধ্যায় আরতি আদি অমৃতবাণীর দ্বারা করতে বলা হয়েছে। ইনিই সংসারের উপকার করে থাকা উপকারক জগৎগুরু।

।। যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ৩০।।

সন্ধিচ্ছেদ ঃ- ব্রতেম দীক্ষাম্ আপ্নোতি দীক্ষা আপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধাম আপ্নোতি শ্রদ্ধা সত্যম্ আপ্যতে।।৩০।।

অনুবাদ ঃ- (ব্রতেন্) খারাপ অভ্যাসের ব্রত রেখে অর্থাৎ ভাঙ, মদ, মাংস, তামাক আদির সেবন (খাওয়া) থেকে সংযম রাখা সাধক (দীক্ষাম্) পূর্ণ গুরুর দ্বারা দীক্ষাকে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় বা পূর্ণ গুরুর শিষ্য হয়ে থাকে। (দীক্ষয়া) পূর্ণ গুরুর দীক্ষিত শিষ্য থেকে (দক্ষিনাম্) দান (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ) সাদু (গুরু) তার কাছ থেকে দক্ষিণা নিয়ে থাকে যে দান দক্ষিণা থেকে ধর্ম করে তার থেকে (শ্রদ্ধাম্) শ্রদ্ধা (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় (শ্রদ্ধয়া) শ্রদ্ধাতে ভক্তি করলে (সত্যম্) সদা থাকা সুখ ও পরমাত্মা বা অবিনাশী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

ভাবার্থ ঃ- পূর্ণ সন্ত (গুরু) ওই ব্যক্তিকেই শিষ্য বানান যিনি সদাচারী থাকে। অভক্ষ পদার্থ ভোজন বা নেশার বস্তুর সেবন না করে কিংবা কাউকে সেবন করার জন্য প্রচেষ্টা করেনা এই সমস্তকে সংযোম করা সাধক না। পূর্ণ সন্ত তার কাছ থেকে নাম দান গ্রহণ করে থাকেন এবং যে তার শিষ্য হয়েছে। পূর্ণ গুরু থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করে দান দক্ষিণা করলে শ্রদ্ধা বাড়ে। শ্রদ্ধা দিয়ে সত্য

ভক্তি করলে অবিনাশী পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ হয়। পূর্ণ সন্ত (গুরু) ভিক্ষা ও চান্দা চায় না।

কবীর, গুরুবিন মালা ফেরতে গুরুবিন দেতে দান
গুরুবিন দোনো নিষ্ফল হে পুছো বেদ পুরাণ।।

তৃতীয় পরিচয় তিন প্রকারের মন্ত্র (নাম)-কে তিনবার উপদেশ করবে যাহার বর্ণন কবীর সাগর গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ২৬৫ বোধ সাগর সাথে মেলে ও গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এবং সামবেদ সংখ্যা নং ৮২২ তে মেলে।

।। কবির সাগরে অমর মূল বোধ সাগর পৃষ্ঠা ২৬৫।।

তব কবীর ঔস কহেবে লীন্থা, জ্ঞানভেদ সকল কহ দীন্থা
ধর্মদাস মে কহ বিচারী, জিহিতে নিবহে সব সংসারী
প্রথমহি শিষ্য হোয় জো আই, তা কহৈ পান দেহু তুম ভাই।। ১।।
জব দেখহু তুম দৃঢ়তা জ্ঞানা, তা কহে কহু শব্দ প্রবানা।।২।।
শব্দ মাহি জব নিশ্চয় আবে, তা কহে জ্ঞান অগাধ সুনাবে ।। ৩।।

দ্বিতীয় বার আবার বুঝিয়েছেন ঃ-

বালক সম জাকর হে জ্ঞানা, তা সো কহহু বচন প্রবানা (১)
জাকো সুক্ষ জ্ঞান হে ভাই, তাকো স্মরণ দেহু লখাই (২)
জ্ঞান গম্য জাকো পুনি হোই। সার শব্দ জা কো কহ সোই (৩)
জাকো হই দিব্য জ্ঞান প্রবেশা, তাকো কহে তত্বজ্ঞান উপদেশ।(৪)

উপরোক্ত বাণীতে স্পষ্ট হয়েছে যে, কড়ি হার গুরু (পূর্ণ গুরু সন্ত) তিন স্তিথিতে সার নাম পর্যন্ত প্রদান করেন আর চৌথা স্থিথিতে সার শব্দ প্রদান করেন। কেননা কবীর সাগরেতে প্রমাণ তো পরে দেখা হয়েছিল। তবে উপদেশ বিধি প্রথমেই পূজ্য দাদা গুরুদেব ও পরমেশ্বর কবীর সাহেব, আমার পূজ্য গুরুদেবকে প্রদান করে দিয়েছিলেন, যাহা আমাকে আমাদের শুরু থেকেই তিনবারে নামদানের দীক্ষা করে আসছেন। আমাদের গুরুদেব রামপালজী মহারাজ প্রথমবার শ্রীগণেশ, শ্রী ব্রহ্মা সাবিত্রী, শ্রী বিষ্ণু লক্ষ্মী, শ্রী শঙ্কর পার্বতী ও মাতা শেরাবালী (দূর্গা)-র নাম জপ দেন। যাদের বাস (স্থান) আমাদের মানব শরীর বানানো চক্রের মধ্যে আছে। মূল আধার চক্রে শ্রী গণেশ বাস করে, স্বাদ চক্রতে ব্রহ্মা সাবিত্রীর বাস, নাভি চক্রতে বিষ্ণু লক্ষ্মীর বাস, হৃদয় চক্রতে শঙ্কর পার্বতীর বাস, কণ্ঠ চক্রে দূর্গা (শেরাবালী) মাতার বাস আর এই সব দেব দেবীর আদি অনাদি নাম মন্ত্র হয়, বর্তমান গুরুদের সে জ্ঞান জানা নেই। এই সব চক্র খোলার পর মানবের ভক্তি করার সামর্থ্য হয়ে থাকে। **সতগুরু গরীবদাস নিজের বাণীতে প্রমাণ বলে গিয়েছেন ঃ-**

পাঁচ নাম গুঝ গায়ত্রী আত্মতত্ত্ব জগাও।
ওঁ কিলিয়ং হরিয়ম্ শ্রীয়ম্ সোহম্ ধ্যাও।।

ভাবার্থ ঃ- পাঁচ নাম যে গুঝ গায়ত্রী আছে। এর জপ করে আত্মাকে জাগ্রিত করো। দ্বিতীয়বারে দুই অক্ষরের জপ দেওয়া হয় তাতে এক ওঁ দ্বিতীয় তৎ (যেটা গুপ্ত আছে শুধু উপদেশীকেই বলা হয়) সে মন্ত্র শ্বাসের সাথে সাথে জপ করতে হয়। তৃতীয় বারে সারনাম দেওয়া হয়, সেটা পূর্ণ রূপে গুপ্ত আছে।

।। তিনবারে নাম জপ দেওয়ার প্রমাণ।।

(গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২৩)

ক্তঁ, তৎ, সৎ, ইতি, নিদেশঃ, ব্রহ্মণঃ, ত্রিবিধঃ, স্মৃতঃ

ব্রাহ্মণাঃ, তেন, বেদা;চ, যজ্ঞাঃ, চ, বিহিতা, পুরা, ।।।। ২৩।।

অনুবাদ ঃ- (ক্তঁ) ব্রহ্মের (তৎ) এটা সাংকেতিক পরব্রহ্মের (সৎ) পূর্ণ ব্রহ্মের (ইতি) এইরকম এ (ত্রিবিধঃ) তিনপ্রকারের (ব্রহ্মণঃ) পূর্ণ পরমাত্মার নাম সুমরনে (নিদেশঃ) সংকেত (স্মৃতঃ) বলেছে (চ) আর (পুরা) সৃষ্টিরও আদিকালে (ব্রাহ্মণাঃ) বিদ্যানরা বলেছে যে (তেন) ওই পূর্ণ পরমাত্মা (বেদাঃ) বেদ (চ) আর (যজ্ঞাঃ) যজ্ঞাদি (বিহিতাঃ) রচেছেন।

।। সংখ্যা নং ৮২২ সামবেদ উতার্চিক অধ্যায় ও খণ্ড নং ৫ শ্লোক নং ৮ ।।

(সন্ত রামপাল দাসজি দ্বারা ভাষাভাষ্য)

মনীষিভিঃ পবতে পূর্বঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাং অসিষ্যদৎ।

ত্রিতস্য নাম জনযন্মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ূং সংখ্যায় বর্ধয়ন্।। ৮।।

মনীষিভিঃ-পবতে-পূর্বঃ-কবির্-নৃভিঃ-যতঃ-পরি-কোশান্-অসিষ্যদৎ-ত্রি-তস্য-নাম-জনযন্-মধু-ক্ষরণঃ-ন-ইন্দ্রস্য-বায়ুম্-সংখ্যায়-বর্ধয়ন।

শব্দার্থ ঃ- (পূর্ব্যঃ) সনাতন বা অবিনাশী (কবীর নৃভিঃ) কবীর পরমেশ্বর মানব রূপ ধারণ করে বা গুরু রূপে প্রকট হয়ে (মনীষিভিঃ) হৃদয় দিয়ে চায় যারা সেইরূপ শ্রদ্ধাতে ভক্তি করা ভক্তাত্মাকে (ত্রি) তিন (নাম) মন্ত্র বা নাম উপদেশ দিয়ে (পবতে) পবিত্র করে (জনয়ন) জন্ম ও (ক্ষরণ) মৃত্যু থেকে (ন) রহিত করে বা মুক্তি দেন (তস্য) তার (বায়ুম্) প্রাণ বা জীবন যেমন শ্বাস কে (আয়ুর যে সময়টাকে) যে সংস্কার বশগুনে গুনে দেওয়া হয় তাকে (কোশান্) নিজের ভান্ডার থেকে (সংখ্যায়) মিত্রতার আধারে (পরি) পূর্ণ রূপে (বর্ধয়ন) বাড়িয়ে দেন। (যতঃ) যার কারণে (ইন্দ্রস্য) পরমেশ্বরের (মধু) বাস্তবিক আনন্দকে (অসিষ্যদৎ) নিজের আশির্বাদ প্রসাদের দিয়ে প্রাপ্ত করান।

ভাবার্থ ঃ- এই মন্ত্রে স্পষ্ট করেছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবীর অর্থাৎ মানব শরীরে গুরু রূপে প্রকট হয়ে, প্রভু প্রেমীদের তিন নাম জপ দিয়ে সত্য ভক্তি করান তথা ওই মিত্র ভক্তকে পবিত্র করে নিজের আশির্বাদে পূর্ণ পরমাত্মা প্রাপ্তির পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত করান এবং সাধকের আয়ূ বাড়িয়ে দেন। ওই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ তে আছে, ক্তঁ-তৎ-সৎ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবি দ্য স্মৃতঃ ভাবার্থ হল, পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা ক্তঁ (১) তৎ (২) সৎ (৩) এই মন্ত্র জপ স্মরণ করার নির্দেশ আছে। এই নামকে তত্বদর্শী সন্ত (সাধু/গুরু) দ্বারা প্রাপ্ত করো। তত্বদর্শী সাধু (গুরুর) বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ তে বলেছে আর গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক ১ তে ও ৪ তে তত্ত্বদর্শী সন্তের (গুরুর) পরিচয় বলেছে এবং এও বলা হয়েছে তত্ত্বদর্শী সন্ত থেকে তত্বজ্ঞান জেনে, পরে ওই পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিৎ। যেখানে গেলে সাধক ফিরে আবার সংসারে আসতে হয় না অর্থাৎ পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। ওই পূর্ণ পরমাত্মার দ্বারা সংসার রচনা হয়েছে।

বিশেষ ঃ- উপরের বিবরণে স্পষ্ট হয়েছে যে চারিবেদ সাক্ষী আছে যে পূর্ণ পরমাত্মাই শুধু পূজার উপযুক্ত বা যোগ্য। তার বাস্তবিক নাম কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) আছে।

অতএব তিন মন্ত্রের জপ করলেই পূর্ণ মোক্ষ হবে। ধর্মদাসজীকে তো পরমেশ্বর সার শব্দ দিতে মানা করে ছিলেন। এও বলেছিলেন যেকি, যদি এই সার শব্দ কোন এককালে দূতের হাতে পড়ে যায়, তাহলে কলিযুগের মধ্যম ধাপের (আত্মার) পাড় হতে পারবে না। যেমন কলিযুগের প্রথমদিকের ধাপের ভক্ত আত্মা অশিক্ষিত ছিল, তথা কলিযুগের অন্ততে অন্তিম ধাপের ভক্ত আত্মা কৃতঘ্নী হয়ে যাবে। ১৯৪৭-তে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর মধ্য ধাপে আরম্ভ হয়েছে। ১৯৫১তে সৎগুরু রামপাল মহারাজজীকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আজ সর্বভক্তজন শিক্ষিত হয়েছে। শাস্ত্র আমাদের কাছে বিদ্যমান, এখন এই সৎমার্গ সৎ সাধনা পুরো সংসারে ছাড়িয়ে পড়বে। নকল গুরু ও সাধু, মহন্ত লুকিয়ে বেড়াবে। এই জন্য কবীর পরমেশ্বর আপন শিষ্য ধর্মদাস মহারাজকে সতলোকে নিয়ে সব সত্য দেখিয়েছিলেন ও সার নাম শব্দ ওই সময় কাউকে দিতে মানা করেছিলেন। যাতে কালের দূতের হাতে যদি সার শব্দ পড়ে যায় তাহলে কেউ মধ্য ধাপেতে উদ্ধার বা মোক্ষ লাভ করতে পারবে না।

।। এইজন্য কবীর সাগর জীব ধর্মবোধ, বোধ সাগর পৃষ্ঠা ১৯৩৭ পর।।

ধর্মদাস তোহি লাখ দোহাই, সার শব্দ কহি বাহর না যাই,
সার শব্দ বাহর জো পরি হে, বিচলি (মধ্য) পীঢ়ী হাঁস নহী তরী হে।

পুস্তক, "ধনী ধর্মদাস জীবন দর্শন ও বংশ পরিচয়, পৃষ্ঠা ৪৬-তে লেখা এগারো পীঢ়ীর গদ্দী মেলেনি। যে মহন্তর নাম "ধীরজ সাহেব" কবর্ধাতে থাকতেন। দ্বাদশ পিঢ়ির মহন্তর নাম উগ্রসাহেব, দামা খেড়া গদ্দী স্থাপনা করেন এবং স্বয়ং মহন্ত হয়ে গিয়েছিলেন এর আগে দামাখেড়ায় গদ্দী ছিল না। এতে স্পষ্ট হয় যে, পুরো বিশ্বেতে সতগুরু রামপালজী মহারাজের অতিরিক্ত (ছাড়া) বাস্তবিক ভক্তিমার্গ নেই। সতগুরু রামপালজী মহারাজ নিজের প্ররোচনায় বার বার বলেন, সর্ব প্রভু প্রেমী শ্রদ্ধালুদের কাছে প্রার্থনা যে আমাকে প্রভুর পাঠানো দাস জেনে যার যার নিজের কল্যাণ করান।

"যহ সংসার সমঝদা নাহী, কহন্দা। শ্যাম দোপহরে নু
গরীব দাস যহ বক্ত জাত হে, রোবোগে ইস পহরে নু।।"

দ্বাদশ পন্থ (গরীব দাস পন্থ দ্বাদশ পন্থ লিখেছেন কবীর সাগর, কবীর চরিত্র বোধ পৃষ্ঠা ১৮৭০ পর) -এর বিষয়ে কবীর সাগরে কবীর বাণী পৃষ্ঠ নং ১৩৬-১৩৭ তে বাণী

সম্বৎ সত্রাসৈ পঁচাত্তর হোই, তাদিন প্রেম প্রকটে জগ সোই,
সাখী হমারী লে জীব সমঝাবে, অসংখ্য জন্ম ঠোর নহী পাবে।
দ্বাদশ পন্থ প্রগট হে বাণী, শব্দ হমারে কী নির্ণয় ঠানী,
অস্থির ঘর কা মরম ন পাবে, য়ে বারা পন্থ হমহিকো ধ্যাবে।
দ্বাদশ পন্থ হমহি চলি আবে, সব পন্থ মেটি একহি পন্থ চলাবে
ধর্মদাস মোরি লাখ দোহাই, সার শব্দ বাহর নহী যাই
সার শব্দ বাহর জো পরহি, বিচলি পিঢ়ি হংস নহী তরহী
তেত্রিশ অর্ব জ্ঞান হম ভাখা, সার শব্দ গুপ্ত হম রাখা
মুল জ্ঞান তব তক ছুপাই, জব লগ দ্বাদশ পন্থ মিট যাই।।

এখানে সাহেব কবির পরমেশ্বর নিজ শিষ্য ধর্মদাসজীকে বোঝাচ্ছেন, ১৭৭৫ সম্বত্ তে আমার জ্ঞান প্রচার হবে, সেটা দ্বাদশ পন্থ হবে মানে (১২ নম্বরের পন্থ) দ্বাদশ পন্থ (১২ নং পন্থ) এই পন্থে আমার বাণী প্রকট হবে কিন্তু সঠিক ভক্তি মার্গ হবে না। পরে দ্বাদশ পন্থে আমিই ফিরে আসব এবং সব পন্থ মিটিয়ে কেবল একই পন্থ চালাব। কিন্তু ধর্মদাস তোকে সৌগন্ধ (প্রতিজ্ঞা) এই যে সার শব্দ যেন কোন কুপাত্র কে দিয়ে দিও না, তাহলে মধ্য ধাপের আত্মা পার হতে পারবে না। এইজন্য যতক্ষণ না বারো পন্থা শেষ হবে বা একপন্থা না হবে ততক্ষণ আমি এই মূল জ্ঞান লুকিয়ে রাখব।

(সন্ত গরীব দাস মহারাজের বাণীতে নামের মহত্ব)

নাম অভৈপদ উঁচা সন্তো, নাম অভৈপদ উঁচা।
রাম দুহাই সাচ কহত হুঁ, সতগুরু সে পুছা।।
নাম নিরঞ্জন নিকা সন্তো, নাম নিরঞ্জন নীকা।
তীর্থ ব্রত থোথরে লাগে, জপ তপ সংযম ফীকা।।
গজ তুরক পালকী অর্থা, নাম বিনা সব দান ব্যর্থা।
কবীর নাম গহে সো সন্ত সুজানা, নামবিনা জগ উরঝানা।
তাহি না জানে এ সংসারা নাম বিনা সব যম কে চারা।।

(সন্ত নানক সাহেবের বাণীতে নামের মহত্ব)

নানক নাম চড়দি কলা, তেরে ভানে সবদা ভলা।
নানক দুখিয়া সব সংসার, সুখিয়া সোই নাম আধার।।
জাপ তাপ জ্ঞান সব ধ্যান, ষট শাস্ত্র সিমরত ব্যাখান।
যোগ অভ্যাস কর্মধর্ম সবক্রিয়া সগল ত্যাগবন মধ্য ফিরিয়া।।
অনেক প্রকার কিয়ে বহুত যত্না, দান পুন্য হোমৈ বহুত রত্না।
শীশ কাটায়ে হোমে কর রাতি ব্রত নেম করে বহুভান্তি।।
নহী তুল্য রাম নাম বিচার, নানক গুরুমুখ নাম জপিয়ে একবার।।

(পরম পূজ্য কবীর সাহেব (কবীর্ দেব) এর অমৃত বাণী)

সন্তো শব্দই শব্দ বখানা।। টেক।।

শব্দ ফাঁস ফঁসা সব কই শব্দ নহী পহচানা।।
প্রথমহিঁ ব্রহ্মস্বঁ ইচ্ছাতে পাঁচৌ শব্দ উচারা।
সোহং নিরঞ্জন, রংরকার শক্তি ওর ওঁ-কার।।
পাঁচৌ তত্ব প্রকৃতি তিনো গুণ উপজায়া।
লোকদ্বীপ চারো খান চৌরাসী লখ বনায়।।
শব্দই কাল কলন্দর কহিয়ে শব্দই ভর্ম ভুলায়া।।
পাঁচ শব্দ কী আশা সে সর্বস মূল গবায়া।।
শব্দই ব্রহ্মপ্রকাশ মেট কে বৈঠে মুন্দে দ্বারা।
শব্দই নিগুর্ণ শব্দই সরগুন শব্দই বেদ পুকারা।।

শুদ্ধ ব্রহ্ম কায়াকে ভিতর, বৈঠ করে স্থানা।
জ্ঞানী যোগী পন্ডিত ও সিদ্ধ শব্দ মে উরঝানা।।
পাঁচই শব্দ পাঁচ হে মুদ্রা কায়া বীচ ঠিকানা।
জো জিহসঙ্ক আরাধন করতা সো তিহি করত বখানা।।
শব্দ নিরঞ্জন চাঞ্চরী মুদ্রা-হে মৈনন কে মাঁহি।
তাকো জানে গোরখ যোগী, মহা তেজ তপ মাঁহি।।
শব্দ ওঁ-কার ভূচরী মুদ্রা ত্রিকুটি হে স্থানা।
ব্যাসদেব তাহি পহিচানা চাঁদ সূর্য তিহি জানা।।
সোহং শব্দ অগোচরী মুদ্রা ভম্বর গুফা স্থানা।
শুকদেব মুনি তাহি পহিচানা সুন অনহদ কো কানা।।
শব্দ রঁরকার খেচরী মুদ্রা দশবে দ্বার ঠিকানা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ আদি লো রঁরকার পহিচানা।।
শক্তি শব্দ ধ্যান উন্মুনী মুদ্রা বসে আকাশ সনেহী।
ঝিলমিল ঝিলমিল জোত দিখাবে জানে জনক বিদেহী।।
পাঁচ শব্দ পাঁচ হে মুদ্রা সো নিশ্চয় কর জানা।
আগে পুরুষ পুরাণ নিঃঅক্ষর তিনকি খবর ন জানা।।
নৌ নাথ চৌরাশী সিদ্ধি লো পাঁচ শব্দ মে অটকে।
মুদ্রা সাধ রহে ঘট ভিতর ফির ওন্ধে মুখ লটকে।।
পাঁচ শব্দ হে মুদ্রা লোকদ্বীপ যম জালা।
কহে কবীর অক্ষর কে আগে নিরক্ষর কা উজিয়ালা।।

যেমন কি এই শব্দে "সন্তো শব্দই শব্দ বখানা" তে লেখা আছে, সবই সন্তজন শব্দের মহিমা শুনায়। পূর্ণ ব্রহ্মকবীর বলেছেন যে, শব্দ সতপুরুষেরও হয়ে থাকে যে কি সৎ পুরুষ প্রতীক আছে এবং জ্যোতি-নিরঞ্জনের প্রতীকও শব্দই আছে যেমন শব্দ জ্যোতি নিরঞ্জন এই চাঞ্চরী মুদ্রাকে প্রাপ্ত করায়, ইহাকে গোরখ যোগী অনেক তপ করে প্রাপ্ত করেছিল, যে কি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় আর পরে গোরখ নাথ কাল পর্যন্তই সাধনা করে সিদ্ধই হয়েছিলেন কিন্তু মুক্ত হতে পারেনি। যখন কবির সাহেব সত্য নাম ও সারনাম দিয়েছিলেন তখন কাল থেকে ছুটেছিল। এইজন্য জ্যোতি নিরঞ্জনের নাম জপ করা ব্যক্তি, কাল জাল থেকে বাঁচতে পারে না এবং সতলোকেও যেতে পারে না। শব্দ ওঁ-কারের জপ করলে ভুঞ্চরী মুদ্রার স্থিতিতে সাধক এসে যায়। যাহা কিনা বেদব্যাস সাধনা করে কালের জালেই থেকে গিয়েছেন। সোহম্ নামের জপেতে অগোচরী মুদ্রার স্থিতি হয়ে যায়, আর কাল থেকে যে ভম্বরী গুফা সেখানে পৌঁছে যায়। যে সাধনা শুকদেব ঋষি করেছিল সে কেবল বিষ্ণু লোকে যে স্বর্গ বানানো সেই পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শব্দর রঁরঙ্কার খৈঞ্চরী মুদ্রা দশম দ্বার (সুষোমনা) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনোজন রঁরকারকেই সত্য মেনে কালের জালে উলঝে রয়ে গিয়েছে। শক্তি (শ্রীয়ম্) শব্দ এ উনমনী মুদ্রাকে প্রাপ্ত করায়, যে কি না রাজা জনক প্রাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু মুক্তি হয়নি। কোনো সন্ত পাঁচ

নামের শক্তির জায়গায় সত্য নাম জুড়ে দিয়েছে, সত্য নাম কোন জপ নয়। এ হল সত্য নামের দিকে ইশারা হয়। যেমন সত্যলোককে সত্য খন্ড ও বলে এই রকম সত্য নাম ও সঠিক নাম আছে। কেবল সত্যনাম সত্যনাম জপ করার নয়। এই পাঁচো শব্দের সাধনা করা নৌ নাথ আর চুরাশী সিদ্ধ ও এই পর্যন্ত্য সীমিত থাকে তথা শরীরেই (ঘটেতেই) ধুনি শুনে আনন্দ নিয়ে থাকে। বাস্তবিক সতলোক স্থান তো শরীর (পিন্ড) থেকে (অন্ত) ব্রহ্মান্ডের ওপারে আছে। এই জন্য কালের ব্রহ্মান্ডে আবার মাতার গর্ভে এসেছে (উল্টো লটকে) অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর কষ্ট সমাপ্ত হয় নি। যাহা কিছু উপলব্ধি (ঘট) শরীরে হোক না কেন, ওতো কাল (ব্রহ্ম)পর্যন্ত্যই থাকে। কেননা পূর্ণ পরমাত্মার নিজ স্থান (সত্যলোক) তথা তার শরীরের প্রকাশ তো পরব্রহ্মআদি থেকেও অধিক এবং অনেক দূরে আছে। সেখানে যেতে হলে, পূর্ণ সন্তই পুরো সাধনা বলবেন যা এই পাঁচ নাম (শব্দ) থেকে আলাদা আছে।

"সন্তো সতগুরু মোহে ভাবৈ, জো নৈনন অলখ লখাবৈ।
ঢৌলত ঢিগৌ না বোলত বিসরে সত উপদেশ দৃঢ়াবৈ।।
আখ না মুন্দে কান না রুন্দে, না অণহদ উরঝাবে।
প্রাণপুঞ্জ ক্রিয়াও সে ন্যারা সহজ সমাধি বতাবে।।

"ঘট রামায়ণের রচয়িতা আদরণীয় তুলসী দাস সাহেবজীর হাত রস বালে স্বয়ং বলেন ঃ- (ঘট রামায়ণ প্রথমভাগ পৃষ্ঠা নং ২৭)।

পাঁচ নাম কাল কে জানো তব দানী মন শঙ্কা আনো।
সুরতি নিরত লে লোক সিধাউ আদি নাম লে কাল গিরাউ।
সতনাম লে জীব উবারী, অস চল জাউ পুরুষ দরবারী।।
কবীর, কোটি নাম সংসার মে। ইনসে মুক্তি ন হো।
সার নাম মুক্তি দাতা, বাকো জানে ন কই।।
পুরা সতগুরু সোয়ে কহাবে দোয়ে অখর কা ভেদ বতাবে।
এক ছুড়াবে এক লখাবে তো প্রাণী নিজ ঘর জাবৈ।।

গুরু নানকের বাণীতে তিন নামের প্রমাণ ঃ-

জৈ পন্ডিত তু পড়িয়া, বিনা দুই অখর দুই নামা।
পরনবত নানক এক লঙ্গায় জে কর সচ সমাবা
বেদ কতেব সিমরিত সব সাংসত, ইন পড়ি মুক্তি ন হই।
এক অক্ষর যো গুরুমুখ জাপে, তিসকি নির্মল হই।

ভাবার্থ ঃ- গুরুনানক নিজের বাণী দ্বারা বুঝাতে চাইছেন, পূর্ণ সতগুরু তিনি যে কিনা দুই অক্ষরের জপের বিষয়ে জানেন। যাকি না এক কাল ও মায়ার বন্ধন থেকে ছাড়ায় আর দ্বিতীয় পরমাত্মাকে দেখায়। আর তৃতীয় যে এক অক্ষর আছে সে পরমাত্মাকে মিলায়।

সন্ত গরীব দাস মহারাজের অমৃত বাণীতে শ্বাস নামের প্রমাণ।

গরীব স্বাসা পারস ভেদ হমারা, জো খোঁজে সো উতরে পারা।
স্বাসা পারা আদি নিশানি, জো খোঁজে শো হই দরবাণী।

স্বাসাহি মে সার পদ, পদমে স্বাসা সার।
দম দেহিকা খোঁজ করো আবাগমন নিবার।।
গরীব, শ্বাস সুরতি কে মধ্য হে, ন্যারা কদে নহী হোয়।
সতগুরু সাক্ষী ভুতকু, রাখো সুরতি সমোই।।
গরীব, চার পদার্থ উসমে জৌবে, সুরতি নিরতি মন পবন সমোবৈ।
সুরতি নিরতি মন পবন পদার্থ (নাম) করো ইক্তর যার।।
দ্বাদশ অন্দর সমোই লে, দিল অন্দর দিদার।
কবীর কহতা হু কহি জাত হুঁ, কহুঁ বজাকর ঢোল।
শ্বাস জো খালি জাত হে, তিন লোক কা মোল।।
কবীর মালা শ্বাস উশ্বাস কী ফেরেঙ্গে নিজ দাস।
চৌরাশী ভ্রমে নহী, কটৈ কর্ম কি ফাঁস।।

।। গুরু নানক দেবের বাণীতে প্রমাণ ।।

চহউ কা সঙ্গ, চহউ কা মীত, জামে চারি হটাবে নীত।
মন পবন কো রাখে বন্দ, লহে ত্রিকুটি ত্রিবেণী সংঘ।।
অখন্ড মন্ডল সে সুন্ন সমা না, মন পবন সচ্চ খন্ড ঠিকানা।।

পূর্ণ সতগুরু তিনিই যিনি তিন বারে নাম দেন এবং শ্বাস ক্রিয়ার সাথে সুমিরন করানো শিখায় তবেই জীবের মোক্ষ সম্ভব। যেমন পরমাত্মা সত্য। ঠিক ওই প্রকার পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ও মোক্ষ প্রাপ্ত করার পদ্ধতিও আদি অনাদি ও সত্য। যে কোনোদিন বদলায় না। **তাই গরীব দাস বাণীতে বলছেন —**

ভক্তি বীজ পলটে নহী, যুগ যাহি অসংখ।
সাইসির পর রাখিয়ে। চৌরাশী নহী শঙ্ক।।
ঘীসা আই একো দেশ সে উতরে একো ঘাট।
সমঝো কা মার্গ একো হে মূর্খ বারো বাট।।
কবীর ভক্তি বীজ পলটে নহী আন পড়ে বহু ঝোল।
জে কাঞ্চন বিষ্টা পরৈ, ঘটৈ ন তাকা মোন।।

অনেক মহাপুরুষ সত্য নামের বিষয় কিছু জানেন না। তারা মনমত নাম দিয়ে থাকে তাতে না সুখ পাওয়া যায়, না মুক্তি পাওয়া যায়। কেউ বলে হবন, তপ যজ্ঞ আদি করো, কিছু মহাপুরুষ চোখ, কান, মুখ বন্ধ করে ভিতর একান্তে ধ্যান লাগাতে বলেন, সে সব বানানো আজগুবি সাধনার প্রতীক। যেহেতু কবীর সাহেব, গরীব সাহেব, নানক সাহেব আদি পরম সন্তরা সমস্ত ক্রিয়া মানা করে কেবল এক নাম জপ করতেই বলেছেন।

এক নৈসত্রে দমস নামক ভবিষ্য বক্তা ছিলেন। তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়েছে ও হচ্ছে। কম পক্ষে চারশো বৎসর পূর্বে লিখে গিয়েছেন ও বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন ২০০৬ তে এক হিন্দু সন্ত প্রকট হবে ও সংসারে তার চর্চা হবে। সে সন্ত না মুসলমান হবে, না খ্রীষ্ঠান

(ইসাই) হবে, সে কেবল হিন্দুই হবে। তার বলা ভক্তি মার্গ সবর্ব থেকে আলাদা হবে এবং তাহা তথ্যের উপর আধারিত হবে, জ্ঞান দ্বারা তাকে কেউ হারাতে পারবে না। ২০০৬ সালে তার আয়ূ ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে থাকবে। (সন্ত রামপালজির জন্ম ১৯৫১ সালের ৮ -ই সেপ্টে ম্বরে হয়েছিল। জুলাই ২০০৬-তে সন্ত রামপালজির আয়ূ ৫৫ বৎসর যে কিনা ভবিষ্যতবাণী অনুসারে ঠিক আছে। ওই হিন্দু সন্ত দ্বারা মুখে বলা যে জ্ঞান পুরো সংসার স্বীকার করবে। ওই হিন্দু সন্তের অধ্যক্ষতাতে সারা সংসারে ভারত বর্ষের শাসন হবে এবং ঐ সন্তের আজ্ঞায় সর্ব কাজ হবে। তার মহিমা আকাশের উপরে হবে। নৈসত্র দমসের দ্বারা ভবিষ্যবার্তা সংকেত সন্ত রামপাল জী মহারাজের যে ২০০৬ - এ বিখ্যাত হয়েছেন। যদিও বা অজানা লোকে তাকে দোষি সাব্যস্ত করে প্রসিদ্ধ করেছে কিন্তু কোন দোষ সন্ত রামপালের খুঁজে পায়নি, সত্যের জয় স্বাভাবিক। উপরোক্ত লক্ষণ সব, তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজেতে বিরাজমান আছে। কোটি জন্মের সাধনায় আজ আমরা এই রকম গুরু বা তত্ত্বদর্শীকে পেয়েছি। ভাবতে অবাক লাগে, এর আগে মহাপুরুষরাও যার সন্ধান খুঁজে পাইনি। সর্ব শাস্ত্র পুঁথি ঘেটেও যে তত্ত্ব খুঁজে আমাদের জানাতে পারিনি, আমার মনে হয় দেবতারাও জানে না এমন তত্ত্ব কোথায় লুকিয়ে ছিল। কেউ কেউ যাদুর মত সিদ্ধ কর্ম করে দেখায় কেউ আকাশে ভাসমান হয়ে থাকে বা কেউ কেউ দেখেছে যে অমুক মহাপুরুষ এই সিদ্ধি লাভ করেছেন, ওই সিদ্ধি লাভ করেছেন। তারা সেসব করে গিয়েছেন কিন্তু আমাদের কাউকে পরমাত্মাকে পাওয়ার কোন মন্ত্র শেখাতে পারেননি। শাস্ত্রে যে বিধি কোনটা সত্য সেটা আমাদের শিখিয়ে যায় নাই। যদিও কেউ কিছু শিখিয়েছেন, সেটা হল, কালের চক্র তে জড়ানো সিদ্ধিই শিখিয়ে গিয়েছেন।



।। সন্তকে (গুরুকে) কষ্ট দেওয়ার শাস্তি ।।

আদরণীয় গরীব দাস সাহেবের জন্ম গ্রাম-পাবন, জিলা-ঝজ্জর হরিয়ানা। পিতার নাম শ্রী বলরাম ধনখড় (জাতি জাট)-র ঘরে হয়েছেন। কবীর পরমেশ্বর ১৩৯৮ তে কাশীর লহরতারা নামক সরোবরে পদ্মফুলে প্রকট হয়েছিলেন, নিরু নিমা নামের দম্পতি ওখান থেকে নিয়ে আসেন। কবীর পরমেশ্বর ১২০ বৎসর কাশীতে ছিলেন। ১৫৮১ তে স্বশরীরে সতলোক চলে গিয়েছিলেন। কারণ পরমেশ্বর কখনও কোন মায়ের গর্ভে জন্ম নেন না। স্বয়ং প্রকট হয়ে থাকেন ঠিক সেই ভাবে সতলোকে চলে যান। গরীব দাস সাহেবকে সালে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন গরীব দাসের বয়স মাত্র ১ বৎসর। সব পরিবারের সদস্য ভাবলেন গরীব দাস মারা গিয়েছে, তাই চিতার উপর রেখেছিল। সেই সময় গরীব দাসের আত্মা পরমেশ্বর কবীর জী সতলোক থেকে মৃতগরীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। ওই সময় চিতা থেকে উঠে নিজের চোখে দেখা কবির পরমেশ্বরকে ও সতলোককে, তাই ওখান কার ও কবির পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন করে কবিতার মাধ্যমে বলতে লেগেছেন। এবং জনগণকে শোনাচ্ছেন। তিনি ১০ বৎসর থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত সবাইকে কবির পরমেশ্বরের মহিমা শোনাতেন। যত দুখী প্রাণী তার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিত সেই সুখী হয়ে যেত। তার মহিমা ধীরে ধীরে চারিদিকে গাইতে লাগল। তার তত্বজ্ঞান দ্বারা অন্য গুরুদের অধুরা জ্ঞানের পোল খুলতে লাগল, তাই তাকে অত্যাধিক হিংসা করতে লাগল। যারা মুখ্য মুরব্বী তাদের কান তার বিরুদ্ধে ভরতে লাগল। যাতে আসে পাশের সাধারণ মানুষও প্রভু কবীরের আদরের সন্তানকে ঘৃণা করে।

দিল্লির বাজিদপুর গ্রামে তার এক শিষ্য ছিলেন। তার উপরও সব গ্রাম হিংসা করত। শিষ্যের অনুগ্রহে গরীব দাস মহারাজ কিছুদিন তার গ্রামে রয়েছিলেন। ওই সময় ফসল পেকে গিয়েছিল, গ্রামের সবার পাকা ফসল গুয়েশালিকের লাখো পাখীর দল নষ্ট করে দিয়েছিল কেবল গরীব দাসের ওই শিষ্যের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেনি। তাই দেখে সবাই গরীব দাসের মহিমা জেনে, তার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তাদের নিজের আত্মার কল্যাণ করেছিল।

গুরুদেবের আদেশে ওই শিষ্য সব ফসল পুরো গ্রামে ভাগ করে দিয়েছে। আর কিছু বস্তায় করে গরীব দাস মহারাজের জন্য গরুর গাড়িতে রেখে দিয়েছে, গুরুদেব মানা করা সত্বেও। শিষ্য বললেন গুরুদেব! পূর্ণিমায় আপনি ভান্ডারা করান মানে লোক খাওয়ান আপনার এই দাসের কিছু দান গ্রহণ করেন, তাই গুরুদেব আর না বলতে পারেন নি। আদরণীয় গরীব দাসের চার ছেলে এবং দুই মেয়ে ছিল। তিনি কমপক্ষে ১৩০০ একর জমির মালিক ছিলেন। ওই গরুর গাড়িতে বসে ছুড়ানী গ্রামে রওনা দিয়েছেন। যখন কনৌদা গ্রামের পাশ দিয়ে গরুর গাড়ি যাচ্ছিল, তখন ষড়যন্ত্র করে কিছু স্বার্থীর আচার্য্য (গুরুরা) গরীব দাসকে ঘিরে সেই বাজরার ফসল যে কিনা শিষ্যা বস্তায় ভরে তাকে দিয়েছিল, তাহা লুটে নিয়ে, গরীব দাসকে ধরে ওই গ্রামের মুরব্বী চৌধুরীকে খবর দিয়েছে বলছে এই সেই হিন্দু ধর্মের দ্রোহী একে আমরা ধরে নিয়ে এসেছি।

চৌধুরী ছাচুরাম একটা বড় খুঁটিতে গরীব দাসজীকে বাঁধার আদেশ দিয়েছিলেন এবং কিছু কানুনী অধিকারও প্রাপ্ত করে রেখেছিলেন। তাকে বেঁধে রেখে বিচার করেছে যে ছয়মাস পর্যন্ত বন্দী থাকবে এবং জরিমানা ৫০০টাকা হবে।

ওই ধর্ম অজ্ঞানী ঠিকেদাররা (গুরু আচার্য্যরা) আগে থেকে সত্য মিথ্যা বানিয়ে কান ভরে রেখেছিল ওই চৌধুরীকে। তাকে কারাগারে বন্ধ করে দুপায়ের মধ্যে মোটা কাঠের লাঠি ঢুকিয়ে, হাত পিছনে বেঁধে দিয়েছিল এতে মানুষ বসতেও পারে না অর্থাৎ ভীষণ কষ্ট যন্ত্রণা হয় এবং পা ফুলে যায়। রেলগাড়ী চালানো ব্যক্তি খালি গাড়ি নিয়ে বাজিদপুর গ্রামে চলে গিয়েছে। কনৌদা গ্রাম থেকে বাজিদপুর ১০ কিলোমিটার দূর। সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে বাজিদপুরের প্রধান সারা গ্রামের লোক নিয়ে, কনৌদা গ্রামের চৌধুরীকে প্রার্থনা করলেন, যাকে আপনি বন্ধকরেছেন, ইনি সাধারণ ব্যক্তি নয়, পরম শক্তি সম্পন্ন আছেন। ছাচুরাম চৌধুরী এমনই ভালো লোক, কিন্তু দুষ্টু ব্রাহ্মণ গুরুদের কথা বিশ্বাস করে তাকে এত কষ্ট দিয়েছিলেন। তাদের সবার কথায় তো তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। আদরণীয় গরীব দাসজী কিছু বলেননি পরে নিজের গ্রাম ছুড়ানিতে শিষ্যরা পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে চৌধুরী ছাচুরাম প্রাতঃকালে মাঠে পায়খানা করতে গিয়েছিল সেখানে দুই জন লোক ঘোড়ায় করে এসে তার দুটো হাত কেটে দিয়ে তারা ওই সময়ই তার চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এই দৃশ্য মাঠের কিছু লোক দেখেছিল। অনেক উপচার করেও যন্ত্রণা ও রক্তপড়া কম হয়নি। কয়েকদিন পর্যন্ত্য খুব চিৎকার কান্নাকাটি করেছে। তখন এক ব্যক্তি বলে, ওই গরীবদাস সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর তিনি খুব দয়ালু। পরিবার লোক ঘোড়ায় করে ওই চৌধুরীকে গরীব দাসজীর গ্রাম ছুড়ানীতে নিয়ে যায় ওখানে গিয়েই চৌধুরী গরীবদাসজীর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছেন। গরীব দাস আর্শিবাদ দিয়ে নাম উপদেশ দিয়ে বলেছেন জীবনভর ভক্তি করো। চৌধুরি বলল দাতা, আমাকে আপনার বিষয়ে অত্যধিক ভ্রমিত করে দিয়েছেন।

আমি জানি না যে আপনি পূর্ণ পরমাত্মা হয়ে এসেছেন। আমি পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের পাঠানো দাস আছি। তাঁর শক্তিতেই আপনি ঠিক হয়েছেন। আপনাকে কোন শাপ আমি দিইনি। আপনার কর্ম আপনি পেয়েছেন। যদি এখানে না আসতেন তাহলে আপনার পরিবারে আরও পাপ হত। এখন আপনার ওই পাপের প্রভাব পরিবারের লাগবে না। কারণ আপনি উপদেশ নিয়েছেন। চৌধুরী তার পরিবারের সবাই কে গুরুদেবের কাছ থেকে উপদেশ দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আজ ওই পুণ্যাত্মা ছাচুরামের বংশের লোক গরীবদাসজীর পরম্পরাগত পূজা করে আসছেন। কম পক্ষে হাজার হাজার পরিবার আছে যাদের ছাজুবাড়া বলা হয়। **কেননা ঃ-** তুমনে ও দরগাকা মহল ন দেখা ধর্ম রায়কে তিল তিল কা লেখ।। রাম কহে মেরে সাধ কো, দুঃখ না দিজো কই।। সাধ দুঃখায় সে দুখী, মেরা আপাভি দুখী হোই। হিরণ্য কশিপু উদর (পেট) বিদারিয়া মেহি মারা কংস। জো মেরে সাধুকো সতাবে, বাকা খোদু বংশ।। সাত সতাবন কোটি পাপ হে, অগণিত হত্যা অপরাধ। দুর্বাসা কী কল্প কাল সে, প্রণয় হো গয়ে যাদব।।

উপরোক্ত বাণীতে সতগুরু গরীব দাসজী প্রমাণ দিচ্ছেন যে, পরমেশ্বর বলেছেন যে আমার সন্তকে দশটচা যেকি আমার সন্তানকে দুখী করো না। যে আমার সন্তকে দুঃখী তাহলে বুঝবে আমার ভক্ত প্রহ্লাদকে দুখী করেছিল, তখন আমি হিরণ্যকশিপুরের পেট চিরে দিয়েছিলাম, কংসকেও মেরেছি আর যদি কেউ আমার সন্তুদের দুখী করবে তার বংশই মিটিয়ে দেব। এইজন্য সন্তুদের কষ্ট দিলে কোটি কোটি পাপ হয়ে থাকে। অগণিত হত্যার পাপ লাগে। এই অজানা লোক পরমাত্মার সংবিধানে পরিচিত নেই। এইজন্য ভয়ঙ্কর ভুল করে ও তার কর্ম ফল পায় সাধু সন্তকে

কষ্ট দিলে নিম্ন দন্ড পায়।

যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে পরজনমে তার হত্যা করা লোককে হত্যা করেই তার পূরণ হয়। কিন্তু সাধু পুরুষকে কষ্ট দিলে তার বড় দন্ড পেতে হয়। অনন্ত জন্মেও পূরণ হয় না। **সৎ গুরু নিজের বাণীতে বলছেন ঃ-**

অর্ধমুখী গর্ভবাসে হরদম বারম্বার।
জুনী ভুত পিশাচকা, জব লগ সৃষ্টি সংহার।।

এইরকম ভুল করা লোককে পরমেশ্বর ভিন্ন প্রাণীর যোনীতে বার বার মায়ের গর্ভে দেয়, এবং বার বার জন্ম নেয় আর মৃত্যু হয়। যতদিন পৃথিবীতে প্রলয় না হয়, ততক্ষণ ভূত পিশাচ যোনিতে ও মায়ের গর্ভে অত্যাধিক কষ্ট হয় খুব দুঃখদায়ক। ততক্ষণ ক্ষমা হয় না যতক্ষণ না ঐ সাধু ক্ষমা করে থাকে।

একবার দুর্বাসা ঋষি অভিমান বশে অম্বরীশ ঋষিকে মারার জন্য, নিজের শক্তির দ্বারা এক সুদর্শন চক্র ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুদর্শন চক্র অম্বরীশ ঋষির পা ছুঁয়ে উল্টে দুর্বাসা ঋষিকে মারার জন্য ছুটেছে। দুর্বাসা দেখল অম্বরীশের পা ছুঁয়ে তার দিকে আসছে, তাই সে ছুটতে লাগল, ছুটতে ছুটতে ব্রহ্মার কাছে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা বললেন আমি কিছু বলতে পারছি না, তুমি শঙ্করের কাছে যাও। শঙ্করের কাছে গেলে সেও ব্রহ্মার মত বললেন, আপনি বিষ্ণুর কাছে যান। এই শুনে দূর্বাসা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, প্রভু এই সুদর্শন চক্রের হাত থেকে এক আপনিই রক্ষা করতে পারবেন। নয়তো আমাকে কেটে মেরে ফেলবে। তখন বিষ্ণু বললেন, ঋষিজি এ সুদর্শন চক্র আপনাকে কেন মারবে? দূর্বাসা ঋষি উপরোক্ত কাহিনী বর্ণন করে বলেলেন, তখন বিষ্ণু বললেন, হে দুর্বাসা ঋষি, আপনি অম্বরিষ ঋষির চরণ ছুয়ে যদি রক্ষা পান। তাছাড়া কোন দেবতা বাঁচাতে পারবে না। তখন দূর্বাসা অম্বরিশের চরণ ধরে কান্না করে। হৃদয় দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। তখন অম্বরিশ ঋষি সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ে বললেন, সন্ত ঋষিদের সাথে কোন দিন বেয়াদপি করবে না, তার পরিণাম খুব খারাপ হয়ে থাকে।

"শ্রীকৃষ্ণ গুরু কসনী হুয়ি অর বচেগা কোন"

যখন শ্রীকৃষ্ণের গুরু শ্রী দুর্বাসার মত ঋষির এই দশা হতে পারে তবে সাধারণ মানুষ কেমন করে বাঁচতে পারে?

।। পথ হারানো ব্যক্তির পথের সন্ধানের বিষয়।।

(ভক্ত সমাজ ব্যক্তি প্রভুর বাস্তবিক ভক্তি থেকে কোশ দূরে)

সতলোক আশ্রম করৌথা, জিলা রোহতক, হরিয়ানাতে (কবির পরমেশ্বরের) প্রকট দিবস উপলক্ষে চলছিল পাঁচ দিবসীয় (১৮ থেকে ২০ জুন ২০০৫ পর্যন্ত) সতসঙ্গ সমারোহতে, ভক্ত বসন্ত সিং সৈনী নিজের ব্যক্তিগত কাহিনী নিজের মুখে বর্ণনা করেছেন, কৃপা করে নীম্নে পড়ুন।

।। প্রভু পিপাসু বসন্ত সিং সৈনীর পথের সন্ধান পাওয়া ।।

আমার নাম বসন্ত সিং সৈনী, গ্রাম গাঁধরা, জেলা-রোহতক, (হরিয়ানা)-র নিবাসী পুরানো ঠিকানা ম. নং এস ১৬১ পান্ডব নগর পাশে মাদার ডায়েরী যমুনাপার দিল্লি- ৯২ তে থাকতাম।

আমার পরিবারের উপর মনে হয় যেন দুঃখের পাহাড় এসে পড়েছিল। তবুও পরমাত্মাকে পাওয়ার ইচ্ছা বা দুঃখ নিবারণের জন্য সাধু মহাত্মাদের কাছে যাওয়া আসা করতাম। একদিন এক মানীগুনী বা নামীগুণী বা নামীদামী সন্ত শ্রী আশারাম বাপুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওই সময় আশারাম বাপুর সঙ্গত দিল্লিতে এক হাজারের মত ছিল। যার কারণে খুব কাছে যাবার সুযোগ হয়েছিল। আমি আমার দুঃখ ও পরমেশ্বরকে পাওয়ার জিজ্ঞাসা তাঁর সামনে রেখেছি। তিনি আমারে ৭ মন্ত্র (ওঁ গুরু, হরি ওঁ, ওঁ এনম্ঃ, ওঁ নমঃ শিবায়ঃ, ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, হ্রীং রামায় নমঃ এবং গায়ত্রী মন্ত্রীদি) দিয়েছিলেন। এর মধ্যে যে কোনো এক মন্ত্র বেছে নিতে বলেছেন, আর এক সোহং মন্ত্র যে শ্বাস দ্বারা সো ভেতরে নেওয়া, এবং হং বাইরে বের করার জপ বলেছিলেন। একাদশী ও পূর্ণিমার ব্রত, সোমবার ও অষ্টমী ব্রত করতে বলেছিলেন। বেশীর ভাগ ত্রিবন্ধ প্রাণায়াম ও সিদ্ধাসনে বসে ধ্যান লাগানো ও অনুষ্ঠান করা। আমি মন্ত্র নিয়েছি আর নিজের দুঃখ কেঁদে বলেছি যে, আমার জ্যাঠামাশাই যে চল্লিশ বছর আগে মারা গিয়েছে। তিনি অনেক বড় ভূত হয়ে গিয়েছে। তিনি আমার দুইভাইকে মেরে দিয়েছে। আট দশ বিয়ানো মহিষ ছিল তাও মেরে দিয়েছে, পাঁচ ছয় গায় ছিল তাও মেরে দিয়েছে। পশুদের কোন বাচ্চা জীবিত থাকে না। ঘরের সব সদস্য অসুস্থ থাকে। দুঃখে হাল একদম বেহাল, কাজকর্ম ঠিক ভাবে করতে দেয় না। এখন বলে তোর বাবাকেও নিয়ে যাব। আমি আশারাম বাপুর কাছে প্রার্থনা করেছি আমাদের বাঁচান। ছয় মাসবাদ ওই প্রেত পিতাজিকেও নিয়ে গিয়েছে। বাপুজি বললেন, যা হবার তা তো হবেই, পশু আদি, ধনের হানি, শারীরিক রোগ তো পাপের ভোগ, যা জীবের আগের কর্মের ফল লেখা থাকে, সেটা তো ভুগতেই হবে। আপনি ভক্তি করুন। তাই প্রভু ভক্তিতে বেশী করে মন লাগিয়ে ছিলাম। বাপুজি বুঝানোর পরে আমি পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য, পুরো শ্রদ্ধার সাথে, দিল্লিতে আশারাম বাপুর আশ্রমে প্রথমে চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান মহন্ত নরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পরামর্শে রেখেছিলাম। এরপরে চল্লিশ দিনের ছয় অনুষ্ঠান, আশারাম বাপু আশ্রম পঞ্চেড় রতলাম, মধ্যপ্রদেশে মহন্ত কাকার দেখাশোনাতে করেছিলাম। তারপরে দুই অনুষ্ঠান আশারাম আশ্রম সাবরমতী আমেদাবাদ গুজরাতের মৌন মন্দিরে করেছিলাম। ওইখানেই শ্রী আশারাম বাপুজির সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে সময় পেয়েছিলাম। তখন আমি বাপুজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাপুজি যে পরমাত্মা পাওয়ার জন্য আমি বা এই সমস্ত ভক্ত সমাজ লেগে রয়েছেন ওই পরমাত্মা কে? বা কোথায় থাকে? বলার জন্য কৃপা করবেন?

এই শুনে বাপুজী বললেন লেগে থাকো, ভক্তি করো সব খোঁজ পেয়ে যাবে। আর এও বলেছেন গীতার এক অধ্যায় প্রতিদিন পাঠ করবে, আর কখনও আমার দর্শনের ইচ্ছা হলে, এক ক্রিয়া বলব, তিনদিন পর্যন্ত এক কামরায় বন্ধ হয়ে যাবে কামরায় বন্ধ হওয়ার আগের দিন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেবে। সন্ধ্যা বেলায় পায়খানা বাথরুমের কাজ সেরে নেবে। তার পরে তিনদিন কিছু খাবে না এবং বাইরেও যাবে না। ঘরে থাকো ও ধ্যান লাগাতে থাকো। আমেদাবাদ থেকে ঘরে ফিরে তিনদিন ওইভাবে পালন করেছি কিন্তু বাপুজীর দর্শন হয় নি, অনুষ্ঠানের সময় জীবন মরণে ঝুলে শেষ পর্যন্ত্য অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম। তবুও ঈশ্বরকে পাওয়ার ইচ্ছা রয়ে গিয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে রোহতক হরিয়ানা কাঠমন্ডীতে সন্ত রামপাল দাস মহারাজের সতসঙ্গ শুনেছিলাম। যিনি তত্বজ্ঞানের আধার পর গীতা বোঝালেন তারপরে গীতা পাঠ করে মনে

ভাবতে লাগলাম, গীতাতে ভগবান কি করছে, আর বাপুজী আমাদের কি বলেছিলেন। রামপালজীর কথা (সৎসঙ্গ) শুনে ভাবছি সত্যি করে কি আমরা ভগবানের বিরুদ্ধে সাধনা করছি? রামপালজীর কথায় (সৎসঙ্গে) যে গীতার অনুবাদ বুঝলাম তখন অন্তরাত্মা কাঁদতে লাগল তখনই আশারাম বাপুর কাছে গীতা নিয়ে যা যা শঙ্কা ছিল জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু বাপুজি কোন শঙ্কার সমাধান করতে পারেনি। আমি তখন বাপুজিকে বললাম, বাপুজি আপনি পরমাত্মার বিষয়ে কিছু জানেন না তো ভক্ত সমাজকে আপনার কাছে কেন ফাঁসিয়ে রেখেছেন, তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না, আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চলে আসলাম।।

পরামাত্মার প্রাপ্তি না পেয়ে না জেনে উলঝানো জীবন দেখে বা হঠরূপী অনুষ্ঠান ব্রত করে শরীর অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যু কাছে কাছেই এসে গিয়েছে বুঝতে পারছিলাম। পরে অন্য সন্ত (যেমন রাধাস্বামী পন্থ, ধন ধন সৎগুরু পন্থ, নিরঙ্কারী মিশন পন্থ শ্রী বাল যোগেশ্বর মহারাজ পন্থ, দিব্য জ্যোতি পন্থ, ব্রহ্মাকুমারী পন্থ, শ্রী সৎপাল মহারাজ পন্থ, জয়গুরুদেব মথুরাবালা পন্থ আদির) কাছে ঘুরে নির্ণায়ক জ্ঞান জ্ঞান শুধু সন্ত রামপালজী মহারাজই বলতে পেরেছেন এ ছাড়া কোন পন্থ (সংঘের)-এর কাছে নেই। আমি পশ্চাতাপ করতে লাগলাম মনে হয় এই পৃথিবীতে কোন সাধু বা মহন্ত নেই যে সে বলতে পারবে পরমাত্মাকে? কি রকম? আর কোথায় থাকেন? এই সব বিচার করে আমি রাত্রে ফুট ফুট করে কান্না করতাম রামপাল মহারাজজির সাথে মুলাকাত (দেখা) করার আগে সব সাধু মহন্তের উপর বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তখন ভাবতাম প্রসিদ্ধ (নামকরা) আশারাম বাপুই যদি কোন শঙ্কার সমাধান করতে পারল না তো কাকে বিশ্বাস করব? একবার মনে ভাবলাম সন্ত রামপালজী জ্ঞান তো শ্রেষ্ঠ বলছেন পরন্তু তাঁর কাছে তো বেশী শিষ্য নেই, তিনি পূর্ণ সন্ত কিভাবে হতে পারে? এই কথা হল ২০০৫-১৮ জুনের ঘটনা। এই শঙ্কা মনে আসতে লাগল। কিছুদিন পরে সন্ত রামপাল মহারাজের এক শিষ্যর সঙ্গে আমাদের গ্রামে দেখা হয়েছিল। আমার কাহিনী শুনে আমাকে পরমাত্মা স্বরূপ পূর্ণ রামপাল মহারাজের সৎসঙ্গে দ্বিতীয়বার নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন আমি একঘণ্টা ধরে সৎসঙ্গ শুনলাম। তারপর কাঁদতে কাঁদতে গুরু মহারাজের সাথে দেখা করতে গেলাম , তিনি আমায় বুকে টেনে বললেন, যে সন্তের কাছে যাচ্ছেন তিনি শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমানি আচরণ করছে ও সবাইকে তাই করাচ্ছে। আমি রামপাল মহারাজজীকে কিছু বলিনি। তিনি আমার মনের প্রশ্নের কথা যেন আগে থেকেই জেনে গিয়েছিলেন। আমি কি চাই তাহা রামপালজী মহারাজ আমাকে তার চরণে ঠাঁই দিয়ে এইভাবে সমাধান করে দিয়েছেন। আমাকে এইভাবে বুঝিয়েছেন—

তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজ বলছেন, পবিত্র গীতা অধ্যায় ৯ মন্ত্র ২৫-তে পিতার পূজা বা শ্রাদ্ধ করা মানা করা হয়েছে। অন্য দেবদেবী পূজা করা ব্যক্তিকে কমজোর বুদ্ধি বালা লেখা আছে (গীতা অধ্যায় ৯ মন্ত্র ১২ থেকে ১৫ ও ২০ এবং ২৩ পর্যন্ত্য) কিন্তু আশারাম বাপুর "শ্রাদ্ধ মহিমা" নামক পুস্তকে শ্রাদ্ধ করা শ্রেষ্ঠ বিধি বলছেন। সন্ত আশারাম বাপুজির প্রকাশিত আমেদাবাদ সাবরমতি আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ঋষি প্রসাদ অংক ১৩৫ মার্চ ২০০৪-এতে লেখা আছে ভূত পূজা করলে, পিতরোপূজা করলে এবং দেবদেবী পূজা করা ব্যক্তি কি হবে, পড়বেন পত্রিকার আগের অংকতে। আগের অংকের পত্রিকা ঋষি প্রসাদ অংক ১৩৬ এপ্রিল ২০০৪ পৃষ্ঠা ১৯ তে

লেখা আছে ভূত পূজা করলে ভূত লোকে যাবে, পিতর পূজা করলে পিতর লোকে আর শ্রীকৃষ্ণ পূজায়ালা ভগবান কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হবে।

বিচার করেন যে শ্রী আশারাম দ্বারা প্রকাশিত "শ্রাদ্ধ মহিমা" নামক পুস্তকে পিতর পূজার ভাল বিধি লিখেছে।

বিচার করেন যে শ্রী আশারাম দ্বারা প্রকাশিত 'শ্রাদ্ধ মহিমা" নামক পুস্তকে পিতর পূজার ভাল বিধি লিখেছে।

কৃপা করে ভাবুন ঃ- কোন ব্যক্তি একথাও বলছে যে, কুয়োতে পড়লে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সে স্বয়ং কুঁয়োতে পরার পরামর্শও দিচ্ছে এবং সে একথাও বলছে কুয়োতে পড়ার ভাল বিধি আমি বলেদিচ্ছি যে কি, দুটো পা উঠিয়ে একদম লাফ দেবে। এ কুয়োতে পড়া শ্রেষ্ঠ বিধি, যে এরকম না করে সে দোষী হবে।

তবে কি সেই ব্যক্তি সৎ লোক বা ভালো লোক? এই ভূমিকা আশারাম বাপু করাচ্ছেন, একদিকে বলছেন, ভূত পূজা করলে ভূত লোকে, পিতর পূজা করলে পিতর লোকে যাবে, সেখানে সে ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছে পরে শ্রাদ্ধ দ্বারা তাকে তৃপ্ত করা হয়। একটা আরও বিচারের বিষয়, যখন পিতামাতা জীবিত ছিল, সে প্রতিদিন কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বার খেতেন। এখন মৃত্যুর পরে সে ভূত বা পিতর যোনী প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে কারণ এরা সাধনা গীতার শাস্ত্রের বিরুদ্ধে করেছেন এই একদিনের শ্রাদ্ধে সে কি করে তৃপ্ত হবে? আর ৩৬৪ দিন তাহলে কি খাবেন? এর জন্য গুরুজন ও সন্ত দোষী যে কিনা ভোলী-ভালী অর্থাৎ সরল সোজা আত্মাদের শাস্ত্র বিরুদ্ধে সাধনা শিখিয়ে রেখে আত্মার অকল্যাণ ডেকে এনেছেন। শাস্ত্র জ্ঞান থেকে অপরিচিত গুরুই এই জীবদের শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধে সাধনা করিয়ে কষ্টকর যোনিতে ফেলে দিয়েছেন। আশারাম বাপু শিবের উপাসনার মন্ত্র (ওঁ নমঃ শিবায়) ও বিষ্ণু মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) বলে থাকেন। এছাড়া হরি ওঁ, ওঁ গুরু আদি নাম থেকে যে কোনো একমন্ত্র নিজের ইচ্ছা অনুসারে বেছে নিতে বলেন এবং সোহং মন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করে শ্বাস দ্বারা স্মরণ করা আদি মন্ত্র দিয়ে থাকেন, যে কিনা কোনো শাস্ত্রে প্রমাণ নেই।

বিচার করুন — কোন রুগী যার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে, আর সে যে কোন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছে, আর ডাক্তার তাকে বলছেন, এখানে ছয় প্রকারের ট্যাবলেট আছে তোমার যেটা ভাল লাগে উঠিয়ে নাও, একটু ভাবুন, একি ডাক্তার হতে পারে?

পবিত্র গীতায় অধ্যায় ৮ মন্ত্র ১৩ তে বলেছে ঃ—

ওঁ ইতি একাক্ষররম্ ব্রহ্ম, ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরণ্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্ ।। ১৩।।

এর শব্দার্থ হল গীতা বলা ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল বলছে যে, (মাম্ ব্রহ্ম) আমার তো কেবল (ইতি) এই একটি অক্ষর (ওঁ একাক্ষরম্) ওঁ একাক্ষর আছে (ব্যহরন্) উচ্চারণ করে (অনুস্মরণ স্মরণ করবে (যঃ) যে সাধক (ত্যজন্ দেহম্) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত্য (প্রযাতি) স্মরণ সাধনা করে (সঃ) সে সাধক আমার গতি (পরমাম্ গতিম্) পরমগতিকে (যাতি) প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ভাবার্থ ঃ- শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত হয়ে ব্রহ্মপ্রবেশ করেছিল, সেই কালের (ব্রহ্মের) হাজার হাত যুক্ত, সেই জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) বলছিল যে, মৃত্যুর অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত যে আমার এই এক অক্ষর (ওঁ) নাম স্মরণ করবে সে আমাকেই পাবে, অন্য কোনো মন্ত্র আমার ভক্তির নয় এবং কালের গতির গুণের কথাও গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র ১৮ তে অনুত্তমাম্ অর্থাৎ খারাপ বা উত্তম গতি নয়, অনুত্তম গতি। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৯ মন্ত্র ২০ থেকে ২৫ বলা হয়েছে। তিন বেদেই (ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ) বর্ণিত বিধি দ্বারা আমার সাধনা করে তা ছাড়া অন্য দেবতারও পূজা করে, তাদের জন্য জন্ম মৃত্যু ও স্বর্গ বানানো রয়েছে। পিতর পূজা করে যারা (শ্রাদ্ধ করনেবালা) পিতর হয়ে পিতরদের প্রাপ্ত হয়। ভূত পূজা করা ব্যক্তি (তেরোদিনে যে ক্রিয়া কর্ম ও বাৎসরিক, অস্থি নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া, পিন্ডি এসব ভূত পূজা) ভূত হয়ে ভূত লোকে চলে যায় এবং ভূত হয়ে পৃথিবীতেও ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই সব বিধিছাড়া কর্ম কে মনমানি (ইচ্ছামত) আচরণ বলা হয় এই জন্য এসব করাই ক্ষতি ও বৃথা। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র ২৩-২৪

বিশেষ ঃ- এখানে চতুর্থবেদ অথর্ববেদের কথা এই জন্য বলা হয় নি যেকি, এই বেদে পূজা বিধি কম, সৃষ্টির রচনা বেশী। এই জন্য গীতা অধ্যায় ১৮ মন্ত্র ৬২-তে বলা আছে, অর্জুন তুই ওই পরমাত্মার স্মরণে যা, সেখানে গেলে তোর পূর্ণ মুক্তি হবে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত হবে তথা গীতা অধ্যায় ১৫ মন্ত্র ৪-তে বলা হয়েছে, যদি কোন তত্ত্বদর্শী পাওয়া যায় তিনি শাস্ত্রের পূর্ণ অভিজ্ঞতা বা অজ্ঞ আছে তোমায় দিতে পারবে। তার বলা শাস্ত্র বিধি অনুসারে সাধনা করার। পরে ওই পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিত। যেখানে গেলে সাধকের আর জন্ম মৃত্যু হয় না, সেখানে অনাদি মোক্ষ পাবে। (গীতা বলা কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ/ব্রহ্মএই কথা বলেছে)- সে একথাও যেকি বলছে "আমিও ওই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি।"

সন্ত রামপাল মহারাজজী বলেছেন যে কি, অন্য সব সন্তেরা বলে যে কি, পাপের ভোগ তো আগে থেকেই লেখা থাকে, সেই জন্য জীবকে ভোগ করতে হয়। ভক্তি করে যেতে হবে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় জীবন সুখময় হবে।

কৃপা করে বিচার করেন — কোনো এক ব্যক্তির পায়ে কাঁটা ফুটেছে যার কারণ খুব যন্ত্রণাও হচ্ছে, সে অন্য এক ব্যক্তির কাছে এই কাঁটার কষ্টের নিবারণের জন্য গিয়েছে। উত্তর দিচ্ছে, কাঁটা থাক জুতো পড়ে নেও, ভবিষ্যতে কাঁটা ফুটবে না। তবে সেই ব্যক্তি কি ঠিক পরমর্শ দিল? কেননা কাঁটা ফোঁটা পায়ে জুতো পরা সম্ভব নয়। আগে কাঁটা বের করার উপদেশ দেওয়া উচিৎ, তবেই তো পরে সাবধানের জন্য জুতো পরবে? যাতে দ্বিতীয় বার কাঁটা না ফোঁটে। ঠিক এইরকম পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি করতে হলে অর্থাৎ কষ্ট নিবারণের জন্য পূর্ণ সন্তের স্মরণে যাওয়া উচিৎ, যাতে পাপরূপী কাঁটার কষ্ট সমাপ্ত হয়ে যায়। পরে সাধক পূর্ণ প্রভুর শাস্ত্রবিধির অনুসার সাধন রূপী জুতো এই ভয়ে পরবে যাতে আবার পাপরূপী কাঁটা কষ্ট পেতে না হয়। সব সন্তেরা এই পবিত্র গীতার অনুবাদে অর্থকে অনর্থ করে দিয়েছেন। গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র ১৮ থেকে ২৪-এ অনুত্তমাম্ কে অতি উত্তম করেছে তথা অধ্যায় ১৮ মন্ত্র ৬৬ -তে ব্রজের অর্থ আসা করে দিয়েছেন। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ও তত্ত্বজ্ঞানহীন গুরুদের কারণেই সর্ব সমাজ শাস্ত্র বিধি রহিত সাধনা করে, মনুষ্য জীবন ব্যর্থ করে দিচ্ছেন (পবিত্রগীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র ২৩-২৪)। সর্ব পবিত্র ধর্মের পবিত্র

আত্মারা তত্ত্বজ্ঞান থেকে অপরিচিত আছে। যার কারণে নকল গুরু, সন্তো, মহন্তো ও ঋষিদের দাপট হয়ে রয়েছে। যে সময় পবিত্র ভক্ত সমাজ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পরিচিত হয়ে যাবে, সেই সময় এই নকল গুরু, সন্ত ও আচার্য্য পন্ডিতরা লুকাবার বা পালাবার জায়গা খুঁজে পাবে না।

উপরোক্ত সত্য নিজ চোখে দেখে আমি ও অন্য পরিবারের সদস্যরা, সাধু (গুরু) রাম পাল মহারাজের চরণে লেগে আছি। এখন আমার পুরো পরিবারে কোন রোগ নেই, ভুতও নেই, কাউকে এখন মারেও না, কোন পশুকেও মেরে ফেলে না। কাজকর্ম করতে দিত না, এখন শুধু আমাদের ঘর থেকেই ভূত পালায়নি, পুরো গ্রাম ছেড়ে ভূত পালিয়েছে। মনে হয় অন্য আত্মীয়দের ঘরে চলে গিয়েছে। যারা আজও শ্রী আশারাম বাপুর শিষ্য রয়েছে, ভূত হয়তো বলছে, বসন্তর ঘরে যাওয়া যাবে না কারণ ওখানে তো পূর্ণ পরমাত্মা স্বরূপ পূর্ণ সন্ত নিবাস করছেন। সন্ত রামপাল মহারাজজী থেকে উপদেশ নিয়ে আমাদের পরিবার পুরো স্বাস্থ্যও সুখী জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন (কুটুম্ব) কম পক্ষে ২০০ সদস্য সন্ত রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে উপদেশ নিয়েছি। আমারা আগে সব আশারাম বাপুর শিষ্য ছিলাম। সন্ত রামপাল মহারাজজী দ্বারা বলা তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝে কমপক্ষে দশ হাজার শিষ্য ২০০৫ সালে হয়েছিল, আশারামের শিষ্যও সন্ত রামপাল মহারাজের শিষ্য হয়ে গিয়েছেন, তারাও আমার মত পশ্চাতাপ করেই পরে উপদেশ নিয়েছেন। ভক্ত সমাজের কাছে আমার অনুরোধ, যদি কোন ভক্তের পরমাত্মার প্রতি প্রেম ভালবাসা থাকে বা তার কাছে চির শান্তি পেতে চায় তাহলে দেরী না করে ততজ্ঞান যত তাড়াতাড়ি বুঝতে চায় পূর্ণ সন্ত গুরু রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে নিজের আত্মার কল্যাণ করার চেষ্টা করুন। মানব জনম দুর্লভ জনম, এই সুযোগ আর কোন দিন নাও পেতে পারেন, কারন, সত্যযুগ দ্বাপরযুগ, ত্রেতা যুগেও মহা ঋষিরা যে শাস্ত্রের মর্ম বুঝিয়ে যেতে পারেননি, আজ পরমাত্মার দূতের রূপে স্বয়ং পরমাত্মা এসেছেন আমাদের মাঝে। তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম। তাঁর জন্যই আজ আমরা পরমাত্মাকে জানতে পেরেছি তাঁর ঠিকানা পেয়েছি, ভগবানের কৃপা যে কি আজ আমরা এতই ভাগ্যবান যে তিনযুগে যে তত্ত্ব জ্ঞান দিতে স্বয়ং পরমাত্মা এসেছিলেন তাই তারা তাকে চেনেনি, তবে আজ এই কলিযুগে মধ্য পিড়িতে আমাদের কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের দূতকে পাঠিয়েছেন, তিনি তো বলেন আমি প্রভুর দাস, তবে আমরা শিষ্যরা তাঁকে পরমেশ্বরই মেনে থাকি কারণ তাঁর মুখবাণী থেকে যে তত্ত্বজ্ঞান বের হয় এটা মানুষের নয় স্বয়ং প্রভুই বলেন মনে করি। সেই জন্য ভক্তগণকে বলি, এই সুযোগ পবিত্র আত্মারা মনে হয় ছাড়বেন না, এই আশা রাখি। তাঁর বর্ণনা মুখে বলা যায় না যা বলিতাও কিঞ্চিৎ, ভাষা নেই বলার। আমার এই বাক্য হয়তো বুদ্ধি মান লোক ইশারা হিসাবে বুঝে নেবেন আর অজ্ঞানীর কাছে কিছুই না। কারণ আমরা প্রভুরই সন্তান সবাই সবার আত্মীয় কেউ পর নয়। কোনো জাত নয়, কোনো ছোট বড় নয়, কোন ধর্ম নয় কেবল একই ধর্ম যা হল মানব ধর্ম, পরমেশ্বরের সন্তান। তাই সবাই আমরা একই পরম পিতার সন্তান মনে করে কোন লড়াই নয় ঝগড়া নয়, শুধু শান্তি পরমেশ্বরকে পাওয়ার আনন্দ। আসুন আমরা মানব ধর্মের ব্রত রাখি ও কৃপা করে পরমাত্মা স্বরূপ পূর্ণ সন্ত রামপালজী মহারাজের চরণে এসে নিজেদের জীবন সুখী বানাই ও পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করি।

ভক্ত বসন্ত দাস

মোবাইল নং - ০৯৮১২১৫১০৮৮

।।অদ্ভুত ঘটনা।।

পূজনীয় আদরণীয় গুরুদেব মহারাজজিকে দন্ডবৎ প্রণাম,

আমি আমার পরিবারের খুশী আদরপূর্বক সমস্ত ভক্তদের জানাতে চাইচ্ছি যে, জানুয়ারী ২০০০ সালের প্রথমে আপনার (সন্ত রামপালজি) প্রবচন (সতসঙ্গ তাজপুর গ্রাম দেহলীতে শ্রী মুরারী ভক্তের নিবাস স্থানে চলছিল তখন এক অন্য ভক্তের মেয়ে, আমার পত্নী শ্রীমতি বিমলা দেবী (ছাবলা) কে বলল যেকি কাকী! পাশের গ্রামে এক সতসঙ্গ চলছে, যদি আপনি ওই গুরু মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নেন, তাহলে আপনার অসাধ্য রোগ (পিঠের হাড় এক ইঞ্চি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল) ঠিক হয়ে যেতে পারে। তখন আমার স্ত্রী ওই মেয়েকে বলল, অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ সেন্টর সাইন্স দিল্লিতে যার আড়াই বছর চিকিৎসা চালিয়ে কিছু করতে পারল না, তো এক নাম বা শব্দতে কি শক্তি আছে? যে কি আমার অসাধ্য রোগ ঠিক হয়ে যাবে? অনেকক্ষণ ধরে দুজনের তর্কাতর্কি চলছিল। পরে আমার পত্নী কিছু ভেবে সৎ সঙ্গে যাওয়ার নির্ণয় করলেন পরম পূজ্য সন্ত রামপাল জী মহারাজের প্রবচন/সৎসঙ্গ/ অমৃতবাণী শুনে অধুরা ছুটে যাওয়া কানেক্সান অর্থাৎ ভক্তির তার পুনঃ বন্দী ছোড়ের সাথে জুঁড়ে গেল আর আড়াই বছর ধরে চিকিৎসায় যে লাভ হয় নি তাহা কেবল নাম সুমিরণে মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে আমার অসাধ্য রোগ ঠিক হয়ে যায়। এর আগে ডাক্তার আমার পত্নীকে বসতে ও দাঁড়াতে একদম মানা করেছিলেন। আজও ট্রীটমেন্ট স্লীপের উপর লেখা আছে ও এক ইঞ্চি তফাৎ এক্স-রে সামনে আছে। সব থেকে বড় সমস্যা আমার পত্নীর এই ছিল যে কি, ওর দ্বারা বসে পায়খানা করতে কষ্ট হত আর পায়খানার হাত ধোয়ার সময়, দশ পনেরো মিনিট পর্যন্ত কান্না করতো, কেননা বেশী ঝুকলে বেশী ব্যথা হত এখন এই পরম পূজনীয় সতগুরু রামপাল মহারাজজীর কৃপায় ও আশির্বাদে ৫০ কিলো ওজনের জিনিষও উঠাতে পারে পরিপূর্ণ সুস্থ্য আছে। আমার সব পাঠকের কাছে এই প্রার্থনা যে কি, পরমেশ্বর তুল্য সন্ত রামপাল জী মহারাজ যে কবির্দেব (কবির পরমেশ্বরের) এর পূর্ণ কৃপা পাত্র হয়ে আছেন, তার কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত নাম প্রাপ্ত করে স্ব-পরিবারের জন্য সুখী ও কল্যাণ করান ও পূর্ণ মোক্ষ এবং সতলোক (শাশ্বতম্ স্থানম্) প্রাপ্ত করেন।

আপনার সেবক ভক্ত নথুরাম
গ্রাম-ছাবলা, দিল্লি দূরভাষ - ২০৯১৩৯৩৬

।।অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছেন পরমেশ্বর।।

আমি ভক্ত সুরেন্দ্রদাস গ্রাম-গাঁধরা, তপশীল সাঁপলা, জিলা -রোহতক হরিয়ানা নিবাসী আমার বয়স ৩১ বৎসর, ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রাখতাম এবং পরমেশ্বরের খোঁজে থাকতাম। আমি মনমানী (মনমুখী) পূজা, যেমন, মন্দিরে যাওয়া ব্রত উপবাস করা, শ্রাদ্ধ আদি ও করতাম। কিন্তু শারিরীক কষ্ট ও মানসিক অশান্তি লেগেই থাকত। তবুও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি এবং ইচ্ছা নিয়মিত ছিল। এই ইচ্ছা আমায় সন্ ১৯৯৫ তে সন্ত আশারাম বাপুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলাম যেমন ভক্তির পথ বাপুজি

বলেছিলেন দৃঢ় মন নিয়ে সেই সাধনা করতাম। কিন্তু এই করে না তো কোনো শারিরীক কষ্ট দূর হয়েছে, না আধ্যাত্মিক কিছু উপলব্ধি হয়েছে কেবল কষ্ট বেড়েই চলেছিল। আমি আশারাম বাপুর বলা অনুসারে সাধনা করতাম। যেমন ২৫০ গ্রাম দুধ সকালে খেতাম, আর ২৫০ গ্রাম দুধ সন্ধ্যা বেলায় খেতাম। আমার কাছে যত মন্ত্রতে যত অক্ষর ছিল ছিল তত লাখ মন্ত্র জপ করতাম ও সমাধি লাগাতাম। চল্লিশ দিনের এই ক্রিয়া ছিল যাহা এক অনুষ্ঠানের মত হত এই ধরনের আমি চৌদ্দটা অনুষ্ঠান করেছি।

একবার আমি বাপুজির সৎসঙ্গে শুনেছি যে, সাতদিন পর্যন্ত্য নিরাহার থেকে মন্ত্র জপ ও সমাধি লাগিয়ে প্রাণায়াম করলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। তাই এই কথা সত্য মেনে এইরকম করেছিলাম। তবে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য ক্ষুদা পেটে থাকার কারণ প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং প্রাণায়াম করার কারণে দিমাগী (মানসিক) পরিস্থিতি হারিয়ে গিয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম।

ওই সময় আমার উপর সৎগুরু পূর্ণ সন্ত রামপাল জী মহারাজের কৃপা দৃষ্টি হয়েছিল তাই ২০০০ সাল সেপ্টে ম্বর মাসে পূজ্য গুরুদেব সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলাম, উপদেশ নেওয়া মাত্রই আমার মনে হল যে যেমন দ্বীপে তেল ঢাললে যেরকম ঠিক সেই রকম প্রদ্বীপ জ্বলে ওঠে ঠিক আমার জীবন তেমন শান্ত হয়ে গেল।

পূর্ণ সন্ত (গুরু) পাপ কর্মকে সমাপ্ত করতে পারেন এর প্রমাণ আমার জীবনে স্পষ্ট রূপে পেয়েছি, যা আমার জীবনে ঘটেছিল। ২০০৪-তে ঔরাঙ্গাবাদ মহারাষ্ট্রতে সন্ত রামপালজী মহারাজের সৎ সঙ্গের উপলক্ষে, ২৫ ফুট উপরে সামিয়ানা অর্থ্যাৎ ছায়া হওয়ার জন্য তাম্বু লোহার পাইপের উপর টাঙ্গানোর জন্য আমি উপরে উঠেছিলাম, ওখান থেকে মানে ২৫ ফুট উচুঁ থেকে মাটিতে পড়ে আমার মেরুদন্ডের হাড় ভেঙে গিয়েছিল এবং নীচের ভাগ (অংশ) অবশ হয়ে (ব্রম্হ) গিয়েছিল। কাল হয়তো অন্য কিছু করবে ভেবেছিল, সে সময় আমি আমার গুরুদেবকে স্মরণ করেছিলাম আমার গুরুদেবের দয়ায়, ওই সময়েই দুটো পা ঠিক কাজ করতে শুরু করে।

গরীব, কাল ডরে করতার সে, জয় জয় জগদ্বীশ,
জৌরা জৌরী ঝাড়তী, পগ রজ জরৈ শীশ।।

ওই সময় আমায় ঔরঙ্গাবাদের প্রাইভেট হস্পিটাল (পটবর্ধন হাসপাতাল) -তে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। ওখানের ডাঃ ডী.জী. পটবর্ধন আমার শরীরের চেকআপ করে আমার রীঢ়ের (মেরুদন্ডের) হোড়ের এক্স-রে নিলেন। রিপোর্টে জানা হয় যে মেরুদন্ডের হাঁড় ভেঙে গিয়েছে। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার চিন্তিত হয়ে বললেন আপনার মেরুদন্ডের এক হাড় ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার বার বার আমার পায়ে হাত লাগিয়ে দেখে বললেন, আপনার উপর পরমাত্মার বিশেষ কৃপা আছে, তাই আপনার পা ঠিক কাজ করছে। কেননা এই রিপোর্ট অনুসারে আপনার অর্ধাঙ্গ নষ্ট হওয়ার কথা। ওই হসপিটলে তিনদিন পর্যন্ত্য ছিলাম, তার পরে ছুটি পেয়ে আমি হরিয়ানা নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলাম।

হরিয়ানায় এসে আমার চিকিৎসা এখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার হাড়ের জন্য চড্ডা সাহেব আমার রিপোর্ট দেখে অবাক হয়ে বললেন, কি করে চলাফেরা করছেন ? আপনার রিপোর্ট অনুসারে

অর্ধ অঙ্গ অচল হওয়ার কথা। তিনি আবার রঙ্গীন এক্স-রে করলেন আর বললেন চিকিৎসা দ্বারা করা সম্ভব নয় তবে অপারেশনের দ্বারা যে স্থিতিতে আগে ছিল সেই স্থিতিতে আনা সম্ভব হতে পারে। যাতে আর হাড় না ভাঙে। তিনি হাড়ের শক্তি পাওয়ার জন্য ইনজেক্সন দেওয়া শুরু করেলেন তিন মাস সব ইনজেক্সন নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর তিনি বললেন অপারেশন অবশ্যই করাতে হবে নয়তো বাকী যে হাড় গুলিও ভেঙে যেতে পারে, এতে দুলাখ টাকা খরচ হবে আর ওই সময় ডাক্তার এইকথাও বললেন রিপোর্টের অনুসারে আপনার তিন মাসের মধ্যে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আজ পরমাত্মার কৃপাতে বেঁচে আছি। অপারেশণ খরচ দুই লাখ দেবার আমি সমর্থ ছিলাম না এই জন্য আমি অন্য এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, উনিও আমার রিপোর্ট দেখে আশ্চর্য্য তে পড়ে গিয়ে বললেন যদি অপারেশনের দেরী হয় তাহলে বাদ বাকী হাড় ভেঙে পড়বে। তিনিও বললেন আপনার অর্ধেক অঙ্গ কাজ করার কথা নয়, কেমন করে আপনি চলাফেরা করছেন?

অবশেষে সবার কাছে হেরে গিয়ে আমি নিজের গুরুদেব সন্ত রামপাল মহারাজের চরণে প্রার্থনা করলাম, তখন তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, বেটা আপনি একদম্ ঠিক হয়ে যাবে, যদি আপনি পরমেশ্বর কবীর সাহেবের শরণে না হতেন তাহলে আপনার ভুগে ভুগেই মৃত্যু হত। আপনি একবার ডাক্তারকে দেখান। আমি পরের দিন ডাক্তারকে দেখালাম গুরুদেবের আদেশ অনুসারে, যে ডাক্তার এক্স-রে করেছিলেন, তিনি ওই এক্স-রে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, যে হাড় ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, সেই হাড় আপনা-আপনি (নিজে নিজে) উপরে গিয়ে কি করে জুড়ে গেল। ডাক্তার বললেন এই হাড়ের পরিস্থিতি এমন ছিল, যেমন কোন গাড়ি অনেক উচুঁতে চড়তে হবে এই সময় সে গাড়ির ইঞ্জিন যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে ওই গাড়ি ফিরে আসতে পারে যদি প্রথম গিয়ারে দেওয়া, পাথর বা ইট বড় চাকার পিছনে দিয়ে গাড়িকে ওই জায়গায় দাঁড় করে রাখা যায়। তাহলে উপরে চড়তে পারবে না বা পারে না। ঠিক সেই রকম যে হাড় এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল, সে কি করে উপরে জুড়ে গেল? এটা আমার ইতিহাসের বাইরের কথা। এতে আমার মনে হচ্ছে যে কোন শক্তি আছে যে কিনা অসম্ভব জিনিষকেও সম্ভব করিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই অবস্থা তো অপারেশান করলেও এই স্থিতিতে আমরা কোনদিন এনে দিতে পারতাম না। অপারেশন করে এতে হয়তো কোন পদার্থ ভরে ওই গ্যাপ্ ভরা যেতে পারত। পরে যদি আপনি কোন ওজনের জিনিষ উঠানো চেষ্টা করেন, তাহলে আবার হাড় ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকতে হত। তারপর মরণ কাছে কাছেই ছিল। ডাক্তার বুঝতেই পারছিলেন না যেকি এইসব কিভাবে হল? আমি বললাম পূর্ণ ব্রহ্ম কবির সাহেবের স্বরূপ আমার পরম পূজ্য গুরুদেব সন্ত রামপালজী মহারাজ আমার পাপ কর্ম কেটে ও আমার মৃত্যুকে কাটিয়ে নিজের কাছ থেকে আমায় নতুন জীবন দিয়েছেন। অর্থাৎ নতুন করে আয়ূ বাড়িয়ে দিলেন। **পরমেশ্বর কবীর সাহেবের বাণী—**

"জো মেরে ভক্তি পিছোড়ী হোই।
তো হমরা নাম লেবে ন কই"।

এখন আমি একদম সুস্থ আছি এবং সতগুরুর চরণে আত্মকল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থে সেবা করছি। ৫০ কিলো ওজনের বস্তা নিয়ে চলতেও পারি। আমাদের গুরুদেবের বাস্তবিক উদ্দেশ্য যে

ভক্তি করিয়ে জীবকে বিকার মুক্ত করিয়ে, আমাদের সকলকে পরমধাম সতলোকে নিয়ে যাওয়া। এখানকার ছোটো ছোটে সুখ তো আমাদের গুরুদেব নিজের খাজানা (তহবিল) থেকে দিয়ে দেন। যাতে জীব ভক্তির পথে দরকার হয়ে থাকে। এই জন্য সর্ব ভক্তের কাছে অনুরোধ ও প্রার্থনা যে কি, আমার গুরুদেবের চরণে এসে সত্যভক্তির মার্গ জানুন ও সংসারের ছোট ছোট সুখের জন্য পরিবারের সবাই কে সুখ দিয়ে তাদের আত্ম কল্যাণ করান।

সৎ সাহেব **ভক্ত সুরেন্দ্র দাস**

মোবাইল নং - ৯৯৯২৬০০৮২৬

বিশেষ ঃ- ঋক্‌বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২ -তে পূর্ণ পরমাত্মা বলেছ্নে যে, হে শাস্ত্রানুকুল সাধনা করা সাধক! তুই সম্পূর্ণ ভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, বা সংশয়রহিত হয়ে আমাকে ভক্তি কর, তাহলে আমি তোর অসাধ্য রোগও সমাপ্ত করে দেব। যদি তোর আয়ূ না থাকে, তোর আয়ূর শ্বাস বাড়িয়ে একশো বৎসর করে দেব। উপরের ঘটনাতে প্রভুর ঋক্‌বেদের বাণীই প্রমাণিত করেছে।

।। প্রভু শুনেছ্নে গরীবের ব্যাথা।।

আমি কর্মবীরের পুত্র ঘাসীরাম গ্রাম ভরান জেলা রোহতক হরিয়ানার স্থায়ী নিবাসী। প্রথমে আমি ও আমার পুরো পরিবার সন্ ১৯৮৬ তে নিরঙ্কারী বাবা হরদেব সিং মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলাম। ওই সময় আমি চুড়ি মালার ফেরী করতাম। আর্থিক স্থিতি ভালই ছিল। ধীরে ধীরে স্থিতি খারাপ হতে লাগল। কিছুদিন পরে আমার পত্নীর শরীরে নানা রোগ হতে লাগল কখনও কোন সমস্যা, বা কখনও কোনো না কোনো রোগ লেগেই থাকত। আমার পত্নীর ববাসীরও পিত্তথলিতে পাথর হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন অপারেশন করতে হবে, বিশ (কুড়ি) হাজার মত খরচ হতে পারে। এই দাসের ঘরে কুড়ি হাজার চালের দানাও ছিল না তাছাড়া আমার শ্বাসের রোগ ছিল। আমার পত্নী ও আমি আমাদের কষ্টের কথা মনে করে দুঃখী মনে চর্চা করতে করতে, একটা অটোতে করে বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছিলাম। পয়সা তো নেই, অপারেশন কেমন করে হবে? আমরা তো মরেই যাব। ওই অটোতে এক বোনও বসেছিলেন। তিনি আমাদের সব কথা শুনে বললেন করৌথা চলে যাও। ওখানে এক মহারাজজী আছ্নে তিনি যে কোনো রোগের ঔষধ বিনামূল্যে দেন। আমার পত্নী ভক্তিমতী মেবা দেবী ২৭.৭.২০০৩-এ সতলোক আশ্রম করৌথ তে গিয়েছিল এবং বন্দী ছোড় সতগুরু রামপালজীর কাছে নিজের অসুখের সব কথা এবং ঘরের পরিস্থিতি বললেন। সতগুরুদেব খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে বললেন, বেটি এখানে কোনো ঔষধ দেওয়া হয় না, কেবল আত্মকল্যাণের পথ বোঝানো হয় আর ভক্তি করার বিধি, পবিত্র বেদ ও পবিত্র গীতার আধারের উপর শাস্ত্রের অনুকূলে বলে থাকেন। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের কৃপাতে কেবল মন্ত্র জপ করা মাত্রই সর্ব কষ্ট দূর হয়ে যায় আর মূল লাভ তো জন্ম মৃত্যু থেকে পূর্ণ রূপে জীবকে মুক্ত করানো হয়। সমাজ সুধার (সমাজকে পবিত্র করা) ও অন্য সুখ তো এক্সট্রা (ফ্রি) তে দেওয়া হয় বা নিঃশুল্ক দেওয়া হয়ে যায়। তার কাছ থেকে নাম উপদেশের ঔষধ নিয়ে, আমি সুস্থ ও আমার পরিবার এখন তার কৃপায় সুখী। রোগের কোন চিহ্ন লেশ মাত্র

আমাদের পরিবারে নেই। গুরুদেবের আশির্বাদে কষ্ট জ্বালা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। বন্দী ছোড়ের কাছে এই প্রার্থনা আমার মত সুখী জীবন এইরকম সমাজের সবার ভাগ্যে যেন মেলে এই আশা রাখি।

ভক্ত কর্মবীর দাস পুত্র ঘাসীরাম
গ্রাম-ভরান, তপশীল-মহম, জিলা - রোহতক

।। ভগবান এইরকমই হন ।।

আমি ভক্ত মহাবীর সিং পিতা শ্রী কে হর সিং গ্রাম- ঢরানা, জিঃ ঝজ্জর (হরিয়ানা) নিবাসী। প্রথমে আমি কট্টর শিবের ভক্ত ছিলাম। আমার লিভার ও কিড্‌নির ভিতরে পুঁজ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে আমার ভাই ভক্ত মহেন্দ্র সিং মেডিকেলে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে যায়। তার আগেও অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল এই রোগের পিছনে কিন্তু কোনো আরাম পায়নি। মেডিকেলে অল্টাসাউন্ডের পর তিনটে অপারেশনের কথা বলেছিল, আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি অপারেশন করতে মানা করে দিয়েছি। খাওয়া যেত না শরীর একদম কমজোর হয়ে পড়েছিল। আমার বড় ভাই মহেন্দ্র সিং বলত, সন্ত রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নে, তিনি পূর্ণ পরমাত্মার অবতার হয়ে এসেছেন। কবীর পরমেশ্বর পূর্ণ ব্রহ্ম আছেন। আমি আমার ভাইকে বলতাম ভগবান শিবের কাছে তোর কবীর তাঁতীর কি শক্তি আছে, বা কি ক্ষমতা আছে? তিনি তো এক কবি ছিলেন, তিনি কি করে ভগবান হতে পারেন? আমার বড় ভাই মহেন্দ্র সিং পিতা কেহর সিং, ইনাদের পরিবার একদম অভাবের ছিল। সন্ত রামপালজিয়ের শরণে গিয়ে পূর্ণ সুখী এখন আছে। তারা আগে যত দেব দেবীর পূজা করতো সব ত্যাগ করে এক পরমেশ্বর কবির সাহেব ও তার স্বরূপ গুরুদেবকেই পূজা করেন। তারপরও তারা সুখী রয়েছে। আমিও মানতাম্ তবুও আমি আমার শিবের থেকে বেশী কাউকে মানতাম না। আমার বড়ভাই মহেন্দ্র আমাকে বলতো, মহাবীর এই ভুল সবারই হয়। পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) -ই আছেন। ইনার শক্তির সামনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্ম, ও পরব্রহ্ম তো ক্ষুদ্র শক্তিযুক্ত। যেমন দেশের প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সামনে প্রদেশ মন্ত্রির শক্তি যেমন হয়, ঠিক সেই রূপ অন্তর, পরমেশ্বর কবীর সাহেবের ও শিব বা অন্যান্য দেবতাদের শক্তি। সন্ত রামপাল দাসজি মহারাজ সব সদ্‌গ্রন্থের গহন (গভীর) অধ্যয়ন করেছেন। ভক্তি শক্তি থেকে স্বঅনুভব দ্বারা ঠিক পেয়েছেন।

তখন নিজে তিনি জে.ই.এর চাকরি ত্যাগ করে ভক্তি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজ সর্ব সন্ত ও মহন্ত আচার্য্য কে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। সমস্ত পন্থের ও মহর্ষি দয়ানন্দের লেখাকে পর্যন্ত্য ফেল করে দিয়েছেন। সমাচার পত্রতেও একদম খুলে বলে দিয়েছেন। যদি কেউ আমার শাস্ত্রের ভুল ধরতে পারে, সে যেন আমার সামনে আসেন। আর্য সমাজের নাদান (অবুঝ) কিছু লোক বিরোধ করেছিল, পরে মুখ নিচু করে চলে যায় কেননা রামপাল মহারাজ যুক্তি প্রমাণের সাথে কথা বলেন। অন্য সন্ত বা অন্য ব্যক্তিরা দন্ত কথা (রূপকথা)-র আধারের মার্গ দর্শন করছেন। সত্যের সামনে অসত্য কখনও স্থির (টিকে) থাকতে পারেনা।

বড়ভাই মহেশের উপরোক্ত কথা শুনে মনে হতো একবার ঝগড়া করব কিন্তু আমরা বড়

আমি বলে আমি চেপে থাকতাম্ কিছু বলতাম না। যদি অন্য কোন ব্যক্তি আমার সামনে শিব থেকে বড় কোন ভগবানের কথা এইরূপ বড়ভায়ের মত বলতো, তাহলে লড়াই অনেক বড় ধরনের হয়ে যেত। তবে এখন বুঝতে পেরেছি যে সত্যকে মানুষ যতদিন না জানবে সে মিথ্যার জন্য অর্থাৎ মিথ্যাকে আড়াল কপূপৈ জন্য লড়াইও করতে পারে, আজ আমার সেই পরিস্থিতি হতে চলেছিল। আজ আমি নিজের ভুল মানতে স্বীকার হয়েছি। জেনেছি যে, সত্যি করেই কবীর পরমেশ্বরই পূর্ণ পরম ব্রহ্ম, তার উপরে কোন পরমেশ্বর নেই। মরণ পথের মানুষ কি না করতে পারে? ওইদিন আমার তিনটে অপারেশনের কথা ছিল, তাই শুনে ভয় হয়ে গিয়েছিল। সেই দিনই ভাইকে বললাম ভাই আমাকে বাঁচাও। আমার ভাই বলল, চল তোকে করৌথা আশ্রমে নিয়ে যাই তাহলে যদি তোর জীবন বাঁচতে পারে। আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার জন্য সেদিন ট্রলিতে শুয়ে দিয়েছিল। অপারেশন করার কাপড়ও পড়িয়ে দিয়েছে। আমি ট্রলি থেকে উঠে নিজের কাপড় পড়ে বড় ভাই মহেন্দ্রকে বললাম, আমি তোমার ঐ গুরুদেবের কাছ থেকে এক্ষুণি নাম নেব। আমরা গাড়ি করে মেডিকেল রোহতক থেকে সোজা বন্দী ছোড় সতগুরু ।

রামপালজি মহারাজের শরনে চলে যাই এবং নাম উপদেশ নিয়ে, আশ্রমে ভোজনও গ্রহণ করলাম। কয়েকদিন পরে যখন মেডিকেলে গিয়ে ডাক্তারকে দিয়ে যখন চেকাপ্ করালাম, তখন ডাক্তার আশ্চর্যতে পড়লেন এবং দেখলেন যে আমার কোনো স্থানই নষ্ট হয় নি আর আমাকেও সুস্থ দেখলেন। তবে ডাক্তারের কাছে অপারেশন করলে আমার প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হয়ে যেত কিন্তু আশ্রমে যাওয়াতে আমার কোনো খরচা হয়নি। সেখান থেকে নাম উপদেশ নিয়ে, ফ্রিতে পুস্তকও পেয়েছি। আমার পরিবারের সবাই অন্যান্য দেব দেবীর পূজা পাঠ করতো, তবে নাম উপদেশ নেবার পরে সমস্ত পূজা ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বরের পূজা করে ও গুরুদেবের বলা সৎমার্গের পথে চলে, পূর্বের থেকে অধিক সুখী আছি এবং স্বাস্থ্যবানও হয়েছি। বন্দীছোড় পূর্ণ পরমাত্মা সৎগুরু রামপালজি মহারাজের গুনগান মহিমা সারাদিন করলেও কম মনে হয়।

সন্ত রামপাল মহারাজের মুখ্য উদ্দেশ্য তো কেবল নাম উপদেশ দিয়ে ভক্তি করিয়ে কালের জাল থেকে মুক্ত করে পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন করানো। যুগ যুগ সাধনা করে যার খোঁজ কেউ পায়নি। আজ রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে সেই সত্যের সন্ধান পেয়েছি, তাকে কোটি কোটি দন্তবৎ প্রণাম। কলিযুগে আমাদের জীবন তাকে পেয়ে ধন্য মনে করছি। পরমাত্মার সন্ধান বা সংবাদ নিয়ে দূত হয়ে আমাদের মুক্তির জন্য পৃথিবীতে যাকে পাঠিয়েছেন, এই অনমোল বা দূর্লভ সন্তকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরাতে চাই না। এই জীবন চালানোর জন্য কর্ম করে খেতে হবে, তাই তার নজরের সামনে থেকে এই দাস দূরে আছি। কিন্তু তাকে আমরা হৃদয়ে বসিয়ে রেখেছি। কারণ তার থেকে বড় বান্ধব আমাদের আর কেউ নেই।

তাহাকে মুক্তিদাতা বলতে বাধ্য হয়েছি কারণ এই সমস্ত ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির সম্পূর্ণ সঠিক জ্ঞান একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম(পরমেশ্বর) কিংবা তাহারই অংশকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়ে দেন কেননা এই প্রকার সম্পূর্ণ সৃষ্টির সঠিক জ্ঞান কোনো দেবতা বা তাহাদের উপরে যে ব্রহ্ম পরব্রহ্ম আছেন তাহাদেরও জানা নেই। কারণ হল পরমেশ্বর যখন এই সমস্ত ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছিলেন তখন সেই সৃষ্টি দেখার জন্য কোনো সাক্ষী ছিল না। তার কারণে এই বাস্তবিক সম্পূর্ণ তত্ত্ব সৃষ্টির জ্ঞান কেবল,

আমাদের আদরণীয় পরমেশ্বর তুল্য গুরুজি, তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজি মহারাজের কাছেই আছে, অন্য কাহারও জনা নেই। তাই আমার সকল পরমেশ্বর প্রেমী ভক্তদের কাছে নিবেদন যে কি, এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না যত তাড়াতাড়ি পারেন, আপনার সুখী হয়ে নিজেদের আত্মার কল্যাণ করান।

।। সর্বহারার সাহারা বা আশ্রয় দাতা ।।

আমি ভক্ত জিয়ারাম (রাজু) পিতা গণেশীরাম, গ্রাম-ঢরানা নিবাসী। আমার ও আমার পত্নীর অসাধ্য রোগ ছিল, তবে কেউ কেউ ভূত প্রেতের উপরের দৃষ্টি আছে। ডাক্তার বলেছিলেন টি বি হয়েছে, অনেক ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি, কিছু পরিবর্তন আসেনি। দেবী দেবতার পূজা করিয়েছি এবং উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থানের বালাজি আদির অনেক জায়গায় ঠোকর খেয়ে অনেক পয়সা কড়ি নষ্ট হয়েছে। দশ বারো বৎসর এইভাবে ঘোরাঘুরিতে সময় নষ্ট করেছি। যা পুঁজি বাটা ছিল, সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কোথাও গিয়ে একটু শান্তির দুটো কথাও শুনতে পারি না বা কেউ একটু সান্তনা ধরনের কথাও এই দশ বছরের মধ্যে শুনাতে পারি নি। আমাদের নিজের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না, আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিলাম। যজ্ঞ করেছি যজ্ঞ করার সময় পন্ডিত ভয় পেয়েছিল আর বলল এর মধ্যে বড় জিন ভূত আছে আমি আবার যজ্ঞ করে পরে বলব। আমি যে গ্রামের বাসিন্দা আছি ভক্ত মহেন্দ্রও সেই গ্রামের লোক তিনি তো আগেই সন্ত রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে রেখেছিলেন। আমাকে অনেক বুঝাতেন তখনও আমি তার কথা বিশ্বাস করতাম না। আমাকে বলতো জিয়ারাম সব জায়গায় ঘুরে নে, আর যত ঠকার ইচ্ছা ঠকে নে, আছে তোকে যত সময় না লুটবে তুই মানবি না। সন্ত রামপালজি ছাড়া তোর এই কষ্ট আর কেউ নিবারণ করতে পারবে না। আমিও তোর মত সারা জায়গায় ঘুরে তার চরণে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সুখী অনুভব করছি, শুধু এই জীবনের জন্য শান্তি বা সুখ অনুভব করছি না, পরকালের কথা মনে করেও সুখী অনুভব করছি। গুরুদেবের আশির্বাদে আজ আমি ধন্য ও গৌরান্বিত, এরপরে আর কোন সুখ থাকতে পারে না। সব জায়গায় ঘোরার পরে মহেন্দ্র ভক্তের সাথে দেখা করে সব আলোচনা করলাম, পরের দিন সন্ত রামপালজীর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে আজ আমি সুস্থ আমার পুরো পরিবার সুস্থ। ভক্ত সমাজের কাছে আমার প্রার্থনা যে সময় থাকতে মুক্তি দূতকে চিনে নিন, আমার মত যেন কেউ সর্বহারা না হয়, আজ আমি সব কিছু পেয়েছি কোন কিছুর অভাব নেই।

সৎসাহেব **ভক্ত জিয়ারাম**

।। গুরু হলে এইরকমই গুরু হওয়ার দরকার ।।

আমি শশী প্রভা প্রধানাচার্য্য (প্রিন্সিপাল) রাজকীয় বরিষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডিগানা জিলা জিন্দ-তে কার্য্যরত। আমি আমার ঘরের লড়াই-ঝগড়া ও মানসিক অশান্তিতে প্রায় ৩৫ বৎসর ধরে ভুগছি। আমার স্বামী আমাকে মারত ও পুরো মাসিক বেতন কেড়ে নিত। অর্থাৎ যতটা আমাকে কষ্ট দেওয়ার দিত। ৬০ বিঘা জমির মালিক হয়েও আমাকে সব সময় কুকুরের মতো খেতে দিত। আমি তার আত্মীয় স্বজন ও আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম, কেউ

সাহায্য করেনি, সমাজের পঞ্চায়েতের লোকের কাছেও সাহায্য চেয়েছি, কেউ সাহায্য করতে আসেনি একটা লোকও আমার সাহায্য করেনি। ভাবলাম গুরু করলে হয়তো দিন ভাল হয়ে যাবে, এই মনে করে আনন্দপুর (বীনা) মধ্যপ্রদেশ বালা থেকে মন্ত্র নিয়ে গুরু করেছিলাম। এখন এই সব উলঝনে পড়ে আমি বালাজি হয়ে গিয়েছিলাম। বগড় (রাজস্থান) ধৌলিধার হিমাচল প্রদেশও গিয়েছিলাম। পীর ফকির গুরুদ্বারের ও সাহারা নিয়েছি। ঘরে যখন একা থাকতাম শুধু কাঁদতাম ভাবতাম ভগবান নেই এত জ্বালা যন্ত্রণা অন্যায় সহ্য করতে করতে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। ছোট মেয়ে পরমাত্মার দয়ায় পড়ছে, কিন্তু বিয়ের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। তার বাবা কোনো ছেলেরও খোঁজ নিতেন না।

তারপর একদিন এই দুঃখী আত্মা পরমাত্মার দরবারে (দরজায়) গিয়ে পৌঁছায় যেখানে দুঃখ নিবারণ হয়। আমার বাড়ীর পাশে এক বাড়ীতে পাঠ হচ্ছিল, সেই বাড়ী থেকে আমাকে প্রসাদ নেওয়ার জন্য ডাকতে এসেছিল, পরে ওখানে গিয়ে কিছু কথা বার্তা হয়, পাঠের সম্পর্কে। তিনি বললেন এই পাঠ হল পরমাত্মার সত্য বাণী, যা শুনলে দুঃখ কাটে কিন্তু এই পাঠ সন্ত রামপাল জীয়ের আজ্ঞা অনুসারেই করলে লাভ হয়, অন্য কাউকে দিয়ে এ পাঠ করালে লাভ হবে না। যেমন রাজা পরিক্ষিতকে পাঠ শুনানোর জন্য কোনো ঋষিদের সাহস হচ্ছিল না। কেননা কারর অধিকার ছিল না পাঠ শুনাবার ও সাতদিনের দিন মৃত্যু অনিবার্য অতএব সাতদিনে এই অভিশাপের ফল নিশ্চি ত ফল ফলবেই জেনে সবাই আগ্রহ করে স্বর্গ থেকে শুকদেব ঋষিকে ডেকে পরিক্ষিতকে শিষ্য বানিয়ে সাতদিন ভাগবত পাঠ শুনিয়েছিলেন। তবেই পরিক্ষিতের কিছু আশ্বাস হয়েছিল। বর্তমান কোন সন্তের বাস্তবিক শাস্ত্রের জ্ঞান ও সত্য সাধনার জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় নেই। এইজন্য যে কেউ যেখানে বা যে কোনো বাড়িতে পাঠ করার কথা বললেই পাঠ করা শুরু করে দেয়। যাহা করলে সাধকের কোন লাভ হয় না। যে বোনের সঙ্গে আমার পরিচয় ও চর্চা হয়েছিল, সেই বোন সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম নিয়ে ছিলেন ও তাহার বিচার শুনতেন। সে অশিক্ষিত ছিলেন তবুও গুরুদেবের সত্য বিচার শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য আমাকে শুনিয়েছিলেন আর আমি প্রধান আচার্য (প্রধান শিক্ষক প্রিন্সিপাল) হওয়া সত্ত্বেও হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। তখন এইরকম মনে হচ্ছিল পরমেশ্বর যেন আমার হাত ধরতে আসছেন। সেই বোন বললেন আমার গুরুদেব সবার দুঃখ নিবারণ করেন। আমি বললাম আমাকে তার কাছে নিয়ে দর্শন করাবে? তিনি বললেন আগামী দিন যাব, আমরা পরের দিন রওনা দিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি, সন্ত রামপাল মহারাজজী সাধারণ চেয়ারে বসা রয়েছেন। আমি জানতাম না সন্ত কেমন হয়, বা তার কেমন মহিমা হয়। বুঝলাম যে যত বড় হন, সে ততই সাধারণ দেখায়। আজকাল গুরুরা তো হাজার হাজার টাকা নিয়ে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা ও নাম দীক্ষা দিয়ে থাকেন আমি জানতাম যে আমার স্থান তো পৃথিবী থেকেও নীচে, আমি পরমাত্মার মহিমার কি জানি? আমার ব্যাথা শুনে গুরুদেব বললেন, নাম উপদেশ নিয়ে নেও সব ঠিক হয়ে যাবে। পরের দিন উপদেশ (দীক্ষা) দিলেন। একমাসের ভিতর মেয়ের সম্বন্ধ হয়ে বিয়েও হয়ে যায়। এই রকম মনে হচ্ছিল কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছে, ওই স্বামী যে কিনা কোন এসম্বন্ধ মেয়েদের আনত না, সে বিয়েও দিল। ফির কিছুদিন পরে আমার মেয়ের পেটে গাঁঠ হয়েছিল, বাচ্চা হয় নি, তাই চিন্তা হতে লাগল। আমি আমার ছেলেকে বলছিলাম যে

কি, যখন আমরা ফিল্ম দেখি সিনেমার মধ্যে যদি কোন পরিবারের অপরেশন হয় এবং সে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে , এই সময় পরিবারের লোক মন্দিরে প্রার্থনা করে, যেকি অপারেশন যেন ঠিকমত হয় আর সে যেন জীবিত থাকে, তখন তাদের প্রার্থনায় সে রুগী সুস্থ হয়ে যায়। তখন ছেলেও আমার এই কথায় সহমত হল, পরে আমি তাজপুর (দিল্লি) সৎগুরুর সৎসঙ্গে সেবার জন্য চলে যাই। তারপর ওখান থেকে হাসপাতলে গিয়ে দেখি অপরেশন ঠিক হয়েছে, কেন্সারের শঙ্কা ছিল, তাও ঠিক হয়ে যায়, পরে মেয়ে গর্ভবতীও হয়েছে। একদিন জামাইয়ের ট্রেকটরের সাথে এক মোটর সাইকেলের এক্সিডেন্টের (দুর্ঘটনার) খবর শুনলাম। আমি তো কেবল পূজ্য গুরুদেব ছাড়া কিছু বুঝতাম না। মালিকের যতটা গুণগান গাই এটা কমই, এই জিহ্বা থেকে আমি আমার গুরুর মহিমা লোককে শুনায় এ কিছু মাত্র! দেড় মাসের মধ্যে জামাইও ঠিক হয়ে হসপিটাল থেকে বাড়ি আসল।

যে দিন থেকে আমি উপদেশ (দীক্ষা) নিয়েছি, সেইদিন আমি ওই নকল গুরুর ফটো জ্বালিয়ে দিই ওইদিন থেকে আমার জীবন গাড়ি সুন্দর ভাবে চলতে থাকল। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তে আমি জাগ্রিত আঁখ (চোখ) দিয়ে ৪ঙ্গ৫ টার সময় বিকালে এক ভয়ঙ্কর আকৃতি বালাকে দেখেছি এত ভয়ঙ্কর যে, যদি আমি গুরুজির কাছে দীক্ষা না নিতাম তাহলে আমি ভয়েতেই মারা যেতাম। কিন্তু এই সময় আমি ভয় পাইনি, এতটা বুঝেছি এইটা যমদূত হবে, পরের দিন আমি গুরুদেবকে এই ঘটনা বর্ণন করলাম। তিনি বললেন ঐ দিনই তোমার শেষ দিন ছিল। আজ আমি পরমাত্মা স্বরূপ গুরুদেবের কৃপাতে বেঁচে আছি। তার দয়ায় আমার ছোট মেয়ের বিয়ে এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে হয়েছে। দুই তিনবার আমার চাকরি চলে যেতে যেতে পরমাত্মা আমায় সামলিয়ে নিয়েছেন, এবং দুটো পদোন্নতিও দিয়েছেন। গুরুদেব বলতেন রাজাও প্রভুরই সন্তান তার মধ্যে ও প্রভুর শক্তি আছেন বা কাজ করে। প্রভুই সাধকের জন্য মন্ত্রির মধ্যে প্রেরণা দিয়ে সবার ফের বদল করিয়ে থাকেন। দেখাচ্ছে রাজা করছে করান পরমাত্মা। যে কোনো ব্যক্তি একবার আমার গুরুদেবের শরণে এসে আশ্রয় নিয়ে দেখুন কি ভাবে দুঃখ দূর করেন সে নিজেই বুঝতে পারবে না যে কি তার কত করুণা, স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারবে না। পরমাত্মা সত্যিকারেই অসহায় ব্যক্তির সহায় দাতা। আত্মার ভাষা তিনি বোঝেন আমার সাথে যে সব ঘটনা হয়েছে এ সমাধান শুধু পরমাত্মাই করতে পারেন। আমার গুরুদেবের মহিমা বর্ণনা করার জন্য আমার কাছে শব্দ বা কোন ভাষা নেই, তিনি স্বয়ংই কবির সাহেবের অবতার, যদি কেউ পরমাত্মার ভালবাসাও কৃপার দরকার মনে করেন, তাহলে হরিয়ানা হিসার জিলা, বরবালা আশ্রমে অবশ্যই আসেন আর নিজের চোখে দেখে যান, গুরু কেমন হওয়ার দরকার আর কি করে গুরুদেবের মাধ্যমে পরমাত্মার কৃপা আশির্বাদ পরিবারের উপর বর্ষণ হয়, এটাই এক মাত্র প্রমাণ। নানা গুরুর উপদেশ শুনেছি, তবে সত্যের বাস্তবিক সন্ধান কোন গুরুর কাছে নেই কারণ তারা দেবতাদের পাওয়া সিদ্ধির সন্ধান দেখিয়ে আশ্চর্য্য করায়ে গুরুপদ বজায় রাখার চেষ্টা করে আর নিজের পদবী বাড়ানোরই চেষ্টা করে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে থাকেন, নিঃস্বার্থে বিনামূল্যে তারা উপদেশ সত্য নাম তাদের কাছে নেই, তো দেবে কোথা থেকে? একমাত্র পরমেশ্বরের অবতার রূপে এসেছেন, সন্ত রামপাল মহারাজজী যার কথা ভবিষ্যৎবক্তারা সাড়ে চারশো বৎসর আগেই বলে গিয়েছিলেন যেকি, ভারতে শক্তিশালী মহিলা প্রধান হবে, রক্ষকের গুলিতে মারা যাবেন। তার ছেলে গদিতে কিছুদিনের জন্য আসবেন তিনিও

হঠাৎ মারা যাবেন আর এও বলে গিয়েছিলেন ভারত সর্ব শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্র হবে, তবে এমন দূত আসবেন যে কিনা সর্বধর্মকে এক মানব ধর্ম রূপে পরিবর্তন করবেন, কোন আলাদা ধর্ম থাকবে না, কোন উঁচু নিচু জাত বলতে কিছু থাকবে না, পশুবলিও বন্ধ হয়ে যাবে, ভাই ভাইয়ের পবিত্র সম্বন্ধ, মা বাবাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন সন্তানরা, ধনী গরীব, ছুয়া ছুত কিছুই থাকবে না, স্বর্ণ যুগ আরম্ভ হবে। সর্বদেশ ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। যাহা লোকে কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না সেই যুগ সেই মহাপুরুষের মাধ্যমে হবে। তার জ্ঞানের কাছে কোন জ্ঞান টিকে থাকতে পারবে না, সে শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যক্ষতা লাভ করবে, একমাত্র সত্যের সন্ধান তার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। আমার ভাগ্য খারাপ না জানি ওই যুগে আমার জন্ম দুইবার হতেও পারে, না ও হতে পারে সেটা পরমেশ্বরের ইচ্ছা। এই ধরনের এক হাজার ভবিষ্যবাণী বলে গিয়েছেন তার মধ্যে আজ পর্যন্ত্য প্রতিটি সত্য হয়েছে, তিনি আরও বলেছেন যে, ওই তত্ত্বদৃষ্টি হিন্দু সন্ত দ্বারা ১৯৯৯ থেকে চালানো আধ্যাত্মিক ক্রান্তি ২০০৬-তে প্রকাশ্যে প্রমাণের জন্য মারাঠী কাগজে আগেই ছাপানো হয়েছিল। নাস্ট্রোডেমসের ভবিষ্যবাণী, অনেক ভবিষ্যবক্তা প্রমাণ করেছেন তাদের পুস্তকে। আরও অনেকে রামপাল মহারাজজীর বিষয়ে অনেক ভবিষ্যৎবাণী বলেছেন, পরের পৃষ্ঠায় মারাঠি ভাষায় লেখা প্রমাণ আছে। সব কথা এখানে বলা সম্ভব না পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া রয়েছে। আমার মতো অভাগিনীকে কিভাবে তিনি সামলিয়ে নিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কোন শব্দে তাঁর মহিমা গাইব ? এই শব্দকে পাঠক নিজের হৃদয়ে বসিয়ে নিজের লাভ করান।

খুব ছোট জীব অভাগিনী শশী ভক্তিমতি।

।। নিজের ভক্তকে যমের দরবার থেকে ছাড়িয়ে আনা ।।

আমি ভক্ত ওমপ্রকাশ পিতা মাতদীন, নজফগড়, দিল্লির নিবাসী। আমি পরম পূজ্য সন্ত রামপাল জী মহারাজজী থেকে নাম, দেড় বৎসর আগে নিয়ে রেখেছিলাম। নজফগড়ে আমার মিষ্টির এক দোকান আছে। ১৯ শে মে ২০05 রাত ৯.৩০ টায় আমার দোকানে বসেই খুব পেটে ব্যাথা শুরু হয়, ব্যাথার কারণে একদম খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল, আমি গুরুদেবের নাম জপতে জপতে ঘরে পৌঁছেছি। ঘরে ঢুকতেই সামনে গুরুদেবের বড় ছবি টাঙানো আছে, সেখানে আমি দন্ডবৎ প্রণাম করে, যখন দাঁড়িয়েছি, আমার পেটে যন্ত্রণা তখন ঠিক হয়ে গেল, তারপর আমি খাঁটে (পালঙ্কে) গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মানে বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিলাম। পরে দেখি যমের দূতরা আমাকে একটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, আর আমাকে উঠিয়ে যমের দরবারে নিয়ে গিয়েছে। পরে দেখি যমের দরবারে অনেক লম্বা লাইন, যখন আমার লাইন এসেছে, তখন যমরাজ বলল, একে এই কুমীরের পুকুরে ফেলে দাও। তখন দেখলাম সেই পুকুরে শুধু কুমির আর কুমির। আমি দেখে ভয় পেয়ে পরম দয়াল রামপাল গুরু মহারাজকে স্মরণ করি, সেই সময়েই আমাকে পুকুরে ফেলতে যাচ্ছিল, আমি জোরে বললাম, হে 'গুরুদেব আমায় বাঁচাও"। তখন দেখলাম আমার গুরুদেব, পরমাত্মা কবীর সাহেব রূপে এসে পুকুরে ফেলার আগেই ধরে নিলেন। তখন যমরাজ দন্ডবৎ প্রণাম করলেন কবীর সাহেবকে, পরে কবীর সাহেব রূপ থেকে আমার গুরুদেবের রূপে এসে আমাকে বললেন, এখন তুই কিসের জন্য ভয় পাচ্ছিস্ ? আমি তো তোর সাথেই আছি তখন আমার ভয় দূর হল। যমরাজ প্রণাম দন্ডবৎ করলো কবীর পরমেশ্বরকে।

(গুরুজীকে) তখন রামপাল মহারাজজীকে বললেন আপনি বার বার একে কেন বাঁচাচ্ছেন? এটা আমার খাদ্য আপনি একে আগেও দুইবার বাঁচিয়েছেন। তবে আমি আগেও একবার স্কুটর ও জীপের সামনা সামনি এসেগিয়েছিলাম আসার পরও আমাকে একটু আঁচও গুরুদেব লাগতে দেন নি আর দ্বিতীয়বার মটর সাইকেল স্লীপ হয়ে চলতি লরির তলায় পড়েও গিয়েছিলাম। গুরুদেব তখন আমাকে ট্রাকের (লরির) তলা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। তাই আমার গুরুদেব যমরাজাকে বললেন, এ আমায় আগের জন্মে ভক্তি করেছিল, এইজন্য আমি বাঁচিয়েছি পরে যমরাজ বলল, এবার কেন বাঁচালেন, যেহেতু এর নাম আমি ভেঙে দিয়ে রেখেছি। তারপর গুরুজী বললেন, এর নাম তুমি ভেঙে দিয়েছো। এতো ভঙ্গ করেনি, সেই জন্য আমি বাঁচিয়েছি, এ আমার ভক্তি করে। তখন কাল যমরাজ বলল, দেখব যে কি করে আপনি কতদিন একে বাঁচাতে পারেন? গুরুদেব বললেন পল পল এর সাথে আছি, তুমি এর কিছুই করতে পারবে না।

পুনরায় সৎগুরুদেব যমরাজকে বললেন, এবার যদি একে আবার কোন প্রকারে কষ্ট দিস্ তাহলে যেমন তুই লোককে কষ্ট দিস্, তার থেকে বেশী খারাপ হাল করব তোর। এরপরে সদগুরু আমায় যমের দরবার থেকে নীচে নিয়ে আসলেন, ও আমাকে বললেন তুই তাড়াতাড়ি পরিবারের সবাইকে বল যে কি, ভাল আছিস তাই আমি সবাইকে বললাম আমি একদম সুস্থ আমাকে ঘরে নিয়ে চলো। দুই ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন, আমরা এ রুগী ঠিক করতে পারব না। আমার পরিবারের লোক মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি পরিবারকে বললাম আমায় তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে চলো, আমি একদম সুস্থ আছি। যারা আমার সাথে ছিল সবাই আশ্চর্য হয়ে পড়েছে, কেননা তারা জানে যে আমি মারা গিয়েছিলাম, তাই ভাবল এর হোঁশ কি করে আসল? এ এই রকম কথা কি করে বলছে? তাই রাস্তা থেকেই ফিরিয়ে ঘরের দিকে আসতে লাগল, তখন সতগুরুকে, পদ্মফুলের মধ্যে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছিলাম। কখনও গুরুদেবের রূপে, কখনও কবির সাহেবের রূপে, আমার দিকে হাত হিলাতে হিলাতে চলে যেতে দেখলাম। আমি আবার জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম। আমার গুরুদেব আমার গুরুদেব বলে। আমার ঘরের লোক সব ঘাবরিয়ে গিয়েছিল, এ কিরকম করছে ঘরের লোক এই ভেবে তাই আবার মেডিকেলের দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল। তখন গুরুদেব আবার বললেন, ভক্ত এ তুই কি করছিস, তোকে আমি ঘরে যেতে বলেছি, তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যা। তাই আমি সবাইকে বললাম আমি ঠিক আছি। আমি গুরুদেবকে দেখছিলাম উনিই আমাকে ঘরে যেতে বলেছেন। আমাকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর যে যে ঘটনা হয়েছে, সব কথা পরিবারকে শুনিয়েছি, সবাই তো অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কি, কি করে মরা মানুষের জীবন ফিরে পায়। সৎগুরু রূপে পরমেশ্বর কিনা করতে পারেন? আজ সদগুরুর কৃপায় আবার নতুন জীবন পেয়েছি। একমাত্র সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই একই মালিক কবীর পরমেশ্বরের অবতার।

সৎ সাহেব

ভক্ত ওম প্রকাশ দাস
RZ-15 Block গলী নং - ২; মকসুদা
বাদ কলোনী, নজফগড়, নই দিল্লি।
মোবাইল নং -০৯৮১২১৬৬০০৮৮৮

।। পূর্ণ পরমাত্মা সাধককে ভয়ঙ্কর রোগ থেকে মুক্তি করে আয়ুও বাড়িয়েছেন।।

ভক্ত ডাঃ ওমপ্রকাশ হুড্ডা (C.M.O.) প্রমাণ

প্রমাণ ঋক্‌বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ১, ২ ও ৫ পরমেশ্বর বলেন যে, যদি কাউকে প্রত্যক্ষ না গুপ্ত ক্ষয় রোগ বা টি.বি. হয়ে যায় তাকেও ঠিক করে থাকি বা যদি কোনো রোগী ব্যক্তির প্রাণ শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। যার আয়ূ না থাকে, তার প্রাণ রক্ষা করি, এবং তার আয়ূ একশো বছর প্রদান করেও থাকি এবং সর্ব সুখ দিয়ে থাকি। মন্ত্র ৫-তে বলা হয়েছে, পুনর্জীবন প্রাপ্ত প্রাণী! তুই সর্ব ভাব দ্বারা আমার স্মরণ গ্রহণ কর। যদি পাপ কর্ম দন্ডের কারণ তোর চোখের দৃষ্টি সমাপ্ত হয়ে থাকে হলেও তা আমি তোকে পূর্ণ জীবন পর্যন্ত চোখে দৃষ্টি দান করব। তোর রোগ মুক্ত করে সর্ব অঙ্গ প্রদান করবো। আমাকেও প্রাপ্ত হবি এবং আমি তোর সঙ্গে মিলব (দেখা করব)

জম জৌরা জাসে ডরে মিটে কর্ম কি লেখ।
অদলী অদল কবীর হে, কুল কে সতগুরু এক।।

উপরোক্ত বাক্য আমার জীবনে পূর্ণ রূপে সত্য ঘটিত হয়েছে। আমি ডাঃ ওম প্রকাশ হুড্ডা C.M.O., M.B.B.S., M.S. (Eye Specialist) ১৮-এ সরকুলার রোড রোহতক নিবাসী, হরিয়ানা আমার মোবাইল নং ৯৮১৩০৪৫০৫০। আমার জন্ম ১২ ই এপ্রিল ১৯৫৩ ১৯৫৩ তে গ্রাম কিলোই জেলা রোহতকে হয়েছিল। আমার পড়াশুনা, ক্লাস ফাইভ থেকে বারোক্লাশ পর্যন্ত্য D.A.V. স্কুল ও D.V.D. কলেজ অমৃতসরেতে হয়েছিল। অমৃতসরে আমার বড় ভাই Libraria-র পদে D.A.V. স্কুলে কার্য্যরত ছিলেন। ওখানকার জানা শোনা লোক আমাকে মাষ্টারজী বলে ডাকতেন। আর আমাকে ছোট মাস্টারজী বলতেন। যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম, আমার এক মহাত্মা, যিনি কিনা দুরগ্যানা মন্দির অমৃতসরের সেবক ছিলেন, তিনি আমার হাতের রেখা দেখে বললেন, ছোট মাস্টারজী আপনি ডাক্তার হবেন, আর ৫০ বৎসর পর্যন্ত্য আপনার আয়ু আছে! তিনি এইকথা বলে দেওয়ার পর ভয় পেয়ে বললেন, ছোট বাচ্চাকে এ কথা বলে ভুল করেছি। কিন্তু তখন আমি ওই কথায় বেশী গুরুত্ব দিই নাই। তবে আমি বড় হয়ে ডাক্তারও হয়েছি এবং আমি M.B.B.S.ও M.S. (Specialist) ও P.G.I.M.S. রোহতকেই করেছি।

ঠিক পঞ্চাশ বছর যখন পূর্ণ হওয়ার কথা সে সময় ১০/১১ এপ্রিল ২০০৩ তে রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে আমার সপরিবার তখন রোহতকেই ছিলাম। আমার দুই হাতে যন্ত্রণা এবং বুকে অসহ্য যন্ত্রণা মনে হল যেন কেউ ভারি শিল (পাথর) দিয়ে বুকে চাপা দিয়েছে। চিকিৎসার জন্য P.G.I.M.S. তে নিয়ে যায়। এর আগে আমার কোনদিন ব্লাড প্রেসার ছিল না এবং সুগারেরও কোন রোগ ছিল না। ২৫-১২-১৯৯৯তে সতগুরু রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে নাম উপদেশ নেওয়া ছিল।

নাম নেওয়ার আগে ধুম্রপান অবশ্যই করতাম। ওখানে ওই সময়ের ডাক্তার কে আমি আমার পরিচয় দিলাম যে (H.C.M.S.I. (Group A) শ্রেণীতে আমি S.M.O.পদে আছি। (ওই সময় S.M.O.বর্তমানে C.M.O.) পরিচয় দেওয়ার পর ডাক্তার তাড়াতাড়ি উচিৎ নিরিক্ষণের পর চিকিৎসা শুরু করে দিলেন, আর Intensive Care Unit-তে শিফ্‌ট করা পর্যন্ত্য আমার সব কিছু গতিবিধি (স্মৃতি) জানা ছিল পরে কি হয়েছে? আমি জানি না। দেড়ঘণ্টা বাদ আমার মনে হল,

যমের দূতসব আমার চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর আমায় বলছে চলো তোমার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, তোমাকে নিতে এসেছি। আমি তাঁদের কিছু বলতে পারিনি, তখনই পূর্ণ পরমেশ্বর কবীর সাহেব আমার তত্ত্বদর্শী সতগুরু, মহারাজের রূপে আমার বেডের (বিছানার) পাশে প্রকট হলেন। এদিকে দেখলাম সেই যমদূতের চেহারা ভয়ানক ও শরীর নাদুস্ নুদুস, মহারাজকে দেখতেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

আমার সতগুরু দেব আশির্বাদ দিলেন ও বললেন যে কবীর পরমেশ্বর আপনার আয়ু নিজের তরফ থেকে (নিজের শক্তি থেকে) বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাহাতে আপনি আপনার ভক্তি পূরণ করতে পারেন এবং সতলোকে যেতে পারেন। আমি কেঁদে কেঁদে বললাম, মালিক আপনিই স্বয়ং পরমেশ্বর আছেন, আপনি এই দেহে লুকিয়ে আছেন পরমেশ্বরের ভক্তিই আপনিই করাচ্ছেন। আমি ভক্তি করার কে হই? এতটা বলতেই আমার চোখ খুলে যায় এবং চোখের জল বেয়েই পড়ছে, জল ছাড়া আর কিছুই নেই। তিন দিন পর আমাকে I.C.U. থেকে স্পেশাল ওয়ার্ড নিয়ে আসল তখন আমি উঠে হাঁটা শুরু এবং এক ডাক্তার দৌড়িয়ে এসে আমায় ধরে নিয়েছেন, আর বললেন আপনি কি করছেন? আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল চলতে মানা।

স্পেশাল ওয়ার্ডে শিফ্‌ট করার পর, ডাক্তার বলছেন আমরা একদম হয়রান ছিলাম যে কি ১০/১১ তারিখ রাতে আপনার E.C.G./B.P. ইত্যাদি রিপোর্টে বলছিল আপনি বাঁচবেন না, সকালে E.C.G. আদি ফির স্বাভাবিক শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি ২৫-১২-১৯৯৯ তে তত্ত্বদর্শী রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে নাম (দীক্ষা) গ্রহণ করেছিলাম। তার আগে ব্রহ্মা কুমারী, জৈনী, রাধা স্বামীর শিষ্য ছিলাম। তথা D.A.V. School/College-এর ছাত্র ছিলাম তাই আর্য সমাজের পুরো ছাপ আমার মধ্যে ছিল। গায়ত্রী মন্ত্রের জপ কয়েক লাখ বার করা হয়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে এক দেড়শো দেবদেবীর ফটো ছিল জলে ভাসিয়ে দিয়েছি এবং সব প্রকারের পূজা করা বন্ধ করে দিয়েছি। সতগুরু রামপাল মহারাজের আদেশানুসারে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব)-র ভক্তির সাথে গুরুদেবেরও শ্রদ্ধা ভক্তি শুরু করে দিয়েছি। কেননা সতগুরু বলেন যে কি —

এঁকৈ সাধৈ সব সধৈ সব জায়া।
মালী সীঁচে মূলকো ফলে ফুলে অঘায়ে।।

এক কবীর পরমেশ্বরের ভক্তিতে আরুঢ় হলে তাও আবার কেবল তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজের থেকে নাম নেওয়ার পর লাভ এই হয়েছে যে গুরুদেবের নিজের কোটা থেকে আমার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ভক্তি মার্গের জন্য সময় করে দিয়েছেন। এই কথা আমি ও আমার পরিবারের সদস্য মিলে P.G.I.M.S.-এর কার্য্যরত ডাক্তার ও স্টাফ সদস্যদের বলেছি তবে কিন্তু একথার মানে ওদের মগজে ঢোকেনি, তার কারণ হল, এই কথা সেই ব্যক্তিই বুঝবেন যার চ্যানেল পরমেশ্বর ON (খুলে) করে দিয়েছেন সেই ব্যক্তিরা বুঝবেন অন্যথা এই জ্ঞান বোঝা সম্ভব নয়।

যখন আমি ২৫-১২-১৯৯৯ তে তত্ত্বদর্শী রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম নিয়েছিলাম তখন আমি জানতাম না যে ইনিই ওই পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর সাহেব যিনি এই গুরুদেবের শরীর নিয়ে অবতার হয়েছেন। কিন্তু যখন আমার সহিত উপরোক্ত ঘটনাঘটিত হয়েছে, তখন আমি বুঝেছি বা বিশ্বাস করেছি —

মাঁসা ঘটে না তিল বঢ়ে, বিধনা লিখে জো লেখ।
“সাচা সৎগুরু মেট কর উপর মারে সেখ।।”

কবীর পরমেশ্বর সশরীর সন্ত রামপাল জী মহারাজের রূপে এসেছেন। যিনি সত্য সতগুরু আছেন আর বিধনা (ভাগ্য)-র পাপ কর্ম রূপী লেখাকে মিটিয়ে নিজের শক্তিতে নতুন করে ভাগ্য লেখেন।

।। ভক্তিমতি সুশীলার চোখ ঠিক হওয়া।।

এই প্রকার আমার ধর্মপত্নী শ্রী মতি সুশীলা হুড্ডার ৬-১২-২০০৪ তে ডান চোখ দিয়ে দুই দুটো জিনিষ দেখতে শুরু করে। P.G.I.M.S. রোহতকে সব টেস্ট M.R.I. এবং M.R.I. Angio graphy ইত্যাদি করানো তথা সবই বরিষ্ঠ ডাক্তারকে দেখানো হয়েছে চিকিৎসাও করিয়েছি কিন্তু কোন লাভ হয়নি। প্রাভভেট ডাক্তার ঈশ্বর সিং আদি ডাক্তারকে দেখিয়ে কোন লাভ হয়নি। এইসব আমার সদগুরুর আজ্ঞা নিয়েই করিয়েছিলাম। যখন ঔষধে কোন লাভ হয় নাই, তাই বুঝে আমি সতগুরুর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, হে পরমেশ্বর আপনি আয়ূ বাড়িয়ে দিতে পারেন, আপনার কাছে একি কঠিন? কৃপা করে আপনি আপনার সন্তানের উপর একটু কৃপা আরও করে দেন। সতগুরুদেব কৃপা করে সুশীলার মাথায় হাত রেখেছেন অমনি ওর ডান চোখে ঠিক আগের মতো সোজাসুজিই দেখতে লাগল, আর কোন বস্ত দুটো করে দেখায়নি। এখন ইনাকে পূর্ণ পরমাত্মা যিনি পাপ কর্ম জালিয়ে নষ্ট করনে বালা ভগবান বলবো না তো কি বলব? কৃপা করে পাঠক স্বয়ং পড়ে বিচার করে নির্ণয় নেবেন আর অতি শীঘ্র আপনারা আপনাদের মান-বড়াই ও শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে সাধনা পূজা ত্যাগ করে শাস্ত্রের মতানুসারে সতলোক আশ্রম বারবালা হরিয়ানাতে এসে, পরম পূজ্য সতগুরু রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যাণ করুণ ও পরিবারের সদস্যেরও কল্যান করান। ভক্তের জন্য ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে, যে যতশীঘ্র নাম নেবেন সে তত তাড়াতাড়িই ফল পাবেন এই আশা রাখি।

সৎ সাহেব প্রার্থী ভক্ত ডাঃ ওমপ্রকাশ হুড্ডা।

।। ত্রিতাপ জ্বালা একমাত্র পরমাত্মাই সমাপ্ত করতে পারেন।।

ভক্ত রামকুমার ঢাকা (Ex. Headmaster M.A.B.E.D.) র প্রমাণ

আমি রামকুমার ঢাকা “রিটায়র হেডমাস্টার দিল্লি (M.A.B.E.D.) গ্রাম সুন্ডানা, জেলা-রোহতক, বর্তমান ঠিকানা- আজাদ নগর রোহতক (মোবা- ৯৮১৩৮৪৪৭৪৭) নিবাসী। সন্ ১৯৯৬ থেকে আমার পত্নী ও দুই ছেলের এক ভয়ানক অসুখ ছিল। এই অসুখের কারণ এতই বিরক্ত হয়ে গিয়েছে, দুটো ছেলে বলেতো আমাদের কোনো দিন চাকরি হবে না, কারণ এই রোগে গলা বন্ধ হয়ে শ্বাস আসা বন্ধ হয়ে যেত। তখনই ডাক্তার নিয়ে আসতেন আর নেশার টিকা দিতেন পরন্ত রাত্রে ডিউটির উপর থাকলে তখন কোথায় নিয়ে যাব, খুবই মুশকিল হতো। অফিসারও আমাকে ডেকে নিতেন, আমি তাকে এই কথা শোনালে তিনি বলতেন, চিকিৎসা করান। যখন ঘরে থাকতাম তখন কখনও কখনও দুইবারও ডাক্তারকে ঘরে ডেকে আনতাম। কখনও কোনো ঘরের সদস্য বা কখনও কাহারও কাছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য যেতাম। তবে যে যেখানের

ঠিকানা দিত সেখানেই দৌড়ে যেতাম। উত্তরপ্রদেশ, করানা শামলী, খেখড়া, রাজস্থানে বালাজি, কখনও খাটু শাম, কখনও যন্ত্রমন্ত্র বালার কাছে, হরিয়ানায় তো কোন জায়গাই বাদ দিই নি। এইভাবে প্রায়ই তিনলাখ টাকা নষ্ট হয়ে যায়।

আমি নিঃস্ব হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার পত্নী আমায় একদিন বলল, আমার জীবন শেষ হতে চলেছে তাই ভক্ত সুভাষের ছেলে মহেন্দ্র পুলিশ বালা যে সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম (দীক্ষা) নিয়েছে, তার কাছ থেকে আমায় নাম (দীক্ষা) দিয়ে নিয়ে এসো। তখন আমি কাহারও কথা বিশ্বাস করতাম না। গুরু বানানোর কথা তো অনেক ছোট ভাবতাম। আমার পত্নীকে বলতাম তোর গুরুতো আমি। আমি এম.এ.বি.এড. করেছি, আমার থেকে বড় কোন গুরু হতে পারে? কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বিবশ করে দিয়েছে, তাই ওই স্বীকৃতিও একদিন পত্নীকে দিলাম বললাম যা গুরু করে নে। আমার পত্নীর ওজন ছিল ৮০ কিলো পরে মাত্র ৫০ কিলো হয়ে গিয়েছিল। উঠতে বসতে কষ্ট হত চলা তো দূরের কথা। আমি বললাম মরে তো যাবি, তবে এই আশাও পূর্ণ করে নে। এখন তোকে আমি কোন কিছুই মানা করব না। কেননা সন্ত রামপালজী থেকে নাম নেওয়ার জন্য, আমার ভাতিজা ২/৩ মাস পরে পরে এসে বুঝাতো, আর তার জ্যাঠিমাকে বলতো মরে যাওয়ার আগে একবার নাম নিয়েই পরে মরো।

আমি তখন বললাম, কোনো ডাক্তারও দেখাতে বাকী রাখিনি। বালাজি তান্ত্রিক এই ধরণের সবার কাছে গিয়েও কোনো লাভ হয়নি, এরাই যখন কিছু করতে পারেনি, তাহলে শুধু তোমার গুরুদেব নাম উপদেশ দিয়ে কি ঠিক করবে? খুব অসহ্য হওয়ার পরেই নাম উপদেশ নেবার জন্য ১৬ জানুয়ারী ২০০৩ এতে পাটিয়ে দিলাম, তবে সেখান থেকে নাম গ্রহণ করে আসার পথে আমার স্ত্রী হাতে করে আশ্রম থেকে একটা 'গহরী নজর গীতা' নামের পুস্তকও নিয়ে আসল। তবে এর পূর্বে যদি কেউ আশ্রমে যাবার কথা বলত, তখন সেই কথায় আমি খুব বিরোধিতা করতাম। তবে আশ্রম থেকে নাম নিয়ে আসার একমাসের মধ্যে আমার সংসারে যেন, প্রদ্বীপে তেল ঢাললে যেমন জ্বলে ওটে ঠিক সেই রূপ আমাদের সংসারের হাল হতে লাগল। আমার স্ত্রীর ওজন প্রতিমাসে তিনকিলো ওজন বাড়তে লাগল।

তখন আমার বড় ছেলেরও বিনা নাম (দীক্ষা) নিয়েই ভাল ঘুম আসতে লাগল। তাই সে তার স্ত্রীকেও নাম দিয়ে নিয়ে আসল। পরে আমি "গহরী নজর গীতা" পুস্তক পড়েছি তখন অনুভব করে গভীরে গিয়ে বুঝলাম, এইরকম জ্ঞান না পেয়েছি কোনদিন, না পড়েছি, না শুনেছি। পরে আমি ও ২০০৩ এপ্রিল মাসে নাম নিয়েছি। আজ ছোট বাচ্চা থেকে বড় সবাই গুরুদেবের কাছ থেকে নাম নিয়ে রেখেছে এবং খুব আনন্দেই আছি।

যখন এই রোগ শুরু হতো ঘরের সবার গা কেঁপে উঠত। লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকত, চাকরিতে বিবাদ, ডাক্তার লেগেই থাকত, মেডিকেল ইমারজেন্সিতে যাওয়া আসা লেগেই থাকত। আজ আমার ঘর স্বর্গের মত সমান, সতলোক যাওয়ার সবার ইচ্ছা। এক মাস আগে স্বপ্নতে পরমেশ্বর কবীর সাহেব গুড়গাঁও সেকটর ৫৭ তে প্লোট বুক করে গিয়েছিলেন, যখন ড্রা বের হয়েছে তো প্লোট নং ৫৭ ই সকালে সমাচার পত্রতে পড়ে দেখি, প্লোট নং অলোট হয়েছিল। আমার এখানে এমনই অসুখ বিসুখ ছিল হয়তো কেউ এত দুখী হয়তো হয় না, যেমন আমি

ছিলাম। এখন রামপাল মহারাজজীর কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করার পরে কয়েকদিনেই আমি সুখী হয়ে গিয়েছি।

আমার ঘরে জিন্দ (প্রেতাত্মা) প্রকট হয়ে বলছে, তোর আশ্রমে আমি যাই, সবকিছু দেখে আসি, কিন্তু কাঁচের মধ্যে আমি যাই না কেননা ওখানে বসে তোদের গুরু জী সতসঙ্গ করে, কেননা আমি সব কথা জানি, কারণ আমি যদি ওখানে যাই, তাহলে আমাকে পিটাই করবে। এইজন্য আমি বাইরে ফিরে আসি আর তুমি যদি কখনও তান্ত্রিকের কাছে যে বালাজি যেতে আমি তখন ভেতরে যেতাম না, বাইরেই থাকতাম তবে আমাকে কেউ বাঁধতে পারে না। আমার সাথীরা খুব ভীতু ছিল, তাই পালিয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি পালিয়ে যাব না। আমাকে মন্ত্র পড়ে ছেড়েছে, আমি তোর ঘরের আর তোর মেয়ের ঘরের ইটকে ইট দিয়ে বাজিয়ে দেব। আমাকে এই প্রকার মন্ত্র পড়ে ছাড়া হয়েছে, একের পর একের বিনাশের নম্বর আসবে তাতে তোরা যেখানেই পালাস না কেন? কিছুদিন পর ওই প্রেত ঘরে প্রকট হল, আর জোরে জোরে বলছে, তোর গুরু রামপাল কোথায়? কোথায় তোর মালিক কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর)? প্রেত যখনই প্রকট হতো মানুষের মতো কথা বলতো,তখনই আমার পত্নী ঘরে পূজা স্থলে গুরুদেবের কাছে দন্ডবৎ করলো, তখনই প্রেতের পিটাই শুরু হতে লাগল। আর সে বলছে কেমন পিটাই করছো? এখনই এই দেয়াল ভেঙে দেব। পরে খুব পিটাই খেয়ে বলছে, হায় এতো দেওয়াল না যেন লোহার জাল। এ মালিক রামপাল কোথা থেকে আসল? এ তো বরবালাতে সতসঙ্গ করতে গিয়েছিল। (ওই দিন রামপাল মহারাজজী বরবালা জেলা হিসার সতসঙ্গে করতে গিয়েছিলেন) আমি তো সেই জন্যই এসেছিলাম, যে, মালিক এখানে নেই।

আবার জিন বলছে আমি তো এসেছিলাম তোর ইট বাজাতে কিন্তু আমারই ইট বেজে গেল। আমাকে তো নরকে ফেলে দেবে, আমি চলে যাবো, আমাকে ছাড়িয়ে নিও। করৌথাতে সন্ত রামপাল বসে আছে, ওকে মানুষ ভেবো না পূর্ণ পরমাত্মা এসেছেন, একে ছেড়ে দিও না। নয়তো পরে পছতানো হবে। এইরকমই খেড়া কচনীবালা পন্ডিতও এইরকম চিকিৎসা করতো।

যখন আমি খেড়া কচনীতে গিয়েছিলাম তখন সেই পন্ডিতও বলেছিল তোমার পরিবার একের পর এক শেষ হয়ে যাবে। তখন আমি মানিনি, তবে শাহপুরেই ভায়ের মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পন্ডিতের বাড়ীও শাহপুরেই। পরে পন্ডিতজী আমার ভাতিজি (ভাইজির) শ্বশুরকে ডেকে বলল, রোহতক জেলার যে আপনার ছেলের শ্বশুর তার ঘরে খতরনাক (ভয়ানক অসুখ) অসুখ সেই রোগে সারা পরিবার নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে এখানে নিয়ে এসো তাই মেয়ের (ভাইজির) শ্বশুড় আমার জামাইকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। পরে জামাইয়ের সাথে তাদের গ্রামের সেই পন্ডিতের কাছে গেলাম, কিন্তু চিকিৎসা খুব কঠিন, কারণ এক মুসলমানে এই করে ছেড়ে রেখেছিল। তবে প্রেতের আসার একটা সময় আছে, পাঁচ পাঁচ বার ওই পন্ডিত চৌকি দিত। এক এককে নীচে নামিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিত। এই কার্য্যক্রম চার বছর পর্যন্ত্য করেছে পরে তার দ্বারা আর হয় নি।

পরে বহুতাবালা গ্রামে আরেক তান্ত্রিকের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বালাজিতে নিয়ে গিয়েছিল। না ওই তান্ত্রিকের কাবুতে প্রেত এসেছে, না ওই মন্দিরের কাবুতে এসেছে তিনি আমাকে

বলেছিল আমি কেটে দিতে পারব। কিন্তু শনি মঙ্গল বারে একটা টাইমে ওই প্রেত আসত, তাই ওকে চৌকি দিতে দিতে তান্ত্রিকও হয়রান হয়ে হাত উচুঁ করে দিয়েছে। কেননা পাহারা দেওয়ার সময় হলে, আমার কাছেও খবর এসে যেত যে রাত ৯ থেকে ২ পর্যন্ত্য আগুন জ্বালাবে, জলের ঘটি ও লাঠি নিয়ে জেগে থাকবে। এই কর্ম ১৯৯৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত্য চলেছে। বহুতাবালা তান্ত্রিকের যখন চৌকি দেওয়া সময় হয়েছে তখন তার কাছে এক চিঠি আসে, তাতে লেখা আছে তুই মাঝখান থেকে সরে যা, নয়তো তোরও রক্ষা নেই, তোকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব তাই সে আমাদের কাছে মানা করে দিল। আমি দিনে দিল্লিতে চাকরিতে যেতাম আর রাত্রে পাহারা দিতাম। কখনও রাত্রে ডাক্তারকে ডেকে আনতাম। আমার দশা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি উপরের কাজের চাপ থেকে ও পরিবারের অবস্থা দেখে অসহ্য হয়ে উঠেছিলাম। কাউকে বললে মজা করতো, কেউ সাথ দেয়নি। অনেক টাকা কড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আমার পত্নী চাঁদকৌরের থাইরাইড হয়েছিল। জানুয়ারী ২০০৩ তে ডাঃ ও.পি. গুপ্তা থাইরাইডের জন্য তিমারপুর, দিল্লির হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য মার্ক করা হয়েছিল। পরে আমি ওখানে না গিয়ে মেডিকেলে ডাঃ চুগ এর স্পেশালিষ্ট ছিল, তার দ্বারা চিকিৎসা করালাম। তিনি বললেন সারা জীবন ঔষধ খেয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন নাম নেওয়ার পর আর ঔষধ খেতে হয় না। আমি ডাক্তার চুগকে দিয়ে চেকাপ করিয়েছি, তিনি অবাক হয়ে বললেন, এটা কি করে সম্ভব? তখন তাকে ঘটনা সত্যি বললাম।

এখন আমার পত্নী আমার ছেলেরা বন্দী ছোড়ের কৃপায় ঠিকঠাক। বড় ছেলের নাম সুরেন্দ্রকুমার, ছোট ছেলের নাম মনোজকুমার। দুজনেই হরিয়ানা পুলিশের চাকরি করে। ওই দুইজনই প্রেতের গ্রস্থ ছিল। অনেকবার এই দুজনকেও হয়রান করেছিল। নাম নেওয়ার পর সব ভাল। পরমাত্মা কবীরই ওদের আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

তত্ত্বদর্শী সতগুরু রামপাল মহারাজজী আমাদের জন্যই অবতারিত হয়েছেন। কেননা যে ঘরে দুই ছেলে চাকরি করে আর তাদের উপর জিন ভূত থাকে তাদের কি জীবন? যে লোকেদের সতলোক বারবালা আশ্রমের জ্ঞান নেই, তারা আজও অন্ধকারে রয়েছে। কেননা পড়ার জন্য পরমেশ্বর দিমাগ (ব্রেন) দিয়েছেন পড়েন ও ভাবেন বাস্তবিক কোনটা? আমার পরিবার বর্বাদ হয়ে গিয়েছিল। যখন আমার স্ত্রী ও দুই ছেলে ঠিক হয়ে গিয়েছিল তখন আমি নিজেকে সতগুরু সন্ত রামপালজীর চরণে আমায় সমর্পণ করে দিয়েছি। আমার কিছুই নাই সব মালিকের দান। এই তন মন ধন সবই গুরুজির চরণে সমর্পণ করলাম। আমার মেয়ে ও জামাই ও নাম নিয়েছে তাহার কাছ থেকে আজ আমার মেয়ের ঘরও স্বর্গ। জামাই মদ খেত, তাও ছেড়ে দিয়েছে। মেয়ের প্রমোসন, প্লোট মকান কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং সবাই সুখী।

সন্ ২০০৩ তে বন্দী ছোড় গুরু রামপালজী মহারাজ, আমাদের পাপকর্ম রূপী শুকনো ঘাসের ঢিবিকে সতনাম রূপী আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে দিয়েছেন। না কোন তাবিজ না কোনো গ্রহের পাথর ব্যাস্ কেবল মাত্র বন্দী ছোড়ের মন্ত্র জপ মাত্রই সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। মন্ত্র তো ভগবানকে পাওয়া, তার কাছে যাওয়া পরম আনন্দে তার দর্শন করা এবং সব বন্ধন থেকে মুক্ত কর, এই মোক্ষ আর পরিবারের সুখ শান্তি মন্ত্রের সাথে এক্সট্রা অর্থাৎ কবীর সাহেবের মন্ত্রের সাথে

এগুলো ফ্রি দিয়ে থাকেন। যদি এই রকম না হত তাহলে হাজার হাজার লোকের ভক্তি থেকে বিশ্বাসই উঠে যেত। এখন আমি খুব সুখী। এখন চাই যে যতই যাদু টোনা করুক না কেন, আমার কিছুই হবে না। কারণ আমি বন্দি ছোড় কবীর সাহেবের হাঁস তার চরণে আছি। প্রথমে আমি এসব পাখন্ড বা ধোখাধারী (ঠকানো) ভাবতাম। যখন একের পর এক সবাইকে ডাক্তারের কাছে নিতাম একবারে অসহ্য হয়ে যেতাম, যেমন অসুখ তেমন পয়সা খরচ। পরে আমার চোখ খুলেছে তাই বুঝলাম যে বাস্তবেই আমরা কালের জালে ফেঁসে আছি, এখানে কোন শান্তি কাল (ব্রহ্ম) দিতে পারে না। ভগবান ছাড়া এ সুখ আর কে দিতে পারে? এই ভূত প্রেত অনেকে বিশ্বাস করে না। তবে এটা বাস্তব সত্য কথা কারণ যারা এর পাল্লায় পড়ে, তারাই এর অনুভব করতে পারে। এইজন্য আমার ভক্ত সমাজের কাছে অনুরোধ যে আপনিও আপনার সমস্ত দুঃখ কষ্ট গুরুদেবের কাছে এসে এবং তার চরণে ঠাই পেলেই সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। গুরুদেবের কাছে মুফত (বিনা মূল্যে) নাম নিয়ে মানুষ জীবন ধন্য করুন।

এই উপরোক্ত কয়েকজন ভক্ত আত্মাদের আত্মকথা শুনলেন, এই রকমের হাজার ও লাভ ভক্তরা আছে, যারা তাদের আত্মকথা পুস্তকে লেখাতে চান, কিন্তু এইখানে সময় ও স্থানের অভাবে কেবল কয়েকটা আত্মকথা দিতে পেরেছি। যদি সকল ভক্তদের আত্মকথা লিখতে বসি তাহলে, অনেক পুস্তক ছাপাতে হবে বা ছেপে যাবে, এইজন্য সমস্ত ভক্ত-আত্মাদের বলি যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য ইশারাতেই অনেক বুঝে নেন।

ভক্তির মধ্যেও ভেদ ঃ- ভক্তি ভক্তির মধ্যেও অনেক রকমের ভেদ আছে। আপনারা যে কোনো দেব-দেবীর ভক্তি করেন না কেন, তার কিছুটা ফল আপনারা অবশ্যই পাবেন, তবে সেই ফলটা আপনাদের নাশবাদ অর্থাৎ চিরস্থায়ী নয় কারণ এই কালের (ব্রহ্মের রাজ্যে) সুখের পরে দুঃখ, এবং দুঃকের পরে সুখ হয়। এই সুখকে চিরকালের ক্ষন্য সুখ বা অবিনাশী সুখ বলা যায় না। কারণ যত সময় পাপ কর্ম সমাপ্ত না হয়ে, মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারবে, ততক্ষণ পরম শাশ্বতধাম (সতলোক) ও চিরস্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হবে না। এই পাপ কর্ম সমাপ্ত না হলে, বার বার জন্ম নিতে হবে। অতএব চুরাশী লাখ পশু যোনী ভেদ করার পরে যে মানব জন্ম পাওয়া যায় এটা কেবল পরমেশ্বরের ভক্তি করে তোকে প্রাপ্তি করার জন্য হয়ে থাকে। মুক্তি তো কেবল পূর্ণ সন্তের (পূর্ণ গুরুর) শরণে গিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ গুরুর কাছ থেকে নাম ও উপদেশ গ্রহণ করে, ভক্তি করলেই হবে অন্যথা হবে না।

‘এ সংসার সমঝদা নহী, কহন্দা শাম দুপুরণু।
গরীবদাস এ বক্ত জাত হে, চরাবোগে ইস পহরেণু।।’

প্রার্থী —

হেডমাষ্টার রামকুমার (এম, এ, বি, এড্)



।। কবীর পরমেশ্বরের সঙ্গে কাল (ব্রহ্মের)-র কথাবার্তা ।।

যখন পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছিলেন এবং পরে নিজের লোকে (সত লোকে) গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। তার পরে আমরা সব লোক কালের ব্রহ্মাণ্ডে থেকে, যেমন কর্ম করছিলাম তারই কর্মদন্ড এখন ভোগ করছি। সেইজন্য আমরা দুঃখী হয়ে। সুখ শান্তি খোঁজ করতে থাকি। আজ আমরা পরমেশ্বরের সত্য খোঁজ পেয়েছি। তার বাসস্থানেরও সন্ধান পেয়েছি। আগে মহাঋষিরাও ভগবানের বাসস্থানের সন্ধান পায়নি। কারণ কাল (ব্রহ্ম) সন্ধান দেয় নি। কারণ কাল ব্রহ্ম আর প্রকৃতি (মায়া)-র ছলে যেমন তেমন করে কিছু সিদ্ধি প্রাপ্তি করিয়ে ঋষি ও দেবতাদের ভুলিয়ে রেখেছে। দেবতারা যখন কালের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থেকে পরমেশ্বরের সন্ধান পায়নি তাহলে ঋষিরা বা আমাদের মত সাধারণ মানবকে কে সেই পরমেশ্বরের সন্ধান দেবে? তাই পরমেশ্বর নিজে অবতারিত হয়ে নিজের ঠিকানা নিজেই দিতে এসেছেন। অতএব আজ সেই পরমেশ্বরের ঠিকানা পেয়ে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি, বা খুব পশচাতাম করছি। ওখানে যেতে হলে ভক্তির প্রয়োজন তাই ভক্তি করছি। কোন কোন ব্যক্তি বা আগের ঋষিরা ৪ (চার) বেদ মুখে মুখস্থ করে বা উগ্রতপ করে যজ্ঞ সমাধি ক্রিয়া করত কিন্তু সত লোকে যেতে পারেনি। কারণ উপরোক্ত নিয়ম বিধি করলে (রাজা মহারাজা মন্ত্রী-প্রধান মন্ত্রি) বড় ব্যাপারী, উদ্যোগপতি, বড় অধিকারী, দেব মহাদেব, স্বর্গ মহাস্বর্গ আদি লাভ করে, আবার ফিরে চুরাশী লক্ষ ভোগ করতে হয়। বার বার যোনিতে ঘোরার ভোগার পরে যখন সাধনার মাধ্যমে জানতে পারে যে এই সব যোনিতে ঘুরে কোনদিন মোক্ষ লাভ হবে না। তাই পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, হে পরমেশ্বর হে দয়ালু তুমি আমাকে আপন ঘরের সন্ধান দাও। নিজের ঘরের রাস্তা দেখাও। আমি হৃদয় থেকে তোমায় ভক্তি করছি। তুমি আমায় দর্শন কেন দেও না?

এই উপরোক্ত কয়েকজন ভক্ত আত্মাদের আত্মকথা শুনলেন, এই রকমের হাজার ও লাখ ভক্তরা আছে, যারা তাদের আত্মকথা পুস্তকে লেখাতে চান, তিন্তু এইখানে সময় ও স্থানের অভাবে কেবল কয়েকটা আত্মকথা দিতে পেরেছি। যদি সকল ভক্তদের আত্মকথা লিখতে বসি তাহলে, অনেক পুস্তক ছাপাতে হবে বা ছেপে যাবে, এইজন্য সমস্ত ভক্ত আত্মাদের বলি যে,বুদ্ধি মান ব্যক্তিদের জন্য ইশারাতেই অনেক বুঝে নেন।

ভক্তির মধ্যেও ভেদ ঃ— ভক্তি ভক্তির মধ্যেও অনেক রকমের ভেদ আছে। আপনারা যে কোনো দেব-দেবীর ভক্তি করেন না কেন, তার কিছুটা ফল আপনারা অবশ্যই পাবেন, তবে সেই ফলটা আপনাদের নাশবাদ অর্থাৎ চিরস্থায়ী নয় কারণ এই কালের (ব্রহ্মের রাজ্যে) সুখের পরে দুঃখ, এবং দুঃখের পরে সুখ হয়। এই সুখকে চিরকালের জন্য সুখ বা অবিনাশী সুখ বলা যায় না। কারণ যত সময় পাপ কর্ম সমাপ্ত না হয়ে, মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারবে, ততক্ষণ পরম শাশ্বতধাম (সতলোক) ও চিরস্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হবে না। এই পাপ কর্ম সমাপ্ত না হলে, বার বার জন্ম নিতে হবে। অতএব চুরাশী লাখ পশু যোনী ভেদ করার পরে যে মানব জন্ম পাওয়া যায় এটা কেবল পরমেশ্বরের ভক্তি করে তাকে প্রাপ্তি করার জন্য হয়ে থাকে। মুক্তি তো কেবল পূর্ণ সন্তের (পূর্ণ গুরুর) শরণে গিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ গুরুর কাছ থেকে নাম ও উপদেশ গ্রহণ করে, ভক্তি করলেই হবে অন্যথা হবে না।

'এ সংসার সমঝদা নহী, কহন্দা শাম দুপুরনু।
গরীব দাস ও বক্ত জাত হে, চরাবোগে ইস পহরেণু।।'

এই বৃত্তান্ত কবির সাহেব ধর্মদাসকে যখন বলছিলেন যে, ধর্মদাস! এই সমস্ত জীবদের ডাক (মিনতী) শুনে আমি, নিজের সতলোক থেকে জগজিতের রূপ বানিয়ে কালের লোকে (ব্রহ্মাণ্ডে) এসেছিলাম। এই একুশ ব্রহ্মাণ্ডেতে তখন কাল (ব্রহ্ম) জীবদের ভেজে সুক্ষ্ম শরীর থেকে ময়লা বের করছিল, তপ্তশিলা থেকে। এই একুশ নম্বর ব্রহ্মান্ড হল কালের আপন ঘর এখানের তপ্ত শিলায় ভেজেই জীবদের খায়, প্রত্যেকদিনে এক লাভ জীব খেতে হয় এবং এক লাখ পচিঁশ হাজার জীবকে উৎপন্ন করতে হয়। যখন আমি এই কালের একুশ ব্রহ্মান্ডে আসতেই, এই জীবেদের জ্বলন সমাপ্ত হয়ে গেল। তারা আমাকে দেখে বলল হে পুরুষ! আপনি কে? আপনার দর্শন হওয়ামাত্রই, আমাদের বড় সুখ ও শান্তির আভাস হচ্ছে। আমি বললাম, আমি পাড়ব্রহ্ম পরমেশ্বর কবীর আছি। তোমরা সবাই অর্থাৎ জীবাত্মারা, আমার লোক (ধাম) থেকে এসে এই কাল ব্রহ্ম লোকে ফেঁসে গিয়েছ। এই কাল রোজ এক লাখ মানবের সুক্ষ শরীর থেকে গন্ধ ময়লা বের করে খাওয়ার পরে নানা প্রকার যোনীতে দন্ড ভোগার জন্য ছেড়ে দেয়। আমি তাদের একথাও বলেছিলাম যে, কালের এই সকল ব্রহ্মান্ড, তিনবার ভক্তি করে আমার কাছ থেকে প্রাপ্ত করেছিল। এই জায়গার সমস্ত বস্তুর প্রয়োগ করছিলে বা সকলে যে করছে এই সব আমি কাল ব্রহ্মকে দিয়েছি তার জন্য এই সমস্ত এখন কালের, তোমরা সবাই এখানে ঘুরতে এসেছিল। সেই জন্য এখন তোমাদের উপর কাল ব্রহ্মের বেশী পরিমানে ঋণ হয়ে গিয়েছে আর সেই ঋণ আমার সত্যনামের জপ ছাড়া পরিশোধ হবে না।

যতক্ষণ তোমাদের এই ঋণ মুক্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত্য এই কাল ব্রহ্মের জালেই ফেঁসে থাকতে হবে। তার জন্য তোমাদের আমার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিতে হবে। তারপর আমি তোমাদের ছাড়িয়ে নেব। আমি এই কথা তাদের (জীবদের) সাথে বলছিলাম এমন সময় হঠাৎ কাল ব্রহ্ম এসে উপস্থিত হল। কাল ব্রহ্ম ক্রোধিত হয়ে আমার উপর হামলা করতে চাইল, তখন আমি আমার শব্দ শক্তি দিয়ে ওকে মুর্ছিত (বেঁহুশ) করে দিলাম। পরে তার কিছু সময় পর ওর হোঁশ আসতেই, আমার চরণে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল;আর বলল আপনি আমার থেকে বড়, আমার উপর দয়া করুন, আর এই কথা বলুন যে আপনি আমার লোকে কি করতে এসেছেন? তখন আমি বললাম, কিছু জীব আত্মারা ভক্তি করে নিজের ঘর সতলোকে ফিরে যেতে চাইছে। সতভক্তির মার্গ (রাস্তা) এদের জানা নেই। তাই আমি ওদের সতভক্তির মার্গ বলার জন্য ও তোর ভেদ (মুখোশ) পরিচয় দেওয়ার জন্য এসেছি, যে কি তুই কাল একলাখ জীবের আহার করিস আর সোয়া লাখ জীবের উৎপন্ন করিস;এবং তুই আসল ভগবান হয়ে বসে আছিস। আমি এদের বলে দেব যে, তোরা যাকে ভগবান মানছিস, এ ভগবান নয় কাল আছে। এই শুনেই কাল বলল, যদি সব জীব ফিরে সতলোকে চলে যায়, তাহলে আমি কি ভোজন করব? আমি ক্ষিদেতে মরে যাব, আপনার কাছে আমার প্রার্থনা যে, তিন যুগে জীব কম নিয়ে যাবেন, আর সবাইকে আমার পরিচয় (ভেদ) বলবেন না, যে আমিই কাল তাই সবাই কে খাই। যখন কলিযুগ আসবে তখন যত ইচ্ছা তত জীব নিয়ে যাবেন। এই বচন কাল আমার কাছ থেকে নিয়ে ছিল। কবীর সাহেব ধর্ম দাসকে

আরও শোনালেন, সতযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগেও আমি এসেছিলাম। অনেক জীবকে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু কালের ভেদ (পরিচয়) কাউকে বলিনি। তাই আমি আজ কলিযুগে এসেছি, এবং কালের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে, কাল ব্রহ্ম আমাকে বলল এখন আপনি যত জোর লাগান না কেন, আপনার কথা কেউ শুনবে না। প্রথমতঃ তো আমি জীবকে ভক্তির লায়ক থাকতে দিই না, তাদের বিড়ি , সিগারেট, সিনেমা, মদ, মাংস, বেশ্যাগমন, আদি দুর্ব্যসন (নেশা)-য় মাতিয়ে রেখেছি, এত লোভ লালচ সুখ আনন্দে ভরিয়ে রেখেছি এইসবের মাধ্যমে থেকে তারা সুখ উপভোগ করছে, তাদেরকে সন্তানের মায়ায় জড়িয়ে রেখেছি যাতে আমার ব্রহ্মাণ্ডের মায়ায় জালের মধ্যেই থাকে, নানা দেবী-দেবতার রূপে তাদের মনের বাসনা পূর্ণ করছি, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে পূজা পাঠ করাচ্ছি। এইভাবে তাদের খারাপ করে রেখেছি আর দ্বিতীয় কথা যে, যখন আপনি আপনার জ্ঞান এই কলিযুগে দিয়ে চলে যাবেন সতলোকে, তারপরে আমি (কাল) আমার দূত পাঠিয়ে নানা পন্থ (নানা ধর্মের) মাধ্যমে লড়াই বাধিয়ে রাখব, বারো পন্থ বানিয়ে লোককে ভ্রমিত করবো, তারা মহিমা সতলোকের করবে, নাম আমার নেবে, তবে এই বারো পন্থ সবার সাথে মিল জুল খাবে, কিন্তু তাদের সব সময় বিবাদে জড়িয়ে রাখব। যার কারণে আমার ভোজনের ব্যবস্থা হয়ে থাকবে। এই কথা শুনে কবির সাহেব বললেন, তুমি তোমার চেষ্টা চালাও আর আমি সতমার্গের (সৎ পথের) কথা বলেই ফিরে যাব, আর যে আমার জ্ঞান শুনবে সে তোর ফাঁদে পড়তে চাইবে না। সতগুরু কবীর সাহেব বললেন, নিরঞ্জন! যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে, তোর সারা খেল, এক সেকেন্ডের মধ্যে শেষ (সমাপ্ত) করতে পারি, কিন্তু এই রকম করলে আমার বচন ভঙ্গ হয়ে যাবে। এই ভেবে আমার প্রিয় হাঁস (আত্মা)কে যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই ও শব্দের বল প্রদান করেই সতলোকে নিয়ে যাব। আর বললেন —

সুনো ধর্ম রায়া, হম সংখো হংসা পদ পরসায়া।
জিন লিন্হা হমরা প্রবানা, সো হংসা হম কিয়ে অমানা।।

।। পবিত্র কবীর সাগর গ্রন্থে, জীবকে ভুলভুলাইয়া রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং নিজের ক্ষিদে মেটানোর জন্য নানা নানা ষড়যন্ত্রের বর্ণনা।।

দ্বাদশ পন্থ করু মে সাজা, নাম তোম হারা লেকরু অবাজা।
দ্বাদশ যম সংসার পঠহো, নাম তুমহারা পন্থ চলৈহো।।
প্রথম দূত মম প্রগটে যাই, পিছে অংশ তোমহারা আই।
যহি বিধি জীবন কো ভ্রমাউ, পুরুষ নাম জীবন সমঝাউ।।
দ্বাদশ পন্থ নাম জো লৈহে, সো হমরে মুখ আন সমৈ হে।
কহা তুমহারা জীব নহি মানে, হমারে ওর হই বাদ বখানে।।
মে দৃঢ় ফন্দা রচি বনাই, জামৈ জিব রহে উরঝাই।
দেবল দেব পাষাণ পূজায়, তীর্থ ব্রত জপ তপ মন লাই।।
যজ্ঞ হোম অরু নেম অচারা, ওর অনেক ফন্দ মে ডারা।
জো জ্ঞানী জায়ো সংসারা, জীব ন মানৈ কহা তুমহারা।।

।। সতগুরুর বচন।।

জ্ঞানী কহে শুন অন্যায়ী, কাটো ফন্দ জীব লে যাই।।
জেতিক ফন্দ তুম রচে বিচারী, সত্য সবদ তে সবৈ বিন্ডারী।।
জৌন জীব হম শব্দ দৃঢ়াবে;ফন্দ তুমহারা সকল মুকাবৈ।।
চৌকা কর প্রবানা পাই, পুরুষ নাম তিহি দেউ চিহ্নাই।।
তাকে নিকট কাল নহী আবৈ, সন্ধি দেখি তাকহ্ সির নাবৈ।।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে সিদ্ধ হয় যে, অনেক পন্থ চলে এসেছে, যার কাছে (পাশে) কবীর সাহেব দ্বারা বলা সতভক্তির মার্গ (পথ) নেই, এরা সব কালের ভক্ত (কালের প্রেবিত হওয়া)। অতএব বুদ্ধিমান বিচার-বিবেচনা করেই সতমার্গ বেছে নেবে, কেননা মানব জন্ম দূর্লভ জন্ম বার বার আসে না। কবীর সাহেব বলেন —

মানব জন্ম দূর্লভ জন্ম, মিলে না বারংবার।
তরুবর সে পত্তা টুট গিরে, বহুর ল লগতা ডারি।।



।। বিশ্ব বিজেতা সন্ত (গুরু)।।

(সন্ত রাম পাল মহারাজজীর অধ্যক্ষতাতে হিন্দুস্থান বিশ্ব ধর্ম গুরু রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে)

-ঃ সন্ত রামপাল মহারাজের সম্পর্কে নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্য বাণী ঃ-

ফ্রেঞ্চ (ফ্রান্স) দেশের নাস্ত্রেদমস নামের ভবিষ্যবক্তা সন্ (ইং.) ১৫৫৫ তে এক হাজার শ্লোকের মধ্যে ভবিষ্যতের সাংকেতিক সত্য ভবিষ্যবাণী লিখেছেন। একশো-একশো করে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। যার মধ্যে এতদিন পর্যন্ত্য সর্ব সিদ্ধ (প্রমান) সত্য হয়েছে। হিন্দুস্থানের মধ্যে সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যবাণী ঃ-

১. ভারতের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী প্রভাবশালী ও কুশল হবে। (এই সংকেত স্বর্গীয় শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীকে করা হয়েছিল) এবং তার মৃত্যু নিকটতম রক্ষক দ্বারা হবে, লেখা ছিল, যা সত্য প্রমাণ হয়েছে।।

২. তারপরে তার পুত্র তার উত্তরাধিকারী হবে, এবং খুব কম সময়ে রাজ্য করবে ও আকস্মিক মৃত্যুর প্রাপ্তি হবে, যাহা সতও সিদ্ধ হয়েছে। (এ সংকেত পূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্বঃ রাজীব গান্ধির)।

৩. সন্ত রামপাল জী মহারাজের বিষয়ে ভবিষ্যবাণী নাস্ত্রেদমস দ্বারা যে, বিস্তারপূর্বক লিখেছেন।

নাস্ত্রেদমস নিজের ভবিষ্যবাণীতে লিখেছেন যে, পাঁচ শতকের অন্তে (শেষের দিকে) আর ছয় শতকের প্রারম্ভে (প্রথমদিকে) আজ অর্থাৎ ইং সাল ১৫৫৫ থেকে ঠিক ৪৫০ বছর পরে অতএব২০০৬-এতে এক হিন্দু সত গুরু (শায়রন) প্রকট হবে এবং সারা বিশ্বে (জগতে) তাহারই চর্চা হবে, সেই সময় ওই হিন্দু ধার্মিক শায়রণের (ধর্মগুরুর) আয়ূ হবে ৫০ আর ৬০ বছরের মধ্যে। পরমেশ্বর ১৫৫৫ সালে নাস্ত্রেদমসকে তত্ত্বদশী সন্ত রামপাল মহারাজের অর্ধেক বয়সের (৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যের) শরীরের সন্তকে সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন, চলচিত্রের পর্দার মত ঘটনাকে দেখিয়েছিলেন আর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নাস্ত্রেদমস ১৬ শতককের প্রথম শতক বলেছিলেন, এই প্রকার পাঁচ শতক ২০ বী সদী হয়ে থাকে। নাস্ত্রেদমস বলেছিলেন যে, সেই ধার্মিক হিন্দু নেতা (শায়রন) পঞ্চম শতকের অন্তের (শেষের) বছরের দিকে অর্থাৎ ইং ১৯৯৯-তে ঘরে ঘরে সৎসঙ্গ কে ত্যাগ করে অর্থাৎ নিজের এরিয়া থেকে বেড়িয়ে আসবে এবং নিজের অনুযায়ীদেরকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তিমার্গের কথা বলবেন।

ওই মহান সন্তের (শায়রণের) বলা মার্গের অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভৌতিক লাভ অনুযায়ীরা পাবেন। ওই তত্ত্বদৃষ্টা হিন্দু সন্তের (শায়রনের) দ্বারা বলা শাস্ত্রপ্রমাণিত তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝে পরমাত্মা চাওয়া বা প্রাপ্তির ইচ্ছা শ্রদ্ধালুব্যক্তি এমন অচম্ভিত হবে; যেমন কেউ গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে ঠিক এই প্রকার। ওই তত্ত্বদৃষ্টা হিন্দু সন্তের দ্বারা সন্ ১৯৯৯ তে চালানো আধ্যাত্মিক ক্রান্তি ২০০৬ সাল পর্যন্ত্য চলবে। ততসময়ে বহু সংখ্যাতে পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছাবালা ভক্তরা, তত্ত্বজ্ঞান বুঝে অনুযায়ী হয়ে সুখী হয়ে যাবে। পরে ওই স্থান অর্থাৎ নিজের এরিয়া ছাড়াও

বাইরে বেরিয়ে যাবে। তখনই ২০০৬ সাল থেকে স্বর্ণ যুগ আরম্ভ হবে।

নোট ঃ- প্রিয় পাঠকগণ, কৃপা করে পড়েন নীম্ন বাণী এটাও নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণী। যে বিষয়ে মাদ্রাসের এক জ্যোতিষশাস্ত্রী (K.S. Krishna Murti) বলেছেন যে, নাস্ত্রেদমস দ্বারা ১৫৫৫ সালে লেখা ভবিষ্যবাণীগুলোর যথার্থ অনুবাদ সন্ । ১৯৯৮ সালে মহারাষ্ট্রের এক জ্যোতিষ শাস্ত্রী করবে। ওই জ্যোতিষ নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণীর সাংকেতিক ভাষার স্পষ্টিকরণ করে তাহাতে লিখিত ভবিষ্যৎ ঘটনার অর্থ দিয়ে নিজের ভবিষ্য গ্রন্থ প্রকাশিত করবে। ওই জ্যোতিষশাস্ত্রী দ্বারা যথার্থ অনুবাদিত করা পুস্তক থেকে অনুবাদ কর্ত্তার শব্দতে পড়েন ঃ-

(১) (পৃষ্ঠা ৩২--৩৩ মধ্যে) ঃ- দাঁড়াও স্বর্ণযুগ (রামরাজ্য) আসছে। এক অর্ধেক বয়সের উদার অজোড় (যার জোড়া নেই) মহাসত্ত্বা অধিকারী শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে স্বর্ণ যুগ আনবে আর নিজের সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান করে, সঠিক (যথার্থ) ভক্তি মার্গের কথা বলে, সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্র বানাবে। তৎপশ্চাৎ ব্রহ্ম দেশ পাকিস্থান, বাংলা, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, তিববত (তিবেত), আফগানিস্থান, মলায়া আদি দেশে ঐ সন্তই সার্বভৌম ধার্মিক নেতা হবে। সত্তাধারী (লোভী ঘুষখোর গুন্ডাগিরী) নেতাদের উপর তার সত্তা হবে, ঐ নেতার (শায়রন) দুনিয়াকে অদ্ভুত মনে হবে, ব্যাস্ দেখতে থাকো।

(২) (পৃষ্ঠা ৪০র মধ্যে লেখা) ঃ- দাঁড়াও রামরাজ্য (স্বর্ণযুগ) আসছে। জুন ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত্য চলতে থাকা উৎক্রান্তিতে স্বর্ণযুগের উত্থান হবে। হিন্দুস্থানে উদয়হতে থাকা চলেছে তারনহার (ত্রানকর্ত্তা) শায়রন দুনিয়াতে সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রদান করবে। নাস্ত্রেদমস নিঃসন্দেহে বলেছে, প্রকট হতে আসা শায়রন (CHYREN) এখনও জ্ঞাত নহে, কিন্তু সে ক্রিশ্চন (খ্রীষ্টান) মুসলিম তো হবেই না। সে হিন্দু হবে, আর আমি নাস্ত্রেদমস তারজন্য বুক ঠুকে গর্ব করে বলেছি কেননা ওই দিব্য স্বতন্ত্র সূর্য শায়রনের উদয় হতেই, পূর্বের যত বিদ্যান নেতারা নিষ্প্রভ হয়ে তার সামনে নম্র হতে হবে। ওই হিন্দুস্থানী তত্ত্বদৃষ্টা সন্ত সবাইকে অভুতপূর্ব রাজ্য প্রদান করবে। তিনি সমান আইন (কায়দা) সমান নিয়ম বানাবে, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, ধনী গরীবের সমান অধিকার, জাতি ধর্মে কোন ভেদ রাখবে না, কাহারও কোন অন্যায় হতে দেবে না। ওই তত্ত্বদর্শী সন্তকে সর্ব জনতা বিশেষ সন্মান করবে। মাতা পিতা তো আদরণীয় হয়েই থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার আধারে ওই শায়রন (তত্ত্বদর্শী)-এর মাতা পিতা থেকে আলাদা স্থান হবে। নাস্ত্রেদমস স্বয়ং জিউ বংশের খ্রীষ্টান ধর্ম স্বীকার করেছিলেন ফ্রান্স দেশের নাগরিক তবুও সে নিঃসন্দেহে বুক ঠুকে বলেছিলেন ওই প্রকট হয়ে আসা সন্ত (শায়রন) কেবল হিন্দুই হবে।

(৩) (পৃষ্ঠা ৪১র মধ্যে লেখা) ঃ- সবাইকে সমান কায়দা, নিয়ম, অনুশাসন ও পালন করিয়ে সত্য পথ নিয়ে আসবে। আমি (নাস্ত্রেদমস) একটা কথা নির্বিবাদ সিদ্ধ করছি ঐ শায়রন (ধার্মিক নেতা) নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করবে। উনিই সত্য মার্গ (পথ) দর্শন করানে বালা, এশিয়া খন্ডে যে দেশের নাম মহাসাগর (হিন্দ মহাসাগর) ওই নামবালা (হিন্দুস্থান) দেশে জন্ম নেবে। ও নাতো খ্রীষ্ঠান হবে না, মুসলিম হবে না জিউ ধর্মের হবে, কেবল মাত্র হিন্দুধর্মের হবে। অন্য

ভূতপূর্ব ধার্মিক নেতাদের থেকে সর্বাধিক বুদ্ধিমান হবে এবং অদ্বিতীয় শায়রন হবে। (নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণীতে শতক ৬ শ্লোক ৭০-তে মহত্বপূর্ণ সংকেত খবর বলছেন) তাকে সবাই (ভালবাসবেন, তার চর্চা হতে থাকবে) তার ভয়ও সবাই করবে। কেউ অপকৃত্য করতে চাইলেও একবার ভাববে। তার নাম ও কীর্ত্তি ত্রিখন্ডে গুঁজবে (ছড়াবে) অর্থাৎ আকাশের পাড়ও তার মহিমা ছড়াবে। আজ পর্যন্ত্য অজ্ঞান নিদ্রায় অগাধ ঘুমে ঘুমিয়ে থাকা সমাজকে, তত্ত্বজ্ঞানের রোশনী, জ্যোতি দিয়ে জাগাবে। সর্ব মানব হড়বড়িয়ে জেগে উঠবে। তার তত্ত্বজ্ঞানের আধারে ভক্তি সাধনা করবে, সর্ব সমাজকে সত্য সাধনা করাবে। যার কারণে সর্ব সাধকের নিজের আদি অনাদি স্থান (সত্য লোক) এবং নিজে পূর্বজ (আগের বংশজ)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে সেখানকার স্থান প্রাপ্ত করাবে। ক্রুর (নিষ্ঠুরঃ এর ভূমিকে (কাল লোক) থেকে মুক্তি করাবে। এই শব্দ বলে উঠবে।

(৪) (পৃষ্ঠা ৪২-৪৩র মধ্যে লেখা) ঃ- এই হিংসক ক্রুরচন্দ্র (মহাকাল) কে আছেন? কোথায় আছেন? এই কথা একমাত্র ঐ শায়রনই (তত্ত্বদর্শী)-ই জানেন তিনিই বলবেন। ওই ক্রুর চন্দ্রের (মহাকালের) হাত থেকে ওই শায়রনই মুক্ত করাবেন। শায়রন (তত্ত্বদর্শী)-র কারুকার্য্যতে এই পৃথিবীর পবিত্র ভূমির পর (হিন্দুস্থানে)স্বর্ণযুগের অবতরন হবে, পরে তাহা পুরো বিশ্বতে ছড়িয়ে পড়বে। ওই বিশ্বনেতা এবং তার তাহার সতগুণ। তারপরেও মহিমা গাইতে থাকবে। তার মনের শালীনতা, বিনম্রতা, উদারতার এত সুপ্রসিদ্ধ হবে, যে কি এর আগে নমুনা করা শতক ৬ শ্লোক ৭০-রের শেষ পংক্তি (পোংতি) তে করা আছে উল্ল্যেখ যে নিজেই শব্দ নিজেই বলে, উঠবে, আর শায়রণেরই আওয়াজে বলছিল কি, শায়রন নিজের বিষয়ে ব্যাস্ তিন শব্দই বলে এক বিজয়ী জ্ঞাতা, এর সাথে যেন আর বিশেষণ না চিপকায় এটা আমার মঞ্জুর হবে না। (এই পৃষ্ঠা ৪২ বালা ৪ উল্লেখ বাণী শতক ৬ শ্লোক ৭১ তে আছে)। হিন্দু শায়রন নিজের জ্ঞান দ্বারা দৈদ্বীপ্যমান উত্তম উচুঁ স্বরূপের বিধান (তত্ত্বজ্ঞান) তাহাও আবার বিনা শর্তে উজাগর করাবেন। (Chyren will be Chief of the World, Loved feared and unchallanged)আর মানবী সংস্কৃতি অনায়াসেই সামলাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখনও কেউ জানে না, ঠিক কিন্তু নিজের সময় মত যেমন নরসিংহ হঠাৎ প্রকট হয়েছিল, এই রকমই মহান বিশ্বনেতা (Great Chyren) নিজের তর্কশুদ্ধ, অচুক আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর ভক্তি তেজে বিখ্যাত হবে। আমি (নাস্ত্রেদমস) অচম্ভিত যে, আমি নাতো ওই দেশ (যেখান থেকে অবতরিত হবে অর্থাৎ সতলোক থেকে) -কে না চিনি নাকে জানি কিন্তু আমি আমার সামনে তাকে দেখতে পারছি। তার মহিমার শব্দ বদ্ধে, কেউ মিলাতে করতে পারবে না। ব্যাস্ তাকে Great Chyren (মহান ধার্মিক নেতা) বলছি, আমার ধর্ম বন্ধুদের বর্তমান কানিন সমস্যা থেকে দয়নীয় অবস্থাতে অস্থির হয়ে স্বতন্ত্র জ্ঞান সূর্যের উদয় করে আপনার ভক্তির তেজে জগতের তারণহার ৫৬০ শতক (২০ শতাব্দীর) অন্তিম বর্ষের শেষ ১৯৯৯ সালে অর্ধেক বয়সীর মধ্যে সে বিশ্বের মহান নেতার মত, তেজস্বী সিংহ মানব (Great Chyren) উদ্বিগ্ন অবস্থা থেকে চৌখট (লক্ষণ রেখা) পাড় হয়ে, আমার(নাস্ত্রেদমসের) মনের ভেদ নিচ্ছে, আর আমি তার স্বাগত করে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি এবং উদাসও হচ্ছি কারণ এইযে, তিনি যে সময় অবতরণ (অবতারিত) হবে, সেই পর্যন্ত্য তো আমি বাঁচব না এবং তার তত্ত্বজ্ঞানও আমি উপলব্ধি করতে পারব না। তাই আমার দুঃখ

হচ্ছে বা আমি খুব আফসোস করছি। আমি ঐ তত্ত্বদর্শীর তত্ত্বজ্ঞান থেকে উপেক্ষা পাত্র হয়ে রইলাম। আমার চিৎভেদক ভবিষ্যৎবাণী আর ঐ বৈশ্চি ক সিংহ মানবের উপেক্ষা করবেন না। তিনি প্রকট হওয়ার পর এবং তার তৈজস্বী তত্ত্বজ্ঞান রূপী সূর্য উদয় হলে আদর্শবাদী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুনরুত্থান তথা স্বর্ণযুগের প্রভাত শতক ৬-তে আজ ইং সাল ১৫৫৫ থেকে ৪৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ২০০৬ সালে (১৫৫৫ + ৪৫০=২০০৫ এর পর অর্থাৎ ২০০৬ সালে) শুরু হবে। এই কৃতার্থ শুরু হবে তা আমি (নাস্ত্রেদমস) দেখতে পারছি।

(৫) (পৃষ্ঠা ৪৪, ৪৫, ৪৬র মধ্যে লেখা) ঃ- নাস্ত্রেদমস শতক ১ শ্লোক ৫০-তে আবার প্রমাণিত করছে) তিনদিকের সাগর দিয়ে ঘেরা দ্বীপ (হিন্দুস্থান দেশে)-তে ওই মহান সন্তের জন্ম হবে। সেসময়ে তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞান অন্ধকার থাকবে। নৈতিকতার পতন হয়ে হাহাকার সাচবে। ওই শায়রন (ধার্মিক নেতা) গুরুবর অর্থাৎ গুরুজী কে বর মানে (শ্রেষ্ঠ) মেনে নিজে সাধনা করবে ও করাবে। ওই ধার্মিক নেতা (তত্ত্বদর্শী সন্ত) নিজের ধর্ম বল (অর্থাৎ ভক্তির শক্তিদিয়ে তথা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব রাষ্ট্রোকে নতমস্তক করাবে। এশিয়াতে তাকে থামানো বা তার প্রচারে বাধা দেওয়া পাগল পর্ণ হবে। (শতক ১ শ্লোক ৫০)

নোট ঃ- নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণী ফ্রান্স দেশের ভাষাতে লেখা হয়েছিল। পরে এক পাল ব্রন্টন নামের ইংরেজ এই নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণী, "সেঞ্চুরী গ্রন্থকে" ফ্রান্সে কয়েক বৎসর ধরে বুঝে পরে ইংলিশ ভাষায় লেখে। তিনি গুরুবর শব্দকে (বৃহস্পতি) গুরুবার থার্সডে বুঝে লিখে দিয়েছিল, এবং নিজে তার পূজোর আধার বৃহস্পতি বারে বানাবে ভেবে বৃহস্পতিবারই করত। বাস্তবে গুরুবর শব্দের অর্থ হল, সর্ব গুরুর যে এক তত্ত্বজ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ তথা গুরুকে মুখ্য মেনে সাধনা করা হয়ে থাকে তাকে বোঝায়। বেদ ভাষায় বৃহস্পতির ভাবার্থ সবের্বাচ্চ স্বামী অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্বিতীয় বৃহস্পতির অর্থ জগৎগুরুও হয়ে থাকে। জগৎগুরু ও পরমেশ্বর ও বৃহস্পতি বোধ হয়।

ঐ অর্ধেক বয়সীতেই তিনি তত্বজ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হয়ে ত্রিখন্ডে কীর্তিমান হবে। আমায় (নাস্ত্রেদমসের) মনে হচ্ছে যে যিনি অবতারিত হবেন, তার নতুন উপায় সাধনা মন্ত্র এমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে যেমন সাপের মাথায় গাছরা রাখলে বিষধর সাপও যেমন বশ হয়ে যায় ওই নতুন উপায় নতুন কায়দা বানানো বালা তত্ত্ববেতা দুনিয়ার সামনে উজাগর হবে। তাকেই আমি (নাস্ত্রেদমস) অচম্ভিত হয়ে "গ্রেট সায়রন" বলছি, তার জ্ঞানের দিব্য তেজের প্রভাবে ওই দ্বীপকল্প (ভারতবর্ষ) তে আক্রামক তুফান, খলবলী আরম্ভ হয়ে যাবে অর্থাৎ অজ্ঞানী সন্তের দ্বারা বিদ্রোহ করা হবে। সে সব শান্ত করার উপায়ও সে জানে। যেমন জালিম সর্পিনী বশ করে থাকে। তিনি সিংহের সমান শক্তিশালী ও তেজপুঞ্জ ব্যক্তিত্বর হবে। এই নাস্ত্রেদমস "আমি" স্পষ্ট শব্দতে বলছি তিনি কুন্ডলিনী শক্তি ধারণ করা আছে প্রথমে স্পষ্ট শব্দ এই যে সে সময় ওই তত্ত্বদর্শী (শায়রন) যে মহাসাগরের দ্বীপকল্পে আছেন ওই দেশের নামের উপর মহাসাগরের নাম (হিন্দ মহাসাগর)। বিশেষতা এই হবে যে ওই দেশে ভুজঙ্গ সর্পিনী শক্তি (কুন্ডলিনী শক্তি)-র পূর্ণ পরিচিত True Master হবে। ওই Chyren (মহান ধার্মিক নেতা)উদারমনের কৃপালু, দয়ালু, দৈদ্বীপ্যমান, সনাতন সাম্রাজ্য অধিকারী আদি পুরুষ (সত্যপুরুষ)-এর অনুযায়ী হবে। তার সত্তা, মহিমা সার্বভৌম হবে তার মহিমা উপায় গুরু শ্রদ্ধা, গুরু ভক্তি অর্থাৎ গুরু বিনা কোন কিছু সফল হয় না, এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়

করবে। তত্ত্বজ্ঞানের সৎসঙ্গ করে প্রথম অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকা নিজের ধর্ম বন্ধুদের (হিন্দুদের) জাগ্রিত করে, অন্ধবিশ্বাসের আধার সাধনা করা শ্রদ্ধালুদের শাস্ত্রবিধি রহিত সাধনার বুরকা ছিড়ে ফেলে গহন জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান)-এর প্রকাশ করবে। আপন সনাতন ধর্মের পালন করিয়ে, সমৃদ্ধ শান্তির অধিকারী বানাবে। তৎ পশ্চাৎ তার তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। ওই (মহান তত্ত্বদর্শী সন্ত)-এর জ্ঞানের কেউ বরাবরি (সমতুল্য) করতে পারবে না। বা তার থেকে জ্ঞানী কেউ হতে পারবে না। তার গুঢ় জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান)-এর সামনে সূর্যের তেজও কম পড়বে। এই জন্য আমি (নাস্ত্রেদমস) এখন বুঝতে পারছি যে, সেই বৈশ্চিক সিংহ মহামানব এতই মহান হবে যে কি, আমি তার মহিমাকে শব্দতে বাঁধতে পারছি না বা পারব না। (নাস্ত্রেদমস)-আমি ঐ গ্রেট শায়রন কে দেখতে পারছি।

উপরোক্ত বিবরণের ভাবার্থ হল "ঐ বিশ্ব নেতা ৫০ বৎসর আয়ূতেই তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রতে প্রমাণিত হবে, অর্থাৎ ৫০ বৎসর আয়ূতেই সন্ ২০০১-তে সর্বধর্মের শাস্ত্র কে পড়ে, তার জ্ঞাতা (তত্ত্বজ্ঞানী) হবে। আর পরে ওই তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞেয় (জানার যোগ্য পরমেশ্বরের জ্ঞান যিনি অন্যকে প্রদান করেন বালা) হবে এবং তার আধ্যাত্মিক জন্ম অমাবস্যায় হবে। ওই সময় তার আয়ূ তরুণ অর্থাৎ ১৬-২০-২৫ বর্ষের মধ্যে হবে না তিনি প্রৌঢ় বয়সীর হবে, তথা যখন তিনি প্রসিদ্ধ হবে তখন তাহার আয়ূ ৫০ থেকে ৬০ বয়সের মধ্যে হবে।

(৬) (পৃষ্ঠা ৪৬, ৪৭র মধ্যে লেখা) ঃ- নাস্ত্রেদমস বলেন, নিঃসন্দেহে বিশ্বতে শ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞাতা (গ্রেট শায়রন)-এর বিষয়ে আমার ভবিষ্যবাণীর শব্দা। শব্দকে কোন নেতার উপর জুড়ে তর্ক-বিতর্ক করে দেখলে কেউ সামনের উপর আসবে না। আমি (নাস্ত্রোদমস) বুক ঠুকিয়ে শব্দাশব্দকে জোর গলায় বলছি, আমার শায়রনের কর্তৃত্ব (কর্তাপণ) আর তাহার গুঢ়-গভীর জ্ঞান (তত্ত্ব জ্ঞান) সকলের ছাল ছাড়াবে। ব্যাস্ ২০০৬ সাল আসতে দাও। এই বিধানের এক এক শব্দের কড়া-কড়া সমর্থন শায়রনই দেবে।

(৭) (পৃষ্ঠা ৫২র মধ্যে লেখা) ঃ- নাস্ত্রেদমস নিজের ভবিষ্যবাণীতে বলেছেন যে, ২১ বী সদী (২১ শতাব্দী)র প্রারম্ভে দুনিয়ার ক্ষিতিজের উপর শায়রনে (তত্ত্বদর্শীর) উদয় হবে। যা কিছু পরিবর্তন হবে সেটা আমার ইচ্ছায় নয়, বল্কি (অতএব) শায়রনের আজ্ঞাতে নিয়তির ইচ্ছাতেই পরিবর্তন হবে। তবে নতুন পরিবর্তন অর্থাৎ হিন্দুস্থান সর্ব শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হবে যাহা কয়েক বছর ধরে দেখেনি কেউ এইরকম হিন্দুদের সুখ সমৃদ্ধ দৃষ্টিগোচর হবে। ওই দেশের জন্ম হওয়া ধার্মিক সন্তই তত্বদৃষ্টা ও জগতের তারনহার জগজ্জেতা হবে। এশিয়া খন্ডতে রামায়ণ, মহাভারত আদির জ্ঞান, যা হিন্দুদের প্রচলিত, তার থেকেও ভিন্ন অনেক পূর্বের (আগের) জ্ঞান ওই তত্বদর্শী কাছে সন্তের আছে। এবং সতপুরুষের অনুযায়ী হবে। তিনি এক অদ্বিতীয় সন্ত হবে।

(৮) (পৃষ্ঠা ৭৪র মধ্যে লেখা) ঃ- অনেক সাধু সন্ত নেতা আসবে আর যাবে, সব পরমাত্মার দ্রোহী ও অভিমানী হবে। আমাকে সেই শায়রনের আন্তরিক সাক্ষাৎকার হয়েছে। হিন্দুস্থানের হিন্দু সন্ত সামনের অন্ধকারী (ভক্তিজ্ঞানের অভাব দ্বারা অন্ধ) প্রলয়কারী (স্বার্থ বশে ভাই ভাইকে মারে, ছেলে বাবা মাকে দেখে না, হিন্দু হিন্দুরই শত্রু, মুসলমান-মুসলমানের দুষ্মন (শত্রু) হয়ে আছে।

ধুন্ধুকারী (মায়ার অন্ধকারে ধৈর্য্য হারা সমাজ) জগৎকে নতুন প্রকাশ দিতে আসা, সর্বশ্রেষ্ঠ জগজ্জেতা ধার্মিক বিশ্বনেতার নিজ উদাসী ছাড়া কোন অভিলাষা থাকবে না, অর্থাৎ মানব উদ্ধারের জন্য চিন্তা, ছাড়া অতিরিক্ত কোন অভিলাষা বা স্বার্থ নেই তাছাড়া না অভিমান হবে একথা আমার ভবিষ্যবাণীর গৌরব হবে যে, বাস্তবে ওই তত্বদর্শী সন্ত সংসারে অবশ্যই প্রসিদ্ধ হবে। তার দ্বারা বলা জ্ঞান কয়েক শো বছর পর্যন্ত্য ছেয়ে থাকবে। ওই সন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দেবে। এইরকম আধ্যাত্মিক চমৎকার করবে যে কি, বৈজ্ঞানিকরাও আশ্চর্য্যতে পড়ে যাবে। তাহার সর্ব জ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণিত হবে। আমি নাস্ত্রেদমস্ বলছি যে, কোন বুদ্ধিবাদি ব্যক্তি তাকে যেন উপেক্ষা না করে। এবং তাহাকে ছোট জ্ঞানদ্বীপ না ভাবে, ওই তত্ববেতা মহামানব (শায়রন)কে সিংহাসনস্থ করে (আসনে বসিয়ে) তাকে আরাধ্য দেব মনে করে পূজা করবে। তিনি আদি পুরুষ (সৎপুরুষ)-এর অনুযায়ী দুনিয়ার তারনহার (পরিত্রাতা) হবেন।

।। সন্ত রামপালজি মহারাজের সমর্থনে অন্যান্য ভবিষ্যৎবক্তার ভবিষ্যবাণী।।

(১) ইংলন্ডের জ্যোতিষী 'কীরো' সন ১৯২৫ তে লেখা পুস্তকে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। বীসবী ২০ শতাব্দী অর্থাৎ ২০০০ ইং, সালের উত্তরার্ধের (১৯৫০ সালের) পরে উৎপন্ন সন্তই বিশ্বতে "নতুন সভ্যতা" নিয়ে আসবে, যাহা সম্পূর্ণ বিশ্বতে ছড়িয়ে পড়বে। ভারতে ঐ এক ব্যক্তি সারা সংসারে জ্ঞানক্রান্তি নিয়ে আসবে।

(২) ভবিষ্যবক্তা "শ্রী বেজীলেটিন"- এর অনুসারে ২০ বী সদীর উত্তরার্ধে বিশ্বতে একব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে প্রেমে অভাব, মানবতার হ্রাস, মায়া সংগ্রহের দৌড় লুট ও রাজ নেতারা যে অন্যায়ী হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি উৎপাত দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারত থেকে উৎপন্ন হওয়া শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব ভাবের উপর আধারিত নতুন সভ্যতা, সংসার মানে দেশ, প্রান্ত আর জাতির সীমা ভেঙে বিশ্বতে শান্তি ও সুখ উৎপন্ন করবে।

(৩) আমেরিকার ভবিষ্যবক্তা (মহিলা) "জীন ডিক্সন"-এর অনুসারে ২০ বী সদীর অন্তের পূর্বে বিশ্বতে এক ঘোর হাহাকার তথা মানবতার সংহার হবে। বৈচারিক যুদ্ধের পর আধ্যাত্মিকতার পর আধারিত এক নতুন সভ্যতা সম্ভবতঃ ভারতের গ্রামীণ পরিবারের ব্যক্তির নেতৃত্বতে জমবে আর সংসার থেকে যুদ্ধ সদা সদার জন্য বিদায় করে দেবে।

(৪) আমেরিকার 'শ্রী এন্ডরসন্'- এর অনুসারে ২০ বী সদীর অন্ত থেকে আগে বা ২১ শো শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্বতে অসভ্যতার ন্যাংটা নাচের তান্ডব হবে। এর মাঝে ভারতের এক গ্রাম প্রান্তের ধার্মিক ব্যক্তি, এক মানব, এক ভাষা, এক পতাকার রূপরেখার সংবিধান বানিয়ে সংসারকে সদাচার, উদারতা, মানবীয় সেবা ও প্যার (ভালবাসার শিক্ষা)-এর সবক (উচিৎ শিক্ষা) দেবে। এই মসীহা ১৯৯৯-এর পরে বিশ্বকে আর ও হাজার বৎসর পর্যন্ত সুখ শান্তিতে ভরে দেবে।

(৫) হলান্ডের ভবিষ্যদৃষ্টা 'শ্রী গেরার্ড ক্রাইসে'-এর অনুসারে ২০বী সদী মানে ২০০০ সালের অন্তের আগে বা ২১ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কারণ, কোন কোন দেশের অস্তিত্বই মিটে যাবে। পরন্তু ভারতের এক মহাপুরুষ সম্পূর্ণ বিশ্বকে মানবতা এক সুত্রে বেঁধে দেবে ও হিংসা, লুট-দুরাচার, ছল-কপট আদি সংসার থেকে সদাকালের জন্য মিটিয়ে দেবে।

(৬) আমেরিকার ভবিষ্যবক্তা 'শ্রী চালর্স ক্লার্ক'- এর অনুসারে ২০ বী সদীর অন্তে থেকে আগে, এক দেশ বিজ্ঞানের উন্নতিতে সব দেশকে আছড়ে দেবে, কিন্তু ভারতের প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে তার ধর্ম ও দর্শন থেকেই হবে। যাহা কিনা সারা বিশ্ব আপন করে নেবে। এই ধার্মিক ক্রান্তি ২১ শতাব্দী ইংরাজীর প্রথম দশকে সম্পূর্ণ বিশ্বকে প্রভাবিত করবে আর মানুষকে অধ্যাত্মিকতায় বিবশ করে দেবে।

(৭) হঙ্গরীর মহিলা জ্যোতিষী 'বোরিস্কা'-র অনুসারে সন্ ২০০০-ই থেকে প্রথম প্রথম উগ্র পরিস্থিতি হত্যা আর লুটমারের মাঝখানেই মানবীয় সতগুণের বিকাশ এক ভারতীয় ফরিস্তের দ্বারা ভৌতিকবাদের সফল সংঘর্ষের ফলস্বরূপ হবে। যাহা কিনা চিরস্থায়ী থাকবে, এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তির অনেক বড় সংখ্যায় ছোট ছোট লোকই অনুযায়ী হয়ে, ভৌতিকবাদকে বদলে দেবে।

(৮) ফ্রান্সের ডাঃ জুলবর্ণ – এর অনুসারে সন্ ১৯৯০ এর পরে ইউরোপীয় দেশ ভারতের ধার্মিক সভ্যতার দিকে তেজিতে ঝুকবে। সন্ ২০০০ পর্যন্ত্য বিশ্বের জনসংখ্যা ৬৪০ কোটির কাছাকাছি হবে। ভারত থেকে ওঠা জ্ঞানের ধার্মিক ক্রান্তি নাস্তিকতার নাশ করে আন্ধী-তুফানের মত সম্পূর্ণ বিশ্বকে ঢেকে নেবে। ওই ভারতীয় মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তির অনুযায়ী দেখতে দেখতে এক সংস্থার রূপে আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বের উপর প্রভাব জমিয়ে নেবে।

(৯) ফ্রান্সের নাস্ত্রেদমসের অনুসার বিশ্বভরে সৈনিক ক্রান্তির পর, অল্প থেকেই ভাল লোক সংসারকে ভাল বানাবে। যার মহান ধর্মনিষ্ঠ বিশ্ববিখ্যাত নেতা ২০ বী সদীর অন্তে আর ২১ বী সদীর শুরুতে কোন পূবী দেশ থেকে জন্ম নিয়ে ভ্রাতৃবৃত্তি ও সৌজন্যতা দ্বারা সারা বিশ্বকে একতার সূত্রে বেঁধে দেবে। (নেস্ত্রদমস শতক ১ শ্লোক ৫০ তে প্রমাণিত করছে)। তিনদিক থেকে সাগর ঘেরা দ্বীপে, ওই মহান সন্তের জন্ম হবে। ওই সময় তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞান অন্ধকার হবে। নৈতিকতার পতন হয়ে, হা হা, কার মাচাবে। ওই শায়রন (ধার্মিক নেতা) গুরুবরকে অর্থাৎ গুরুকে (শ্রেষ্ঠ) মেনে নিজের সাধনা করবে এবং করাবে। ওই ধার্মিক নেতা (তত্বদর্শী সন্ত) নিজের ধর্মবল ও শক্তি দিয়ে তথা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সর্ব রাষ্ট্রকে নতমস্তক করাবে। এশিয়াতে তাকে থামানো অর্থাৎ তার প্রচারে বাধা দেওয়া পাগলপনা ছাড়া কিছু না। (শতক ১ শ্লোক ৫০) (সেঞ্চুরী ১, কন্না-৫০)

(১০) ইজরায়েলের "প্রোঃ হরারের" অনুসারে, ভারত দেশে এক দিব্য মহাপুরুষ মানবতাবাদী বিচার দিয়ে সন্ ২০০০ই থেকে প্রথমে প্রথমে আধ্যাত্মিক ক্রান্তির মূল মজবুত (শক্ত) করে নেবে ও সারা বিশ্বকে তার বিচার শুনতে বাধ্য হতে হবে। ভারতে অধিকতর রাজ্যতে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে, পরে নেতৃত্ব ধর্মনিষ্ঠ বীর লোকের উপরই হবে। যে কিনা এক ধার্মিক সংগঠনের আশ্রিত হবে।

(১১) নার্বের "শ্রী আনন্দাচার্য্যের" ভবিষ্যবাণী অনুসারে, সন্ ১৯৯৮-এর পরে এক শক্তিশালী ধার্মিক সংস্থা ভারতে প্রকাশ্যে আসবে, যার স্বামী এক গৃহস্থ ব্যক্তির আচার সংহিতার পালন সারা বিশ্ব করবে। ধীরে ধীরে ভারত উদ্যৌগিক, ধার্মিক ও আর্থিক দৃষ্টিতে বিশ্বের নেতৃত্ব

করবে। আর তার বিজ্ঞান, (আধ্যাত্মিক তত্বজ্ঞান)-ই সারা বিশ্বতে মান্য হবে।

উপরোক্ত ভবিষ্যবাণী অনুসারে আজ বিশ্বতে যে ঘটনা ঘটছে। যুগ পরিবর্তন প্রকৃতির অটল সিদ্ধান্ত, বৈদিক দর্শনের অনুসারে চার যুগ-সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগের ব্যবস্থা করা আছে। যখন পৃথিবীর উপর পাপীদের এক ছত্র (ছাতা) সাম্রাজ্য হয়ে যায়, তখন ভগবান, পৃথিবীতে মানব রূপে প্রকট হন। এই প্রকার যুগ পরিবর্তনের ভবিষ্যবাণী ইসাইদের পবিত্র ধার্মিক পুস্তক বাইবেলও স্পষ্ট শব্দতে বলেছে। পবিত্রাতা যীশু সেন্ট জোহনের ১৫ : ১৬ ও ১৬ : ৭ থেকে ১৫ তে এক সহায়ক পাঠানোর ভবিষ্যবাণী করেছিলেন। বাইবেলের ভবিষ্যবাণীর অনুসার যদি, ওই সহায়ক ২০ বীংসদীর অন্তের থেকে আগে আগে উৎপন্ন না হয়, তাহলে বাইবেলের ভবিষ্যবাণী স্বয়ং অসত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে কিন্তু এখন অসম্ভব, কেননা ঐ মহান আত্মা যীশু ঐ সহায়ককে পাঠানোর জন্যই নিজের প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন। এই তথ্য সেন্ট জোহনের ১৬ : ৭ তে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তবুও আমি তোমাকে সত্যি বলছি যে আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভাল হবে কেননা যদি আমি না যাই, তাহলে ওই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবে না। আর আমি যদি যাই, তাহলে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, আর নিজের কথা অনুসারে ওই পবিত্রাত্মা নিজের জীবন স্বেচ্ছাতে বলি চড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মানবতার এই পূর্ণ বিকাশের কাজ অনাদি কাল থেকে ভারতবর্ষই করে আসছে। এই পুণ্যভূমিতে অবতারদের অবতরণ অনাদি কাল থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু কেমন বিড়ম্বনা যে কি ঋষি-মুনিরা, মহাপুরুষদের ও অবতারদের জীবন কালে, ওই সময়ের শাসন ব্যবস্থা ও জনতারা উনাদের দিব্য আদর্শের কথায় ধ্যান দেয়নি। আর তার অন্তর্ধান হওয়ার পরে দুগুণা উৎসাহতে তার পূজা শুরু করে, পূজা করতে লাগে। এটাও একটা বিড়ম্বনা যে কি আমরা জীবন্ত ও সময় থাকতে তাকে মানি না, তিনি জীবন্ত থাকতে দুষ্টু ব্যক্তির কথা শুনে তাকে অপমান ও শাসন করতে থাকি। কিছু স্বার্থীতত্ব ব্যক্তি জনতাকে ভ্রমিত করে পরম সন্তকে বদনাম করে বাধক বানিয়ে থাকে। এই উক্তি প্রতি যুগে প্রমান হয়ে আসছে, এবং আজও হচ্ছে।

যে মহাপুরুষ হাজার কষ্ট সহন করে নিজ তপস্যা ও সত্যের উপর দৃঢ়ভাব রেখে থাকে, তার কথা অসত্য হতে পারে না। সত্য ও দৃঢ় থেকেই ইসামসিহা নিজের শরীরে পেরেকের ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা সহ্য করে নিয়েছেন। সুকরাত বিষ খেয়ে নিয়েছিল। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ও যাতনার শিকার হতে হয়েছিল।

ইসা মসিহা বলেছিলেন পৃথিবী ও আকাশ নড়ে যেতে পারে। সূর্যের অটল সিদ্ধান্ত হল উদয় ও অস্ত হওয়া সূর্যও নিরস্ত হতে পারে কিন্তু আমার কথা কোনোদিন মিথ্যা হতে পারে না।

সজ্জনোরা ! যদি আজকের কোটি মানব ওই পরমতত্বের জ্ঞাতাসন্তকে খুঁজে স্বীকার করে, বা তার বলা পথ অনুসার নিজের জীবনকে সুধরায়ে নেয়, তাহলে বিশ্বতে সদ ভাবনা, আপসে ভাই বন্ধুর প্রেম, দয়া সদভক্তির বাতাবরণ হয়ে যাবে। বর্তমানের মানুষ বুদ্ধিজীবি আছেন, এই জন্য ওই সন্তের বিচারকে অবশ্যই স্বীকার করবেন এবং ধন্যও হয়ে যাবেন। ঐ সন্ত হলেন জগৎ গুরু তত্বদর্শী রামপাল জী মহারাজ। তার সংক্ষিপ্ত জীবনী সব ভবিষ্যবাণীতে প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

।। সন্ত রামপাল জী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।।

এই তত্ত্বদর্শী জগৎগুরু সন্ত রামপাল মহারাজের জন্ম ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সালে গ্রাম-ধপানা, জেলা-সনিপত, হরিয়ানা এক কৃষাণ পরিবারে হয়েছিল। পড়া শেষ করে হরিয়ানা প্রান্তে সেচ্ বিভাগে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের পোষ্টে ১৮ বৎসর কার্য্যরত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে স্বামী রাম দেবানন্দ মহারাজ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করে, তথা তন-মন থেকে সক্রিয় হয়ে স্বামী রামদেবানন্দ মহারাজের দ্বারা বলা ভক্তি মার্গের সাধনা করেন ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন।

সন্ত রামপাল মহারাজের নাম দীক্ষা ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সালে ফাল্গুন মাসে অমাবস্যার রাত্রীতে প্রাপ্ত হয়েছে, ওই সময় সন্ত রামপাল মহারাজের বয়স ৩৭ বৎসর হয়েছিল। নাম উপদেশের দিনকে (দীক্ষা দিবস) সন্ত মতে উপদেশী ভক্তের আধ্যাত্মিক জন্মদিবস মানা হয় বা বলা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত বিবরণ শ্রী নাস্ত্রেদমসের ওই ভবিষ্যবাণীতে সম্পূর্ণ মিল হয়, যাহা পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪-৪৫-তে লেখা আছে। তাতে লেখা আছে যেকি, যে সময় ওই তত্ব দৃষ্টা (শায়রনের)-র আধ্যাত্মিক জন্ম হবে, ঐ দিন অন্ধকার অমাবস্যা হবে। ঐ সময় ঐ বিশ্বনেতার বয়স ১৬-২০-২৫ বৎসরের বয়সের হবে না, তিনি তরুন হবে না, বল্কি তিনি প্রৌঢ় হবে, আর তার ৫০/৬০ বৎসরের মধ্য বয়সের সময় সংসারে প্রসিদ্ধ হবে, ঐ সাল ২০০৬ সালে হবে।

১৯৯৩ সালে স্বামী রামদেবানন্দ মহারাজ, তাকে সৎসঙ্গ করার আজ্ঞা দিয়েছিলেন তথা ১৯৯৪ সালে নামদান করার আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন। ভক্তি মার্গে লীন হওয়ার কারণ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং পোষ্ট থেকে ত্যাগপত্র দিয়ে দিয়েছিলেন, যা কিনা হরিয়ানা সরকার দ্বারা ১৬-০৫-২০০০ কে পত্রের ক্রমাংক ৩৪.৯২-৩৫০০, তিথি ১৬-০৫-২০০০-রের আধারে স্বীকৃত হয়। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত্য সন্ত রামপাল জী মহারাজ নিজে ঘরে-ঘরে, গ্রামে-গ্রামে, নগর-নগরে গিয়ে সতসঙ্গ করতেন, অনেক সংখ্যাতে অনুযায়ী হয়ে যায়। সাথে সাথে জ্ঞানহীন স্বার্থবাদী গুরুদেরও বিরোধ বেড়ে চলে। ১৯৯৯ সালে গ্রাম করৌথা, জেলা রোহতক (হরিয়ানা)-তে সতলোক আশ্রম করৌথার স্থাপনা করা হয়। আর ১ জুন ১৯৯০ থেকে ৭ ই জুন ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত্য পরমেশ্বর কবিরের প্রকট দিবস উপলক্ষ্যে সাত দিন যাবৎ বিশাল সৎসঙ্গের আয়োজন করে আশ্রম প্রারম্ভ করেছিল এবং মাসের প্রত্যেক পূর্ণিমায় তিনদিনের সৎসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছে। দূর দূর থেকে শ্রদ্ধালু ভক্ত সৎসঙ্গ শুনতে আসতে লাগল, আর তত্বজ্ঞান বুঝে বহুসংখ্যায় অনুযায়ী হতে লাগল, কিছুদিনের মধ্যে অনুযায়ীর সংখ্যা দশ লাখে পৌঁছে যায়। আর এদিকে অন্য গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন যে অনুযায়ী তারা, সন্ত রামপাল মহারাজের সৎসঙ্গে এসে নাম উপদেশ নিয়ে, উপদেশ শুনতেন। পরে পূর্বের ঐ পুরানো জ্ঞানহীন গুরুর কাছে রামপাল মহারাজজি শাস্ত্রমতের কিছু প্রশ্ন সেই গুরুকে জিজ্ঞাসা করে বলতেন, যে আপনি শাস্ত্রের বিপরীত কেন আমাদের বলতেন? সেই অজ্ঞানী গুরু সেই এই অনুযায়ীর উত্তর দিতে পারেন নি।

যজুর্বেদ অধ্যায় ৮ মন্ত্র ১৩ তে লেখা আছে, যে পূর্ণ পরমাত্মা নিজ ভক্তের সর্ব অপরাধ (পাপ) নাশ (ক্ষমা) করে দিয়ে থাকেন। এই অনুযায়ীরা যারা এখন রামপাল মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন এরাই আগে আর্য্য সমাজয়ালার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, এরাই সেই

আর্য্য সমাজের গুরুর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনাদের পুস্তক সত্যার্থ প্রকাশ সমুল্লাস ৭-তে লেখা আছে যে, সূর্যের উপর পৃথিবীর মত মানুষ ও প্রাণী আছে বা বাস করছে এবং এই রকম পৃথিবীর মতো সব কিছু পদার্থ আছে। বাগ বাগীচা, নদী, ঝরণা আদি এটা কি সম্ভব ? আর আপনাদের পুস্তকে এও আছে লেখা যেকি পরমাত্মা নিজের ভক্তের পাপ নাশ(ক্ষমা) করেন না। পবিত্র যজু বেদের অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১-তে লেখা আছে যেকি, পরমাত্মা সশরীরে আছেন। অগ্নে তনুঃ অসি। বিষ্ণবে ত্বাং সৌমস্য তনুর্ অসি।। এই মন্ত্রে দুইবার সাক্ষী দিয়েছে, যে পরমেশ্বর সশরীরে আছেন। ঐ অমর পুরুষ পরমাত্মা সর্বকে পালন করার জন্য শরীর ধারণ করে আছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা যখন নিজের ভক্তকে তত্বজ্ঞান বোঝানোর জন্য, কিছু সময়ের জন্য অতিথি রূপে এই সংসারে আসেন। তখন নিজের যে বাস্তবিক তেজোময় শরীরের উপর হাল্কা আলোকরশ্মি শরীরে ধারন করে আসেন। এই জন্য উপরোক্ত মন্ত্রতে দুইবার প্রমাণ দিয়েছেন। এই ধরনের তর্ক থেকে নিরুত্তর হয়ে, নিজের অজ্ঞানের পর্দা ফাঁস হওয়ার ভয়ে, ওই অজ্ঞানী সন্তরা ও মহন্ত আচার্য্য পন্ডিতরা সতলোক আশ্রম করৌথার, আসেপাশের গ্রামে, সন্ত রামপাল মহারাজের বদনাম করার জন্য দুষ্প্রচার করতে আরম্ভ করতেন। তাই ১২.০৭.২০০৬-তে সন্ত রামপাল মহারাজকে প্রাণে মারার চেষ্টা ও আশ্রম নষ্ট করার জন্য, নিজে স্বয়ং ও তার অনুযায়ীদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসে আক্রমণ করেছিলেন। পুলিশে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যার কারণ কিছু উপদ্রবকারীর চোট লেগেছিল। সরকার সতলোক আশ্রমকে নিজের অধীন করে নিয়েছেন। সন্ত রামপাল মহারাজ ও কিছু অনুযায়ীদের উপর মিথ্যা কেস বানিয়ে জেলে দিয়েছিল। এই প্রকার ২০০৬ সালে সন্ত রামপাল মহারাজ বিখ্যাত হয়েছিলেন। যদিও বা না জেনে মিথ্যা আরোপ লাগিয়ে সন্ত রামপালকে প্রসিদ্ধ করেছেন কিন্তু তিনি নির্দোষ আছেন। প্রিয় পাঠক, নাস্ত্রেদমস-এর ভবিষ্য বাণী পড়ে ভাববেন যেকি, রামপাল মহারাজকে এতই বদনাম করে দিয়েছিল, তাহলে কিভাবে সম্ভব হবে, যে তিনি বিশ্বকে জ্ঞান প্রচার করবেন ? তবে তাদের কাছে প্রার্থনা জানাই যেকি পরমাত্মা পল পল পরিস্থিতিকে বদলাতে পার।

কবীর, সাহেব সে সব হোত হে, বন্দে সে কুছ নাহি
রাই সে পর্বত করে, পর্বত থেকে ফির রাই।।

পরমেশ্বর কবীর সাহেব নিজের বাচ্চার উদ্ধারের জন্য শীঘ্রই সমাজকে তত্বজ্ঞান দ্বারা বাস্তবিকতা থেকে পরিচিত করাবেন, পুরো বিশ্ব সন্তরাম পালজীয়ের জ্ঞানকে লোহা মানবে।

সন্ত রামপাল মহারাজজী ২০০৩ সালে খবরের কাগজে ও টি.ভি, চ্যানেলের মাধ্যমে সত্য জ্ঞানের প্রচার করে, অন্য ধর্ম গুরুকে বলেছিলেন যে, আপনার জ্ঞান শাস্ত্র বিরুদ্ধ, অর্থাৎ আপনি ভক্ত সমাজকে শাস্ত্ররহিত পূজা করাচ্ছেন আর নিজেও দোষী হচ্ছেন। যদি আমি ভুল বলে থাকি, তাহলে এর জবাব দেবেন আজ পর্যন্ত্য কোনো সাধু সন্ত জবাব দিতে হিম্মৎ হা সাহস করেনি।

সন্ত রামপাল মহারাজকে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে হঠাৎ প্রেরণা হয়েছিল যে "সর্বধর্মের সদ্গ্রন্থের গভীরে অধ্যায়ন করার" এই আধারে সর্বপ্রথম শ্রীমদভাগবত গীতার অধ্যয়ন করলেন আর **"গহরী নজর গীতা নামক পুস্তক"** রচনা করলেন, তথা ঐ আধারে সর্ব প্রথম রাজস্থান প্রান্তের যোধপুর শহরে মার্চ ২০০২ সালে সতসঙ্গ আরম্ভ করলেন। এইজন্য ভবিষ্যবক্তা নাস্ত্রেদমস বলেছিলেন, বিশ্ব ধার্মিক হিন্দু সন্ত (শায়রন) পঞ্চাশ বৎসর আয়ূর

সময়ে অর্থাৎ ২০০১ সালে জ্ঞেয় জ্ঞাতা হয়ে প্রচার করবেন। সন্ত রামপাল মহারাজের জন্ম পবিত্র হিন্দু ধর্মতে ১৯৫১ সালের ৮ই সেপ্টে ম্বর, গ্রাম-ধনানা জেলা-সোনীপত, প্রান্ত হরিয়ানা (ভারত) -তে এক কৃষাণ পরিবারে হয়েছেন। এই প্রকার ২০০১ সালে সন্ত রামপাল মহারাজের আয়ূ পঞ্চাশ বর্ষ হয়ে ছিল, তার সঙ্গে নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণীর সাথেই মিল হয়। অতএব তিনিই বিশ্ব ধার্মিক নেতা সন্ত রামপাল মহারাজই আছেন। যাহার অধ্যক্ষ তাতে ভারতবর্ষ পুরো বিশ্বতে রাজ করবে। পুরো বিশ্বতে একই জ্ঞান (ভক্তিমার্গ) চলবে। একই কানুন হবে, কোন দুঃখ থাকবে না, বিশ্বতে পূর্ণ শান্তি হবে। যে বিরোধ করবে অবশেষে একদিন সেও অনুতাপ করবে বা নিজের ভুল বুঝবে। কারণ তত্বজ্ঞান স্বীকার করতে বিবশ হবে আর সর্ব মানব সমাজ, মানব ধর্মের পালন করবে আর পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে সতলোকে যাবে।

যে তত্বজ্ঞানের বিষয়ে ভবিষ্যবক্তা নাস্ত্রোদমস নিজে উল্লেখ করেছেন, যে কি ওই বিশ্ববিজেতা সন্তের দ্বারা বলা শাস্ত্র প্রমাণিত তত্ব জ্ঞানের সামনে পূর্বের সকল সন্ত নিষ্প্রভ (অসফল) হয়ে যাবে এবং সবাইকে নম্র হয়ে ঝুকতে হবে। তার বিষয়ে পরমেশ্বর কবীর বন্দী ছোড়, নিজের অমৃত বাণীতে পবিত্র "কবীর সাগর" গ্রন্থে (যে কিনা ধর্মদাসের দ্বারা কমপক্ষে ৫৫০ বর্ষ পূর্বে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন) বলেছেন, এক সময় আসবে, যখন পুরো বিশ্বতে আমারই জ্ঞান চলবে। পুরো বিশ্ব শান্তি পূর্বক ভক্তি করবে, সবার সাথে সবার প্রেমভাব থাকবে, সতযুগের মত সময় (স্বর্ণযুগ) হবে। পরমেশ্বর কবীর বন্দী ছোড় দ্বারা বলা জ্ঞান সন্ত রামপাল মহারাজ বুঝেছেন। এই জ্ঞানের বিষয়ে কবীর সাহেব নিজের বাণীতে বলেছেন—

কবীর, ওর জ্ঞান সব ঝানড়ী, কবীর জ্ঞান সো জ্ঞান।
জৈ সে গোলা তোব কা, করত চলে ময়দান।।

ভাবার্থ হল যে, তত্বজ্ঞান এতই প্রবল যে কি, এর সম্মুখে অন্য গুরুর জ্ঞান ও ঋষিদের জ্ঞান টিকতে পারে না। যেমন তোপের গোলা, যেখানে পড়ে বড় বড় দেওয়ালও মাটিতে মিশে যায় অতএব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যায়।

ওই প্রমাণ সন্ত গরীব দাসজীর (গ্রাম-ছুড়ানি, জিলা-ঝজ্জর হরিয়ানা) বালা দিয়েছিলেন, সতগুরু (তত্বদর্শী সন্ত পরমেশ্বর কবীর বন্দী ছোড়ের পাঠানো) দিল্লি মন্ডলে আসবেন। **গরীব বলছেন—**

সৎসগুরু দিল্লি মন্ডল আয়সী, সুতি ধরনী সুম জগায়সী

পরমাত্মার ভক্তি বিনা কৃপণ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জাগাবেন। গ্রাম-ধনানা, জেলা-সোনিপত আগে দিল্লি শাসিত ক্ষেত্রে ছিল। এইজন্য সন্ত গরীব দাসজি বলেছিলেন, সতগুরু (বাস্তবিক জ্ঞান জানা সন্ত বা তত্বদৃষ্টা সন্ত) দিল্লি মন্ডলে আসবে, তাই বলেছিলেন—

"সাহেব কবির তখত খবাসা, দিল্লি মন্ডল লিজৌ বাসা"

ভাবার্থ হল যে, পরমেশ্বর কবীর বন্দী ছোড়ের তক্তা (দরবার)-এর খবাস (চাকর) অর্থাৎ পরমেশ্বরের নুময়দা (প্রতিনিধি) দিল্লি মন্ডলে বাস করবে, অর্থাৎ ওখানে উৎপন্ন হবে। প্রথমে নিজের হিন্দু বন্ধুদের তত্বজ্ঞান দিয়ে পরিচিত করাবেন। বুদ্ধিমান হিন্দু এমনভাবে জাগবে যেন গহরী ঘুমে ঘুমানোর পরে কেউকে হঠাৎ জাগালে যেভাবে জাগে, ঠিক ওই রূপ জাগবেন। আর

ওই সন্তের বলা তত্বজ্ঞানকে বুঝে তাড়াতাড়ি তার শরণ গ্রহণ করবেন। এই ভবিষ্যবাণী নাস্ত্রেদমসও দিয়েছিলেন। নাস্ত্রেদমস এও লিখেছিলেন যে, শুধু আমার মনে এই দুঃখ যে কি এই তত্বজ্ঞান থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে, শায়রণের (তত্বদৃষ্টা সন্তের) উপেক্ষা পাত্রই রয়ে গেলাম। হে বুদ্ধিমান মানব! তার উপেক্ষা বা অবহেলা করো না। তাকে তো সিংহাসনে বসিয়ে, আরাধ্য দেব (ইষ্ট দেব) রূপে সন্মান করার যোগ্য আছেন তাহা জানবেন। ওই হিন্দু ধার্মিক সন্ত শায়রন আদি পুরুষ (পূর্ণ পরমাত্মা)-র অনুযায়ী জগতের তারনহার বা পরিত্রাণ কর্ত্তা।

নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবক্তার পুস্তক **পৃষ্ঠা ৪১-৪২** -তে তিন শব্দের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যেকি ওই বিশ্ব বিজেতা তত্বদৃষ্টা সন্ত ক্রুরচন্দ্র অর্থাৎ কালের দুঃখদায়ী ভূমি থেকে ছাড়িয়ে, আমাদের আদি অনাদি পূর্বজোদের (পূর্ব পুরুষদের) সাথে মিলিয়ে এবং মুক্তি দেবেন। এখানে উপদেশ মন্ত্রের দিকে সংকেত আছে যে, ওই শায়রণ (তত্বদৃষ্টা) কেবল তিন শব্দ **(ওঁ-তৎ-সৎ)**-এরই মন্ত্র জপই দেবেন। এই তিন শব্দের সাথে মুক্তির জন্য অন্য কোনো শব্দ চিপকাবে না। এই প্রমাণ পবিত্র ঋক্‌বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬-তে, সামবেদ শ্লোক সংখ্যা ৮২২ ও শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২৩-তে আছে যে, পূর্ণ সন্ত (তত্বদর্শী সন্ত) তিন মন্ত্র **(ওঁ-তৎ-সৎ যার মধ্যে তৎ ও সৎ হল সাংকেতিক আছে)** দিয়ে পূর্ণ পরমাত্মা (আদিপুরুষ)-এর ভক্তি করিয়ে জীবকে কাল জালের হাত থেকে মুক্ত করায়। পরে ওই সাধকের ভক্তির কামাইয়ের বলে ওখানে চলে যায়, যেখানে আদি সৃষ্টির ভাল প্রাণী থাকেন। ওখান থেকে এই জীব পূর্ব পুরুষদের ছেড়ে, এই ক্রুরচন্দ্রে (কালপ্রভু)-র সাথে এসে দুঃখদায়ী লোকে ফেঁসে কষ্টের পর কষ্ট ওঠাচ্ছে। নাস্ত্রেদমস এ কথাও স্পষ্ট করে গিয়েছেন যে কি, মধ্য কাল অর্থাৎ বিচলী পীঢ়ি মানে কলিযুগকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, এখন যে সময় চলছে এটাই মধ্যকাল মানে (বিচলী পিঢ়ি) এই সময়ে হিন্দুরা আদর্শ জীবন কাটাবে। শায়রন (তত্বদৃষ্টাসন্ত) নিজ জ্ঞান দ্বারা দৈদীপ্যমান সর্বোচ্চ সরূপ আর সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রানুকুল ভক্তিবিধান পুনরায় বিনা শর্তে উজাগর করাবেন, এবং মানবী সংস্কৃতি বা মানব ধর্মের লক্ষণ নির্ধোক (নিষ্কপটভাবে) সামলাবেন। (মধন্যা)কালাত হিন্দু ধর্মাচে ও হিন্দুচ্যা আদর্শবৎ ঝালেন-এটা মরাঠী ভাষাতে **পৃষ্ঠ ৪২**-তে লেখা আছে যে, উপরোক্ত ভাবার্থ হল, বিচলী পিঢ়ির উদ্ধার শায়রন করবে। এই উল্লেখ **পৃষ্ঠা ৪২**-তে হিন্দিতে লিখতে বাকী রয়ে গিয়েছে। এইজন্য এখানে লিখে দিয়েছি। তথা স্পষ্টীকরণও দিয়েছি। **এই প্রমাণ পূর্ণ পরমাত্মা কবীর বলেন যে—**

ধর্মদাস, তোহে লাখ দোহাই, সারজ্ঞান ও সারশব্দ বাহর ন যাই।
সার নাম বাহর যো পরহী, বিচলী পিঢ়ি হংস নহী তর হী।।
সারজ্ঞান তব তক ছুপাই, জপেতক দ্বাদশ পন্থ ন মিট যাই।

যেমন ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ইংরেজদের (ব্রিটিশের) হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল, তার আগে হিন্দুস্থানে শিক্ষা কম ছিল। ১৯৫১ সালে সন্ত রামপাল মহারাজজিকে পরমেশ্বর পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের আগে ছিল কলিযুগের প্রথম পিঢ়ি ১৯৪৭ সালের পর বিচলি পিঢ়ি (মধ্য পিঢ়ি) প্রারম্ভ হয়েছে। এই এক হাজার বর্ষ পর্যন্ত্য সত্য ভক্তি করবে। এর মধ্যে যারা পূর্ণ নিশ্চয়ের সাথে ভক্তি করবে, সে বা তারাই সত লোকে যেতে পারবে, আর যারা সতলোকে

যেতে পারবে না, তারা হল যেমন যারা কখনও কোনদিন ভক্তি করেছিল, বা কখনও ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু গুরুর বিরুদ্ধে কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নি, বা গুরু দ্রোহী নয়, এই ধরনের ব্যক্তি হাজার জনম এই কলিযুগে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত করবে, এটা তার শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনার পরিণাম হবে এই প্রকার কয়েক হাজার বর্ষ পর্যন্ত্য কলিযুগের সময়, বর্তমান থেকেও ভাল যাবে।

আবার শেষের দিকের পিড়ি অর্থাৎ কলিযুগের অন্তের জীবেরা, ভক্তিহীন হবে, কেননা যারা কিছু শুভ কামাই ভক্তিযুগে করেছিল, তারা বার বার জন্ম নিয়ে, তার কামাই সমাপ্ত করে দেবে। এই প্রকার কলিযুগের শেষে কৃতঘ্নী (ভক্তি রহিত) অর্থাৎ জঘন্য হয়ে যাবে তারা ভক্তিও করতে পারবে না। এইজন্য বলা হচ্ছে যেকি, এখন সেই কলিযুগের বিচলী পিড়ি অর্থাৎ মধ্যম পিড়ি চলছে (১৯৪৭ সাল থেকে)। ২০০৬ সাল থেকে ওই শায়রন সর্বের সমক্ষ প্রকট হয়ে গিয়েছে। তিনিই হলেন 'সন্ত রামপালজি মহারাজ'।

উপরোক্ত জ্ঞান যে বিচলি পিড়ি (মধ্য পিড়ি) ও প্রথম পিড়ি এবং অন্তিম পিড়ির কথা সন্ত রামপাল মহারাজজি নিজের প্রবোচনে বর্ষ ধরে (থেকে) বলে আসছেন, যাহা এখন নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণীতে স্পষ্ট হয়েছে। এইজন্য সন্ত গরীব দাস মহারাজজি বলেছিলেন যে কি- কবীর পরমেশ্বরের ভক্তি, পূর্ণ সন্ত থেকে উপদেশ নিয়ে করো, নয়তো এই অবসর আর কোনদিন আসবে না। **গরীব বাণী—**

সমঝা হে তো সির ধর পাব, বহুর নহী রে এইসা দাব।।

ভাবার্থ হল, যদি আপনি তত্বজ্ঞানকে বুঝে যান, তাহলে মাথার উপর পা রেখে অতিশীঘ্রতায় তত্বদর্শী রামপাল মহারাজের কাছে থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যাণ, ও পরিবারকে ভালবাসলে তাদেরও কল্যাণ করান। শরীরের যত্ন নেবার জন্য সব ব্যস্ত আছে যে, কি করে ভাল থাকব, কি করে ভাল বাড়ি তৈরী করে ভাল বাড়িতে থাকবো কি করে ভাল খাব, ভাল পোষাক পড়ব, এতেই তার সময় নষ্ট করে দেয়। তবে শরীরের বয়স যদি একশো বছর হয়ে থাকে, তা এই ভাবেই কেটে যাবে, কিন্তু শরীরের ভিতরে যে এক আত্মা আছে, সে আত্মা তো কোন দিন মরে না, এই আত্মা আগে পরমেশ্বরের কাছে সন্তান রূপে সুখে বাস করতো, পরে কালের (ব্রহ্মের) চক্রতে তার কথা শুনে, ভগবান কে ছাড়া হয়ে, কালের রাজ্যে এসেছে। এই কালের রাজ্যে বার বার জন্ম নেয় এই আত্মা এই জন্মে রাজা (মন্ত্রী) থাকলে, পরের জন্মে কেন না, আবার কুকুর, গাধা, এইরূপ যোনি হাজার রকমের তার চক্রতে চাঁকার মত ঘুরে বেড়াতে হয়। এক মানব জন্ম ধারণ হলেই, ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করার একবার চান্স হয়, আর এই মানব জনমে যদি, পরমেশ্বরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ না রাখতে পারি, তাহলে, কেউ কি কোন গ্যারেন্টি দিতে পারবে? যেকি এই জন্মে ভগবানকে ডাকিনি তো কি হয়েছে? পরের জন্মে মানুষ হয়ে ভগবানকে ডাকব? কেউ এই কথা বলতে পারবে না। তাই বলছি বুদ্ধিমানরা ইশারার ভাষা বোঝেন। এই কথা পাঠকরা বিবেচনা করবেন। নিজের কল্যাণ নিজের করতে হবে, উদাহরণ— ক্যানসারে যে ব্যক্তি ভোগে যন্ত্রণা সেই ব্যক্তি পায়, তার আত্মীয় স্বজন অনুভবই শুধু করে নিজে একটু দুঃখ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রণার কষ্ট পায় যার ক্যানসার হয়েছে, তারই ভোগ করতে হবে ঠিক সেই রূপ। এই আত্মা ধরেন রাম বা শ্যাম নামের শরীরে রয়েছে, এখন রাম খারাপ কাজ করে আত্মাকে পাপে পরিপূর্ণ করে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছে পরে কালের দরবারে যাওয়ার আগে কাল তার সুক্ষ্ম

শরীরকে ভেজে গন্ধ ময়লা খাবে যখন ভাজবে তার জ্বালা তো আছে, তাতেও মাফ নেই, ওইখান থেকে আবার যমের দরবারে পাঠাবে, সেখান থেকে বিচার করে, কাকে কোন পাপে কোন যোনিতে দেওয়া যেতে পারে, তারপরে তো চুরাশী লক্ষ পশু যোনিতে ঘোরার পালা। পরে তার ভাগ্যে আবার যদি এইরকম মানুষ জনম কোনদিন হয়, তবে, হয়তো সেই রামের বা শ্যামের আত্মা অন্য কোনো নাম নিয়ে এসে ভাল কাজ করল, কিন্তু এই সন্তকে (পূর্ণ গুরুকে) বা এই তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারল না, তাহলে সেই রাম বা শ্যামের ১০০ বছর আয়ূর স্থানে যদি ১০০০ বৎসর আয়ূ থাকলেও তার ওই মানব শরীর ধারনের কোনো মানেই হয় না। তবে সে পরমেশ্বরকে পাবে কিনা সে তো পরমেশ্বরই বলতে পারবেন, কিন্তু এত জনম না ঘুরে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই জীবনেই নিজের আত্মার কল্যাণ করে সুখী হতে পারে। তবে আজ আমাদের সামনে যে সুঅবসর এসেছে একে আসা রাখি, কেউ ছাড়তে চাইবে না। এই কথা মুর্খ অজ্ঞানী, অভিমানী লোক বুঝবে না, একমাত্র বুদ্ধিমানরাই বুঝবেন। এই সেই ভবিষ্যৎ বাণীর (মধ্যকাল) বিচলী পিঢ়ি সময় দিয়েছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর এই সময়েই আসার কথা বলেছিলেন অতএব এই সময়কে হাতছাড়া করলে পশ্চাতাপ ছাড়া এবং হায় হায় ছাড়া কিছুই পাবেন না। তাই বলছি মানব শরীরে আপনাদের সামনে পরমেশ্বরের পাঠানো দূত এসেছেন এর সুবর্ণ সুযোগ অবহেলা করে যারা ভক্তির মার্গে না যাবে, তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে।

এ সংসার সমঝদা নহী, কহনদা শ্যাম দুপহরে নু।
গরীব দাস এ বক্ত জাত হে, রোবো গে ইস পহরে নু।।

ভাবার্থ হল যে, এই সরল ভোলা সংসার শাস্ত্রবিধি ছাড়া অর্থাৎ শাস্ত্রোবিধির বিপরীত সাধনা করছে, যাহা কিনা অতি দুঃখদায়ক, আবার কেহ একেই সুখ মনে করছে। যেমন জুন মাসে (দিনে বারোটার সময়)-তে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ জ্বলছে, তাকেই যদি সে সন্ধ্যাবেলা বলে। যেমন-কোন মদ খাওয়া ব্যক্তি মদ খেয়ে রোডের উপর বা রাস্তার উপর পড়ে আছে, আর তাকে যদি কেউ বলে, তুমি দুপুরের রৌদ্রে কেন জ্বলছো? ছায়াতে চলো, তারপরে মদ খাওয়া ব্যক্তি তখন নেশার ঝোঁকে বলবে, কে বলছে এখন দুপুর? এখন তো সন্ধ্যা। ঠিক এই প্রকার শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাধকরা মনমানী আচরণ করে নিজের জীবনকে নষ্ট করছে। তাকে ত্যাগ করতে চাইছে না। আপাতত তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মেনে কালের লোকে জ্বলছে। কারণ পরমেশ্বর কবীর সাহেবের সঙ্গে কালের যখন কথা হয়, তখন কাল বলেছিল, যখন কলিযুগে তুমি তোমার সন্তানকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে আসবে, তার পূর্বে সমস্ত জীবকে মায়ায় জড়িয়ে নেশা করিয়ে তাদেরকে নষ্ট করেই রাখব, তারা তোমার সাথে যেতে চাইবে না। তারা যদি যায় তাহলে রোজপ্রতিদিন একলাখ লোক না পেলে, না খেয়ে আমি মরে যাব। এই কথা বার্তা কালের সঙ্গে পরমেশ্বর কবীরের হয়েছিল। তবে এখন যাদের ইচ্ছা হবে যে কালের রাজ্যে থেকে কালকে খেতে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ কালের আহার রূপে মায়াতে তাড়িয়ে থাকবে তার সেটা ভাবার বিষয়। পরমেশ্বরের সঙ্গে পরমেশ্বরের সতলোকে, অর্থাৎ আগে আমরা যেখানে ছিলাম, ওখানে কোন দুঃখ নেই, কেউ সাজা দেয় না, কেউ বৃদ্ধ হয় না, কাহারও রোগব্যাধি হয় না। সেই সতলোক থেকে একটাই নমুনা আমাদের পৃথিবীতে কবীর পরমেশ্বর দিয়েছেন, সেটা হল গঙ্গা।

তাই গঙ্গা জলে কোন কীটাণু হয় না, তাহলে, সেই সতলোকের অন্যান্য জিনিষ কেমন হতে পারে? সেটা বিচার করার বিষয়। সন্ত গরীব দাস বলছেন এত প্রমাণ মিলে যাওয়ার পরও যদি, সতসাধনা পূর্ণ সন্তের বলা সত্ত্বেও না করতে পারে তাহলে, এই অনমোল (দুর্লভ) মানব শরীর (মধ্যকালের) বিচলী পিড়ির ভক্তি যুগ হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। আর এই সময়কে মনে করে করে কাঁদবে ও পশ্চাতাপ (পস্তাবে) করবে। তারপরে মাথা খুটে মরলেও এই সময়কে খুঁজে পাবে না। **পরমেশ্বর কবীর বন্দী ছোড় বলেছেন—**

আচ্ছে দিন পাছে গয়ে, সতগুরু সে কিয়া না হেত,
অব পছতাবা ক্যা করে, জব চিড়িয়া চুগ গয়ী খেত।।

সর্ব মানব সমাজের কাছে প্রার্থনা করছি যে, পূর্ণ সন্ত রামপাল মহারাজকে চিনুন এবং নিজে ও নিজের পরিবারের কল্যাণ করান। নিজের রিস্তেদার (কুটুম্ব) ও বন্ধুদেরকে বলেন ও পূর্ণ মোক্ষের সুযোগ লাভ করেন। স্বর্ণ যুগ প্রারম্ভ হয়ে গিয়েছে। দশ লক্ষ অনুযায়ী সন্ত তত্বদর্শী রামপাল মহারাজকে চিনে, সত্য ভক্তি করে নিজের সংসার সুখময় করে নিয়েছেন। সর্ব নেশা বিকার ছেড়ে পবিত্র নির্মল জীবন যাপন করছেন, যাদের ঘরে অশান্তি ছিল বছরের পর বছর স্বামীর জ্বালাতন সহ্য করতো সেই ঘরেও সব শান্তিতে আছে, নাম নিয়ে দশ লক্ষ পরিবার সুখী হয়েছেন। **১১৬ পৃষ্ঠা ১৪০ পৃষ্ঠা** পর্যন্ত্য কিছু প্রমাণ আছে। সবার প্রমাণ দিতে গেলে অনেক পুস্তকের প্রয়োজন। বুদ্ধিমান বুঝমান ব্যক্তির জন্য ইশারাই বেশী।

ভক্তিতে ভেদ ঃ- ভক্তি ভক্তিতেও অনেক ভেদ হয়ে থাকে। আপনি যেই দেবদেবীর পূজা করেন না কেন, ফল অবশ্যই পাবেন, সে ফলও নাশবান দেবদেবীরাও নাশবান। সেই দেবদেবী ফল দেবে তার মুক্তি দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। তবে কর্মফলের পূণ্য পাপ তার ফল দেব দেবতারা দেয় কারণ ব্রহ্ম কালকে পরমেশ্বর কবীর, পঞ্চ তত্বও তিনগুণ দিয়ে ২১ ব্রহ্মান্ডোতে পাঠিয়েছিল। ওই তিন গুণ কাল ব্রহ্ম, তিন সন্তান যেমন (রজোগুণ-ব্রহ্মকে সতো গুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব) কে এই গুণের দ্বারাই ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুপালন কর্ত্তা ও শিব-সংহারের ভার দিয়ে ব্রহ্মান্ডকে চালু করে রেখে কর্মফল অনুযায়ী, পুণ্যের ফল ও পাপের ফল এরা দিয়ে থাকে তবে এই দেবতারা মোক্ষ লাভ করাতে পারে না। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন/ব্রহ্ম/কাল/ক্ষর পুরুষ/ এবং মাতা প্রকৃতি (দূর্গা)। শাস্ত্রের বিষয়ে গুঢ় তত্বজ্ঞানের রহস্য জানতে হলে, তত্বজ্ঞানী সন্ত রামপাল মহারাজের কাছে থেকে উপদেশ নেওয়ার পরে এমন এমন জ্ঞানের গুঢ় রহস্য শুনতে পারবেন যে, সেই জ্ঞানের তত্ব কোন দেবতা বা মহাঋষিরাও কোন দিন বোঝেননি। যে ব্রহ্ম (কালের) ব্রহ্মাণ্ডে আমরা রয়েছি, সেই কালও যার অধীন সে হল কবীর পরমেশ্বর। সর্ব পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে কবীর সাহেবের নাম আছে কিন্তু, তিনযুগে সে বেদের তত্ব কেউ ভাল ভাবে জানতেন না। গীতায় কাল ব্রহ্ম অর্জুনকে যেমন বলেছিল পিতর পূজা করলে, পিতর লোকে, ভূত পূজা করলে ভূত লোকে, দেবতা পূজা করলে দেবলোকে আমি ব্রহ্ম আমাকে পূজা করলে আমাকে পাবে। আমরা এই গুণেরই পূজা করে থাকি (ঈশ্বর) পরম অক্ষর ব্রহ্ম যিনি কবীর সাহেব গীতায় ব্রহ্ম(কাল) বলেছিল উর্দ্ধে যার মূল নীচে যার শাখা এইরূপ দেহকে অশ্বত্থ বলা হয়। ছন্দ সমন্বিত বেদ সকল উহার পত্রস্বরূপ, এই প্রকার অশ্বত্থকে যিনি অবগত (জানা) আছে তিনিই বেদজ্ঞ। এই বেদজ্ঞ হলেন সন্ত রামপাল মহারাজজি।

की

भविष्यवाणियों का अपूर्व अर्थग्रहण व सम्प्रेषण

भारत के उज्ज्वल भविष्य के दर्शन

महायुद्धों से सम्बन्धित उद्घोषणा

उन्मादियों द्वारा धर्मस्थलों को नेस्तनाबूद करना

के कर्णधारों का तख्तापलट

भी बहुत बहुत बहुत कुछ

आलन्दकर

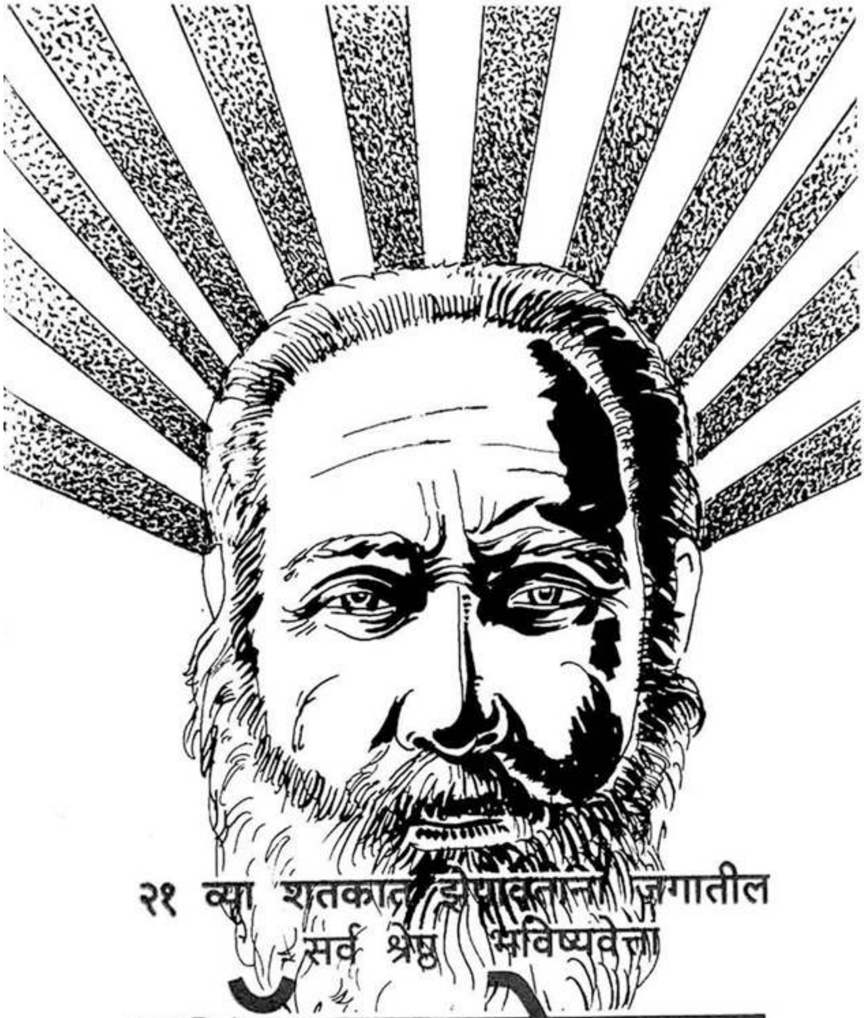
ভবিষ্যৎ বক্তা নাস্ত্রেদমসের ফটোকপি

হতেই আবার বিশ্বতে যোগ্য মার্গে ভ্রমণ করে শত্রুত্ব ভাবে ভারতকে ত্রস্ত করবে। দেখেন, প্রথম মুসলিম সমাজ রূপে শুক্র, ভারত আক্রমণ করে ওই ভূমিকে তছনছ করে দেবে। এর পরে ভারতে ঢুকে গদি (সত্বা) উপর দখল করবে। অন্ধ শ্রদ্ধালু ও দুর্বল ভারতীয় জনতাদের অত্যাচার জুলুম করবে এবং জোর করে মুসলিম বানাবে। ভারতীয় প্রদেশ ও সমাজকে নষ্ট ভ্রষ্ট করবে। এই কর্ম ইং ১২৯১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত্য চলবে।

ঐ সময়ে ভারত মাতার (কামদুহিতা)-র বন্ধু গুরুপিঙ্গল সম শত্রুত্ত্ব ভাবধারণ করে, পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান ব্যাপারী নাবিক সেজে ভারতে পাঠাবে, সেই নাবিক সাজ ব্যাপারী প্রথমে ভারতকে লুটবে, তারপরে এক এক প্রদেশ হাতে নিয়ে, সেই প্রদেশের জনতাকে ভ্রষ্ট বানিয়ে খ্রীষ্টান বানিয়ে তার উপর শাসন করবে। ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব বাড়িয়ে সম্পূর্ণ ভারত মাতাকে নিজের কব্জায় করে নেবে। ঐ সময় ভারতের দূর্বল গুলাম জনতারা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য মন্দির বানিয়ে দেব-দেবীর ভজন কীর্ত্তন শুরু করবে।

এই সময়ে ধোঁখেবাজ ক্রিশ্চন গুরু ভ্রষ্টাচারী রূপ নিয়ে আসবে। এই ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করে কিরো জ্যোতিষের মত ইউরোপীয়ন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ হবে। আর ভারতের অন্ধ ও মিথ্যা জ্যোতিষীদের নিজ জ্যোতিষ গ্রন্থের অর্থ বোঝাবে না, তাদের গুলাম বানাবে। তাদের নিজের মানসিকতা ও প্রবৃত্তির কারণে ইংরেজী ভাষাকে উচ্চ মৌজুদ (উপপস্থিত) ভাষাই সত্য মনে হবে। কিন্তু কিরোসম ভারতীয় ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, মহান বিদ্ধতাধারক লেখকের দ্বারা লিখিত ইংরেজী পুস্তকের আধারে জ্যোতিষশাস্ত্র বুঝবে না। শেষে (অন্তে) শাপিত (অভিশপ্ত) হবে, এবং তার কারণ তার মধ্যে মূর্খতা ও ক্রুরতা হবে।

তারজন্য মহাপরিবর্তন কালের আরম্ভ হবে। সেই কাল ১৯০৫ থেকে ২০২৮ পর্যন্ত্য হবে। সর্ব প্রথমে ভারতকে সাতন্ত্র করার জন্য কংগ্রেসের স্থাপনা হবে। ভারতীয় জনতা মহান রাক্ষস কুম্ভকর্ণের মত গহরী (গভীর) ঘুম থেকে জাগ্রিত হতে লাগবে। মিথ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র নষ্ট করে, অচুক (স্পষ্ট সত্য) ভবিষ্য জ্ঞান দেওয়ার জন্য মাদ্রাসে K.S. Krishnamurti-র জন্ম হবে, ঐ ভারতীয় জনতাকে কৃষ্ণমুর্ত্তি পদ্ধতির জ্ঞান দেবে। ১৯৯৮ সালে মহারাষ্ট্রতে এক জ্যোতিষশাস্ত্রী নাস্ত্রেদমসের ভবিষ্যবাণীতে অঙ্কিত সাংকেতিক ভাষার স্পষ্টীকরণ করবে, তাতে লিখিত ভবিষ্যঘটনার অর্থ দিয়ে নিজের ভবিষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত করবে। ওই সময়ে তিনি ভারতে অজ্ঞাত জ্যোতিষ দ্বারা, কলিযুগের বিষয়ে দেওয়া মহান সাংকেতিক ভাষার অর্থকে স্পষ্টীকরন করে, তাতে লেখা ভবিষ্যবাণীর অর্থ স্পষ্ট করবে। কিন্তু ভারতীয় জনতার উপর, সত্ত্বাধারী নেতাদের উপর প্রচন্ড মিথ্যাচারী জ্যোতিদের প্রভুত্ব হবে। তারা এই নতুন মহান জ্ঞানী জ্যোতিষের ভবিষ্যবাণীকে প্রকাশ্যে আসতে দেবে না। কারণ তাদের উপর স্বার্থেরও অন্ধকার অজ্ঞানী, মিথ্যা ধর্ম জাতির ভূত চড়ে বসে থাকবে। এখনও সেই গারুড়ী কাজে মগ্ন হয়ে সত্যের, মানবতা ধর্মের, সত্য জ্যোতিষজ্ঞানের খুন করতে থাকবে।



नॉस्ट्राडेमस्

यांचे जागतिक स्तरावरचे भविष्य

- डॉ. रामचंद्र ज. जोशी

21 ব্যা শতকাকডে ঝেপাবতাংনা
জগাতীল সর্বশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যবেত্ত্বা!
মায়কেল দ নাত্রদেম (নাস্ট্রেডেমস)
যাঞ্চে জাগতিক স্তরাবরচে ভবিষ্য

ডাঃ রামচন্দ্র জ. জোশী

জোশী ব্রদার্স অপ্পা বলবন্ত চৌকি, পুনে — ২ ফোন - ৪৪৫৯৪২৪	**শ্রী গজানন বুক ডেপো** ভরত নাট্য মন্দিরা সংমার পুনে — ৩০ ফোন - ৪৪৭৩৩০৪
শ্রী গজানন বুক ডেপো কবুতর খানা, দাদর মুম্বই — ২৮ ফোন - ৪২২৭৫৮৪	**শ্রী গজানন বুক ডেপো** বিল্ডিং নং, ১৩২ একতালা পন্তনগর, ঘাটকোপর, মুম্বাই — ৭৫ ফোন - ৫১৩৮০০৯

——————— (৩২) ———————

আফ্রিকেলা বলসা ঘালন্যাচা দ্রাবিড়ি-প্রাণায়াম ত্যা সুবেজ কালব্যচ্যা নির্মিতীনে কমী ঝালা হে খরেচ, পণ ত্যা কালব্যচ্যা নির্মিতীচি কল্পনা নাস্ত্রোডেমসচ্যা বিলক্ষণ ভাকিতানে ফ্রেঞ্চ বাস্তুশাস্ত্রবিশারদ লেসেপ্রণ য়ালা সুচলেলী আহে হি বস্তুস্থিতী আহে।

পাহিল্যা প্রকরণাতচ স্পষ্ট কেলে আহে কি ১৯৯৯ সালী ছেডল্যা জানাষ্যা তিসয্যা জাগতিক মহাযুদ্ধতে, আজ পরবর পাহতা পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রে মিত্র বনুন, আমেরিকা ও রাশিয়া যাঞ্চে একত্রিত বল প্রচন্ড অসেন, নাস্ত্রোডেমসচ্যা মৃত্যুন্তর ২০৯ বর্ষানী জন্মালা আলেলী আমেরিকা আপল্যা সামর্থ্যা চ্যা শিখরাবর আসল অসে শতক ২ শ্লোক ৪৯ মধ্যে হা দ্রষ্টা জ্যোতির্বিদ সাঙ্গতো হে সত্য কিতী চিত্তথরারক আহে?

ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্র?

যা পূর্বীত্যা লেখাত কৈ, ইন্দিরা গান্ধিঞ্চা নাস্ত্রোডেমসনে কেলেলা উল্ল্যেখ আপনা বাচলা, ত্যা সন্ধর্ভাত (হনরী সী রোর্বটস "কমপ্লীট প্রোফেসীজ অফ্ নাস্ত্রোডেমস যা ১৯৪২ সালী প্রসিদ্ধ ঝালেল্যা আপল্যা পুস্তকাত লিহিতো 'ডোমিনট প্রিমিয়র' (মহনজেত প্রভাবী পন্তপ্রধান) ইন্দারাজী গান্ধী যাঞ্চ্যা আকস্মিক খুনান্তর দোল বদল হোতীল, ত্যাতীল ক্রমাঙ্ক পহিল্যা বদলাপ্রমাণে ত্যাঞ্চে পুত্র রাজিব গান্ধি জরী পন্ত প্রধান ঝালে অসলে তরী দুসরা জো বদল হোনার আহে তাং মহনজে এক মধ্যম বয়াচা নেতা পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, তিবেট, আফগানিস্থান, মলায়া আদি দেশ, জিঙ্কুল হিন্দু স্থানালা জগাতীল সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাষ্ট্র মহনুন নির্মান করনার আহে, তো সার্বভৌম অসেল। ঔদার্যাত অজোড় ব আপন্যা সনাতন ধর্মালা পুনরজ্জীবন দেইল আনি ভারত খন্ডাচত নবহে তর সান্যা পৃথিবীবর সুবর্ণযুগ আনীল (সেঞ্চুরী শতক ৪ শ্লোক ৪১ বা) যা শ্লোকাবদ্দল সর্বচ ভাষ্যকারান্ত একমত আহে, বরীল দোন বদলাঞ্চা দরম্যানঞ্চা কালাত সত্তাধারী মন্ডলীতে বাবরনারী চান্ডাল চোকড়ী সত্তাকেন্দ্র আপল্যা অব্যাত ঠেবুন বরাচ কাল মনমানী করীল, বর উল্ল্যেখ কোলেনা নেতা ফক্ত জগালা অদ্যাপ মাহীত ব্যাথচা আহে।

---------------- (৩৩) ----------------

ঃ ৪ ঃ

থাম্বা, ই. স. ২০০ মধ্যে

রামরাজ্য য়েতেয় !

হিন্দু জগজ্জেতা ভুতলাবর সুবর্ণ-যুগ আপনার আহে !

জ্যোতিষ হে হি এক শাস্ত্র আহে

শিতাবরুন ভাতাটী পরীক্ষা' যা বাকপ্রচারনুসার নাস্ত্রোডেমস যাত্রী বর্তবিলেল্যা অনেক ভাকিতাঞ্চে খরেপন আপনা গেল্যা প্রকরনাত পাহিলে, নাস্ত্রোডেমস যান্না হে সর্ব জ্ঞান আগামী পিঢ়ীলা দেনে আবশ্যক বাটলে; ব ত্যানে 'সেঞ্চুরী সন্ধ্যে দহা শতকে (১০০০ শ্লোক লিহীলিং ব ১৫৫৫ সালী তেং পুস্তক প্রসিদ্ধ ঝালে যা পুস্তকাতিল শ্লোকাঞ্চি বর্গবারী কেলী তর অসে আঢ়লতে কী পহীলে সুমারে ১০০ শ্লোক ফাঞ্চ বা ইউরোসাঠী, মহনজে নাস্ত্রোডেমসচ্যা কালাতীল ঘটনান্বদ্দল কেলেল্যা ভাকিতাম্বরচ খরচ ঝালে আহেত ত্যানন্তর ৩৫০-৪০০ শ্লোক ২৯-২০ ব্যা শতকাতীল ঘটনাঞ্চ্যা ভাকিতাঞ্চা উহাপোহ করন্যাত লাগলে অসুন উরলেল্যা ৪৫০ - ৫০০ শ্লোকান্ত ২১ ব্যা শতকাপাসুন ই. স. ৩৭৯২ পর্যতচ্যা কাল খন্ডাত হোউ ঘাতলেল্যা ভাকিতাঞ্চে বিবরণ আলেলে আহে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র হে অসে চমৎকারিক শাস্ত্র আহে কী সর্বসামান্য মানসানপাসুন অধিকারী বর্গ, দেশা-রাষ্ট্রাঞ্চে শাস্ত্রে, ধনাঢ্য, শ্রীমন্ত, রাজেরজবাড্যাপর্যন্ত সর্বান্নাচ ত্যাচে আকর্ষণ আহে, উঘডরীত্যা ত্যা শাস্ত্রাচ্যা নিষেধ, পরন্তু খাজগীরিত্যা ত্যাচী চাচপনীচ কেবল নবহে তর অবর্জুন ত্যা শাস্ত্রাচ্যা পারমগত জ্যোতির্বিদাচী মনধরনী করন্যাচী প্রথা সর্বকালী ব সর্বদেশন্তুন রুঢ় অসল্যাচে দিসতে, জ্যোতিষ হে শাস্ত্র আহে, ত্যাচে আকাশস্থ গ্রহানঞ্চ্যা গতিনুসার ধরলেলে আড়াখে আহেত, ইথুন তিথুন নিসর্গ হা সারখাচ অসল্যানে ত্যা ত্যা কালচ্যা গ্রহ স্থিতিনুসার ব্যক্তি, সবাজ, দেশনি ত্যাচে ধর্ম, সংস্কৃতি আবর পরিণাম ঘড়ত অসতাত, জ্যোতিষি ফক্ত ত্যানে কেলেন্যা শাস্ত্রাভ্যাসাচ্যা আধাররূপে মিলবিলেন্যা জ্ঞানানে জে পরিণাম ঘড়ায়চে অসতাত ত্যাচী আগাউ মাহিতী সাঙ্গতো ত্যাচে আনন্দদায়ী, সুখসংবর্ধক বদল স্পষ্ট করতো তে বদল কেবহা কসে হোতিল ত্যাবদ্দল ভাকিত বর্তবতো ত্যাচপ্রমানে দুঃখ বর্ধক উনযাপালথী কায় হোতিল ত্যাচীহি নোন্দ করীত অসতো, জে ঘরায়চে অসতে তে জ্যোতিষালা ঠালতা য়েত নাহী কিংবা তো তে ঘড়বীতহি না হী মহনুন নাস্ত্রোডেমস সারখে জগপ্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ আত্মবিশ্বাসানে মহনতাত কী, মী লিহিলে, সাঙ্গিতলে ত্যাত কাহিহী বদল করন্যাচী মাঝী ইচ্ছা নাহী।

---------------(৪০)---------------

গেলী নউ বর্ষে ইরাক বরোবর বিধংসক যুদ্ধাৎ গেলি, জবল জবল এক হাজার কিলোমিটার প্রদেশ ইরাকনে সোডলেলা পাহী, যুদ্ধ কৈদী সোডবিতা আনে নসল্যানে যুদ্ধ থাম্বলে, পরন্ত ইরানচী মানহানী সম্পলেনী নাহী যা যুদ্ধাত পেট্রোলিয়মচ্যা উদ্যোগাচী মহত্বাচী সাধনে উদ্ধবস্ত ঝালী, অর্থব্যবস্থা, উদ্যোগ ধন্ধে, রোজগার য়াঞ্চী ঝালেলী হানী ফার মোঠী আহে, শাহ য়াঞ্চা পদচ্চুতিচ্যা সুমারাস জী স্থিতি হোতী ত্যাপেক্ষা কিতীতরী পটীনে সধ্যাচী ইরানচী আর্থিক স্থিতি ঢাসললী আহে।

আপলে ঘরদার, কৌটুম্বীক সুখ ব সুরক্ষীততা যা বাবীঞ্চা বিচার ঠালতা য়েনে অশক্য ঝালে আহে, আনি ত্যাবদ্দল বহুজন সমাজ বোলু লাগেনা আহে, ইরানী রাষ্ট্রাঞ্চ্যা সমস্যানা তোন্ড ফুটু লাগলে আহে আনী ত্যা সমস্যাঞ্চী সোডবলুক করায়লা ইস্লামচী অথবা ধর্মাচী বাঢ় পুরেশী পড়নার নাহী য়াচী জানীব বহুজন সমাজালাচ নবহে তর সত্তারুঢ় পক্ষাতল্যা সবালান্নাহী হোউ লাগলী আহে।

নাস্ত্রোডেমস য়ানী শতক ১ শ্লোক ৭০ মধ্যে অসে স্বচ্ছ লিহুন ঠেবলে আহে কী, খোমেনীচ্চা কড়ব্যা হেকটপনালা বিরোধকচ কড়বেপনালে মোড়ুন কাঢ়তীল নি খোমেনী বিরোধকাঞ্চী সরসী হোইল;ত্যাঞ্চা বিজয় হোইল, অখেরীস ফ্রান্সচ মধ্যস্থী করুন খোমেনী ব ত্যাচে সাথীদার য়ান্না দয়া দাখবাবী অসেল সাঙ্গেল ব বন্ডখোর ফ্রান্সচা সল্লা মানতীলহী! নাস্ত্রোডেমস য়া সর্ব ঘরা মেডীঞ্চে বর্ণন করুন সাঙ্গতোয় 'থাম্বা রামরাজ্য য়েতেয়! জুলৈ ১৯৯৯ তে ই, স ২০০৬ পর্যন্ত চালনান্যা য়া সর্ব সংহারক যুদ্ধাঞ্চ্যা শেবটী সুবর্ণযুগ অবতরেল;হিন্দুস্থানাত উগবনারা তারনহার শায়রন ব ফ্রেঞ্চ নেতা মার্স য়াঞ্চী যুতি হোইল ত্যানান্তর ৩ বর্ষে জগাত সুখ-সমৃদ্ধি, ব শান্ততা নান্দেল (১০/৮৯)

নাস্ত্রোডেমস নিঃসন্ধিগ্ধপনে মহটলয়েঃ কী নব্যানে প্রকট হোনারা শায়রন (CHYREN) আজচ্যা ঘটলো অজ্ঞান আহে, পরন্ত তো খ্রীষ্টান বা মুসলীম নসেল পাশ্চাত্য বিদ্বানান্নানীহি হে বিধান মান্য কেলে আহে।

নাস্ত্রোডেমস স্বতঃ জিউ বংশাচা খ্রিষ্টান ধর্ম স্বীকারলেলা, ফ্রান্সচা নাগরিক, তো ৪৫০ বর্ষীনী অবতরানারা বিশ্বনেতা হিন্দুচ অসেল অসে ছাতিঠোকপনে সাঙ্গতো, ত্যা হিন্দু নেত্যাচা গৌরব করতো তো হ্যাচ কারন্নানী কী ত্যা স্বাতন্ত্রসূর্য শায়রনচ্যা উদয়াবরোবর আধীতে নেতে নিষ্প্রভ হোউন নম্র হোতিল, তো শায়রন তিসন্যা জাগতিক যুদ্ধাচ্যা কালান্তর বাচলেল্যা নাগরিকান্না কায়দ্যাচে রাজ্য দেইল, কুনাবরহী অন্যায় হোনার নাহী, গুনাঃ পূজাস্থানন নচ লিঙ্গম্ নচ বয়ঃ বরোবরচ 'নচ শ্রদ্ধাস্থানঃ' হী ত্যা লোকশাহী রাজ্যাচী বেদী অসে সামাজিক রচনা 'গুনকর্মবিভাগশঃ আসল জন্মদাত্যা মাতাপিত্যাচ্যা শ্রদ্ধাস্থানান্বর তী আধারলেলী অসনার নাহী, রাখীব জাগা, খাস হক্ক হী ভাষা অসনার নাহী, ত্যাচপ্রমানে দলিত, মাগাসলেলা সমাজ অসি বিভাগনীহি যা সাম্রাজ্যাত অসনার নাহী, প্রত্যেকাচ্যা বৈয়ক্তিক গতিশীল প্রয়ন্তানা প্র্যোত্যাসাহন দিলে জাইল ত্যাচ্যা প্রগমনশীল কর্তৃত্যালা ভরপুর সন্ধি ব বাব দিলা জাইল সরসকট আভিষাঞ্চি খিরাপত বাটলি জালার নাহী যামুলে জো মেহনত করিল।

---------------(৪১)---------------

ত্যালা 'সন্ধি' মিলেলচ মিলেল অশী আশ্বাসক খাত্রী পটল্যানে রাষ্ট্র সংবর্ধননালা আবশ্যক অসনারী চঢ়ায়োঢ় সমাজাত মানবালা কার্যপ্রবণ করীল শাসন অমানবী বাগরানাপ্পা রধনিবর অনীলচ, শিবায় ত্যাঞ্চাতিল অতিরেকাঞ্চা নিঃপাত কেলা গেলা জাইল, সর্বান্না লাগু পড়নারা সমান কায়দা রাজ্যভর কসোশীনে পালন্যাত য়েইল

আতা এক গোষ্ঠ নির্বিবাদপনে সিদ্ধ ঝালী আহে কী তিসন্যা অতি সংহারক মহাযুদ্ধ াতুন নব্যানে দর্শন ঘরবিনারা তারনহার 'এশিয়া খন্ডাত জন্ম ঘেতলেনা অসেল, (শতক ২০ শ্লোক ২৫) ইউরোপতে নাহীচ নাহী! তো খ্রীষ্টান নসেল, মুসলমান তর নসেলচ নসেল, জিউহি অসনার নাহী, তর হিন্দুচ অসেল অসে জে নাস্ত্রোডেমসনে নিঃসন্ধিগ্ধপনে মহটলেয় তে পাশ্চ াত্য বিদ্বানান্নাহি মান্য আহে তো হিন্দু নেতা অন্য সর্বভূতপূর্ব নেত্যাংপেক্ষা মহত্তর অসেল, বুদ্ধি মান অসেল, অঞ্জিক্যহী! নাস্ট্রোডেমসচা শতক ৬ শ্লোক৭০ ফার মহত্ত্বাচা মানাবা লাগেল।

The grest **CHYREN** will be
Chief of the world
Loved feard and unchallenged
even at the death
His name and praise will reach
beyond the skies
And he will be content to be
known only as Victor.

মহান শায়রন জগাচা প্রমুখ নিয়ন্তা হোই ল ত্যাচাবর সর্বসামান্য জনতাপ্রেম করীল; ত্যাচবরোবর ত্যাচা বচক এবঢ়া অসেল কী প্রজাজন কাহীহী অপকৃত্য করায়লা ধজনার নাহীত ত্যাচ্যা মৃত্যুনন্তরহী ত্যাচা দবদবা কায়ম রাহীল, ত্যাচেনাব আনি পরাক্রম নাগরিকাঞ্চা মনাবর ইতকে খোলবর পরিণাম করতীল কী ত্যাচী কীর্ত্তি ত্রিখন্ড পসবেল সামর্থ্য প্রচন্ড অসেল কী শত্রুত্যাচ্যা দেশালা ঘাবরতীল, ত্যাচা রাজ্যাচী, নবহে সাম্রাজ্যাচী দহশত মানতীল তো সার্বভৌম অসেল ত্যাচ্যা কর্তৃত্যাচা প্রভাব সম্পূর্ণ জগাবর পড়েল হা মহান হিন্দু নেতা ভারতালা ভূমি আনি সাগর আবর অঞ্চিক্যপদ প্রাপ্ত করুন দেইল, আতা পর্যন্ত নিদ্রিস্ত অসলেল্যা হিন্দুনা খড় বরুন জাগ্রীত করুন ত্যাঞ্চাকরবী অসী কাহী চিরন্তন কামগিরী করবীল কী জ্যানে তে আপল্যা পূর্বজ্যাঞ্চে স্বার্থ বারস ঠরতীল, শতক ২, শ্লোক ৭৯ দ্বারা দ্রষ্টা নাস্ত্রোডেমস স্বচ্ছপনে সাঙ্গতোয়কী, শায়রন এর আনিহিংসক জমাতীতল্যান্না ঠিকানাবর আনিল আমি চন্দ্র কোরিচ্যা তাব্যাতীল ভূমি মুক্ত করীল ত্যাচে হে শব্দচ পহা কিতি বোলকে আহেত!

ফ্রেঞ্চ—

Subjuguva 10 gent crelle add fire be grand chyren ostena du longin tous las captifs par seline baniaet.

---------------(৪২)---------------

ইংলিশ মধ্যে স্বৈর ভাষান্তরিত শব্দাত সাঙ্গায়চে তর—

Will subjugate the cruel and
violent freed,
The great **CHYREN** will
take from distance,
All those held captive by
crescent moon.

বরীল শ্লোকাতীন Cruel and violent held captive by crescent moon.

মহনজেচ হিংসক আনি ক্রুরচন্দ হে শব্দ ইতকে অর্থবাহী আহেত কী বরীল উল্লেখ মুসলমানান্না উদ্দেশুনচ আহেত যাবাবত দুমত ন বহাবে

থোড়ক্যাত সঙ্গায়চে তর শায়রনচ্যা কারকীর্ত্তিদ যা ভুতলাবর সুবর্ণযুগ অবতরেল ত্যাচ্যা মৃত্যুনন্তরহী ত্যাচ্যা মহানতেচে ব সদগুনাঞ্চে আবর্জুন গুনগান হোত রাহিল পণ ত্যাচ্যা মনাচী শালীনতা, বিনম্রপনা ব ঔদার্য্য ইতকে ঢলঢলীতপনে দিসতে কী য়াপুর্বী নমুদ কেলেন্যা শতক শ্লোক ৩০ ব্যা শ্লোকাচ্যা শেবটচ্যা গুলিত ত্যাবদ্দল কেলেনা উল্লেখ ফারবোলকা আহে, (শায়রণ মহনতোয়) 'জলতেনে ত্যাচ্যাবদ্দলচা উল্লেখ ফক্ত এক বিজয়ী নেতা যা তিন শব্দাত করায়চা ৩ শদাত করায়চা আনখী বিশেষণে ত্যাচ্যা নাবালা চিকটব নুয়েত।

মধল্যা কালাত হিন্দুধর্মাচে ব হিন্দুচ্যা আদর্শবত্ জীবনাচে পুসট ঝালেলে ক্ষণচিত্র্ পুনহা আপল্যা দ্বেদীপ্যয়মান উতুঙ্গ স্বরূপাৎ প্রস্থাপিত হোনারচ, আনি মানবী সংস্কৃতী নির্ধোক বলেল হে, নেস্ত্রোদমেস পুরেশা স্পষ্টপনে সুচবিলে আহে, ত্যাত সংদিগ্ধতা কুঠেহী নাহী হে সর্ব ঘরবুন আননার। আজ অজ্ঞাত অসনারা পরন্তু যোগ্য সময়ী প্রকট হোনারা মহাপুরুষ তথা শায়রন হা হিন্দুধর্মীয়চ আসল অসেহী নাস্ত্রোডেমস নিখালস পলে সাঙ্গতো, নবহে নবহে, জবল জবল সাড়েচারশে বর্ষাপূর্বী অক্ষরবদ্ধ করতো।

ত্যানে যা শায়রনাচ্যা মনাবা ঘেতলেলা বেধহী ইতকা কাহী তর্কশুদ্ধ ব অচুক আহে কি নাস্ত্রেডেমাসচ্যা দ্রষ্টেপলাচে আশ্চর্য বাটতে। নাস্ত্রেডেমসনে মটলেয়কি, শায়রন বেচৈন মনানে খুপ প্রবাস করিল যা বেচৈনিচে কারণ কায় অসনে শক্য আহে? আপল্যা ধর্ম বান্ধবাচ্যা সমস্যা আনি ত্যাঞ্চী সদ্যঃকালীন দয়নীয় অবস্থা হে অসু শকেল! ত্যা বচৈন অস্বস্থ্ মনাচা কানোসা আপন পুঢ়চ্যা প্রকরণত ঘেউ!

---------------(৪৩)---------------

নাস্ট্রোডেমসচ্যা ভাকিতাল্লা দুজোড়া দেনারী আনখী কানহী ভাকিতে

উভ্যা আয়ূষ্যাত ভারতালা কধীহী ভেট ন দিলেল্যা মহর্ষী নাস্ট্রোডেমসনে, সুমারে ৪০০-৮৫০ বর্ষাপূর্বী ২০০১ সালী প্রলঙ্কারী বিনাশাচ্যা উম্বরঠয়াবর অসলেন্যা জগালা শায়রন **(CHYREN)** হা হিন্দু নেতা আপল্যা ক্ষাত্রনেজানে তারনহার হোইল য়া স্বাতন্ত্রসূর্যাচ্যা আগমনানে বলচ্য হিন্দু রাষ্ট্রাচ্যা উদয় হউন হিন্দুচে পুনুরাত্থান হোইল, হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন হোউন 'সুবর্ণ যুগ অবতারেল' অসে ভবিষ্য শব্দবদ্ধ কেলে অঅহে।

১৯৯৯ সালী সুরু হোনান্যা ব ই. স. ২০০৬ লা সম্পন্নাব্যা মহাযুদ্ধা সম্বন্ধী অনেক শ্লোকাত নাস্ট্রোডেমস লিখিত 'সেঞ্চুরী' মধ্যে 'শায়রন' যা টোপন নাবাচা উল্লেখ 'বিশ্বনেতা' মহনুন ঠিকঠিকানী কেলেলা আঢ়লতো, গেলি জবল জবল ২০০ বর্ষে য়া 'শায়রন' চা শোধ ঘেন্যাচে কাম নাস্ট্রোডেমস বিষয়াতীল তজ্ঞ হিরীরীলে করীত আহেত গেল্যা প্রকারাননান্ত য়া বিশ্বনেতাবন্দন নাস্ট্রোডেমসচ্যা কিত্যেক অভ্যাস কান্নী লঢ়বিলেলে তর্ক কুতর্ক কিতী বিসংগত আহেত হে দাখবিলে; আনি ত্যা সংদর্ভাত সন্ধ্যাচা ইরানচা ধর্মনেতা আয়াতুল্লা খোমেনিচে নাব আগ্রহানে ঘেতলে জাতে তে তর কিতি অসংবদ্ধ আহে ত্যাচীহি চোঁ কৈলী।

নাস্ট্রোডেমসচ্যা ভবিষ্যবাণীত 'ক্রম' নসতো-সকারণ নসতো, অ্যামুলে হে তর্কাধিষ্ঠিত ঘোটালে হোতাত হে জরী খরে অসলে তরী নাস্ট্রোডেমস বেগবেগল্যা লোকাংমধুপ শায়রন বাতে জে বিখুরলেলে উল্ল্যেখ করতো ত্যাবরুন এট পাহান্যাত্ত্যা রুত্ত্যা জাগতিক যুদ্ধ কালাতীন ক্ষিতিজাবর নবয়ানে উগবনারা পণ আজ জগালা অজ্ঞাত অসলে না জগজ্জেতা কোন অসেল, কুঠচা অসেল যাবাবত সুসঙ্গত তর্ক করায়েলা উডচন পড়ু নয়ে

পৃষ্ঠ সংখ্যেচে বন্ধন লক্ষান্ত ঘেউন আতাপর্যন্ত নাস্ট্রোডেমসচ্যা শ্লোকাঞ্চে 'শতক অমুক ব শ্লোক ক্রমাংক অসুক' এবচাচ নির্দেশ করুন ত্যানে বর্তবিলেল্যা ভাকিতাঞ্চা মা গোবা ঘেত ঘেত গুঢ়ার্থাঞ্চী উকল কেলী পরন্ত। আতা যাপুঢ়ে মহান্ শায়রনাচ্যা কর্ত্তৃত্বাচ্যা প্রকাশ পাডনান্যা ভাকিতান্বদ্দলচে লেখন, নুসতেচ শতক 'শ্লোক' ক্রমাঙ্ক অশা সংদর্ভাৎ ন দেতা, আবশ্যক তেবঢ়ে মূল শ্লোক, জসেচ্যা এসে, উদ্ধৃ ত কেল্লাশিবায় বাচকাঞ্চেহী সমাধান হোনার নাহী মেহনুন তে প্রসিদ্ধ করন্যাচে যোজিলে আহে, মূল ফ্রেঞ্চ ভাষেতীল শ্লোক দেনে অশক্য নাহী তরী তী ভাষা অত্যাল্প লোকান্না সমজনারী অসল্যানে ত্যা শ্লোকাঞ্চে ইংগ্রজীত ভাষান্তর উদ্ধৃত কেলে জাইল ত্যাবরুন নাস্ট্রোডেমসচ্যা এককো বিধানাচে নিরুপন করনে সোপে হোইল।

----------------(৪৪)----------------

য়াপূর্বীচ্যা ২ য়া প্রকরনান্ত নাস্ট্রোডেমসচা জীবন বৃতান্ত দেতান্না, ত্যানে গুঢ় ভাষেত ভবিষ্যকথন কসে কেলে আহে ত্যাচে উদাহরণ মহনুন, 'সেঞ্চুরী' চ্যা শতক ৪ শ্লোক ২৪ চা পূর্বার্ধ মূল ফ্রেঞ্চ ব ত্যাচেচ ইংগ্রজীত রূপন্তরিত ভাগ উদ্ধৃ ত করুন তাবদ্দল বিবরন কেনে। তিসরে প্রকরন নাস্ট্রোডেমসচ্যা তন্তোতন্ত খব্যা ঝালেল্যা ভাকিতাঞ্চি অলোখ বাচকান্না ব্যহাবী মহনুন লিহিলে, ত্যাত পুন্যা বরীল শতকা-শ্লোকাচ্যা আধারে তারতাচ্যা 'ডোমিনন্ট প্রিমিয়র' কৈ, ইন্দিরা গান্ধী যাঞ্চা অকস্মাত (ইংগ্রেজী শব্দ আহে Sudden) হত্যেনে 'ভারত' সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাষ্ট্র ঘডবিন্যাচ্যা সম্ভাব্য দোন বদলণ্ড্যা উল্ল্যেখ কেনা তো অসা ইন্দ্রীরাঞ্চিচে পুত্র রাজীব গান্ধি হে পন্ডপ্রধান হোতিল (শ্লোকাতীল শব্দ Shall cause Change) হা পহিলা বদল তর, বরীল শব্দাংপাঠোপাঠ ত্যাচশ্লোকাত আলেল্যা and pur another in the reign soon যা অধোরেখিত শব্দাংনী হোনারে রাজিব গান্ধিচ্যা পাঠোপাঠ ২০ ব্যা শতবাচা অস্ত হোন্যাচে কালী উগবলারে দুসরে সত্ত্বাধারী মহনজেচ নাস্ট্রোডেমসনা অভিপ্রেত অসেলেলা 'শায়রন' অসেল হে সুসঙ্গত বাটতে হেনরী সী, রোবর্টস্ নামক নাস্ট্রোডেমসচে এক প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আহেত যান্নীহি বরীল বিধান উচলুন ধরলে আহে।

নাস্ট্রোডেমস এবচ ত্যাবরচ থান্বত নাহী তর বিশ্বনেত্যাবদ্দল আনখী কাহী মহত্ত্বাচ্যা খুনা দাখবতো।

শতক ৫ শ্লোক ৪২ মধ্যে নাস্ট্রোডেমসনে স্পষ্টচ সাঙ্গিতলে অহেকী, রাত্রী অন্ধ্যায়া বেলী (ত্যাঞ্চে শব্দ আহেত-Noctural time) 'তো' জন্মালা য়েইল, তো সার্বভৌম আসল আমি ঔদার্যাত ত্যাচাশী কুনীহী বরোবরী করু শকনার নাহী তো আপল্যা সনাতন ধর্মাচে পুনরুজ্জীবন করীল আনি যা অবনীতলাবর সুবর্ণযুগ অনীল।

'অন্ধ্যায়া বেলী' য়া শব্দাঞ্চে অনেক অর্থ সম্ভবতাত পৈকী এক মহনজে শ্রীকৃষ্ণাচ্যা জন্মাচে বেলে প্রমাণে 'তো' শায়রন রাত্রীচ কেবল নবহে তর অমাবস্যেচ্যা অন্ধাঃ কারময় রাত্রিহি জন্মপাবেলা আসেল! দুসরা অসাহী অর্থ হেউ শকতো কী, ভোবতালচে জগাত জেবহা ত্যা জগাস 'অন্ধার-যুগ' মহনন্যাইতকী কাল্যা কৃত্যাঞ্চী বেবন্ধশাহী মাজলী অসেল তশা ভয়ঙ্কর কালাবধীত 'শায়রন'নে যা জগাত পদার্পণ কেলে অসাবে তিসরাহী অর্থ যা 'রাত্রী' চ্যা উল্ল্যেখালা চিকটবালা জাতো, তো মহনজে, যা অবনীতলাবর চালু অসলেল্যা 'জগা' মধ্যে আনীবাণী জাহীর হোউন (উদা ২ নং মহাযুদ্ধ তে বেলী জশী অন্বলাত হোতী তশী) ব্লক আউট অসেল তেবহা জন্মালা আলেলে হে মূল অসাবে! যা সর্ব লেখনাচা ইতকাচ ইত্যর্থ নিঘতো কী আগামী মহাসংহারক তিসন্যা মহাযুদ্ধাত আমেরিকা-রাশিয়াচ্যা যুতিসহ 'শায়রন' হী তিসরী ভারতীয় শক্তি মহান কার্য করীল, আজ তী অজ্ঞাত অসলী তরী তী ব্যক্তি আজচ্যা জগাত বাবরত অসেল, অমাবস্যেসারখ্যা কুঠল্যা তরী অন্ধেন্যা রাত্রী জন্ম ঘেতলেলী ব আগামী মহান নেতা ধরনারী হী ব্যক্তিতরুণ ১৬-তে-২০-২৫তে ২০-২৪ বর্ষাচী তরী অসেল কিংবা পন্নাশীসাটী গাঠলেলী অনুভবী ধ্যৈযৈকশরন পৌঢ় ব্যক্তিহী অসু শকেল; য়াপেক্ষা শায়রনাচ্যা বয়াবর প্রকাশ পাড়নারা উল্ল্যেখ নেস্ট্রোডেমসনে কুঠে কেল্যাচে আঢ়লত নাহী।

---------------(৪৫)---------------

নাহী মহলায়লা নাস্ট্রোডেমস হে মাত্র নমুদ করতো কী যা নেত্যাব্যা নেতৃত্বাখালী ভারত ২১ জগাতীল সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলেন, ইতকেচ নবহে তর দুরবর পরসলেলে হিন্দুঞ্চে সাম্রাজ্য নব্যানে আকারসে এইল।

শতক ১ শ্লোক ৫০ মধ্যে ত্যা পুরুষাচা পুনহা উল্ল্যেখ আঢ়লতো তো অসা—

From Peninsula of three seas will be born one who will make Thursday his day of worship. His fame praise and rule will from mighty by land, Sea There will be a tempest of India.

তিন সাগরান্নী বললেল্যা ব্যাপক দ্বীপকল্পাত তো জন্ম ঘেইল;ত্যাচ্যা গুরুবার হা প্রার্থনে চা দিবস অসেল, ত্যাচী কীর্ত্তি ত্রিখন্ডাত পসরেল ত্যাচে সামর্থ্য ইতকে প্রভাবী অসেল কী ত্যাচ্যা আক্রমক ঘোড়দৌড়ী মুলে উৎপন্ন ঝালেল্যা ত্যাচ্যা প্রভাবানে বাদলী বাতাবরন উৎপন্ন হইল দ্বীপকল্প গুরুবার প্রার্থনেচা দিবস (যা সংদর্ভাত অসেহী মহটলে গেলে আহে কী শায়রনচা বিশ্রান্তি ঘেন্যাচা দিবস সোমবার অসেল) যা তিন্থী লাক্ষনিক শব্দাংদ্ধারে নাস্ট্রোডেমসলা কায় সুচবায়চে অসাবে ত্যাবদ্দল আপূর্বীচ্যা প্রকরান্তন স্পষ্টী করন কেলেচ আহে যা সর্বাঞ্চা নিঃসংদিগ্ধপনে আশয় স্পষ্ট হোতো তো হা কী শায়রন হা মহাম নেতা ভারতাত জন্মলেলা হিন্দু নেতাচ আসল।

বরীল ভাকিতালা দুজোরা দেনারে ভাষ্য নাস্ট্রোডেমসনে স্বতঃচ শতক ৪, শ্লোক ২৪ মধ্যে কেলে আহে তেচ পহা না—

The Arab Primer, Mars, Sol Venus, Leo, Rule of Church will Surrender to the sea towards Persia, close to a million, True serpent power invade Turkey and Egypt.

মার্গে উল্ল্যেখ কেলেল্যা হেনরী রোবর্টসনে যাহী শ্লোকখালি, আপল্যা পুস্তকাত টীপ দিলি আহে কী—

Christian Ideal will be overcome by oriental Ideology where serpent meaning true serpent.......'

(মহনজেচ কুন্তলিনী শক্তি ধারণ করনারী ব্যক্তি) নাস্ট্রোডেমস ভাবিষ্যাচা বেধ ঘেউন, বরীল শ্লোকাত স্বচ্ছপনে সাঙ্গুন টাকতো কী সাগরাচ্চা নাবাচা ধর্ম জ্যাচা আহে মেহনজেচ হিন্দি মহাসাগর ত্যা অনুষঙ্গানে হিন্দুধর্ম তথা হিন্দুস্থান!) কুঠল্যাহি প্রাদেশিক ভূমিকড়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করন্যাকরিতা অসা উল্ল্যেখ কুঠল্যাহী ভৌগলিক বাংময়াত আঢ়লত নাহী তো জ্যাচা আহে ত্যাচ্যা পুঢ়াকারানে ইউরোপ মাধিল নবহেত তর খ্রীষ্টান ব যাবনী সংস্কৃতীচা খাতমা কেলা জাইল ত্যাচী সারী কেন্দ্রে জ্যা জ্যা রাষ্ট্রাৎ বিখুরলেলী আহেত তী রাষ্ট্রেহী পাদাক্রান্ত কেলী জাতিল, ইতর, কোনত্যাহী ধর্মাত জ্যাপ্রমানে গুরুবারহা প্রার্থনেচা দিবস মহনুন পাললা জাত নাহী ত্যাচপ্রমানে কুন্ডলিনী শক্তি কুনাহী বিগর হিন্দুলা জ্ঞাত নাহী, হিন্দুতে খাস শক্তিস্থান আহে, তে হিন্দুচ ইজিপ্ত, তুর্কস্থান ইত্যাদি মধ্যপূর্বেত অসলেল্যা সত্ত্বাধান্যন্না দূর ফেকুন তিথে হিন্দু, সংস্কৃতি কেবল নান্দু লাগেল অসে নাহি তর তিচা অম্মল সুখেনৈব চালু রাহিল।

---------------(৪৬)---------------

বরীল ভাকিতাবর আনখী ঋগঋগীত প্রকাশ টাকনারে ভাকিত নাস্ট্রোডেমসনে শতক ১০ শ্লোক ৯৬ মধ্যে প্রসিদ্ধ কেলে আহে তে অসে Religion of the name of sea will against the sect of Caliphs of the Moon vanquish, The deplorably obstinate sect shall br afraid of wounded by Alef and Alef.'

ফ্রেঞ্চ দ্রষ্টা জ্যোতিষবর্ষানে কেলেল বরীল ভবিষ্য ফার মহত্ত্বাচে আহে কারণ, যাত জাস্তচ স্পষ্টপনে সাঙ্গিতলে আহে কী সমুদ্রাচে (তথা হিন্দী মহাসাগরাবে) নাব অসলেলা দেশ-হিন্দুস্থান খলিফাচ্যা প্রশংসিত পন্থাচা নাশ করিল, বরচ্যা শ্লোকাতীল ২ ন্যা ওলীতীল Sect ২১ শব্দ মহত্ত্বাচা ব নাস্ট্রোডেমসচ্যা মার্মিক শব্দযোজনাঞ্চা নিদের্শক আহে, ত্যা শব্দাচা কে অর্থ জসা 'পন্থ' হোউ শকতো তসাচ তো শব্দ ফ্রেঞ্চ ভাষেত বাপরলা জাতো 'শ্রদ্ধা' যা অর্থানে ! যা দৃষ্টীনে যা কাব্যপংতিচা অর্থ লাবাবয়াচা তর সমুদ্রাচে নাব অসলেল্যাঞ্চী শ্রদ্ধা তথা ধর্ম, হা স্বধর্ম আহে তর খলিফা প্রশংসিত ধর্ম হী কেবল অন্ধশ্রদ্ধা আহে যা বাক্যাচা আনখী স্পষ্টার্থ করায়চা তর নাস্ট্রোডেমসলা হিন্দু হা 'ধর্ম' তর ইসলামলা তো অন্ধশ্রদ্ধা মহলুন অভিপ্রেত আহে Obstinate হে বিশেষণ খলিফাচ্যা পন্থালা লাবুন নাস্ট্রোডেমসনে হেহী আড়পরদা ন ঠেবতা সাঙ্গুন টাকলে আহে কী, 'খলিফ-প্রশংসিত পন্থ অপরিবর্তনশীল, অতিরেকী আহে।

যা পূর্বাচ্যা প্রকরনাত 'শায়রন' মহনুন আয়াতুল্লা খোমেনীবদ্দল লিহিতান্না সদ্ধা জগভর চালু অসলেন্যা রশদীঞ্চ্যা 'সেটিনিক বহর্সেস' যা কাদম্বরী বরুন উসললেল্যা সৈতানী উদ্রেকাচা উল্লেখ কেলাচ আহে, ত্যালা আনখী দুজোরা দেনারী বাতমী নুকতীচ বাচন্যাত আলী, তীহী যা সংদর্ভাত বরেচ কাহী সাঙ্গুন জাতে অসে বাটতে মহনুন য়েথে তিচা উল্লেখ করতো প্যারিস হুন আলেলী হী সত্যকথা আহে প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ গায়িকা বেহরোনিক সান্ত্রা আপল্যা কার্য্যক্রমাৎ 'অল্লা' হে গীত সাদর করীত অসে (ম গান্ধী জ্যাপ্রমানে ত্যাঞ্চ্যা রামনামাত ঈশ্বর অল্লা তেরে নাম' অসে খাদীচে ঠিগল লাবুন মহনত ত্যা প্রমানে !) পরন্তু, গীত-গায়কালা ঠায় সারু অশী ধমকী ত্যান্না দেন্যাত আল্যাবর ত্যান্না তে গীত ন গান্যাচে ঠরবীলে নভোবানীবরীল একা মুলাখতীত হী মাহিতী দেউন পুঢ়ে স্পষ্টীকরনহী কেলে কী, বাস্তবিক যা গীতাত ইসলামচা অবমান করনারে কাহীহী নাহী, তী এক প্রার্থনা আহে, পন 'জ্ঞানলব দূর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরংন রঞ্জয়তি।।'

হে জাস্ত অনুভবসিদ্ধ বাক্য কুনাচ্যা খিজগনতীত আহে ?

মুসলিম ধর্ম্যাত্যা তত্বানা খোমেনীসারখে ধর্মান্ধ ত্যান্না অভিপ্রেত অসলে লা বেগলাচ রঙ্গ দেন্যাতা প্রয়ন্ত করীত অসতাত, ত্যাসুলে হোতে কায় তর কাহী মুসলীম মুল গ্রন্থ ন বাচতাচ বিনাকারণ কড়বে ধর্মান্ধ বলত চাললেলে আহেতমশিদী মধ্যে ঠিয্যা মারুন বসলেলে মুল্লা মৌলবী নি ইমাম আপাপলে রাজকারণ পুঢ়ে রেটনাচ্যে মনসুবে উভারন্যাত মশগুল ঝালে আহেত ভারতীয় শিক্ষণ যন্ত্র নেতুন ইসলাম বিরোধী (হেহী ত্যান্নীচ ধরবায়চে) সারে উল্লেখ কাঢুন টাকাবেত, পাঠ্যপুস্তকাঞ্চে শুদ্ধিকরন (১) কেলে

---------------(৪৭)---------------

জাবে অসি মাগনী করায়লা শুরুবাত ঝালী আহে, যা সর্বাঞ্চী পরিণতি কশাত হইল হে সাঙ্গ নে আতা পর্যন্তচ্যা অতিরেকী অনুভবাবরুন জানতা যেন্যাসারখে অসলে তরী জ্যা বেগানে ১৯৯৯ চা ঝঞ্ঝাবাত মসীপ যেত আহে ত্যা বেগাশী সুসঙ্গত অসা অত্যাচারাঞ্চা নেহলী উসলনারা ডোম্ব লক্ষাত আলা কী হীচ বাবটল আগামী তিসন্যা মহাযুদ্ধাঞ্চী নান্দীধরান্যাঞ্চী শক্যতা নাকারতা এনার নাহী।

১৭ ব্যা শতকাত জ্যাপ্রমানে মুসলমানাঞ্চা অত্যাচারান্নী হিন্দুস্থানান্ত মর্যাদা গাঠলি তেবহা মুঠভর মাবলআন্না একত্র করুন পরিস্থিতিশী মুকাবলা করনে অপরিহার্য ঝালে।

তেবহা বাল শিবরায়ান্নী বিজাপুর সোডুন মুন্যাচ্যা আপল্যা জহাগিরিত রাহায়লা শুরুয়াত কেলী ব আপল্যা সবঙ্গড্যাংসহ করঙ্গলীচে বোট কাপুন শ্রীশঙ্করাবর (রোহিতশ্বর?) রক্তাচা অভিষেক করুন স্বরাজ্যাচী মুহুর্তেমেঢ় রোবলী, হাতাশী অশলেলে সীমিত মনুষ্যবল, যুদ্ধ মান শাস্ত্রাঞ্চা তুটবড়া, অর্ধপোটি জেবন, আনি একন্দর সমাজাবর মুসলমানী অম্বলাচী খোলবর রুজলেলী দহশত ব ত্যাসুলে রুললেলী অগনিকতা যামুলে গানিমী কাব্যালে য সত্তেশী দোন হাত করাবে লাগলে, পারন্ত্র্যাচা এক অবশ্যমেব ভাগ অসা অসতো কী ত্যাবিরুদ্ধ প্রথম উঠাব করনাবালা নামোহরম করনে, ঘরচ্যাপেক্ষা বাহেরচা সত্ত্বাধারী আপলাসা বাটলে! ঘরভেদীপনা সৎকর্মাচা রঙ্গ ঘেতো, প্রত্যেক কৃতিলা ধর্মান্ধতা মহল্যাত যেতে, জাতীয়তেচা ছাপ মারলা জাতো সূর্যাজী পিসালাচী অবনাদ উত্তম হোউন ফন্দ ফিতুরী বাঢ়তে যা সর্বান্বর মাত করুন শিবরায়ন্নী রাজগড়াবর তোরন বান্ধুন, রাজ্যাভিষেক করবিলা তেবহাচ ভূষন কবীন্নী ত্যাঞ্চা গৌরব কেলা তো যা শব্দান্নী শিবাজী ন হোতা তো সব কী হোতী সুন্তা' ইতিহাসাচি পুনরাবৃত্তি হোত অসতে অসে মহনতাত ত্যানুসার আজহী শায়রনচ্যা নেতৃত্বানে হিন্দুত্বাচী দ্বাহী ফিরবন্যাচী নেমকী বেল আলী আহে, শিবরায়ান্নী অনুসরলেলা মার্গ ধর্মান্ধতেচা নব হতা ওর 'স্বত্ব' টিকবিন্যাচা হোতা ত্যাকরিতা প্রাণাঞ্চি বাজী লাবুন মরাঠমোল্যান্নী লঢ়া দিলা হোতা, তী স্ফুর্তি নন্তর ১৯ ব্যা শতকাপর্যন্ত কার্যরত হোতী মরাঠাঞ্চা ভগবা জরিপটকা অটকেপার লাগলা দিল্লিচে তক্ত ফোডুন আপল্যা শৌর্যাচী মুদ্রা ভারত ভর পসরলেল্যা ভারতীয়াবর উমটবলী এবঢ়ী মর্দুমকী অসুনহী দিল্লিচ্যা সিংহাসনাবর তক্তাবর শেবট পর্যন্ত মরাঠা ন বসবিতা মোঘল বাদশাহীচ চালু রাহিলী হে বিষয়ান্তর এবচ্যাসাঠীচ কেলে কী হিন্দুচী যুদ্ধ প্রবীনতা তে সত্ত্বাধীশ হোন্যাইতকী বলশালী অসুনহী ত্যাঞ্চা বিশিষ্ট মানসিক ধেবনিনুসার তে আক্রমক সত্ত্বাধারী কেবহাচ ঝালে লাহিত হে স্পষ্ট বহাবে!

ভারতীয় হিন্দু হে নিঃসর্গতঃ ব ত্যান্না মিলালেল্যা ধার্মিক ব আধ্যাত্মিক বারসানুসার প্রবৃত্তিনে সৌম্য প্রকৃতিচে আহেত, আক্রমক নাহিত। পরন্তু যা আধী উদ্ধৃত কেলেল্যা নাস্ট্রোডেমসচ্যা শতক ১, শ্লোক ৫০ প্রমাণে শায়রন হা হিন্দু নেতা অখিল হিন্দুবিশ্ববালা জাগৃতি আনুন স্বতঃচ্যা বাদলী ব্যক্তিমত্বানে। আপল্যা ভূমি নি সাগরী সামর্থ্যাচে দর্শন ঘডবিলার আহে অজিনক্য হিন্দুনেতা হী আপলী প্রতিমা সর্ব।

---------------- (৫২) ----------------

প্রারম্ভী জগাচ্যা ক্ষিতিজাবর উগবলার আহে, হা জো বদল ঘডনার আহে তো নাস্ট্রোডেমসচ্যা ইচ্ছেনে ঘডনার নসুন নিয়তিচ্যা ইচ্ছেনে হা সারা বলাব ঘড়নার আহে ত্যাতুন নবীন জে ঘডনার আহে তে মহনজে হিন্দুস্থান হা সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হোনার আহে আজ কিত্যেক শতকে ন দিসলেলে, দৃষ্টিয়াড ঝালেলে হিন্দুঞ্চে সাম্রাজ্য অবতরনার আহে।

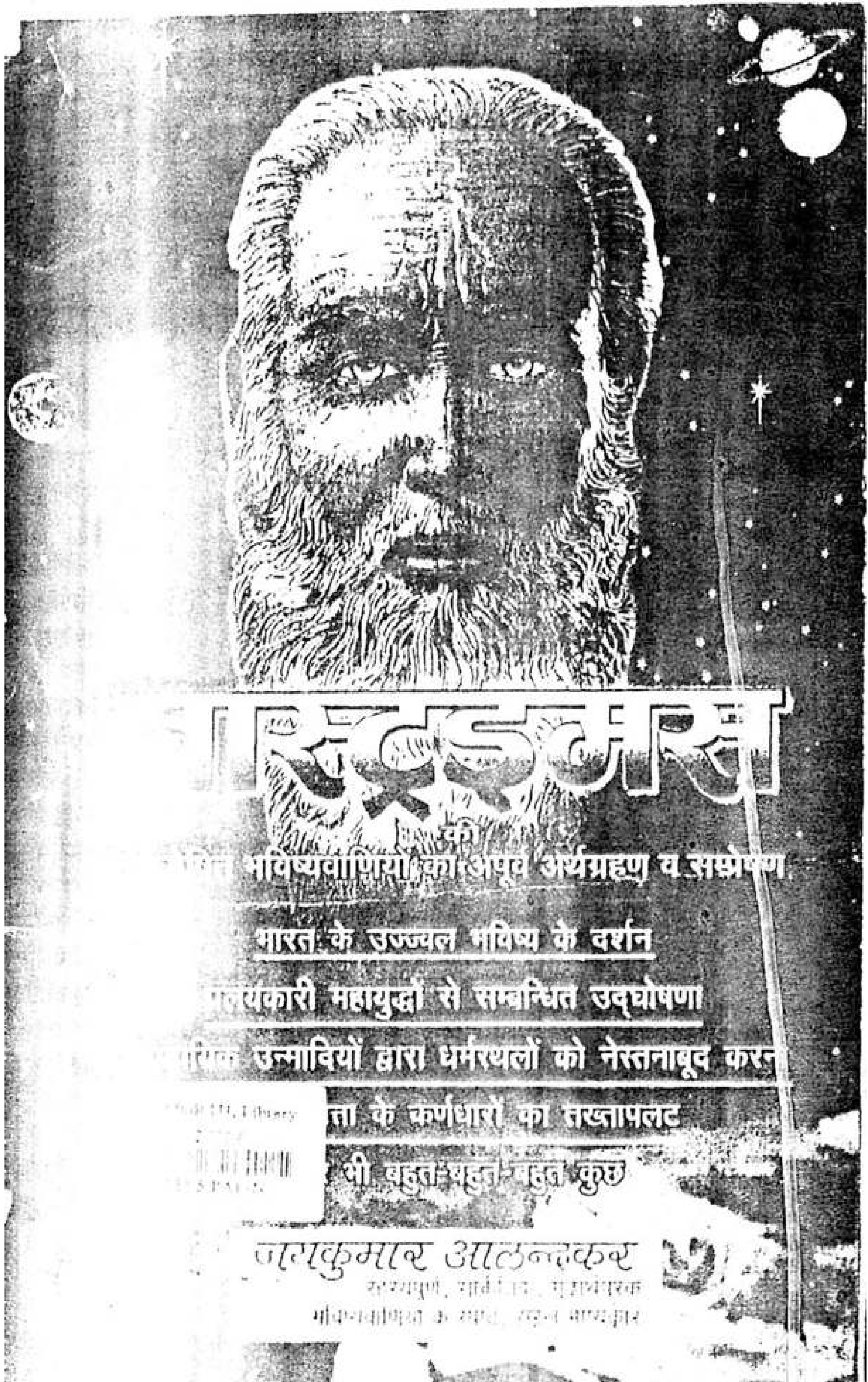
আজচ্যা বিজ্ঞানযুগাত অনুশাস্ত্রাচা জো অভ্যাস চালু আহে ব অনু অস্ত্রে বনবিন্যাচী বা সংগ্রহী ঠৈবন্যাচী জী চঢ়ায়োঢ় সর্ব জগভর চালু আহে ত্যাবরুন আগামী যুদ্ধাচী ভীষণতা স্পষ্ট হোত অহে, সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘাতফেং তজজ্ঞানী কেলেল্যা অভ্যাসানন্তর জো অহবাল প্রসিদ্ধ ঝালা আহে, ত্যাবরুন নিঃসংদিগ্ধ শব্দাত প্রামুখ্যানে সাঙ্গিতলে আহে কী, আগামী যুদ্ধ হে অনুযুদ্ধ হে ঝাল্যাস আনি আজ, ত্যা দৃষ্টিনে জী পাবলে পড়ত আহেত ত্যানুসার ত হে মহাযুদ্ধ অনুযুদ্ধচ হোনার যাবদ্দল দুমত হোন্যাসারখেহী নাহী প্রত্যক্ষ পরিণাম প্রচন্ড মনুষ্যহানী, উদধ্বস্ত ঝালেলে দেশ, ভস্মসাৎ ঝালেলী মালমত্তা ব শেতী যা দৃষ্টান্নী দিসতীল হে তর খরচ, পণ ত্যাহীপেক্ষা ত্যাচে জে অপ্রত্যক্ষ পরিণাম প্রদীর্ঘ কালপর্যন্ত জানবতীন তে মাত্র ফারচ ভয়ঙ্কর সরূপাচে অসতীল।

যা অনুযুদ্ধানে জগাতীল হবামানাত বদল হোইল জ্যা গোলার্ধাতীল শহরান্বর অনুবোম কিংবা রকেটস্ যাঞ্চা মারা হোইল আনি উত্তর গোলার্ধাতীল মোঠ্যা শহরান্বর অসা বর্ষাব হোন্যাচা সম্ভব জাস্ত-ত্যা গোলার্ধাতীল তপমান শুন্য অংশ সেলশিয়স্ খালী জাইল, সূর্য প্রকাশ পুরেসা মিলনার নাহী পাটস কমী পড়েল, ত্যামুলে শেতী, বনস্পতি উগবন্যা-উৎপন্ন হোন্নাবর বিপরীত পরিণাম হোইল, ওঝোনোচা সংরক্ষক থর কমী হোত আহে, অশী আজব আবই উঠলি আহে, তো সংরক্ষক থরহী অনুযুদ্ধানে আনখী কমী হোউন অতিনীল কিরন রোখলে জ্যান্যাচে প্রমাণ কমী হোইল ! নাস্ট্রোডেমসলা হে সর্ব প্রলঙ্কারী দৃশ্য দিসত অসুনহী ত্যানে কেলেন্যা গ্রহগণিত্যাচা আধারে তো মহনতো কী, য়া তিসল্যা মহাযুদ্ধাত অনেক তথা কথিত প্রাপ্ত দেশ বেচিরাখ হোতিল, তরী ত্যাতুন মানববংশ টিকুন রাহীল;হিন্দুস্থান মহনজে হিন্দুরাষ্ট্র আন ত্যা দেশাত জন্মলেলা দৃষ্টা নেতাচ, সর্ব জগাচা তারনহার জগজ্জেতা আসল,।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যাঞ্চে এক ফ্রেঞ্চ ভক্ত রীনকোর্ট নামক লেখক আহেত, ত্যান্নী পরমহংসাঞ্চা নির্বানাপূর্বী জে সাঙ্গিতলে তে শ্রীরামকৃষ্ণাঞ্চে শব্দ উদ্ধৃত করুন মহটলে আহে কী রামকৃষ্ণাঞ্চি তী ভবিষ্যবাণী নাস্ট্রোডেমসচ্যা ভাকিতান্না পুষ্টিচ দেতে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস মহনালে হোতে কী ত্যাঞ্চা 'পুঢ়চা জন্ম ভারতাচ্যা বায়ব্যেলা হোইল' হেচ দুসন্যা ভাপেত বিশদ করুন সাঙ্গায়চে তর পরমহংস রশিয়ান্ত হিন্দু সন্ত মহনুন পুনঃ জন্ম ঘতিল, নি হিন্দুত্বাচে পুনরুত্থাপন হোইল, 'শক-হুন' আদি জমানীন প্রমানে রাশিয়াহি হিন্দুত্ববাদী ঝালেলা দিসেল, ত্যা জীবনপদ্ধতিচা স্বীকার করীল কারণ যা আকাশখালী সর্বকশ বিচারস্বাতন্ত্র অসলেলী দুসরী জীবনপদ্ধতীজ নাহী রাশিয়া।

---------------(৭৪)---------------

হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্ম, ব ত্যাঞ্চে রাষ্ট্রপ্রেম যাবদ্দল, নাস্ট্রোডমস স্বতঃ জিউ বা খ্রিষ্টান অশুনহি, জে উৎকটতেনে উদগার কাঢ়তো ত্যালা কাহী আন্তরিক সাক্ষাৎকার ঝাল্যামুলেং কাঢ়িত অসাবা অসে বাটান্যা ইতকে খন খনিত আহেত ভারতান্তিন হিন্দু হে ঘরে হিন্ধুস্থানচে রহিবাসী, ভারতান্তিন মুস্লিম হে ঘুসখোর তরী কিংবা বাটগে মুসলমান, ত্যামুলেং ত্যান্না, নাস্ট্রোডেমস, রাষ্ট্রদ্রোহী, মহনতো, হিন্দু ধর্মাশিবার হিন্দুস্থান অশক্য, আনি হিন্দুস্থানচি হিন্দু সংস্কৃতিহী আশক্যচ। আগামী প্রলঙ্কারী যুদ্ধান্তন জগালা নবা প্রকাশ দেনারা জগজ্জেতা মহনুন হিন্দুচ নেতা অসেল যাবদ্দল 'নাস্ট্রোডেমস' ঠাম আহে!

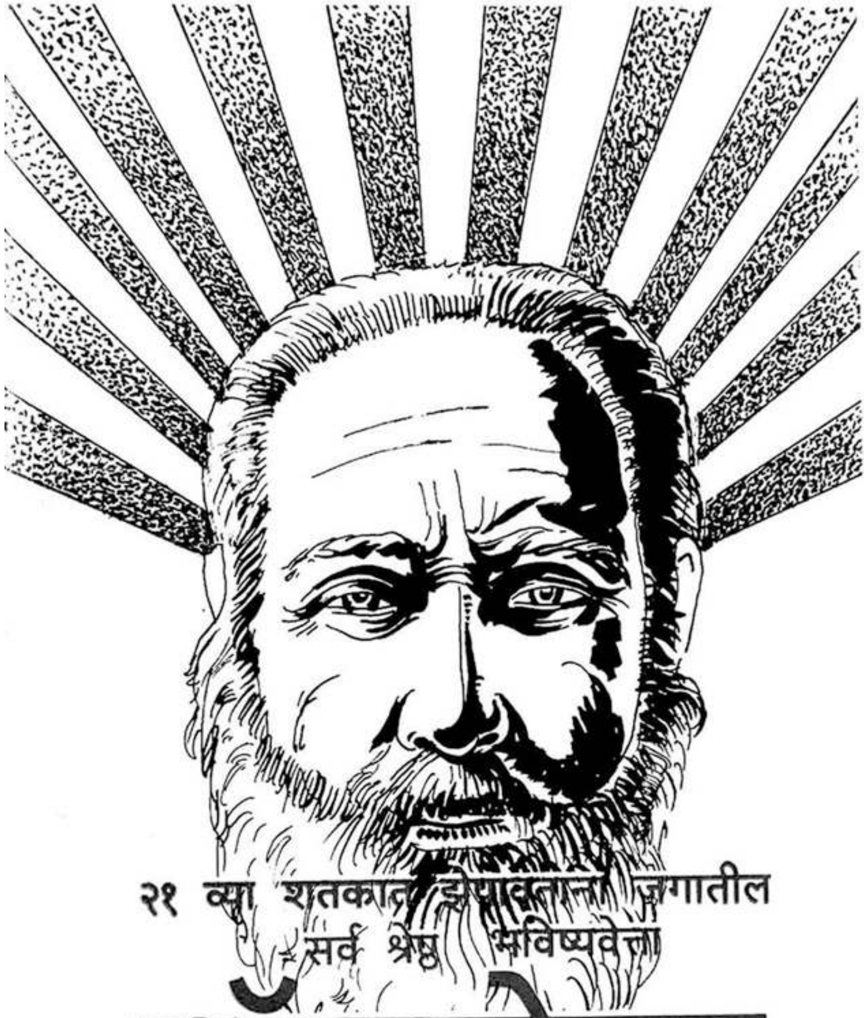

की
भविष्यवाणियों का अपूर्व अर्थग्रहण व सम्प्रेषण
भारत के उज्ज्वल भविष्य के दर्शन
लयकारी महायुद्धों से सम्बन्धित उद्घोषणा
उन्मादियों द्वारा धर्मस्थलों को नेस्तनाबूद करन
त्ता के कर्णधारों का तख्तापलट
भी बहुत-बहुत-बहुत कुछ
आलन्दकर

होते ही वे फिर से विश्व में योग्यमार्ग से भ्रमण करके शत्रुत्व के भाव से भारत को त्रस्त करेंगे। देखिए, प्रथम मुस्लिम समाज रूप से शुक्र भारत पर आक्रमण करके उस भूमि को तहस-नहस कर देगा। उसके बाद भारत में घुसकर वे सत्ता पर कब्जा करेंगे, अंधश्रद्धालु और दुर्बल भारतीय जनता को सतायेंगे और उन्हें मुस्लिम धर्म की दीक्षा देंगे। उसके कारण महान् भारतमाता मुस्लिमों की दासी बनेगी। भारतीय प्रदेश और समाज भ्रष्ट होगा। यह कार्य इ.स. 1291 से 1999 तक चलेगा।

इसी काल में भारत माता का (कामदुहिता का) बंधु गुरु पिंगल सम शत्रुत्व भाव धारण करके पश्चिम यूरोप के क्रिश्चनों को व्यापारी और नाविक बनाकर भारत की ओर भेज देगा। वे प्रथम व्यापारी बनकर भारतमाता को लूटेंगे। उसके बाद एक--एक प्रदेश हाथ में लेकर उन्हें और वहाँ की जनता को भ्रष्ट क्रिश्चन बनाकर उन पर शासन करेंगे। धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाकर वे संपूर्ण भारत माता को अपने कब्जे में ले लेंगे। उसी समय भारतीय गुलाम दुर्बल जनता मोक्षप्राप्ति के लिए मंदिर बाँधकर देवी-देवता के भजन-कीर्तन करती रहेगी।

इसी काल में धोखेबाज क्रिश्चन गुरु का भ्रष्टाचारी रूप लेकर आयेंगे। यहाँ के प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन कर किरो जैसे यूरोपीयन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी होंगे। लेकिन भारतीय अंध और झूठे ज्योतिषियों को अपने ज्योतिष-ग्रंथों का अर्थ नहीं समझेगा। वे गुलाम होंगे। उन्हें अपनी मानसिकता और प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी भाषा में मौजूदा ज्ञान ही सत्य लगेगा। लेकिन कीरोसम भारतीय ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन करके महान् विद्वताधारक लेखकों द्वारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर ज्योतिषशास्त्र नहीं समझेगा अन्त में वे शापित होंगे और उसके कारण उनमें मूर्खता और क्रूरता होगी।

उसके कारण महापरिवर्तन काल का आरंभ होगा। वह काल होगा इ.स. 1905 से 2028 तक। सबसे पहले भारत को स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिए कॉंग्रेस की स्थापना होगी। भारतीय जनता महान् राक्षस कुंभकर्ण के अनुसार गहरी नींद में से जागृत होने लगेगी। झूठा ज्योतिषशास्त्र नष्ट करके अचूक भविष्य ज्ञान देने के लिए मद्रास में के.एस.कृष्णमूर्ति का जन्म होकर वे भारतीय जनता को कृष्णमूर्ति पद्धति का ज्ञान देंगे। 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिषशास्त्री नॉस्ट्रॅडॅमस की भविष्यवाणी में अंकित सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण कर उसमें लिखित भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्यग्रंथ प्रकाशित करेगा। उस समय वह भारत में अज्ञात ज्योतिष द्वारा कलियुग के विषय में दिये गए महान् सांकेतिक भाषा में अर्थ को सुलझाकर उसमें लिखित महान् भविष्यवाणी का अर्थ स्पष्ट करेगा। लेकिन भारतीय जनता पर और सत्ताधारियों पर झूठे प्रचंड ज्योतिषियों का प्रभुत्व होगा। वे इन नये महान् ज्ञानी ज्योतिषियों को प्रकाश में नहीं आने देंगे। लेकिन उन पर स्वार्थ के अंधकार से, झूठे धर्म जाति का भूत सवार हुआ होगा। अब भी वे मातंग (गारुड़ी) कार्य में मग्न होकर सत्य का, मानवता धर्म का, ज्योतिष ज्ञान का खून करते रहेंगे।



नॉस्ट्राडेमस्

यांचे जागतिक स्तरावरचे भविष्य

- डॉ. रामचंद्र ज. जोशी

२१ व्या शतकाकडे झेपावतांना
जगातील सर्वश्रेष्ठ भविष्यवेत्ता!

मायकेल द नॉत्रदेम (नॉस्ट्राडेमस)

यांचे जागतिक स्तरावरचे भाविष्य

डॉ. रामचंद्र ज. जोशी.

ग्रंथ मिळण्याचे ठिकाण

जोशी ब्रदर्स अप्पा बळवंत चौक, पुणे २. फोन: ४४५९४२४	**श्री गजानन बुक डेपो** भरत नाट्य मंदिरासमोर, पुणे ३०. फोन : ४४७३३०४
श्री गजानन बुक डेपो कबुतरखाना, दादर, मुंबई २८. फोन: ४२२७५८४	**श्री गजानन बुक डेपो** बिल्डिंग नं.१३२, पहिला माळा, पंतनगर, घाटकोपर, मुंबई ७५. फोन: ५१३८००९

...(32)...

आफ्रिकेला वळसा घालण्याचा द्राविडी-प्राणायाम त्या सुवेज कालव्याच्या निर्मितीने कमी झाला हे खरेच, पण त्या कालव्याच्या निर्मितीची कल्पना नॉस्ट्राडेमसच्या विलक्षण भाकिताने फ्रेंच वास्तुशास्त्रविशारद लेसेप्स याला सुचलेली आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

पाहिल्या प्रकरणातच स्पष्ट केले आहे की, १९९९ साली छेडल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या जागतिक महायुध्दात, आज वरवर पाहता परस्पर विरोधी राष्ट्रे मित्र बनून, अमेरिका व रशिया यांचे एकत्रित बळ प्रचंड असेल. नॉस्ट्राडेमसच्या मृत्यूनंतर २०९ वर्षांनी जन्माला आलेली अमेरिका आपल्या सामर्थ्याच्या शिखरावर असेल असे, शतक २, श्लोक ४९ मध्ये हा द्रष्टा ज्योतिर्विद सांगतो हे सत्य किती चित्तथरारक आहे?

'भारत' सर्वश्रेष्ठ हिंदु राष्ट्र?

या पूर्वीच्या लेखात कै. इंदिरा गांधींचा नॉस्ट्राडेमसने केलेला उल्लेख आपण वाचला. त्या संदर्भात हेन्री सी रॉबर्टस 'कंप्लीट प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडेमस' या १९४२ साली प्रसिध्द झालेल्या आपल्या पुस्तकात लिहितो- 'डॉमिनन्ट प्रिमियर' (म्हणजेच प्रभावी पंतप्रधान) इंदिराजी गांधी यांच्या आकस्मिक खुनानंतर दोन बदल होतील. त्यातील क्रमांक पहिल्या बदलाप्रमाणे त्यांचे पुत्र राजीव गांधी जरी पंतप्रधान झाले असले तरी दुसरा जो बदल होणार आहे तो म्हणजे एक मध्यम वयाचा नेता पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ, तिबेट, अफगाणिस्तान, मलाया आदी देश जिंकून हिंदुस्थानाला जगातील सर्वश्रेष्ठ हिंदुराष्ट्र म्हणून निर्माण करणार आहे. तो सार्वभौम असेल. औदार्यात अजोड व आपल्या सनातन धर्माला पुनरुज्जीवन देईल आणि भारत खंडातच नव्हे तर साऱ्या पृथ्वीवर सुवर्णयुग आणील. (सेंच्युरी शतक ५, श्लोक ४१ वा). या श्लोकाबद्दल सर्वच भाष्यकारांत एकमत आहे. वरील दोन बदलांच्या दरम्यानच्या काळात सत्ताधारी मंडळीत वावरणारी चांडाळ चौकडी सत्ताकेंद्र आपल्या ताब्यात ठेवून बराच काळ मनमानी करील. वर उल्लेख केलेला नेता फक्त जगाला अद्याप माहीत व्हायचा आहे!

...(33)...

: ४ :

थांबा, इ. स. २००६ मध्ये रामराज्य येतेय!

हिंदु जगज्जेता भूतलावर सुवर्ण-युग आणणार आहे!

ज्योतिष हे हि एक शास्त्र आहे

'शितावरून भाताची परीक्षा' या वाकप्रचारानुसार नॉस्ट्राडेमस यांनी वर्तविलेल्या अनेक भाकितांचे खरेपण आपण गेल्या प्रकरणात पाहिले. नॉस्ट्राडेमस यांना हे सर्व ज्ञान आगामी पिढीला देणे आवश्यक वाटले; व त्याने 'सेंच्युरी' मंध्ये दहा शतके (१००० श्लोक) लिहिलीं व १५५५ साली तें पुस्तक प्रसिध्द झाले. या पुस्तकातील श्लोकांची वर्गवारी केली तर असे आढळते की पहिले सुमारे १०० श्लोक फ्रान्स व युरोपसाठी, म्हणजे नॉस्ट्राडेमसच्या काळातील घटनांबद्दल केलेल्या भाकितांवरच खर्च झाले आहेत. त्यानंतर ३५० - ४०० श्लोक १९ - २० व्या शतकातील घटनांच्या भाकितांचा ऊहापोह करण्यात लागले असून उरलेल्या ४५० - ५०० श्लोकांत २१ व्या शतकापासून इ. स. ३७९२ पर्यंतच्या कालखंडात होऊ घातलेल्या भाकितांचे विवरण आलेले आहे.

-ज्योतिष शास्त्र हे असे चमत्कारिक शास्त्र आहे की सर्वसामान्य माणसांपासून अधिकारी वर्ग, देशा-राष्ट्रांचे शास्ते, धनाढ्य, श्रीमंत, राजेरजवाड्यापर्यंत सर्वांनाच त्याचे आकर्षण आहे. उघडरीत्या त्या शास्त्राचा निषेध, परंतु खाजगीरीत्या त्याची चाचपणीच केवळ नव्हे तर आवर्जून त्या शास्त्राच्या पारंगत ज्योतिर्विदाची मनधरणी करण्याची प्रथा सर्वकाली व सर्व देशांतून रूढ असल्याचे दिसते. ज्योतिष हे शास्त्र आहे, त्याचे आकाशस्थ ग्रहांच्या गतीनुसार ठरलेले आडाखे आहेत. इथून तिथून निसर्ग हा सारखाच असल्याने त्या त्या काळच्या ग्रहस्थितीनुसार व्यक्ति, समाज, देश नि त्यांचे धर्म, संस्कृती यावर परिणाम घडत असतात. ज्योतिषी फक्त त्याने केलेल्या शास्त्राभ्यासाच्या आधाराने मिळविलेल्या ज्ञानाने जे परिणाम घडायचे असतात त्याची आगाऊ माहिती सांगतो, त्याचे आनंददायी, सुखसंवर्धक बदल स्पष्ट करतो. ते बदल केव्हा कसे होतील त्याबद्दल भाकित वर्तवतो. त्याचप्रमाणे दुःख वर्धक उलथापालथी काय होतील त्याचीही नोंद करीत असतो. जे घडायचे असते ते ज्योतिषाला टाळता येत नाही - किंवा तो ते घडवीतही नाही. म्हणून नॉस्ट्राडेमससारखे जगप्रसिध्द ज्योतिर्विद आत्मविश्वासाने म्हणतात की, 'मी लिहिले, सांगितले - त्यात काहीही बदल करण्याची माझी इच्छा नाही.'

...(40)...

गेली नऊ वर्षे इराकबरोबर विध्वंसक युध्दात गेली. जवळ जवळ एक हजार किलोमीटर प्रदेश इराकने सोडलेला नाही. युध्दकैदी सोडविता आले नसल्याने युध्द थांबले, परंतु इराणची मानहानी संपलेली नाही. या युध्दात पेट्रोलियमच्या उद्योगाची महत्त्वाची साधने उद्ध्वस्त झाली, अर्थव्यवस्था, उद्योगधंदे, रोजगार यांची झालेली हानी फार मोठी आहे. शाह यांच्या पदच्युतीच्या सुमारास जी स्थिती होती त्यापेक्षा कितीतरी पटीने सध्याची इराणची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे.

आपले घरदार, कौटुंबिक सुख व सुरक्षितता या बाबींचा विचार टाळता येणे अशक्य झाले आहे; आणि त्याबद्दल बहुजनसमाज बोलू लागला आहे. इराणी राष्ट्रांच्या समस्यांना तोंड फुटू लागले आहे आणि त्या समस्यांची सोडवणूक करायला इस्लामची अथवा धर्माची वाढ पुरेशी पडणार नाही याची जाणीव बहुजन समाजालाच नव्हे तर सत्तारूढ पक्षातल्या मवाळांनाही होऊ लागली आहे.

नॉस्ट्राडेमस यांनी शतक १ श्लोक ७० मध्ये असे स्वच्छ लिहून ठेवले आहे की, खोमेनीच्या कडव्या हेकटपणाला विरोधकच कडवेपणाने मोडून काढतील नि खोमेनी विरोधकांची सरशी होईल; त्यांचा विजय होईल. अखेरीस फ्रान्सच मध्यस्थी करून खोमेनी व त्याचे साथीदार यांना दया दाखवावी असे सांगेल व बंडखोर फ्रान्सचा सल्ला मानतीलही! नॉस्ट्राडेमस या सर्व घडामोडींचे वर्णन करून सांगतोय. 'थांबा, रामराज्य येतेय!' जुलै १९९९ ते इ. स. २००६ पर्यंत चालणाऱ्या या सर्व संहारक युध्दाच्या शेवटी सुवर्णयुग अवतरेल; हिंदुस्थानात उगवणारा तारणहार शायरन व फ्रेंच नेता मार्स यांची युति होईल. त्यानंतर ७५ वर्षे जगात सुख-समृध्दि, व शांतता नांदेल. (१० / ८९)

नॉस्ट्राडेमसने निःसंधिग्धपणे म्हटलेय, की नव्याने प्रकट होणारा शायरन (CHYREN) आजच्या घटकेला अज्ञान आहे. परंतु तो ख्रिश्चन वा मुस्लिम नसेल. पाश्चात्य विद्वानांनीही हे विधान मान्य केले आहे.

नॉस्ट्राडेमस स्वतः ज्यू वंशाचा, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला, फ्रान्सचा नागरिक. तो ४५० वर्षांनी अवतरणारा विश्वनेता हिंदूच असेल असे छातीठोकपणे सांगतो, त्या हिंदु नेत्याचा गौरव करतो तो ह्याच कारणांनी की त्या स्वातंत्र्यसूर्य शायरनच्या उदयाबरोबर आधीते नेते निष्प्रभ होऊन नम्र होतील. 'तो' शायरन तिसऱ्या जागतिक युध्दाच्या काळानंतर वाचलेल्या नागरिकांना कायद्याचे राज्य देईल. कुणावरही अन्याय होणार नाही. 'गुणाः पूजास्थानं नच लिंगम् नच वयः' बरोबरच 'नच श्रध्दास्थानः' ही त्या लोकशाही राज्याची वेदी असे. सामाजिक रचना 'गुणकर्मविभागशः' असेल. जन्मदात्या मातापित्याच्या श्रध्दास्थानांवर ती आधारलेली असणार नाही. राखीव जागा, खास हक्क ही भाषा असणार नाही. त्याचप्रमाणे दलित, मागासलेला समाज अशी विभागणीही या साम्राज्यात असणार नाही. प्रत्येकाच्या वैयक्तिक गतिशील प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले जाईल; त्याच्या प्रगमनशील कर्तृत्वाला भरपूर संधि व वाव दिला जाईल, सरसकट आमिषांची खिरापत वाटली जाणार नाही. यामुळे जो मेहनत करील

...(41)...

त्याला 'संधि' मिळेलच मिळेल अशी आश्वासक खात्री पटल्याने राष्ट्रसंवर्धनाला आवश्यक असणारी चढाओढ समाजात मानवाला कार्यप्रवण करील. शासन अमानवी वागणारांना वठणीवर आणीलच, शिवाय त्यांच्यातील अतिरेक्यांचा निःपात केला गेला जाईल. सर्वांना लागू पडणारा समान कायदा राज्यभर कसोशीने पाळण्यात येईल.

आता एक गोष्ट निर्विवादपणे सिध्द झाली आहे की तिसऱ्या अतिसंहारक महायुध्दातून नव्याने दर्शन घडविणारा तारणहार 'आशिया खंडात जन्म घेतलेला असेल, (शतक २० श्लोक २५).' युरोपात नाहीच नाही! तो ख्रिश्चन नसेल, मुसलमान तर नसेलच नसेल. ज्यूही असणार नाही. तर हिंदूच असेल असे जे नॉस्ट्राडेमसने निःसंदिग्धपणे म्हटलेय् ते पाश्चात्य विद्वानांनाहि मान्य आहे. तो हिंदू-नेता अन्य सर्व भूतपूर्व नेत्यांपेक्षा महत्तर असेल, बुध्दिमान असेल, अजिंक्यही! नॉस्ट्राडेमसचा शतक ६ श्लोक ७० फार महत्त्वाचा मानावा लागेल.

The grest CHYREN will be
chief of the world.
Loved feard and unchallenged
even at the death
His name and praise will reach
beyond the skies.
And he will be content to be
known only as Victor.

महान् शायरन जगाचा प्रमुख नियंता होई ल. त्याच्यावर सर्वसामान्य जनता प्रेम करील; त्याचबरोबर त्याचा वचक येवढा असेल की प्रजाजन काहीही अपकृत्य करायला धजणार नाहीत. त्याच्या मृत्युनंतरही त्याचा दबदबा कायम राहील, त्याचे नाव आणि पराक्रम नागरिकांच्या मनावर इतके खोलवर परिणाम करतील की त्याची कीर्ति त्रिखंड पसरेल. सामर्थ्य इतके प्रचंड असेल की शत्रू त्याच्या देशाला घाबरतील, त्याच्या राज्याची, नव्हे साम्राज्याची दहशत मानतील. तो सार्वभौम असेल, त्याच्या कर्तृत्वाचा प्रभाव संपूर्ण जगावर पडेल. हा महान् हिंदु नेता भारताला भूमि आणि सागर यावर अजिंक्यपद प्राप्त करून देईल. आतापर्यंत निद्रिस्त असलेल्या हिंदूंना खडबडून जागृत करून त्यांच्याकरवी अशी काही चिरंतन कामगिरी करवील की ज्याने ते आपल्या पूर्वजांचे सार्थ वारस ठरतील.

शतक २, श्लोक ७९ द्वारा फ्रेंच द्रष्टा नॉस्ट्राडेमस स्वच्छपणे सांगतोय की, शायरन क्रूर आणि हिंसक जमातीतल्यांना ठिकाणावर आणिल आणि चंद्रकोरीच्या ताब्यातील भूमि मुक्त करील. त्याचे हे शब्दच पहा किती बोलके आहेत!

फ्रेंच - Subjuguva 10 gent crelle add fiere Le grand chyren ostera du longin Tous les captifs par seline baniaet.

...(42)...

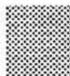
इंग्लिशमध्ये स्वैर भाषांतरित शब्दात सांगायचे तर -

1) Will subjugate the cruel and
violent freed,
The great CHYREN will
take from distance,
All those held captive by
crescent moon

वरील श्लोकातील Cruel and Violent held captive by crescent moon म्हणजेच - हिंसक आणि क्रूरचंद्र हे शब्द इतके अर्थवाही आहेत की वरील उल्लेख मुसलमानांना उद्देशूनच आहेत याबाबत दुमत न व्हावे.

थोडक्यात सांगायचे तर शायरनच्या कारकीर्दीत या भूतलावर सुवर्णयुग अवतरेल. त्याच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या महानतेचे व सद्‌गुणांचे आवर्जून गुणगान होत राहिल. पण त्याच्या मनाची शालिनता, विनम्रपणा व औदार्य इतके ढळढळीतपणे दिसते की यापूर्वी नमूद केलेल्या शतक ६ श्लोक ७० व्या श्लोकाच्या शेवटच्या ओळीत त्याबद्दल केलेला उल्लेख फार बोलका आहे. (शायरन म्हणतोय) 'जनतेने त्याच्याबद्दलचा उल्लेख फक्त' एक विजयी नेता या तीन शब्दात करायचा तर करावा आणखी विशेषणे त्याच्या नावाला चिकटवू नयेत.

मधल्या काळात हिंदूधर्माचे व हिंदूंच्या आदर्शवत् जीवनाचे पुसट झालेले क्षणचित्र, पुन्हा आपल्या देदिप्यमान उत्तुंग स्वरूपात प्रस्थापित होणारच, आणि मानवी संस्कृती निर्धोक बनेल हे नॉस्ट्राडेमसने पुरेशा स्पष्टपणे सुचविले आहे. त्यात संदिग्धता कुठेही नाही. हे सर्व घडवून आणणारा आज अज्ञात असणारा परंतु योग्य समयी प्रकट होणारा महापुरुष तथा शायरन हा हिंदुधर्मीयच असेल असेही नॉस्ट्राडेमस निखालसपणे सांगतो, नव्हे नव्हे, जवळ जवळ साडेचारशे वर्षापूर्वी अक्षरबध्द करतो. त्याने या शायरनच्या मनाचा घेतलेला वेधही इतका काही तर्कशुध्द व अचूक आहे की नॉस्ट्राडेमसच्या द्रष्टेपणाचे आश्चर्य वाटते! नॉस्ट्राडेमसने म्हटलेय की, शायरन बेचैन मनाने खूप प्रवास करील. या बेचैनीचे कारण काय असणे शक्य आहे? आपल्या धर्मबांधवांच्या समस्या आणि त्यांची सद्यःकालीन दयनीय अवस्था हे असू शकेल! त्या बेचैन अस्वस्थ मनाचा कानोसा आपण पुढच्या प्रकरणात घेऊ!



...(43)...

: ५ :

नॉस्ट्राडेमसच्या भाकितांना दुजोरा देणारी आणखी कांही भाकिते

उभ्या आयुष्यात भारताला कधीही भेट न दिलेल्या महर्षी नॉस्ट्राडेमसने, सुमारे ४००-४५० वर्षांपुर्वी, '२००१ साली प्रलयंकारी विनाशाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या जगाला शायरन (CHYREN) हा हिंदू नेता आपल्या क्षात्रतेजाने तारणहार होईल.' या स्वातंत्र्यसूर्याच्या आगमनाने बलाढ्य हिंदू राष्ट्राचा उदय होऊन हिंदूंचे पुनरुत्थान होईल, हिंदू साम्राज्य स्थापन होऊन 'सुवर्णयुग अवतरेल' असे भविष्य शब्दबध्द केले आहे.

१९९९ साली सुरू होणाऱ्या व इ. स. २००६ ला संपणाऱ्या महायुध्दासंबंधी अनेक श्लोकात नॉस्ट्राडेमस लिखित, 'सेंच्युरी' मध्ये 'शायरन' या टोपण नावाचा उल्लेख 'विश्वनेता' म्हणून ठिकठिकाणी केलेला आढळतो. गेली जवळ जवळ २०० वर्षे या 'शायनर' चा शोध घेण्याचे काम नॉस्ट्राडेमस विषयातील तज्ञ हिरीरीने करीत आहेत. गेल्या प्रकरणांत या विश्वनेत्याबद्दल नॉस्ट्राडेमसच्या कित्येक अभ्यासकांनी लढविलेले तर्क कुतर्क किती विसंगत आहेत हे दाखविले; आणि त्या संदर्भात सध्याचा इराणचा धर्मनेता आयातुल्ला खोमेनीचे नाव आग्रहाने घेतले जाते ते तर किती असंबध्द आहे त्याचीही चर्चा केली.

नॉस्ट्राडेमसच्या भविष्यवाणीत 'क्रम' नसतो-सकारण नसतो, त्यामुळे हे तर्काधिष्ठित घोटाळे होतात हे जरी खरे असले तरी नॉस्ट्राडेमस वेगवेगळया लोकांमधून शायरन् बाबत जे विखुरलेले उल्लेख करतो त्यावरून येऊ पाहाणाऱ्या ३ऱ्या जागतिक युध्दकालातील क्षितिजावर नव्याने उगवणारा पण आज जगाला अज्ञात असलेला जगज्जेता कोण असेल, कुठचा असेल याबाबत सुसंगत तर्ककरायला अडचण पडू नये.

पृष्ठसंख्येचे बंधन लक्षांत घेऊन आतापर्यंत नॉस्ट्राडेमसच्या श्लोकांचे 'शतक अमुक व श्लोक क्रमांक अमुक' एवढाच निर्देश करून त्याने वर्तविलेल्या भाकितांचा मागोवा घेत घेत गूढार्थाची उकल केली. परंतु, आता यापुढे महान् शायरनच्या कर्तृत्वाचा प्रकाश पाडणाऱ्या भाकितांबद्दलचे लेखन, नुसतेच शतक 'श्लोक' क्रमांक अशा संदर्भात न देता, आवश्यक तेवढे मूळ श्लोक, जसेच्या तसे, उध्दृत केल्याशिवाय वाचकांचेही समाधान होणार नाही म्हणून ते प्रसिध्द करण्याचे योजिले आहे. मूळ फ्रेंच भाषेतील श्लोक देणे अशक्य नाही. तरी ती भाषा अत्यल्प लोकांना समजणारी असल्याने त्या श्लोकांचे इंग्रजीत भाषांतर उध्दृत केले जाईल. त्यावरून नॉस्ट्राडेमसच्या एकेका विधानाचे निरुपण करणे सोपे होईल.

...(44)...

यापूर्वीच्या २ ऱ्या प्रकरणांत नॉस्ट्राडेमसचा जीवनवृतांत देतांना, त्याने गूढ भाषेत भविष्यकथन कसे केले आहे त्याचे उदाहरण म्हणून, 'सेंच्युरी' च्या शतक ४ श्लोक १४ चा पूर्वार्ध मूळ फ्रेंच व त्याचेच इंग्रजीत रुपांतरित भाग उध्दृत करून त्याबद्दल विवरण केले. तिसरे प्रकरण नॉस्ट्राडेमसच्या तंतोतंत खऱ्या झालेल्या भाकितांची ओळख वाचकांना व्हावी म्हणून लिहीले, त्यात पुन्हा वरील शतका-श्लोकाच्या आधारे भारताच्या 'डॉमिनंट प्रिमिअर' कै. इंदिरा गांधी यांच्या अकस्मात (इंग्रजी शब्द आहे Sudden) हत्येने 'भारत' सर्वश्रेष्ठ हिंदुराष्ट्र घडविण्याच्या संभाव्य दोन बदलांचा उल्लेख केला तो असा- इंदिराजींचे पुत्र राजीव गांधी हे पंतप्रधान होतील (श्लोकातील शब्द shall cause change) हा पहिला बदल तर, वरील शब्दांपाठोपाठ त्याच श्लोकात आलेल्या 'and put another in the reign soon' या अधोरेखित शब्दांनी ध्वनित होणारे राजीव गांधींच्या पाठोपाठ २० व्या शतकाचा अस्त होण्याचे काळी उगवणारे दुसरे सत्ताधारी म्हणजेच नॉस्ट्राडेमसना अभिप्रेत असलेला 'शायरन' असेल हे सुसंगत वाटते. हेन्री सी. रॉबर्टस् नामक नॉस्ट्राडेमसचे एक प्रसिध्द भाष्यकार आहेत. यांनीही वरील विधान उचलून धरले आहे.

नॉस्ट्राडेमस येवढ्यावरच थांबत नाही तर विश्वनेत्याबद्दल आणखी काही महत्त्वाच्या खुणा दाखवतो.

शतक ५ श्लोक ४१ मध्ये नॉस्ट्राडेमसने स्पष्टच सांगितले आहे की, रात्री अंधाऱ्या वेळी (त्यांचे शब्द आहेत - Noctural time) 'तो' जन्माला येईल. तो सर्वभौम असेल आणि औदार्यात त्याच्याशी कुणीही बरोबरी करू शकणार नाही. तो आपल्या सनातन धर्माचे पुनरुज्जीवन करील आणि या अवनीतलावर सुवर्णयुग आणील!

'अंधाऱ्या वेळी' या शब्दाचे अनेक अर्थ संभवतात. पैकी एक म्हणजे श्रीकृष्णाच्या जन्माचे वेळेप्रमाणे 'तो' शायरन रात्रीच केवळ नव्हे तर अमावास्येच्या अंधाःकारमय रात्रीहि जन्म पावला असेल! दुसरा असाही अर्थ होऊ शकतो की, भोवतालचे जगात जेव्हा त्या जगास 'अंधार-युग' म्हणण्याइतकी काळ्या कृत्यांची बेबंदशाही माजली असेल तशा भयंकर कालावधीत 'शायरन'ने या जगात पदार्पण केले असावे. तिसराही अर्थ या 'रात्रीं'च्या उल्लेखाला चिकटवला जातो, तो म्हणजे, या अवनीतलावर चालू असलेल्या 'जगा'मध्ये आणीबाणी जाहीर होऊन (उदा. २ ऱ्या महायुध्दाचे वेळी जशी अंमलात होती तशी) ब्लॅक आऊट असेल तेव्हा जन्माला आलेले हे मूल असावे! या सर्व लेखनाचा इतकाच इत्यर्थ निघतो की आगामी महासंहारक तिसऱ्या महायुध्दात अमेरिका-रशियाच्या युतिसह 'शायरन' ही तिसरी भारतीय शक्ती महान कार्य करील. आज ती अज्ञात असली तरी ती व्यक्ती आजच्या जगात वावरत असेल. अमावस्येसारख्या कुठल्या तरी अंधेऱ्या रात्री जन्म घेतलेली व आगामी महान नेता ठरणारी ही व्यक्ती तरुण १६ते२०-२५ वर्षाची तरी असेल किंवा पन्नाशीसाठी गाठलेली अनुभवी ध्येयैकशरण प्रौढ व्यक्तीही असू शकेल; यापेक्षा शायरनच्या वयावर प्रकाश पाडणारा उल्लेख नॉस्ट्राडेमसने कुठे केल्याचे आढळत नाही.

...(45)...

नाही म्हणायला नॉस्ट्राडेमस हे मात्र नमुद करतो की या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली भारत हा जगातील सर्व-श्रेष्ठ देश बनेल. इतकेच नव्हे तर दूरवर पसरलेले हिंदूंचे साम्राज्य नव्याने आकारास येईल.

शतक १, श्लोक ५० मध्ये त्या पुरुषाचा पुन्हा उल्लेख आढळतो तो असा-

'From Peninsula of three seas will be born one who will make Thursday his day of worship. His fame praise and rule will form mighty by land, sea. There will be a tempest of India.'

तीन सागरांनी बनलेल्या व्यापक द्वीपकल्पात तो जन्म घेईल; त्याचा गुरुवार हा प्रार्थनेचा दिवस असेल. त्याची कीर्ति त्रिखंडात पसरेल. त्याचे सामर्थ्य इतके प्रभावी असेल की त्याच्या आक्रमक घोडदौडीमुळे उत्पन्न झालेल्या त्याच्या प्रभावाने वादळी वातावरण उत्पन्न होईल. द्वीपकल्प, गुरुवार प्रार्थनेचा दिवस (या संदर्भात असेही म्हटले गेले आहे की शायरनचा विश्रांती घेण्याचा दिवस सोमवार असेल). या तिन्ही लाक्षणिक शब्दांद्वारे नॉस्ट्राडेमसला काय सुचवायचे असावे त्याबद्दल यापूर्वीच्या प्रकरणांतून स्पष्टीकरण केलेच आहे. या सर्वांचा निःसंदिग्धपणे आशय स्पष्ट होतो तो हा की शायरन हा महाम नेता भारतात जन्मलेला हिंदू नेताच असेल.

वरील भाकिताला दुजोरा देणारे भाष्य नॉस्ट्राडेमसने स्वतःच शतक ५, श्लोक २५ मध्ये केले आहे तेच पहा ना -

The Arab Primer, Mars, Sol, Venus, Leo,Rule of Church will surrender to the sea towards Persia, close to a million, True serpent power invade Turkey and Egypt.'

मागे उल्लेख केलेल्या हेन्री रॉबर्टस्ने याही श्लेकाखाली, आपल्या पुस्तकात टीप दिली आहे की -

'Christian Ideal will be overcome by Oriental Ideology where serpent meaning True serpent.....'

(म्हणजेच कुंडलिनी शक्ति धारण करणारी व्यक्ति). नॉस्ट्राडेमस भविष्याचा वेध घेऊन, वरील श्लोकात स्वच्छपणे सांगून टाकतो की सागराच्या नावाचा धर्म ज्याचा आहे (म्हणजेच हिंदी महासागर त्या अनुषंगाने हिंदुधर्म-तथा हिदुस्थान!) - कुठल्याहि प्रादेशिक भूमीकडे अंगुली निर्देश करण्याकरिता असा उल्लेख कुठल्याही भौगोलिक वाङमयात आढळत नाही-तो ज्याचा आहे त्याच्या पुढाकाराने युरोपमधील नव्हेत तर ख्रिश्चन व यावनी संस्कृतीचा खातमा केला जाईल. त्यांची सारी केन्द्रे ज्या ज्या राष्ट्रात विखुरलेली आहेत ती राष्ट्रेही पादाक्रांत केली जातील. इतर, कोणत्याही धर्मात ज्याप्रमाणे गुरुवार हा प्रार्थनेचा दिवस म्हणून पाळला जात नाही त्याचप्रमाणे कुंडलिनी शक्ति कुणाही बिगर हिंदूला ज्ञात नाही. हिंदूंचे ते खास शक्तिस्थान आहे, ते हिंदुच इजिप्त, तुर्कस्तान इत्यादी मध्यपूर्वेत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना दूर फेकून तिथे हिंदु संस्कृति केवळ नांदू लागेल असे नाही तर तिचा अम्मल सुखेनैव चालू राहील.

...(46)...

वरील भाकितावर आणखी झगझगीत प्रकाश टाकणारे भाकीत नॉस्ट्राडेमसने शतक १०, श्लोक ९६ मध्ये प्रसिध्द केले आहे ते असे -' Religion of the name of sea will against the sect of Caliphs of the Moon vanquish. The deplorably obstinate sect shall br afraid of wounded by Alef and Alef.'

फ्रेंच द्रष्ट्या ज्योतिषवर्याने केलेले वरील भविष्य फार महत्त्वाचे आहे. कारण, यात जास्तच स्पष्टपणे सांगितले आहे की समुद्राचे (तथा हिंदी महासागराचे) नाव असलेला देश - हिंदुस्थान - खलिफाच्या प्रशंसित पंथाचा नाश करील. वरच्या श्लोकातील २ ऱ्या ओळीतील Sect हा शब्द महत्त्वाचा व नॉस्ट्राडेमसच्या मार्मिक शब्दयोजनांचा निदर्शक आहे. त्या शब्दाचा एक अर्थ जसा 'पंथ' होऊ शकतो तसाच तो शब्द फ्रेंच भाषेत वापरला जातो तो 'श्रध्दा' या अर्थाने! या दृष्टीने या काव्यपंक्तीचा अर्थ लावावयाचा तर समुद्राचे नाव असलेल्यांची श्रध्दा तथा धर्म, हा सद्धर्म आहे तर खलिफा प्रशंसित धर्म ही केवळ अंधश्रध्दा आहे. या वाक्याचा आणखी स्पष्टार्थ करायचा तर नॉस्ट्राडेमसला हिंदू हा 'धर्म' तर इस्लामला तो अंधश्रध्दा म्हणून अभिप्रेत आहे. Obstinate हे विशेषण खलिफाच्या पंथाला लावून नॉस्ट्राडेमसने हेही आडपडदा न ठेवता सांगून टाकले आहे की, 'खलिफ-प्रशंसित पंथ अपरिवर्तनशील, अतिरेकी आहे!'

या पूर्वीच्या प्रकरणात 'शायरन' म्हणून आयातुल्ला खोमेनीबद्दल लिहितांना सध्या जगभर चालू असलेल्या रश्दींच्या 'सॅटॅनिक व्हर्सेस' या कादंबरीवरून उसळलेल्या सैतानी उद्रेकाचा उल्लेख केलाच आहे. त्याला आणखी दुजोरा देणारी बातमी नुकतीच वाचण्यात आली, तीही या संदर्भात बरेच काही सांगून जाते असे वाटते म्हणून येथे तिचा उल्लेख करतो - पॅरिसहून आलेली ही सत्यकथा आहे. प्रसिध्द फ्रेंच गायिका व्हेरोनिक सान्साँ, आपल्या कार्यक्रमात 'अल्ला' हे गीत सादर करीत असे. (म. गांधी ज्याप्रमाणे त्यांच्या रामनामात - 'ईश्वर अल्ला तेरे नाम' असे खादीचे ठिगळ लावून म्हणत त्याप्रमाणे!) परंतु, गीत - गायकाला ठार मारू अशी धमकी त्यांना देण्यात आल्यावर त्यांनी ते गीत न गाण्याचे ठरविले. नभोवाणीवरील एका मुलाखतीत ही माहिती देऊन पुढे स्पष्टीकरणही केले की, 'वास्तविक या गीतात इस्लामचा अवमान करणारे काहीही नाही, ती एक प्रार्थना आहे. पण 'ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति।।' हे जास्त अनुभवसिध्द वाक्य कुणाच्या खिजगणतीत आहे?

मुस्लिम धर्माच्या तत्त्वांना खोमेनीसारखे धर्मांध त्यांना अभिप्रेत असलेला वेगळाच रंग देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे होते काय तर काही मुस्लिम मूळ ग्रंथ न वाचताच विनाकारण कडवे धर्मांध बनत चाललेले आहेत. मशिदीमध्ये ठिय्या मारून बसलेले मुल्ला - मौलवी नि इमाम आपापले राजकारण पुढे रेटण्याचे मनसुबे उभारण्यात मश्गूल झाले आहेत. भारतीय शिक्षण यंत्रणेतून इस्लाम विरोधी (हेही त्यांनीच ठरवायचे) सारे उल्लेख काढून टाकावेत, पाठ्यपुस्तकांचे शुध्दीकरण (!) केले

...(47)...

जावे अशी मागणी करायला सुरुवात झाली आहे. या सर्वांची परिणती कशात होईल हे सांगणे आतापर्यंतच्या अतिरेकी अनुभवावरून जाणता येण्यासारखे असले तरी ज्या वेगाने १९९९ चा झंझावात समीप येत आहे त्या वेगाशी सुसंगत असा अत्याचारांचा नेहमी उसळणारा डोंब लक्षात आला की हीच वावटळ आगामी तिसऱ्या महायुध्दाची नांदी ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

१७ व्या शतकात ज्याप्रमाणे मुसलमानांच्या अत्याचारांनी हिंदुस्तानांत मर्यादा गाठली, तेव्हा मूठभर मावळ्यांना एकत्र करून परिस्थितीशी मुकाबला करणे अपरिहार्य झाले.

तेव्हा बाल शिवरायांनी विजापूर सोडून पुण्याच्या आपल्या जहागिरीत राहायला सुरुवात केली व आपल्या सवंगड्यांसह करंगळीचे बोट कापून श्रीशंकरावर (रोहिडोश्वर?) रक्ताचा अभिषेक करून स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. हाताशी असलेले सीमित मनुष्यबळ, युध्दमान शस्त्रांचा तुटवडा, अर्धपोटी जेवण, आणि एकंदर समाजावर मुसलमानी अंमलाची खोलवर रूजलेली दहशत व त्यामुळे रूळलेली अगतिकता यामुळे गनिमी काव्याने या सत्तेशी दोन हात करावे लागले. पारतंत्र्याचा एक अवश्यमेव भाग असा असतो की त्याविरुध्द प्रथम उठाव करणाराला नामोहरम करणे, घरच्यापेक्षा बाहेरचा सत्ताधारी आपलासा वाटणे! घरभेदीपणा सत्कर्माचा रंग घेतो. प्रत्येक कृतीला धर्मांधता म्हणण्यात येते, जातीयतेचा छाप मारला जातो. सूर्याजी पिसाळाची अवलाद उत्तम होऊन फंद - फितुरी वाढते - या सर्वांवर मात करून शिवरायांनी राजगडावर तोरण बांधून, राज्याभिषेक करविला तेव्हाच भूषण कवींनी त्यांचा गौरव केला तो या शब्दांनी - 'शिवाजी न होता तो सब की होती सुन्ता'. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते असे म्हणतात त्यानुसार आजही शायरनच्या नेतृत्त्वाने हिंदुत्वाची द्वाही फिरवण्याची नेमकी वेळ आली आहे. शिवरायांनी अनुसरलेला मार्ग धर्मांधतेचा नव्हता तर 'स्वत्व' टिकविण्याचा होता. त्याकरिता प्राणांची बाजी लावून मराठमोळ्यांनी लढा दिला होता. ती स्फूर्ति नंतर १९ व्या शतकापर्यंत कार्यरत होती. मराठ्यांचा भगवा जरिपटका अटकेपार लागला, दिल्लीचे तक्त फोडून आपल्या शौर्याची मुद्रा भारतभर पसरलेल्या भारतीयावर उमटवली. एवढी मर्दुमकी असूनही दिल्लीच्या सिंहासनावर - तक्तावर - .शेवटपर्यंत 'मराठा' न बसविता, मोगल बादशाहीच चालू राहिली. हे विषयांतर एवढ्यासाठीच केले की हिंदूंची युध्दप्रविणता ते सत्ताधीश होण्याइतकी बलशाली असूनही, त्यांच्या विशिष्ट मानसिक ठेवणीनुसार ते आक्रमक सत्ताधारी केव्हाच झाले नाहीत हे स्पष्ट व्हावे!

भारतीय हिंदू हे निसर्गतः व त्यांना मिळालेल्या धार्मिक व अध्यात्मिक वारसानुसार प्रवृत्तीने सौम्य प्रकृतीचे आहेत, आक्रमक नाहीत. परंतु, या आधी उध्दृत केलेल्या नॉस्ट्राडेमसच्या शतक १, श्लोक ५० प्रमाणे, 'शायरन' हा हिंदू नेता अखिल हिंदुविश्वाला जागृति आणून स्वतःच्या वादळी व्यक्तिमत्वाने, आपल्या भूमि नि सागरी सामर्थ्याचे दर्शन घडविणार आहे. अजिंक्य हिंदुनेता ही आपली प्रतिमा सर्व

...(52)...

प्रारंभी जगाच्या क्षितीजावर उगवणार आहे. हा जो बदल घडणार आहे तो नॉस्ट्राडेमसच्या इच्छेने घडणार नसून नियतीच्या इच्छेने हा सारा बनाव घडणार आहे. त्यातून नवीन जे घडणार आहे ते म्हणजे हिंदुस्थान हा सर्वश्रेष्ठ देश होणार आहे. आज कित्येक शतके न दिसलेले, दृष्टिआड झालेले हिंदुंचे साम्राज्य अवतरणार आहे.

आजच्या विज्ञानयुगात अणुशास्त्राचा जो अभ्यास चालू आहे, व अणु-अस्त्रे बनविण्याची वा संग्रही ठेवण्याची जी चढाओढ सर्व जगभर चालू आहे त्यावरून आगामी युध्दाची भीषणता स्पष्ट होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानंतर जो अहवाल प्रसिध्द झाला आहे त्यावरून निःसंदिग्ध शब्दात प्रामुख्याने सांगितले आहे की, आगामी युध्द हे अणुयुध्द झाल्यास - आणि आज, त्या दृष्टीने जी पावले पडत आहेत त्यानुसार ३ हे महायुद्ध अणुयुध्दच होणार याबद्दल दुमत होण्यासारखेही नाही - प्रत्यक्ष परिणाम प्रचंड मनुष्यहानी, उद्ध्वस्त झालेले देश, भस्मसात झालेली मालमत्ता व शेती या दृष्यांनी दिसतील हे तर खरेच, पण त्याहीपेक्षा त्याचे जे अप्रत्यक्ष परिणाम प्रदीर्घ कालपर्यंत जाणवतील ते मात्र फारच भयंकर स्वरूपाचे असतील.

या अणुयुध्दाने जगातील हवामानात बदल होईल. ज्या गोलार्धातील शहरांवर अणुबाँब किंवा रॉकेट्स यांचा मारा होईल - आणि उत्तर गोलार्धातील मोठ्या शहरांवर असा वर्षाव होण्याचा संभव जास्त - त्या गोलार्धातील तपमान शून्य अंश सेल्शिअस् खाली जाईल. सूर्यप्रकाश पुरेसा मिळणार नाही. पाऊस कमी पडेल. त्यामुळे शेती, वनस्पती उगवण्या - उत्पन्न होण्यावर विपरित परिणाम होईल. ओझोनचा संरक्षक थर कमी होत आहे, अशी आजच आवई उठली आहे. तो संरक्षक थरही अणुयुध्दाने आणखी कमी होऊन अतिनील किरण रोखले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल.

नॉस्ट्राडेमसला हे सर्व प्रलयंकारी दृष्य दिसत असूनही त्याने केलेल्या ग्रहगणिताच्या आधारे तो म्हणतो की, या तिसऱ्या महायुध्दात अनेक तथाकथित प्रगत देश बेचिराख होतील. तरी त्यातून मानववंश टिकून राहील; हिंदुस्थान - म्हणजे हिंदुराष्ट्र - आणि त्या देशात जन्मलेला द्रष्टा नेताच, सर्व जगाचा तारणहार जगज्जेता असेल!

भगवान् श्री रामकृष्ण परमहंस यांचे एक फ्रेंच भक्त रीनकोर्ट नामक लेखक आहेत. त्यांनी परमहंसांचा निर्वाणापूर्वी जे सांगितले ते श्री रामकृष्णांचे शब्द उद्धृत करून म्हटले आहे की रामकृष्णांची ती भविष्यवाणी नॉस्ट्राडेमसच्या भाकितांना पुष्टीच देते. भगवान रामकृष्ण परमहंस म्हणाले होते की त्यांचा 'पुढचा जन्म भारताच्या वायव्येला होईल' हेच दुसऱ्या भाषेत विशद करून सांगायचे तर परमहंस रशियांत हिंदु संत म्हणून पुनः जन्म घेतील, नि हिंदुत्वाचे पुनरुत्थापन होईल. 'शक-हूण' आदि जमातींप्रमाणे रशियाहि हिंदुत्ववादी झालेला दिसेल, त्या जीवनपद्धतीचा स्वीकार करील कारण या आकाशाखाली सर्वकश विचारस्वातंत्र्य असलेली दुसरी जीवनपद्धतीच नाही. रशिया,

...(74)...

हिंदु संस्कृति, धर्म, व त्यांचे राष्ट्रप्रेम याबद्दल, नॉस्ट्राडेमस स्वतः ज्यू वा ख्रिश्चन असूनहि, जे उत्कटतेने उद्‌गार काढतो, ते त्याला काही आंतरिक साक्षात्कार झाल्यामुळें काढीत असावा असे वाटण्याइतके खणखणीत आहेत. भारतांतील हिंदु हे खरे हिंदुस्तानचे रहिवासी, भारतांतील मुस्लिम हे घुसखोर तरी किंवा बाटगे मुसलमान, त्यामुळें त्यांना, नॉस्ट्राडेमस, राष्ट्रद्रोही. म्हणतो. हिंदु धर्माशिवाय हिंदुस्तान अशक्य, आणि हिंदुस्तानची हिंदु संस्कृतीहि अशक्यच! आगामी प्रलयंकारी युद्धांतून जगाला नवा प्रकाश देणारा जगज्जेता म्हणून हिंदूच नेता असेल याबद्दल 'नॉस्ट्राडेमस' ठाम आहे!

।। যথার্থ জ্ঞান প্রকাশের বিষয় ।।

পরমেশ্বরের বিষয়ে শাস্ত্র কি বলছে?

প্রভু-স্বামী-ইশ-রাম-খুদা-অল্লাহ-রব-মালিক-সাহেব-দেব-ভগবান-গড্-গৌড। এই সব শক্তিবোধক শব্দ আছে, যা ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে উচ্চারণ করা ও লেখা হয়ে থাকে।

"প্রভুর মহিমাতে প্রত্যেক জীব প্রভাবিত হয় যেকি, কোন শক্তি তো আছে যাকিনা পরম সুখদায়ক এবং কষ্ট নিবারক। তিনি কে? কেমন দেখতে? কোথায় আছেন বা থাকেন? কিভাবে পাওয়া যাবে? এই প্রশ্নবাচক চিহ্ন এতদিনে পূর্ণ রূপে হাটেনি। এই শঙ্কা এই পুস্তক থেকে পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হয়ে যাবে।

যে শক্তি অন্ধকে দৃষ্টি প্রদান করে, বোবাকে আওয়াজ (শব্দ) প্রদান করে কানে না শোনা, কালাকে শ্রবণ করান, বাজাস্ত্রীকে পুত্র দেন, নির্ধন কে ধন প্রাপ্ত করান, আর রোগীকে সুস্থ সাস্থ্য প্রদান করেন, তার যদি দর্শন হয়ে যায়, তাহলে অতি আনন্দ অনুভব হবে। যিনি সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচনহার, পূর্ণ শক্তিদায়ক জগৎগুরু ও সর্বজ্ঞ আছেন, যার আজ্ঞা বিনা গাছের পাতাও নড়ে না। সবশক্তিমানের সামনে অসম্ভব বলতে কিছুই নেই। এই সব গুণ যাহার ভিতরে আছে বাস্তবে সেই প্রভু (স্বামী, ইশ, রাম, ভগবান, খুদা, অল্লাহ রহিম, মালিক, রব ও গড্ বা গৌডও) কেহ বলে থাকেন।

এখানে একটা কথা বিশেষ বিচার করার বিষয়, যে কি যে কোনোও শক্তির জ্ঞান যে কোনো শাস্ত্র থেকেই হয় বা বোঝা যায়। ওই শাস্ত্রের আধারে গুরুজন নিজের অনুযায়ীদের মার্গদর্শন করান। ওই শাস্ত্র (ধার্মিক পুস্তক) হল, চারিবেদ (ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ), শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবদ্ সুধাসাগর, আঠারো পুরাণ, মহাভারত, বাইবেল, কুরান ইত্যাদি প্রমাণিত শাস্ত্র আছে। চারি বেদ স্বয়ং পরমাত্মার আদেশে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল/ব্রহ্ম/ক্ষরপুরুষ) সমুদ্রের ভিতরে নিজের শ্বাস দ্বারা লুকিয়ে রেখেছিল। তবে প্রথমবার যখন সাগর মন্থন করে ও বেদ চারখানি ব্রহ্মাকেই প্রাপ্ত হয়েছিল। যে ব্রহ্মা (ক্ষরপুরুষ/কাল/ব্রহ্মের বড় পুত্র) সে পড়ুন, ব্রহ্মা যেমন বুঝেছেন সেই আধারে সংসারে জ্ঞান প্রচার, ব্রহ্মার, বংশ (ঋষি)-এর দ্বারা করিয়েছেন। পূর্ণ পরমাত্মা কবির সাহেব, পঞ্চম নম্বর বেদও দিয়েছিলেন 'স্বসম" (সুক্ষ) বেদও ব্রহ্ম(কাল)-কে দিয়েছিলেন, যে এই কাল, জ্যোতিনিরঞ্জন (ব্রহ্ম) নিজের কাছে গুপ্ত রেখেছিল, ও সেই বেদ সমাপ্ত করে দিয়েছে।

কিছু সময় উপরান্ত অর্থাৎ এক হাজার চতুর্যুগের (এককল্পের) পরে তিন লোক (পৃথিবী লোক, স্বর্গলোক ও পাতাললোক)-র সর্বপ্রাণী প্রলয় (বিনাশ) হয়ে যায়। পরে জ্যোতিনিরঞ্জন (কাল)-এর নির্দেশে ব্রহ্মা নিজের রাত্রি সমাপ্ত হলে (ব্রহ্মার রাত্রী একহাজার চতুর্যুগে হয় তথা এতই দিন) যখন দিন আরম্ভ হয়, রজোগুণে প্রভাবিত করে, প্রাণীদের উৎপত্তি তিনলোকে শুরু করে। তখন সত্যযুগ শুরু হতেই ঐ চারিবেদ কাল (ব্রহ্ম) স্বয়ং ব্রহ্মাকে আবার প্রদান করে, আবার প্রাকৃতিক উথল পুথলের কারণ, চারিপবিত্র বেদের জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যায়। তারপরে আবার সময় অনুসার অন্য ঋষিদের মধ্যে প্রবেশ করে, দ্বিতীয়বার লেখায়।

পরে যখন সময় অনুসার প্রাকৃতিক উথল পুথল হয়, তখন স্বাথী লোকের দ্বারা, বেদের মধ্যে বদলি করে বাস্তবিক জ্ঞান সংসার থেকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়ে থাকে। ওই (কাল) ব্রহ্ম, জ্যোতি নিরঞ্জন, মহাভারত যুদ্ধে র সময় শ্রী কৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করে, চারিবেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীমদভাগবত্ গীতা রূপে দিয়ে বলল, হে অর্জুন এই জ্ঞান আমি আগে সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য নিজের পুত্র বৈবশ্বৎ (মনু)-কে বলেছিল, মনু তার পুত্র ইক্ষাবাকুকে বলেছিল কিন্তু মাঝখানে এই উত্তম জ্ঞান প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই কাল(জ্যোতিনিরঞ্জন) ঋষি বেদব্যাসের শরীরে প্রবেশ করে চার বেদ, মহাভারত, আঠারো পুরান, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা ও শ্রী সুধাসাগর কে পুনরায় লিপিবদ্ধ (সংস্কৃত ভাষাতে) করিয়েছে, যা আজ সবার কাছে উপলব্ধ আছে, এই সর্ব শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। এখন এই শাস্ত্রকে কলিযুগী ঋষিরা ভাষাভাষ্য অর্থাৎ হিন্দি অনুবাদ করে, নিজের বিচার মিলানো চেষ্টা করে তাহা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভুল। যাহা কিনা কিছু কিছু সংস্কৃত ব্যাখ্যার সাথে, অনুবাদ মিল হচ্ছে না। এই সব শাস্ত্র মহর্ষি বেদব্যাস দ্বারা কমপক্ষে ৫৩০০ (পাঁচ হাজার তিন শত) বছর পূর্বে দ্বিতীয়বার লিখেছে। সেই সময়ে হিন্দু ধর্ম, ইসাই ধর্ম, মুসলমান ধর্ম ও শিখ ও ধর্ম, কোনধর্মই ছিল না। এক বেদ মাননেবালা আর্যরাই ছিল। কর্ম আধারে জাতি তৈরী হয়েছিল, তাহা কেবল চার বর্ণেরই (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র) -ই ছিল।

এতে একটা মাত্র প্রমাণ বোঝা যায় যে কি, এই সর্ব শাস্ত্র কোনো ধর্ম বা ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। ইহা কেবল মানবের কল্যানের জন্যে। দ্বিতীয় এ প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের কোন আলাদা জাত বা ধর্ম ছিল না, একই ধর্ম বুঝত বা জানতো সেটা হল মানব ধর্ম। তাদের সবার সংস্কার একই মিলাজুলা ছিল। সর্ব প্রথম পবিত্র শাস্ত্র গীতার উপর বিচার করা হোকঃ-

।। পবিত্র গীতার জ্ঞান কে বলেছেন?।।

পবিত্র গীতার জ্ঞান ওই সময় বলা হয়েছিল, যে সময়ে মহাভারতের যুদ্ধ হতে চলেছিল। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিল না। যুদ্ধ কেন হতে যাচ্ছিল? এই যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধের সংজ্ঞাও দেওয়া যায় না; কেননা দুই পরিবারের সম্পত্তি ভাগাভাগি বা বিতরণের বিষয় ছিল। কৌরব ও পান্ডবদের সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছিল না। পান্ডবদের অর্ধেক রাজ্য্য দিতে মানা করেছিল। এই দুই পক্ষের মাঝখানে মীমংসা করার জন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তিনবার শান্তি দূত হয়ে এসেছিল। কিন্তু দুই পক্ষই নিজের নিজের জিদের উপর অটল ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে যে ক্ষতি বা হানি হবে, তাহাতে পরিচিত করিয়ে দিয়ে বললেন, না জানি এই যুদ্ধে কত বোন বিধবা হবে? না জানি কত সন্তান অনাথ হবে? মহাপাপ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু পাবে না। যুদ্ধতে না জানি কে মরে, কে বাঁচে? তৃতীয় বার যখন শ্রীকৃষ্ণ মীমাংসা করতে গেলেন, তখন দুই পক্ষতেই নিজ নিজ পক্ষ বালা রাজাদের সেনা সহিত সূচীপত্র দেখালেন এবং বললেন এতগুলো রাজা আমার পক্ষে আর এতগুলো আমার পক্ষেতে। যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখল যে, দুই পক্ষই টস্ থেকে মস্ হচ্ছে না।

যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে, তখন শ্রী কৃষ্ণ ভাবলেন, এক দ্যাবপ্যাচ আরও আছে তাও

আজ লাগিয়ে দিই, শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন মনে হয় হয়তো পান্ডবদের আমি আত্মীয় আছি বলে তারা হয়তো ভাবছে বিজয় তো আমাদেরই হবে (কেননা শ্রী কৃষ্ণের বোন সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়েছে) সেইজন্য হয়তো জিদ ছাড়ছে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন, একদিকে আমার সব সেনা থাকবে আর একদিকে আমি স্বয়ং একা থাকব, এবং এর সাথে সাথে আমি বচন বদ্ধ হচ্ছি যে কি, আমি অস্ত্র উঠাবো না। কৃষ্ণের এই কথা শুনে পান্ডবদের পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে গেল। তাই পান্ডবরা ভেবে নিল আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। এই বিচার করে পঞ্চপান্ডব এই বলে সভার বাইরে গেলেন, যেকি, তাহলে আমরা কিছু বিচার করে নিই। কিছু সময় পরে শ্রীকৃষ্ণকে বাইরে আসার জন্যও প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাইরে আসলেন, পান্ডবরা প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান! আমাদের পাঁচটা গ্রাম দিতে বলেন। আমরা যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের ইজ্জত বা সম্মানও থেকে যাবে। আর আপনিও তো যুদ্ধ করাতে চান না, আপনার কথাও থেকে যাবে।

পান্ডবদের এই ফ্যাসলা (প্রস্তাব) শুনে, শ্রীকৃষ্ণ খুব খুশী হয়েছিলেন, তাই ভাবলেন খারাপ সময় হয়তো কেটে গেল। সভায় কেবল কৌরব ও তার সমর্থকরাই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন যুদ্ধ টলে গেল;আমারও এই ইচ্ছা ছিল। আপনি পান্ডবদের পাঁচটা গ্রাম দিয়ে দেন, কেননা তারা যুদ্ধ করতে চাইছে না। দুর্যোধন বলল পান্ডবদেরকে একটা সূঁচের অগ্রভাগ পরিমাণও তুল্য জমি দেব না। যদি জমি নিতে হয়, তাহলে কুরুক্ষেত্র ময়দানে যেন যুদ্ধ করে। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ রাগ হয়ে দূর্যোধনকে বললেন, দুর্যোধন, তুই মানুষ নয় শয়তান আছিস। কোথায় অর্ধেকরাজ্য আর কোথায় পাঁচটা মাত্র গ্রাম? আমার কথা শোন, পাঁচটা গ্রাম দাও। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে রাগ হয়ে দূর্যোধন আজ্ঞা দিল উপস্থিত যোদ্ধাদের যে কি, কৃষ্ণকে ধরে কারাগারে বন্দী কর। আজ্ঞা পাওয়া মাত্রই কৃষ্ণকে চারিদিকে ঘিরে ফেলল। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের বিরাট রূপ দেখালেন। তার জন্য সব যোদ্ধা ও কৌরব ভয়ে চেয়ারের নীচে ঢুকে যায় আর এবং কৃষ্ণের শরীরের তেজ প্রকাশ দেখে চোখ বন্ধ হয়ে গেল। পরে শ্রীকৃষ্ণ ওইখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আসুন বিচার করি ঃ- উপরোক্ত বিরাট রূপ দেখানোর প্রমাণ সংক্ষিপ্ত মহাভারত গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত প্রত্যক্ষ আছে আর যে সময় কুরুক্ষেত্র ময়দানে পবিত্র গীতার জ্ঞান শোনানো প্রভু বলেছিল যে অর্জুন আমি মহাকাল, আমি সর্ব লোককে খেয়ে থাকি, সেই কাল আমি এখন প্রকট হয়েছি। একটু ভাবুন যে, শ্রীকৃষ্ণ তো আগে থেকেই অর্জুনের সাথে ছিল। যদি পবিত্র গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই বলতো, তাহলে একথা বলতো না যে, এইরূপ আগে কেউ দেখেনি আজ তোমায় দেখালাম, কোনো সাধনার দ্বারা বা মুনি ঋষিরাও এইরূপ কোনোদিন দেখিনি। আগে যে বিরাট রূপ দেখিয়েছিল সেটা কৃষ্ণরই রূপ, তবে শ্রীকৃষ্ণকাল নয়/তার দর্শনেতে পশু (গায় আদি) প্রসন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত। যার দর্শন বিনা গোপীরা খেত না, তার জন্য জানতে হবে কাল অন্য কোনো এক শক্তি। কাল শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত হয়ে প্রবেশ করে, পবিত্র শ্রীমদ ভাগবৎ গীতার জ্ঞান রূপে চারি বেদের সার বলে দিয়েছিল। কালের একহাজার হাত আর শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন তার হল চার হাত। আবার গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ২১ থেকে ৪৬-তে অর্জুন বলছিল, হে ভগবান! আপনি তো সবাইকে খাচ্ছেন দেখছি যে আপনার স্তুতি করছে তারাও আপনার মুখ গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে, তারমধ্যে ঋষিদের, দেবতাদের সিদ্ধদেরকও

খেয়ে ফেলছেন, যারা আপনার মহিমা পবিত্র বেদের মন্ত্র দ্বারা উচ্চারণ করছে ও আপনার কাছে জীবনের জন্য রক্ষা ও মঙ্গল কামনা করছেন। নদীরা যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। ঠিক তারাও আপনার দাঁতে বেঁধে রয়েছে, কাহারও মাথা দাঁতে বেঁধে যাচ্ছে। হে সহস্র বাহু (হাজার হাত বালা) ভগবান! আপনি আপনার ঐ চতুর্ভূজ রূপে আসেন। আমি আপনার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে স্থির থাকতে পারচ্ছি না ভয়ে সর্ব অঙ্গ কম্পিত হচ্ছে।

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৪৭-তে পবিত্র গীতা বলা কাল প্রভু বলছে হে অর্জুন। এটাই আমার বাস্তবিক কাল রূপ, এই রূপ তুই ছাড়া পূর্বে কেউ দেখিনি।

উপরোক্ত প্রমাণ থেকে এক তথ্য তো সিদ্ধ বা স্পষ্ট হল যে, কৌরবের সভায় বিরাট রূপ সেইটা হল শ্রীকৃষ্ণের নিজের রূপ। আর এই কুরুক্ষেত্র ময়দানে যে বিরাট রূপ তাহা হল কাল (শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত রূপে ঢুকেছিল, কালের বাস্তবিক রূপ) দেখিয়েছিল। অতএব তাই যদি না হত তাহলে শ্রীকৃষ্ণের এই কথা বলতেন না যে, হে অর্জুন! এই বিরাট রূপ তুই ছাড়া আগে (পূর্বে) কেউ দেখেনি। আর কৌরবের সভায় যে বিরাট রূপ দেখানো হয়েছিল সেটা কৃষ্ণেরই বিরাট রূপ ছিল।।

দ্বিতীয় এই কথা সিদ্ধ হয় যে, পবিত্র গীতাকে যিনি বলছে তিনি হল কাল (ব্রহ্ম বা জ্যোতিনিরঞ্জন)। গীতা বলা কৃষ্ণ নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ আগে কখনও বলেনি যে আমি কাল, এবং পরেও কখনও বলিনি আমি কাল। শ্রীকৃষ্ণ কাল হতে পারে না। কেননা তার দর্শন মাত্র তো দূর দূর ক্ষেত্র থেকে স্ত্রীরা ও পুরুষরা ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

নোট ঃ- বিরাট রূপ কেমন হয় ?

বিরাট রূপ ঃ- আপনি দিনের বেলায় বা চাঁদের রাত্রিতে যখন নিজের শরীরের ছায়া ছোট কিংবা বড় কমপক্ষে শরীরের মাপের লম্বা হলে বা কিছু বড় হলে, ওই ছায়ার স্থানে দুই মিনিট পর্যন্ত্য একভাবে বা একনিরিখে তাকিয়ে থাকবে, তাতে চোখে জলই চলে আসুক না কেন বা জল টপকে পড়তে থাকুক না কেন, দুই মিনিট পরে আকাশের দিকে তাকাবে। তখন নিজে নিজের বিরাট রূপ দেখতে পাবে, যে কিনা সাদা রঙের আকাশকে ছুইবে। এই প্রকার প্রত্যেকের বিরাট রূপ থাকে কিন্তু যার ভক্তি শক্তি বেশী হয়, তার তত তেজ বেশী হয়ে থাকে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণও পূর্বে ভক্তি শক্তিতে সিদ্ধিযুক্ত ছিল, তাই তার নিজের সিদ্ধি শক্তিতে, নিজেকে বিরাট রূপ করেছিল। যে কিনা কালের তেজোময় শরীর (বিরাট) থেকে, শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপের তেজ কম ছিল। তৃতীয় কথা এ সিদ্ধ হয়েছে যে, পবিত্র গীতা বোলনে বালা প্রভু কাল সহস্রবাহু বালা অর্থাৎ হাজার হাত বালা, আর শ্রী কৃষ্ণ হল বিষ্ণু অবতার, যে কিনা চার হাত বালা বা চতুর্ভূজ যুক্ত। শ্রীবিষ্ণু যোল কলা যুক্ত আর জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ভগবান তো হাজার কলা যুক্ত। যেমন এক (বলভ) ৬০ ভোল্টেজের, এক (ভল্ব) (লাইট) ১০০ ভোল্টেজের হয়ে থাকে, আর এক (ভল্ব) ১০০০ভোল্টেজের হয়ে থাকে। রোশনী সব ভল্বের (লাইটেরই) হয়ে থাকে। কিন্তু তার ভিতর অন্তর (ব্যবধান/তফাৎ) হয়ে থাকে। ঠিক এই প্রকার দুই প্রভুর শক্তি আছে এবং বিরাট রূপের তেজও তাই আলাদা আলাদা।

এই তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার আগে যে গীতা জ্ঞান বুঝতেন মহাত্মা, তার কাছে এই দাস (তত্বজ্ঞানী রামপাল মহারাজ) প্রশ্ন করেছিলেন যে, আগে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনবার শান্তি দূত

হয়ে বুঝাতে গিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যুদ্ধ করা মহাপাপ। যখন অর্জুন স্বয়ং যুদ্ধ করতে মানা করে বলছে, হে দেবকী নন্দন! আমি যুদ্ধ করতে চাই না, সামনে আত্মীয় স্বজন বন্ধু কুটুম্বদের বিনাশের কথা ভেবে অটল ফ্যাসলা করে নিয়েছি যে তিন লোকের রাজ্য প্রাপ্ত হলেও আমি যুদ্ধ করব না। আমি চাই যদি দুর্যোধনও আমাকে তীর বিদ্ধ করে মেরে ফেলে, তাতে আমার মৃত্যুতে যদি, যুদ্ধে যে বিনাশ হবে তা যদি বেঁচে যায়? আবার বললেন হে শ্রীকৃষ্ণ! স্বজনদের মারলে তো পাপই হয়। হে কৃষ্ণ! আমি যুদ্ধ না করে ভিক্ষা করে অন্ন খেয়ে জীবন নির্বাহ করাকেই উচিৎ মনে করি। আমার বুদ্ধি কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি আমার গুরু আমি আপনার শিষ্য। আমার উপকার বা হিত যাতে হয় সেই পরামর্শ দিন। তবে আমি মানতে পারছি না, যে কি আপনার কোনো পরামর্শ, আমাকে যুদ্ধের জন্য রাজী করাতে পারবে; অর্থাৎ আমি যুদ্ধ করব না। (প্রমান পবিত্র গীতা অধ্যায় ১ শ্লোক নং ৩১ থেকে ৩৯-৪৬ এবং গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ৫ থেকে ৪ তে)।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করা কাল বার বার বলছে, অর্জুন ভীতু হইও না, যুদ্ধ কর। হয় তো যুদ্ধে মারা গিয়ে স্বর্গ প্রাপ্ত হবে, নয়তো যুদ্ধে জিতে পৃথিবী রাজ্য ভোগ করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি বলে, এমন ভয়ঙ্কর বিনাশ করে ফেলেছে যে আজ অবধি সন্ত মহাত্মাদের বা সভ্য লোকের চরিত্রতে খুঁজলেও পাওয়া যায় না। তখন সে অজ্ঞানী গুরু (নীম-হকীম) বলত, অর্জুন ক্ষত্রীয় ধর্ম ত্যাগ করছে। এতে ক্ষত্রিয় ধর্মের হানি ও সুরবীরতার সদা বিনাশ হয়ে যায়। অর্জুন কে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করানোর জন্য, এই মহাভারতের যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ করিয়েছে। আগে তো আমি উনাদের এই অবুঝ অজ্ঞানী গল্প শুনে চুপ হয়ে যেতাম, কেননা আমার স্বয়ং জ্ঞান ছিল না।

আবার বিচার করুন ঃ- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ক্ষত্রীয় ছিলেন। উগ্রসেন রাজা শ্রীকৃষ্ণের দাদু ছিলেন তাই কংস বধের পরে নাতি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরার সিংহাসন সামলাতে দিয়েছিলেন। একদিন নারদ শ্রী কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, কাছাকাছি একটা গুফা (গুহা) আছে ওখানে এক সিদ্ধিযুক্ত (রাক্ষস রাজা মুচকন্দ) শুয়ে আছে। ওই মুচকন্দ রাক্ষস ছয় মাস ঘুমায় ও ছয়মাস জাগে। জাগলে ছয় মাস যুদ্ধ করে আর ছয় মাস হল ঘুমানোর সময়। যদি কেহ ওই রাক্ষসকে জাগায়, তাহলে তার চোখ থেকে অগ্নিবান ছোটে, তাহলে সামনে যে থাকবে তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়ে যাবে। আপনি কিন্তু সাবধান থাকবেন এই বলে নারদ চলে গেলেন।

কিছু সময় পরে শ্রীকৃষ্ণকে ছোট (অল্প) বয়সেই মথুরা সিংহাসনে বসা দেখে এক কাল্পবন নামের রাজা আঠারো কোটি সেনা নিয়ে মথুরায় আক্রমণ করতে আসে। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন কাল্পবন রাজার শত্রুর সংখ্যা অনেক, না জানি কত সৈনিকের মৃত্যু হয়ে যাবে, ভাবলেন, ঐ কল্পবনের বধ মুলচন্দ রাক্ষসকে দিয়ে করানো হোক। এই বিচার করে শ্রীকৃষ্ণ কাল্পবন রাজাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। আর যুদ্ধ ছেড়ে ক্ষত্রীয় ধর্ম ভুলে বিনাশ থেকে বাঁচাতে হবে জেনে পালিয়ে, ওই গুফার (গুহার) মধ্যে প্রবেশ করলেন, যেখানে মুচকন্দ রাক্ষস শুয়ে ছিল। মুচকন্দের উপর পীতাম্বর (হলুদ) রঙের চাদর ফেলে, শ্রীকৃষ্ণ গুহার মধ্যে অন্য এক স্থানে লুকিয়ে পড়েছিলেন। পিছনে পিছনে কাল্পবন রাজাও ঐ গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। মুচকন্দকে কৃষ্ণ ভেবে, মুচকন্দের পা ধরে ঘুরিয়ে বলছে, ভীতু তুই লুকিয়ে থাকলেই আমি কি তোকে ছেড়ে দেব? যন্ত্রণায় মুচকন্দের ঘুম ভেঙে যেতেই, চোখ থেকে অগ্নিবান ছুটে কাল্পবন বধ হয়ে যায়। কাল্পবনের সৈনিক ও মন্ত্রী

নিজেদের রাজার মৃতদেহ নিয়ে ফিরে চলে গেল। কেননা যুদ্ধে রাজার মৃত্যু হওয়া মানে সেনাদের হার মানা হয়ে থাকে। যেতে যেতে বলে গেল, আমরা নতুন রাজা বানিয়ে তাড়াতাড়িই আসব, তবে শ্রীকৃষ্ণ তোকে ছাড়বে না।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখ্য অভিয়ন্তা (চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার) শ্রী বিশ্বকর্মা কে ডেকে বললেন, এমন জায়গা খোঁজো যেখানে তিনদিকে সমুদ্র আছে এবং একটাই রাস্তা বা দরজা হবে। ওখানে অতি শীঘ্র এক দ্বারিক (এক দ্বার বালা) নগরী বানিয়ে দাও আমি শীঘ্রই ওখানে যেতে চাই। এই মূর্খ লোক এখানে শান্তিতে বাঁচতে দেবে না। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এমন পরিস্কার আত্মা যে কি যুদ্ধের বিপক্ষী ছিলেন, যিনি কিনা ক্ষত্রিয় ধর্মেরও বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ কে এড়িয়ে থাকতেন। এখন বিচার করুন, ঐ শ্রীকৃষ্ণ তবে কি অর্জুনকে (প্রিয় বন্ধু ও সখাকে) যুদ্ধ করার যুক্তি পরামর্শ দিতে পারেন? অতএব এটা কখনও হতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে স্বয়ং বিষ্ণু অবতার হয়ে এসেছিলেন।

এক সময় বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) আরামে শুয়েছিলেন, ভৃগু ঋষি শ্রীবিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ)-র বুকে গিয়ে লাথি মেরেছিলেন। শ্রী বিষ্ণু ভৃগু ঋষির পা ধরে বললেন, হে ঋষিবর। আপনার কোমল চরণে চোট লাগেনি তো? কেননা আমার বুক তো পাথরের মত শক্ত। যদি শ্রীবিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) যুদ্ধ প্রিয় হতেন তাহলে তার সুদর্শন চক্র দিয়ে ভৃগু ঋষির শরীররকে এত টুকরো টুকরো করতে পারতেন। যে কিনা গোনা সম্ভব হত না।

বাস্তবিক হল যে? কাল ভগবান একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিল যেকি, আমি আমার শরীরে ব্যক্ত (মানব সদৃশ নিজ শরীর) রূপে সবার সম্মুখে আসব না। ওই কাল সেইজন্য সুক্ষ শরীর হয়ে প্রেতের (ভূতের) মত শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে, পবিত্র গীতার জ্ঞান তো সঠিক (বেদের সার তত্ব)-ই বলেছে, পরন্তু যুদ্ধ করানোর জন্য, চালাকী বাজীও করতে ছাড়েনি। কাল (ব্রহ্ম) কে আছেন? এই কথা জানতে হলে পড়ুন, সৃষ্টির রচনা, এই পুস্তকে "জ্ঞান গঙ্গা"-র পৃষ্ঠা নম্বর ২০ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত্য। যত সময় মহাভারতে যুদ্ধ সমাপ্ত না হয়েছে তত পর্যন্ত্য জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষ) শ্রী কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশই হয়েছিল এবং যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথাও বলিয়েছিল যে কি, বলে দাও অশ্বত্থমা মারা গিয়েছে। ভীমের নাতি ঘটৎকছের পুত্র ববরুভানের মাথা কাটিয়েছে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে আমি হাতে অস্ত্র তুলল না সেখানে তিনি (শ্রী কৃষ্ণ) স্বয়ং রথের চাকাকে অস্ত্র রূপে উঠিয়েছিল, এই সবই কালেরই কান্ড ছিল, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নয়। মহাভারতের যুদ্ধ সমাপ্ত হতেই, কাল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লির) রাজগদীতে (সিংহাসনে) বসিয়ে, নিজে দ্বারকা যাবে বলেছিলেন। তখন অর্জুন সব মিলে প্রার্থনা করে শ্রীকৃষ্ণকে বললো হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের পূজ্য গুরুদেব আছেন, আমাদের এক সৎসঙ্গ শুনিয়ে যান, যাহা শুনে আমরা আপনার সদবচন পালন করে চলে, নিজেদের আত্মকল্যান করতে পারি।

এই প্রার্থনা স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণ তিথি, সময়, ও স্থান নিহিত করে দিলেন। ধার্য করা তিথিতে অর্জুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছে, হে প্রভু আজ ওই পবিত্র গীতার জ্ঞান সেইভাবেই শুনান। কারণ বুদ্ধির দোষের কারণে আমি সব ভুলে গিয়েছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলল হে অর্জুন তুই নিশ্চয়ই বড় শ্রদ্ধাহীন, তোর বুদ্ধি ভাল নেই, এই পবিত্র জ্ঞান, তুই কেন ভুলে গিয়েছিস? পরে শ্রীকৃষ্ণ

বললেন, এখন ঐ পূর্ণ গীতা জ্ঞান, আমি বলতে পারব না তথা আমার ওই জ্ঞান নেই। আর বললেন ঐ সময় তো আমি যোগযুক্ত হয়ে বলেছিলাম। বিচারের বিষয় হল যে কি যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সময় যোগযুক্ত হয়েছিল, তাহলে শান্ত সময় যোগযুক্ত হওয়া কঠিন ছিল না। যেহেতু শ্রীবেদব্যাস ঐ পবিত্র গীতার জ্ঞান কয়েক বর্ষ উপরান্ত যেমন বলা হয়েছিল ঠিক তেমনই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐ সময় ঐ কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) শ্রী ব্যাসদেবের শরীরে প্রবেশ করে গিয়ে, পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাকে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিল। যাহা আজ আপনাদের কর কমলে আছে।

।। প্রমাণের জন্য সংক্ষিপ্ত মহাভারত পৃষ্ঠা নং ৬৬৭ এবং পুরানের পৃষ্ঠা নং ১৫৩১-এর মধ্যে দেখবেন।।

ন শক্যং তন্ময়া ভূযস্তথা বক্তুমশেষতঃ।।

পরংহি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া। (মহাভারত, আশ্রব ১৬১২-১৩)

ভগবান বললেন—ওই সব ওই রূপে আবার দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ ওই সময়ে আমি যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মা তত্মের বর্ণনা করেছিলাম। (সংক্ষিপ্ত মহাভারত দ্বিতীয় ভাগের, পৃষ্ঠা নং ১৫৩১ থেকে বিবরণ)

(শ্রীকৃষ্ণর ও অর্জুনের গীতার বিষয় যে জিজ্ঞাসা এই কথাই মহর্ষি বৈশম্পায়ন আর কশ্যপের সংবাদে বলা হচ্ছিল) পাণ্ডুনন্দন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাথে থেকে খুব প্রসন্নতে ছিল। অর্জুন একবার ঐ রমনীয় সভার দিকে দৃষ্টি দিয়ে, ভগবানকে বলল, হে দেবকী নন্দন, যখন যুদ্ধের অবসর উপস্থিত ছিল, ওই সময় আমি আপনার মাহাত্ম্যর জ্ঞান ও ঈশ্বরীয় সরূপের দর্শন পেয়েছিলাম। কিন্তু কেশব! আপনি স্নেহবশে আগে যে জ্ঞানের উপদেশ করেছিলেন, ওই সব এই সময় বুদ্ধির দোষে ভুলে গিয়েছি, ওই বিষয়ে শোনার জন্য বারবার আমার মনে উৎকণ্ঠা হচ্ছে, আপনি তাড়াতাড়ি দ্বারকা চলে যাবেন। তাই পুনঃ (আবার) ওই সব বিষয়ে আমাকে শুনিয়ে যান।

বৈশম্পায়ন ও কশ্যপের কথা বার্তা চলছিল, তাই বৈশম্পায়ন বলছেন- অর্জুনের ঐ কথা শুনে বক্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গলায় মিলে উত্তর দিলেন-শ্রীকৃষ্ণ বললেন-অর্জুন! ওই সময় আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ে শ্রবণ করিয়েছিলাম। আপন সরূপভূত ধর্ম, সনাতন পুরুষতমতত্বের পরিচয় দিয়েছিলাম। আর (শুক্ল পক্ষ-কৃষ্ণগতিতে নিরূপণ করছিল) নিত্য লোকেরও বর্ণন করেছিলাম। কিন্তু তোমার অবুঝতার কারণ, ঐ উপদেশকে মনে স্মরণ রাখে নি, এই জেনে আমি দুঃখিত। ঐ কথাগুলো এখন পুরোপুরি স্মরণ করা সম্ভব নয়। পাণ্ডুনন্দন নিশ্চয়ই তুমি বড় শ্রদ্ধাহীন, তোমার বুদ্ধি ভাল নেই। এখন আমার পক্ষে, ঐ উপদেশ সঠিক ভাবে দুবার, (দ্বিতীয়বার) বলা কঠিন। কেননা ওই সময় যোগযুক্ত হয়ে আমি, পরমাত্ম তত্বের বর্ণন করেছিলাম। (বেশী কিছু জানতে হলে পড়ুন, সংক্ষিপ্ত মহাভারতের দ্বিতীয় ভাগ)।

বিচার করেন ঃ- উপরোক্ত মহাভারতের লেখা, ও শ্রী বিষ্ণু পুরাণের লেখা ও শ্রীমদভাগবত গীতা লেখা প্রমাণে সিদ্ধ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার জ্ঞান নিজে বলেনি ওই জ্ঞান তো কাল রূপী ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) অর্থাৎ মহাবিষ্ণু প্রেতবশ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ হয়ে বলেছিল।

অন্য প্রমাণ ঃ- (১) শ্রী বিষ্ণুপুরাণে (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত) চতুর্থ অংশ অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক২৬ পৃষ্ঠা ২৩৩ তে বিষ্ণু (মহাবিষ্ণু অর্থাৎ কালরূপী ব্রহ্ম) দেব তথা রাক্ষসদের যুদ্ধের সময়ে, দেবতাদের প্রার্থনা স্বীকার করে বলেছিল, যে আমি রাজঋষি শশাদের পুত্র পুর্ণজয়ের শরীরে অংশ মাত্র অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য প্রবেশ করে রাক্ষসদের নাশ করে দেব।

(২) শ্রী বিষ্ণু পুরাণ (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত) চতুর্থ অংশ অধ্যায় তৃতীয় শ্লোক ৬-পৃষ্ঠা ২৪২-র মধ্যে শ্রী বিষ্ণু গন্ধর্ব ও নাগের যুদ্ধতে নাগেদের পক্ষ হয়ে বলেছিল, আমি (মহাবিষ্ণু অর্থাৎ কালরূপী ব্রহ্ম) মানধাতার পুত্র পুরুকুৎসতে প্রবিষ্ট হয়ে ওই সম্পূর্ণ দুষ্টু গন্ধর্বদের নাশ করব।

অন্য প্রমাণ ঃ- কিছু সময় পরে যুধিষ্ঠিরকে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা দিতে লাগল, শ্রী কৃষ্ণের কাছ থেকে কারণও সমাধান জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, তুমি যুদ্ধে যে পাপ করেছো, সেই নর সংহারের দোষে তুমি দুঃখ পাচ্ছ। তার জন্য একটা যজ্ঞ কর, শ্রী কৃষ্ণের মুখ কমল থেকে এই বচন শুনে, অর্জুনের খুব দুঃখ লাগল। তাই অর্জুন মনে মনে বিচার করতে লাগল, যে কি পবিত্র গীতা বলার সময় তো তিনি বলছিলেন যে, অর্জুন তোমার কোনো পাপ হবে না, তুমি যুদ্ধ কর (পবিত্র গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭-৩৮)। যদি যুদ্ধে তে মারা যাও তাহলে স্বর্গ সুখ ভোগ করবে, আর যুদ্ধে বিজয় হলে পৃথিবীর সুখ ভোগ করবে। অর্জুন বিচার করল যে সমাধান দুঃখ নিবারণের শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এতে তো কোটি টাকা খরচ হবে। যার কারণেই বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের কষ্ট নিবারণ হবে। আর এখন যদি সেটা মানায় না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমি বাদ-বিবাদ করি তবে পবিত্র গীতা জ্ঞান দেওয়ার সময় তো বলছিলেন, যে তোমার পাপ লাগবে না, আর এখন তার বিপরীত কথা বলছেন। তাহলে আমার বড় ভাই যুধিষ্ঠির ভাববেন, অর্জুন কোটি টাকা খরচ করার ভয়ে অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে এইকথা বলে কথায় বাদ বিবাদ করছে। আমার কষ্ট নিবারণের থেকে ও প্রসন্ন নেই। এইজন্য মৌন থাকা উচিৎ ভেবে সহর্ষ স্বীকৃতি দিয়েছিল, যেভাবে আপনি বলবেন সেইভাবেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ ওই যজ্ঞের তিথি নির্ধারিত করে দিলেন। এই যজ্ঞও শ্রী সুদর্শন স্বপচের ভোজন খাওয়াতে সফল হয়েছিল।

কিছু সময় উপরান্ত ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের কারণে সারা যদুকুল বিনাশ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলায়, এক শিকারী (যেকিনা ত্রেতাযুগে যে, ঐ শিকারী সুগ্রীবের ভাই বালী ছিল, তারই আত্মা) বিষাক্ত তীর মেরেছিল। তখন পঞ্চপান্ডবের ঘটনা স্থলে পৌঁছলে পরে, শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আপনারা আমার শিষ্য, আমি আপনাদের ধার্মিক গুরু, এইজন্য আমার শেষ আজ্ঞা শুনো! প্রথম কথা যে, অর্জুন এই দ্বারিকার স্ত্রীদের ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লিতে) নিয়ে যাবে। কেননা ওখানে কোনো পুরুষ বেঁচে নেই আর দ্বিতীয় কথা আপনারা সব পান্ডব রাজ্য ত্যাগ করে হিমালয়ে সাধনা করে শরীরকে গলিয়ে দেবে। কেননা, তোমরা মহাভারত যুদ্ধে র সময় যে হত্যা করেছো, তার কারনে তোমাদের মাথার উপর ভয়ঙ্কর পাপ চড়েছে। ঠিক ওই সময় অর্জুন আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারল না। অর্জুন বলল, প্রভু এই সময় আপনার যে স্থিতি, তাতে এই কথা বলা শোভা পায় না, কিন্তু প্রভু যদি আজ আমি আমার এই শঙ্কার সমাধান না করি, তাহলে আমি শান্তিতেও মরতে পারব না। সারা জীবন কেঁদে বেড়াবো। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন জিজ্ঞাসা

কর যা প্রশ্ন করার আছে, এখন আমার অন্তিম সময়। অর্জুন চোখে অশ্রু ভরে বলছে, হে প্রভু খারাপ ভাববেন না। যখন আপনি পবিত্র গীতার জ্ঞান বলছিলেন, ওই সময় আমি যুদ্ধ করতে চাই নি। আপনিই তো বলেছিলেন অর্জুন, তোর দুই হাতে লাড্ডু। যদি যুদ্ধে মারা যাস্ তো স্বর্গ প্রাপ্তি হবে আর যুদ্ধে বিজয়ী হলে পৃথীবির সুখ প্রাপ্ত হবে। আর এখন আমাদের রাজ্য ত্যাগ করার কথা বলছেন? না তো যুদ্ধতে মরে স্বর্গ প্রাপ্তি হল আর না তো এখন বিজয়ী হয়ে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করতে পারব। আপনি এখন রাজ্য ত্যাগ করতে বলছেন। এইরকম ছল যুক্ত ব্যাবহারে আপনার কি স্বার্থ ছিল? অর্জুনের মুখ থেকে একথা শুনে, যুধিষ্ঠির বললেন অর্জুন এই স্থিতিতে যখন ভগবান অন্তিম শ্বাস গুনছেন, তোমার এই শিষ্টাচার রহিত ব্যাবহার শোভা পায় না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, আজ আমার অন্তিম স্থিতি, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই আজ বাস্তবিক বলছি, খলনায়কের মত কোন এক শক্তি আছে, যে কিনা আমাকে যন্ত্রের মত নাচাতে থাকে, ওই পবিত্র গীতার জ্ঞানের কথা আমি কিছু জানি না, আমি কি বলেছিলাম। কিন্তু এখন যা আমি তোমাদের বলবো সেটা তোমাদের হিতেই বলব। শ্রীকৃষ্ণ এই বচন অশ্রুযুক্ত নেত্রে বলে প্রাণ ত্যাগ দিলেন। এই উপরোক্ত বিবরণ থেকে সিদ্ধ হয়েছে যে কি, পবিত্র গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেননি। এ তো ব্রহ্ম, (জ্যোতি নিরঞ্জন-কাল) বলেছিল, যে একুশ ব্রহ্মান্ডের স্বামী। কাল (ব্রহ্ম) কে আছে? এই কথা জানার জন্য কৃপা করে এই পুস্তকে পৃষ্ঠা ২০ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠায় পাবেন।

শ্রীকৃষ্ণ সহিত সমস্ত যাদবদের অন্তিম সংস্কার করে অর্জুনকে ছেড়ে চার ভাই, ইন্দ্র প্রস্থে (দিল্লি) চলে গেলেন।

পরে অর্জুন দ্বারকার সর্ব স্ত্রীদের নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লিতে) যাচ্ছিলেন। রাস্তায় জঙ্গলী লোকেরা সব গোপীদের লুটে ও কিছু স্ত্রীদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর অর্জুনকে ধরে পিটিয়েছে। অর্জুনের হাতে ঐ গান্ডিব ধনুক ছিল, যেটা দিয়ে মহাভারতের সময় তখন অগণিত হত্যা করেছিল, সে ধনুক এখন কাজ করছে না। তখন অর্জুন বলছে, এই শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবই মিথ্যাবাদী ও কপটবালা। যখন যুদ্ধে পাপ করানোর দরকার ছিল, তখন তো আমায় শক্তি প্রদান করেছিল, একতীরে একশো যোদ্ধাকে মারতে পারতাম, আর আজ ওই শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে হচ্ছে। এই বিষয়ে তাই কবির সাহেব (কবির্দেব) বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কপট বা মিথ্যাবাদী ছিল না;এই সব জুলুম (জবরদস্তি) কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) করেছিল। যত সময় এই ব্রহ্মান্ডের আত্মারা কবীর পরমেশ্বর (সতপুরুষ)-এর শরণে পূর্ণ সন্ত (তত্বদর্শী) এর না আসবে তত পর্য্যন্ত কাল এইভাবে সব আত্মাকে ৮৪ লক্ষ যোনিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাখবে। সমস্ত আত্মারা পশু যোনিতে এভাবে কয়েক লক্ষ বার ঘুরে যদি ফিরে এই মানব জনম পায়, আর সেই সময় যদি এই সন্ত (তত্বদর্শী) রামপাল মহারাজ সেই যুগে আসেন বা পরমেশ্বর এইরকম তত্বদর্শীকে পাঠান, তবেই এই কালের হাত থেকে রক্ষা পাবে। নয়তো এই কাল ব্রহ্মের রাজ্যে কষ্টের পর কষ্টই পেতে হবে।

বিশেষ বিচার ঃ- উপরের কথায় প্রমাণ বা সিদ্ধ হয়েছে যে, শ্রীমদ ভাগবত গীতার জ্ঞান কাল (ব্রহ্মে)-রই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলেননি। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবতে প্রবেশ করেছিল। কালের পরিচয় ভাল করে জানতে হলে, ২০ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠায় এই পুস্তকে পাবেন।

।। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা সার ।।

পরমেশ্বরের খোঁজে এই সকল আত্মা যুগ যুগ ধরে লেগেই রয়েছে। যেমন পিপাসা যুক্ত মানুষ জলের খোঁজ করে থাকে। এই জীবাত্মা সব পরমাত্মা থেকে আলাদা হয়ে মহাকষ্ট ভোগ করছে। যে সুখ পূর্ণব্রহ্ম (সতপুরুষ)-র সতলোকে (ঋতুধামে) ছিল, ওই সুখ এই কাল (ব্রহ্ম) প্রভুর লোকে নেই। যদিও কেউ কোটি পতি বা পৃথিবীপতি (সর্ব পৃথিবীর রাজা) থাকুক, কিংবা সুরপতি (স্বর্গ রাজা ইন্দ্র) হোক না কেন, অথবা ব্রহ্মা, শিব এই ত্রিলোক পতি না হোক কেন, তার জন্ম মৃত্যু এবং তার কর্মের ভোগ তাকে অবশ্যই পেতে হবে। যেমন ত্রেতা যুগে বালিকে বধ করেছিল ভগবান রাম, তাই দ্বাপর যুগে রামের আত্মাই কৃষ্ণ রূপে এসে সেই ভোগ করতে হয়েছিল। রামের আত্মা অতএব শ্রীকৃষ্ণ আর বালির আত্মা কৃষ্ণ ভগবানকে যে শিকারী বিষাক্ত তীর ছুড়ে মেরে ছিল। এই কালের রাজ্যে এই নিয়ম পালন হতেই থাকবে। (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২ ও গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৫তে আছে)। এই জন্য পবিত্র শ্রীমদ ভাগবত গীতার জ্ঞান দাতা প্রভু (কালভগবান) অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এবং অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছে, অর্জুন হে সর্বভাবদ্বারা ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা, তার কৃপাতেই পরম শান্তি ও সতলোক (শাশ্বতম্ স্থানম্) প্রাপ্তি হবে। তবে ওই পরমেশ্বরের তত্বজ্ঞান ও ভক্তিমার্গের খবর আমি (গীতা জ্ঞানদাতা কাল) জানি না। ঐ তত্বজ্ঞান জানতে হলে কোন তত্বদর্শী সন্তের কাছে যা, তাকে দন্ডবৎ প্রণাম কর এবং বিনম্র ভাবে প্রশ্ন কর। তাহলে তিনি (তত্বদৃষ্টা সন্ত) তোমাকে পরমেশ্বরের তত্বজ্ঞান বোঝাবে। পরে তাহার বলা ভক্তি মার্গের উপর চলে সর্বভাবে লেগে থাক (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ তে) তত্বদর্শী সন্তের পরিচয় (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১-তে) বলে দিয়েছে, যে কি এ সংসার উল্টো ঝুলানো বৃক্ষের মতো। যার উপরে মূল (শিকড়) এবং নীচে শাখা, যে এই সংসার রূপী বৃক্ষের বিষয় জানে সেই তত্বদর্শী সন্ত আছে জানবে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২ থেকে ৪ তে বলা হয়েছে, ওই সংসার রূপী বৃক্ষের তিনগুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতোগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) রূপী হল শাখা। যে (স্বর্গ লোক, পাতাল লোক, ও পৃথিবী লোক) তিন লোকের উপর থেকে নীচে ছড়িয়ে আছে। ওই সংসার রূপী উল্টো লটকানো (ঝুলানো) বৃক্ষের বিষয়ে অর্থাৎ সৃষ্টি রচনার বিষয়ে আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) বলতে পারব না। এখানে বিচার কালে (গীতা জ্ঞান) যে জ্ঞান তোমাকে বলছি, এটা সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়। তারজন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ তে সংকেত দিয়ে বলা হয়েছে যে পূর্ণ জ্ঞান (তত্বজ্ঞান, পরমেশ্বরের সৃষ্টির ও পরমেশ্বরকে সন্ধান পাওয়ার জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রের গুঢ় রহস্য ইত্যাদি) জানবার জন্য তত্বদর্শী সন্তের কাছে যা তিনিই বলে দেবেন। আমি সম্পূর্ণ তত্বজ্ঞানের খবর জানি না। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ তে বলেছে। যে তত্বদর্শী সন্তের প্রাপ্তি হওয়ার পরে, তার কাছ থেকে ঐ পরমপদ পরমেশ্বরের (যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২ তে বলা হয়েছে) খোঁজ করা উচিৎ। যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরবার এই সংসারে ফিরে আসে না, অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অতএব যে পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা উল্টো সংসার রূপী বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তারের প্রাপ্ত হয়েছে। ভাবার্থ হল যে কি,

পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচনা করেছেন, তথা আমি (গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম) ও ওই আদি পুরুষ পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মারই শরণে আছি। তার সাধনা করলে অনাদি মোক্ষ (পূর্ণ মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।

তত্বদর্শী সন্ত তিনিই যিনি উপরের মূলের ও নীচের তিনগুণ (যেমন-রজোগুণ ব্রহ্মা, সতোগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব)-রূপী শাখার এবং মোটা কান্ড ও ডালের পাতা রূপী বৃক্ষের (সংসারের) পূর্ণ সন্ধান বা খবর প্রদান করে থাকেন। কৃপা করে দেখেন উল্টো ঝুলানো সংসার রূপী বৃক্ষের ছবি।

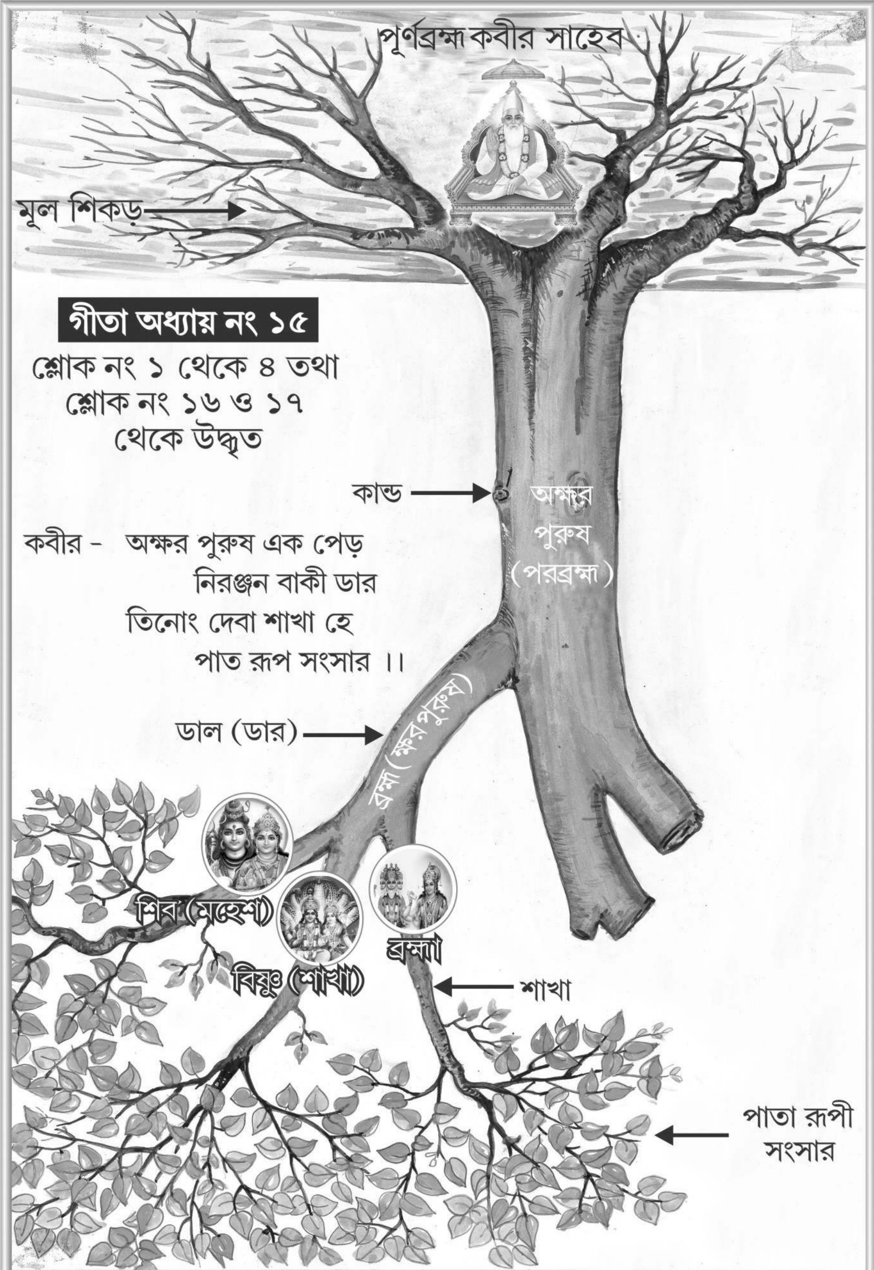
পরমেশ্বর কবির (কবির্দেব) নিজের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ণ জ্ঞান (তত্বজ্ঞান) স্বয়ংই পরমেশ্বর কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) তত্বদর্শী সন্তের ভূমিকা করে (কবিগীর্ভিঃ) কবীর বাণী দ্বারা বলেছেন (প্রমাণ ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র নং ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত্য তথা ঋক্‌বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র নং ১ থেকে ৫ এবং অথর্ববেদ কান্ড ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র নং ১ থেকে ৭-তে।

কবীর ঃ- অক্ষর পুরুষ এক পেড় হে, জ্যোতি নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হে, পাতা রূপ সংসার।।

পবিত্র গীতায় তিন পুরুষ বা তিন প্রভু (১) ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম, (২) অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম (৩) পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মর বিষয়ে বর্ণন আছে। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১-এর উত্তর শ্লোক ও-তে তিনিই পরম অক্ষর ব্রহ্ম, তিন প্রভুর এক আর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৫ গীতা জ্ঞান দাতা কাল (ব্রহ্ম) নিজের বিষয়ে বলেছে, যে আমি অব্যক্ত। এই প্রথম অব্যক্ত প্রভু হয়েছে। পরে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১৮ তে বলেছে, এই সংসার দিনের সময় অব্যক্ত (পরব্রহ্ম) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পরে রাত্রে ওতেই লীন হয়ে যায়। এই দ্বিতীয় বার অব্যক্ত হল। অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ তে বলেছে, ওই দ্বিতীয় অব্যক্ত থেকেও, অন্য যে অব্যক্ত তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম। ওই পরম দিব্য পুরুষ;সর্ব প্রাণী নষ্ট হলেও তিনি নষ্ট হল না। ঐ প্রমাণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১৭-তে ও আছে যে নাশ রহিত ওই পরমাত্মাকে কেউ নাশ করার ক্ষমতা নেই। নিজের বিষয়ে গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম) প্রভু, অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৫ তথা গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২-তে বলেছে আমার তো জন্ম মৃত্যু হয় অর্থাৎ নাশবান।

উপরোক্ত সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়) তো পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মকবির্দেবই আছেন। ইনাকেই তৃতীয় অব্যক্ত প্রভু বলা হয়েছে। বৃক্ষের শিকড় থেকেই এই সর্ব গাছের খাবার প্রাপ্ত হয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭-তে বলা হয়েছে যে বাস্তবে পরমাত্মা হল ক্ষর পুরুষ অতএব ব্রহ্ম, এবং অক্ষর পুরুষ অতএব পরব্রহ্ম থেকেও অন্য। যে কিনা তিনো লোকে প্রবেশ করে সবার ধারণ পোষণ করেন, তিনিই বাস্তবে অবিনাশী, অর্থাৎ যার কোনদিন নাশ হয় না,

(১) ক্ষর শব্দের মানে হল নাশবান। কেননা গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম স্বয়ং বলেছে যেকি অর্জুন তোর ও আমার অনেক জন্ম-মৃত্যু হয়েছে (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২ ও গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৫-তে)।



এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন - উপরে মূল (শিকড়)
নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র

(২) অক্ষরের অর্থ হল অবিনাশী। এখানে পরব্রহ্মকেও স্থায়ী অর্থাৎ অবিনাশী বলা হয়েছে। কিন্তু এও বাস্তবিক অবিনাশী নয়। এ চিরস্থায়ী এমন, যেমন এক মাটির পেয়ালা যা সাদা রঙের চা খাওয়ার কাজে লাগে। ওতো মাটিতে পড়লেই ভেঙে যায়। ঠিক এই পরিস্থিতি ব্রহ্ম (কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষের) দ্বিতীয় পেয়ালা স্টীলের হয় এ মাটির পেয়ালার তুলনায় অধিক স্থায়ী অবিনাশী মনে হয় পরন্তু তারও জঙ্গ লেগে যায়, তথা নষ্ট হয়ে যায় যত ভালই টেকসই হোক না কেন। সেও বাস্তবে অবিনাশী নয়। তৃতীয় পেয়ালা সোনার, সে ধাতু বাস্তবে অবিনাশী, যার নাশ হয় না।

যেমন পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ)-কে অবিনাশী বলা হয়েছে তথা বাস্তবে অবিনাশী এই দুইজন থেকে আলাদা, এইজন্য অক্ষর পুরুষকে অবিনাশী বলা যায় না।

কারণ ঃ- সাতটা রজোগুণ ব্রহ্মার মৃত্যুর পরে এক সতগুণ বিষ্ণুর মৃত্যু হয়। সাতটা সতগুণ বিষ্ণুর মৃত্যুর পরে এক তমোগুণ শিবের মৃত্যু হয়। যখন তমোগুণ শিবের ৭০ হাজার বার মৃত্যু হয়ে যায় তখন এক ক্ষরপুরুষের (ব্রহ্মের) মৃত্যু হয়। তখন এই পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ)-এর এক যুগ হয়। এইরকম একহাজার যুগের পরব্রহ্মের একদিন তথা এতটাই রাত্রী হয়। তিরিশ দিন ও রাতে মিলে এক মাস, বারোমাসে এক বর্ষ তথা একশো বৎসর পরব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ) এর আয়ু হয়। তখন এই পরব্রহ্ম তথা সর্ব (সমস্ত) ব্রহ্মান্ড যে সতলোকের থেকে নীচে আছে তাহা সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। কিছু সময় উপরান্ত সমস্ত নীচের ব্রহ্মান্ড (ব্রহ্ম তথা পরব্রহ্ম লোক) এর রচনা, পূর্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম(সতপুরুষ) তথা তার সতলোক (ঋতধাম) সহিত উপরের অলখলোক, অগম লোক, অনামী লোক কোনদিন নষ্ট হয় না।

এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭তে বলেছে যে, বাস্তবে উত্তম প্রভু অর্থাৎ পুরুষোত্তম তো ব্রহ্ম(ক্ষরপুরুষ) ও পরব্রহ্ম(অক্ষরপুরুষ) থেকে অন্য জনই আছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম(পরম অক্ষর পুরুষ) তিনিই বাস্তবে অবিনাশী আছেন। তিনিই সবার পালন পোষণ করনে বালা, সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়) রূপী পূর্ণ পরমাত্মা তবে বৃক্ষের যে ভাগ মাটির থেকে একটু উপরে দেখা যায়, তাকে আমরা গাছের কান্ড বলি। তাকে অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) জানবে। এই কান্ডের খাবারও ওই মূল শিকড় থেকে হয়ে থাকে। আবার কান্ডের উপরে ভাগ থেকে যে মোটা মোটা ডাল বের হয়, তার মধ্যে এক ডাল ব্রহ্ম (ক্ষরপুরুষ) এরও আহার জড় (মূল শিকড়) থেকে অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ থেকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ওই ডাল (ক্ষর পুরুষ/ব্রহ্ম/কাল) জানবে, তিন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) রূপী শাখা আছে। এরও আহার মূল শিকড় (পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম) থেকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই তিন শাখাদের পাতা রূপে অন্য প্রাণী আশ্রিত আছে। সেই পাতারও আহার ওই মূল শিকড় (পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম) থেকেই প্রাপ্ত হয়। এই জন্য সর্ব (সমস্ত) জীবের পূজ্য পূর্ণ পরমাত্মাই সিদ্ধ হয়েছেন। তবে এটা বলা যাবে না, যে কি ডাল পাতা শাখার কোনো যোগদান নেই, এইজন্য এরাও সর্ব আদরনীয়, পরন্তু পূজনীয় কেবল ওই জড়েরই (শিকড়মূলেরই) হয়ে থাকে। আদর ও পূজার মধ্যে তফাৎ আছে। যেমন পতিব্রত (স্বামী ভক্তি) স্ত্রী সৎকার তো সবাইকে করে, যেমন ভাসুর, শশুড়, শাশুড়ী, জা, দেওর, ননদ কিন্তু পূজা কেবল স্বামীকেই করে, কেননা ভাব সব থেকে স্বামীর উপরই সবার থেকে বেশী হয়ে থাকে, অন্য পুরুষের প্রতি স্বামীর সমান ভাব থাকে না, ঠিক এই রকম।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ- এক সময় হরিয়ানা প্রান্তে বন্যা হয়, ঐ সময় ছয়শো কোটির টাকার লোকসান হয়েছিল। তার পূরণ হরিয়ানা সরকার করতে পারতেন না। কেননা হরিয়ানা সরকারের এক বৎসরের বাজেট নয় কোটি টাকা ছিল। দেশের প্রধান মন্ত্রী ঐ ক্ষতি পূরণ করেছিলেন। ঐ ছয়শো কোটি টাকার বিতরণ হরিয়ানা সরকারের অধিকারী ও কর্মচারী করেছিল। যারা যারা এই সাহায্য পেয়েছে তারা তো জানে না, (অনজান) ঐ বিতরণ কর্ত্তা অধিকারী ও কর্মচারীকেই দান কর্ত্তা ভেবে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকেই অন্যান্য কিছুর আশা রাখত। তাদেরই মান সন্মান, ঘুষ দিতে থাকত। কিন্তু যারা শিক্ষিত তারা জানত যেকি এই অধিকার ও কর্মচারীদের এই দান দেওয়ায় কতটা যোগদান আছে। আদর তো শিক্ষিত ব্যক্তি এদের করত, কিন্তু ঘুষ দিত না। মান পূজা তো উপরে প্রধান মন্ত্রী বা সরকারকে করতো আর না তো অন্য কোনো আশা তারা রাখত।

সাহায্য বিতরণ হওয়ার কয়েকদিন পরে, ঐ ক্ষেত্রে প্রান্ত মন্ত্রি এসেছেন, বললেন আমি আপনাদের ক্ষেত্রে দশলাখ টাকা দিয়েছি। ওই গ্রামের সূচী থেকে নাম পড়ে শুনিয়েছে।

(১) রাম অবতার কে দশ হাজার, আদি আদিকে দিয়েছি। পরে ঐ-ই গ্রামে মুখ্য মন্ত্রী এসেছেন, উনিও সূচী পড়ে বললেন, আপনাদের গ্রামে আমি দশলাখ টাকা দিয়েছি।

(১) রাম অবতারকে দশ হাজার আদি আদিকে দিয়েছি এত এত। মূখ্য মন্ত্রি যাওয়ার কয়েকদিন পরে ঐ গ্রামেই প্রধান মন্ত্রি এসেছেন, বললেন আপনাদের গ্রামে আমি দশলাখ দিয়েছি এবং সূচী পড়ে শুনিয়েছে, তাতে লেখা রাম অবতারকে দশহাজার অন্যকে এত টাকা এইভাবে অমুক অমুককে এত ইত্যাদি ইত্যাদি এই শুনে রামঅবতার বলল, এ সব মিথ্যাকথা, আমায় তো, অঞ্চলের প্রধান দিয়েছে। প্রধান মন্ত্রি মিথ্যা কথা বলছে। ওই অবুঝ রাম অবতার তো পঞ্চায়েত প্রধানের পূজা করে নিজের কার্য্য সিদ্ধি করত কেননা সে যে প্রধানের হাত থেকে দান পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানে যে, প্রধান মন্ত্রি যদি সাহায্য না দিতেন তাহলে মুখ্য মন্ত্রি ও প্রান্তের মন্ত্রি ও প্রধান পঞ্চায়েৎ দিতে পারতেন না। যদি মুখ্য মন্ত্রী যদিও নিজের ভাগ থেকে বিতরণ করতেন তাহলে হয়তো একশো একশো টাকাই একজনের ভাগে দিতেন, সেটা নামমাত্র। এই প্রকার বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঠিক জেনে থাকেন, অনাদরনীয় কেউ হয় না, পরন্তু পূজার জন্য সেই একজনই, সবার চেয়ে শক্তিমান সেইজন্য পূজা কাকে করা হয়। বিচার করে চয়ন করা উচিৎ। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ৪৬ তে বলা হয়েছে যে কি অর্জুন, অনেক বড় জলাশয়ে (যেখানে দশ বৎসরও যদি বৃষ্টি না হয় তবুও সমাপ্ত হবে না) প্রাপ্তির পরে ছোট জলাশয়ে (যেখানে একবৎসর জল না হলে সমাপ্ত হয়ে যায়) তেও আস্থা থেকে যায়, এই প্রকার পূর্ণ পরমাত্মার পাওয়ার লাভের জ্ঞান হওয়ার পরও তোর আস্থা অন্য প্রভুর উপর ওই রকমই থেকে যাবে। ওই ছোট জলাশয় খারাপ লাগে না, কিন্তু তার ক্ষমতার খবর জানো যে, সেটা তো শুধু কোন রকম কাম চালিয়ে নিতে তা হয় বলে।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫-তে বলেছে, যে তিনগুণ দ্বারা যা কিছু হচ্ছে (যেমন-রজগুণ-ব্রহ্ম থেকে জীবের উৎপত্তি, সতগুণ-বিষ্ণু থেকে পালন স্থিতি, আর তমোগুণ শিব থেকে সংহার)এর মুখ্য কারণ আমি (ব্রহ্ম/কাল)ই আছি। যে সাধক তিনগুণ (রজো-ব্রহ্মা, সত-বিষ্ণু, তমো-শিব)-এর পূজা করে, সে রাক্ষস স্বভাব ধারণ করা মানুষ, দুষ্কর্ম করনে বালা মূর্খ, আমি ব্রহ্মকে ভক্তিও করে না। আবার নিজের ভক্তিকে তো খারাপ (অনুত্তমাম্) বলেছে। গীতা অধ্যায়

৭ শ্লোক নং ১৮তে, এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৫শ্লোক নং ৪, তথা গীতা অধ্যায় ১৮শ্লোক নং ৬২তে বলেছে, যে কি পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করলেই, পূর্ণ লাভ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, শাস্ত্র বিধি অনুসার ভক্তি করা, গীতায় লেখা। শাস্ত্র বিরুদ্ধে পূজা যে কিনা অন্য প্রভুর ইষ্ট রূপে সাধনা করা ব্যর্থ। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩-২৪-তে।

যেমন আম গাছের চারা নার্সারী থেকে এনে, তার শিকড় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে লাগিয়ে মাটি দিয়ে সমান করে, গোড়ায় মূলে জল দিলে (পূজা) করলে, সেই আমের চারা বড় হয়ে ফল ফুল শাখাতে হবে, আবার কেউ যদি ঐ চারাকে উঠিয়ে নীচে শাখা পাতা দিয়ে উপরে শিকড় রেখে দিয়ে জল ঢালে তো একদিনেই ঐ চারা শুকিয়ে যাবে। এর চিত্র এই পুস্তকে পৃষ্ঠা নং ১৯৭-১৯৮-তে আছে।

ভাবার্থ ঃ- সাধক যদি পূর্ণ পরমাত্মা (মূল)-এর সাধনা (পূজা) ইষ্ট রূপে করলে, তার ফল আপনা আপনি ওই তিনজন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব (ডাল বা শাখা)-ই প্রদান করবে। কেননা এটা ভগবানের করা কর্মের ফল আপনা থেকেই পেয়ে থাকে বা দিয়ে দেয়।

যদি মনে করেন আপনি কোনো কম্পানীতে চাকরি প্রাপ্ত করতে চাচ্ছেন, তো পূজা কম্পানী (ফ্যাক্টরী)-র মালিককেই করা হয়। তার কাছে পত্র দ্বারা যাঞ্চনা করে চাকরি পাওয়া হয়। সেবা (পূজা) তো মালিকেরই করতে হবে। যেমন কোন কাজ ঐ কর্মচারী (চাকর)-কে বলা হয়ে থাকে, সে কর্মচারী সেই ভাবেই সেবা করে থাকে। এই পূজা (চাকরি) মালিকেরই করা হচ্ছে। চা করি (পূজা)-করার যে কর্মের ফল (পরিশ্রম) ঐ মালিকের কোন অন্য চাকর (কর্মচারী বা অধিকারী) দিয়ে থাকে। যেমন শিফট অফিসার উপস্থিতির আধারে পরিশ্রমিক (কর্মকরার ফল)হিসাব করে ক্যাসিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেয় শিফট অফিসার ও ক্যাসিয়ার কেবল, তার কর্মের ফলই দিতে পারে, তার মধ্যে কোন পরিবর্তন করতে পারে না, না তো এক টাকা বাড়াতে পারে, না তো এক টাকা কমাতে পারে। যদি ঐ চাকর (পূজারী) সৎভাবে সততা নিয়ে পরিশ্রম (পূজা) করে মালিকের তাহলে মালিক তার সেবায় (পূজায়) সন্তুষ্ট হয়ে ধনরাশি বাড়িয়ে দিতে পারেন। ইনাম (পুরস্কার) রূপে অন্য কিছুও এক্সট্রা দিতে পারেন। আর সে যদি মালিকের চাকরি (পূজা) ছেড়ে অন্য কোনো অধিকারীর চাকরি (পূজা) করতে লাগে, তাহলে মালিকের কাছ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে, যার কারণ সে নির্ধন হয়ে যাবে। অধিকারীগণ তাকে অতটা ফল (মালিকের মত) দিতে পারবে না। ফ্যাক্টরী মালিকের তুলনায় অনেক কম সুবিধা পাওয়ার কারণে ও অন্য অধিকারীর সেবক, অর্থাৎ একমালিককে ত্যাগ করে অন্য উপাসনা করা ব্যক্তি মহাদুখী হতে হয়। কৃপা করে এই প্রকার তত্বজ্ঞানের আধারে পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার জ্ঞানকে বুঝবেন।

পূর্ণ ব্রহ্ম কুল মালিকের পূজা ত্যাগ করে অন্য দেবতার পূজা করলে সাধকের পূর্ণ লাভ প্রাপ্তি হয় না। তথা সাধকগণ সাধনা করতে করতেও মহাকষ্ট উঠাতে হয়। এইজন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫ এবং ২০ থেকে ২৩ পর্যন্ত তিনগুণ অর্থাৎ এই তিন দেবতাদের (রজগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব)-র পূজা করা ব্যক্তি রাক্ষস স্বভাব ধারণ করেছে, মনুষ্যতে তারা নীচ, দুষ্কর্ম করা ব্যক্তিদেরকে মূর্খ বলা হয়েছে। যে কি ওই ব্যক্তি (ব্রহ্ম ক্ষর পুরুষ ইনিই ফ্যাক্টরী মালিকের শিফট অফিসার)-র পূজা (চাকরি) করে না। ভাবার্থ হল যে এই তিন

দেবতা ও অন্য দেবতাদের পূজা করে (ক্যাশিয়ারের চাকরি করে) তাকে মূর্খ ও রাক্ষস স্বভাব বালা রাক্ষস বলা হয়েছে যেমন যে লোকের (আয়) রোজগার কম হয়, কোন কোন ব্যক্তি কিছু ছল-চাতুরী অবশ্যই করে থাকে। কেউ চুরি, কেউ ভেজাল, এই ধরণের ছল কপট রাস্তা বেছে নেয়। যার কারণ সমাজ হেয় হয় এবং দরিদ্র হয়ে যায়। এ প্রকার তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব)-এর দ্বারা পূর্ণ লাভ পাওয়া যায় না। তার কারণে সে সাধক মিথ্যা, ছল কপট বা অন্য খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। এই সব করার পর পাপ কর্ম করার দন্ড ভোগও তার ভোগ করতে হয়। এই জন্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (শিফট অফিসার) বলছে যে কি, এ নাদান (অবুঝ) সাধক আমার পূজা (চাকরি) ও করে না। আমি এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের থেকেই বেশী পরিশ্রমির (করা কর্মের ধন)ফল দিতে পারি, যা ওই উপরোক্ত প্রভুদের থেকে বেশী হয়।

আবার গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ তে বলেছে যে, আমার পূজা (চাকরি) তেও পূর্ণ লাভ হয় না।

সেইজন্য নিজের পূজাকেও, গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষ/কাল) প্রভু (অনুত্তমাম্) খুবই খারাপ অর্থাৎ অতি নিম্ন স্তরের বলেছে। এই জন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ এবং অধ্যায় ১৮শ্লোক নং ৬২-তে বলেছে, ওই পরমেশ্বরের স্মরণে যা, যার কৃপাতে তুই পরম শান্তি ও সতলোক (শাশ্বত স্থান)-কে প্রাপ্ত হবি। সেখানে যাওয়ার পরে সাধকের আর পুনর জনম হয় না, অর্থাৎ অনাদি মোক্ষ (পূর্ণ মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়ে যায়। গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু (ক্ষরপুরুষ/ব্রহ্ম) বলছে, আমিও ওই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরনে আছি। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫ এবং ২০ থেকে ২৩ বোঝার জন্য নিচে বিবরণ, ধ্যান পূর্বক পড়বেন।

।। তিনগুণ কি ? প্রমান সহিত ।।

তিন গুণ হল রজোগুনী ব্রহ্মা, সতোগুণীবিষ্ণু, তমোগুনী শিব আছেন। ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল ও প্রকৃতি অর্থাৎ দূর্গা থেকে উৎপন্ন এই তিনজনই নাশবান।

প্রমাণ ঃ- গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীশিব মহাপুরাণ যার সম্পাদক হলেন, শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় রুদ্র সংহিতা এই প্রকার তিন দেবতার ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবের গুণ আছে, পরন্তু শিবকে (ব্রহ্মকাল) গুণাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ- গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ্ দেবীভাগবত পুরাণ, যার সম্পাদক, শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমনলাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩ ঃ- ভগবান বিষ্ণু দূর্গার স্তুতি করে বলেছিলেন আমি (বিষ্ণু ব্রহ্মা) ও শিব তোমার কৃপাতে বিদ্যমান আছি। আমাদের তো আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হয়ে থাকে। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য, ও জগৎ জননী, প্রকৃতি এবং সনাতনী দেবী আছ। এদিকে ভগবান শঙ্কর বলছেন ঃ যদি ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তার পরে আমি উৎপন্ন হওয়া তমোগুণি লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান হলাম নয় কি ? অর্থাৎ আমাকেও উৎপন্ন করনে বালী তুমিই আছ। এই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি-সংহারে তোমারই গুণ সদা সর্বদা আছে। এই তিনগুণ থেকে উৎপন্ন আমরা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব (শঙ্কর) নিয়মানুসারে কার্য্যতে তৎপর থাকি।

উপরোক্ত এই বিবরণ কেবল হিন্দিতে অনুবাদিত শ্রী দেবীমহাপুরান থেকে, যার মধ্যে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। এইজন্য এই প্রমাণ দেখুন, শ্রীমদ দেবীভাগবত মহাপুরান সভাষটিকম্ সমহাত্যম্ খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রকাশন মুম্বই ইহাতে সংস্কৃত সহিত হিন্দি অনুবাদ করা তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক নং ৪২ঃ-

ব্রহ্মা ঃ

অহম্ মহেশ্বরঃ ফিলতে প্রভাবাৎসর্বে বযং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ,

কে অন্যে সুরা শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরানা।। ৪২।।

বাংলা অনুবাদ ঃ- বিষ্ণু বলেছিলেন হে মাত! ব্রহ্মা, আমি ও শিব তোমারই প্রভাবে জন্মবান হয়েছি, আমরা নিত্য নই অর্থাৎ আমরা অবিনাশী নই, তবে অন্যান্য যে দেবতারা আছেন তারা কি প্রকারে নিত্য হতে পারে? তুমিই অবিনাশী আমাদের জননী অর্থাৎ উৎপন্নকারী মাতা প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী আছো। (৪২)

।। পৃষ্ঠা ১১-১২ গীতা অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ৮।।

যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাংৎবিকে কথমহং বিহিতঃ চ তমোগুণঃ

কমল জশ্চ রজোগুণো সম্ভব ঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্বগুণোং হরিঃ। ।৮।।

অনুবাদ ঃ- (ভগবান শঙ্কর বললেন ঃ) হে মাত! যদি আমার উপর দয়াযুক্ত থাকেন তাহলে আমাকে তমোগুণের কেনো বানালেন? পদ্ম ফুল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণের ও বিষ্ণুকে সতগুণের কেন বানালেন? অর্থাৎ জীবদের জন্ম মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মতে কেন লাগিয়েছেন?

শ্লোক নং ১২ ঃ-

রমযসে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদ্ম শিবে ।। ১২।।

অনুবাদ ঃ- নিজের পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা ভোগ বিলাস করতে থাকো তোমার গতি কেউ জানে না।

।। তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা ১৪ অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ৪৩।।

একমেবা দ্বিতীয়ং যৎ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ।

সা কিং ত্বম্ বাৎপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্তয়।। ৪৩।।

অনুবাদ ঃ- যে বেদেতে অদ্বিতীয় কেবল এক পূর্ণ ব্রহ্মবলা হয়েছে, সে কি আপনি না অন্য কেউ? আমার এই শঙ্কার নিবারন করেন।

ব্রহ্মার প্রার্থনার পর দেবী বললেন —

দেব্যউবাচ সদৈকত্বং ন ভেদোস্তি সর্ব দৈব মমাস্য চ।।

যোসৌ সাৎহমহং যোসৌ ভেদোৎস্তি মতিবিভ্রমাৎ।। ২১।।

আবয়োরংতরং সুক্ষং যে। বেদ মতিমান্থি সঃ ।।

বিমুক্তঃ স তু সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।৩।।

অনুবাদ ঃ- দেবী বললেন- তিনি যা আছেন আমিও তাই, যা আমি তা তিনি, মতির বিভ্রম হয়ে ভেদ ভাসে হলেন আমাদের দুজনের যে সুক্ষ অন্তর আছে, তাকে যে জানবে।।২।। সেই মতিমান অর্থাৎ তত্বদর্শী, সে সংসার থেকে পৃথক হয়ে মুক্ত হন এতে কোনো সন্দেহ নেই।৩।

সুমরণা দ্দর্শনং তুভ্যং দাস্যেহং বিষমে স্থিতে।
স্বর্তব্যাহং সদাঃ দেবাঃ পরমাত্মা সনাতন।।৮০।।
উভয়োঃ সুমরনাদেব কার্যসিদ্ধির সংশয়ম্।
বহ্মোবাচ।।ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জাস্মান্দ ত্ত্বা শক্তিঃ সুসংস্কৃতান্ ।।৮১।।
বিষ্ণব্যেথ মহালক্ষী মহাকালীং শিবায় চ।।
মহাসরস্বতীং মহ্যং স্থাণাত্তস্মাদ্ধি সর্জিতাঃ।।৮২।।

অনুবাদ ঃ- সঙ্কট উপস্থিত হলে পরে সুমরনের সময়ই তোমাকে দর্শন দেব, দেবতারা! পরমাত্মা সনাতন দেবের শক্তিরূপে আমার সবসময় সুমরণ করবে।৮০।

দুইজনেরই সুমরনে অবশ্যই কার্যসিদ্ধি হবে, ব্রহ্মা বললেন এই প্রকার সংস্কার করে শক্তি দিয়ে আমাকে বিদায় করেছে। বিষ্ণুর নিমিত্তে মহালক্ষ্মী শিবের নিমিত্তে মহাকালী আর আমাকে মহা সরস্বতী দিয়ে বিদায় করেছেন।৮২।

মম চৈব শরীরং বৈ সুত্রমিত্যাভিধীয়তে।।
স্থুলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।।৮৩।।

অনুবাদ ঃ- আমার শরীর সূত্ররূপ বলা হয়, পরমাত্মাকে ব্রহ্মের স্থুল শরীর বলা হয়।

।। উপরোক্ত পুরান বাক্যের সার ।।

স্পষ্ট হয়েছে যে কি ব্রহ্মা রজোগুণের বিষ্ণু-সতোগুণের ও শিব তমোগুণের। তিন প্রভুই নাশবান; বা জন্ম মৃত্যু হয়ে থাকে। দূর্গাকে প্রকৃতিও বলা হয়। দূর্গার পতি (স্বামী) ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ) কাল আছে। তিনি তার সাথে পতি পত্নীর ব্যবহার (রমন/বিলাস) করতে থাকেন। দূর্গা ও ব্রহ্ম, দুজনেই স্থুল শরীরে আকারে আছেন।

এই প্রমান গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং ৩ থেকে ৫-তে আছে। গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ/কাল) বলছে যেকি প্রকৃতি (দূর্গা) তো আমার পত্নী আছে। আমি এর যোনী (গর্ভাধান স্থান) -তে বীজ স্থাপনা করি, যার থেকে সব প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। আমি সর্ব (একুশ ব্রহ্মান্ডের) প্রাণীদের পিতা এবং প্রকৃতি (দূর্গা/অষ্টাঙ্গী) সবার মাতা। এই দূর্গা (প্রকৃতি/ অষ্টাঙ্গী) থেকে উৎপন্ন তিন গুণ (রজগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব) অন্য প্রাণীদেরকে কর্ম বন্ধনে বাঁধে।

।। ত্রিগুণ মায়া (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব) জীবদের মুক্ত হতে দেয় না।।

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১ ও ২-তে ব্রহ্মবলছে, হে অর্জুন। এখন তোকে ওই জ্ঞান শুনাবো, যাহা জানার পরে আর কিছু জানতে বাকী থাকে না।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ ঃ- গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ/কাল) বলছে যে,

তিনগুণ দ্বারা যাহা কিছু হচ্ছে ওসব আমার থেকে হচ্ছে জানবি। যেমন রজগুণ (ব্রহ্মা) থেকে উৎপত্তি, সতগুণ (বিষ্ণু) থেকে পালন পোষণ স্থিতি এবং তমোগুণ (শিব) থেকে প্রলয় (সংহার) -এর কারণ কাল ভগবানই আছে। পরে বলছেন, আমি এর মধ্যে নেই, কেননা আমি (কাল) অনেক দূরে (একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিজের লোকে থাকে।) আমি মন রূপ মৌজ কালই মানায়, তথা রিমোট দিয়ে সর্ব প্রাণীদের তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে যন্ত্রের দ্বারা চালায়। গীতা জ্ঞান বলা ব্রহ্ম বলছে যে কি, একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের জন্য, আমার পূজা থেকেই শাস্ত্র অনুকুল সাধনা প্রারম্ভ হয়ে থাকে, যা বেদেতে বর্ণিত আছে। আমার অন্তর্গত যত প্রাণী আছে, তাদের সবার বুদ্ধি আমার হাতে। আমি হলাম কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডেরই মালিক। এইজন্য (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২থেকে ১৫ পর্যন্ত্য) যা কিছু তিনগুণ থেকে (রজোগুণ-ব্রহ্মা থেকে জীবের উৎপত্তি, বিষ্ণু-সতগুণ থেকে স্থিতি ও তমোগুণ শিব থেকে সংহার) যা কিছুই হচ্ছে তার মুখ্য কারণ আমি (ব্রহ্ম/কাল)ই আছি। (কেননা কালকে একলাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের শরীরকে মেরে তার ময়লা খাওয়ার অভিশাপ আছে) যে সাধক আমার (ব্রহ্মর) সাধনা না করে ত্রিগুণময়ী (রজগুণ-ব্রহ্মা সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব)-এর সাধনা করে ক্ষণিক লাভ প্রাপ্ত করে, যার কারণ বেশী কষ্ট উঠাতে থাকে, সাথে সংকেতও করেছে, যে কি এর থেকে বেশী লাভ, আমি (ব্রহ্ম/কাল) দিতে পারি, কিন্তু এ মূর্খ সাধক তত্বজ্ঞানের অভাবে, এই তিন গুণেরই পূজা করে থাকে যেমন - ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পর্যন্ত্যই সাধনা করতে থাকে।

এদের সবার বুদ্ধি এই তিন প্রভু পর্যন্ত্যই সীমিত আছে। এই জন্য এরা রাক্ষস স্বভাব ধারন করে আছে। মনুষ্যতে নীচ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা রূপী দুষ্কর্ম করা ব্যক্তি মূর্খ আমায় (ব্রহ্মকে) ভজে না। এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ৪ থেকে ২০ ও ২৩-২৪ পর্যন্ত্য গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২থেকে ১৪ তথা ১৯ ও ২০ তেও আছে।

বিচার করেন ঃ- রাবন শিবকে মৃত্যুঞ্জয়, অজর-অমর সর্বেশ্বর মনে করে (মেনে) ভক্তি করেছিল, তাছাড়া দশবার মাথা কেটে শিবকে সমর্পিত করেছিল, যার বদলে (কারনে) যুদ্ধের সময় দশটা মাথা রাবন প্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু মুক্তি প্রাপ্ত হয়নি, তাকে রাক্ষস বলা হত। এই দোষ হল রাবনের গুরুদেবের যে, অবুঝ গুরু বেদের জ্ঞানকে ঠিক মত না বুঝে, নিজের বুদ্ধিতে ভেবে তমোগুণ যুক্ত শিবকেই পূর্ণ পরমাত্মা বলে বুঝিয়েছে আর সরল আত্মা রাবণ, মিথ্যা গুরুর উপর বিশ্বাস করে নিজের জীবন ও নিজের কুলের নাশ (নষ্ট) করেছিল।

(১) এক ভস্মাগিরী নামের এক রাক্ষস ছিল, যে তমোগুণী-শিবকে ইষ্টদেব মেনে শীর্ষাসন (উপরে পা নীচে মাথা) দিয়ে ১২ বৎসর পর্যন্ত্য সাধনা করেছিল, ভগবান শিবকে বচন বদ্ধ করে ভস্মাকন্ডা নিয়ে নেয়। ভগবান শিবকেই মারতে যায়। উদ্দেশ্য এই ছিল ভস্মকরা বর প্রাপ্তি করে। শিবকে ভস্ম করে পার্বতী-কে পত্নী বানাবে। ভগবান শিব ভয়েতে পালাতে শুরু করে, পরে বিষ্ণুর কাছে যায়, বিষ্ণু পার্বতী রূপে ভস্মাসুরকে সাথে সাথে নাচতে বলে, বিষ্ণুরূপী পার্বতী নাচতে নাচতে নিজের মাথায় হাত দেয়, ভস্মাসুরও নিজের মাথায় হাত দেওয়ার পরেই ভস্ম হয়ে যায়। ঐ শিব (তমোগুণের) সাধককে রাক্ষস বলা হয়। হিরণ্য কশিপু ভগবান ব্রহ্মার (রজোগুণের)-সাধক ছিল, তাকেও রাক্ষস বলা হয়।

(২) এক সময় আজ (২০০৬ সাল) থেকে কমপক্ষে ৩৩৫ বর্ষ পূর্ব হরিদ্বারে হরের সিড়ির উপর (শাস্ত্র বিধি রহিত সাধনা করা লোক) কুম্ভ মেলায় স্নানের সংযোগ হয়েছিল। ওখানে সর্ব (ত্রিগুণ উপাসক) মহাত্মা জন স্নান করতে পৌছিয়েছে। গিরি দল, পুরী দল, নাথ দল হল নাগা দল, আদি ভগবান শিব (তমোগুণি)-এর উপাসক ও বিষ্ণু ভগবান (সতোগুণী)র উপাসক। প্রথমে স্নান করার জন্য নাগা ও বৈষ্ণদলের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হয়ে। কমেপক্ষে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) ত্রিগুণ উপাসকের মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিল। যে ব্যক্তিরা সামান্য কথায় এত ভয়ঙ্কর নরসংহার (সামনা সামনি কাটাকাটি) করে দেয়, এরা তাহলে কি? সাধু না রাক্ষস? স্বয়ং বিচার করেন। এইজন্য পবিত্র গীতায় অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫তে বলেছে, যাদের এই ত্রিগুণ মায়া (রজগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব)-র পূজার দ্বারা জ্ঞান হরণ করে নেওয়া হয়েছে, সে কেবল মান বড়াই ক্ষিদে লাগা রাক্ষসের মত স্বভাব ধারন করে থাকে, মনুষ্যর মধ্যে যে নীচ সাধারণ ব্যক্তি থেকেও অধম স্বভাব বালা, দুষ্কর্ম করা ব্যক্তি মূর্খ আমার ভক্তিও করে না। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬থেকে ১৮ পর্যন্ত্য পবিত্র গীতা বলা ব্রহ্ম(কাল) প্রভু বলছে, যে আমার ভক্তি (ব্রহ্মসাধনা) চার ধরনের সাধক করে, এক যে অর্থার্থী (ধনলাভ চাওয়া ব্যক্তি) যে বেদ মন্ত্র থেকেই যন্ত্রমন্ত্র যজ্ঞাদি করে। দ্বিতীয় (সঙ্কট নিবারণ করার জন্য বেদের যন্ত্র-মন্ত্র ও যজ্ঞ করে) আর তৃতীয় বালা জিজ্ঞাসু যে পরমাত্মার জ্ঞানকে জানার ইচ্ছা রাখে কেবল জ্ঞান সংগ্রহ করে বক্তা হয়ে যায় তথা অন্য সবকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতার আধার পর, উত্তম সেজে জ্ঞানবান হয়ে, অভিশাপ বশ ভক্তিহীন হয়ে যায়। চতুর্থ জ্ঞানী, এ সাধক যে জেনে যায় যে মানব শরীর বার বার পাওয়া যায় না। এর ভিতরে যদি প্রভুর সাধনা করতে না পারি, তাহলে এই জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরে বেদ পড়েছে যাতে জ্ঞান হয়েছে যে কি (ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব) এই তিন গুণ ও ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ) এবং পর ব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) এসবের থেকে যে উপরে যে পূর্ণ ব্রহ্ম, তাকেই ভক্তি করতে হবে বা করা দরকার, অন্য দেবতাকে নয়। ওই জ্ঞানী উদার আত্মাদের আমি ভালবাসি অতএব তাদের আমার এইজন্য ভাল লাগে, যে কি তারা তিনগুণের। (রজগুণ- ব্রহ্মা, সতগুণ- বিষ্ণু ও তমোগুণ- শিব)-এর উপরে উঠে আমার ব্রহ্মসাধনা তো করে, যাহা অন্য দেবতা থেকেও ভাল কিন্তু বেদের মধ্যে ক্তঁ নাম কেবল ব্রহ্মরই সাধনা করার জন্য মন্ত্র, এই মন্ত্র সব বেদ পড়া বিদ্যান লোক নিজে নিজেই বিচার করে, সব বিদ্যান ভেবে নিয়েছে যে, এই পূর্ণ ব্রহ্মের (পরম পূর্ণ পরমাত্মা) মন্ত্র । তাই এই প্রাপ্তির মন্ত্রপরমাত্মাকে নেয়। ক্তঁ মন্ত্র সাধনায় অন্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মোক্ষ প্রাপ্তি এই ক্তঁ মন্ত্র সাধনায় হয় না।

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ তথা পবিত্র যজুর্বেদে অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০ তে বর্ণিত তত্বদর্শী সন্ত পায়নি, যে কিপূর্ণ ব্রহ্মর সাধনা তিন মন্ত্র দ্বারা বলবেন, এইজন্য জ্ঞানী ও ব্রহ্ম(কাল) এর সাধনা করে জন্ম মৃত্যুর চক্রতেই ঘুরতে থাকে।

এক জ্ঞানী উদারাত্মা মহর্ষি চুনক বেদকে পড়েছেন এবং এক পূর্ণ প্রভুর ভক্তির মন্ত্র ক্তঁ-কার কে ভেবে, এই নামের জপ বর্ষ পর্য্যন্ত সাধনা করেছেন। এক মানধাতা চক্রবর্তী রাজা ছিল (চক্রবর্তী রাজার পুরো পৃথিবীর উপর শাসন ছিল) সে অন্যান্য ছোট রাজাদের ঘোষণা করছে লড়াই করার জন্য এক ঘোড়ার গলায় চিঠি লিখে ছেড়ে দিয়েছে। শর্ত, যে রাজার গুলামী অস্বীকার করবে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। সে এই ঘোড়াকে বেঁধে জানাবে। ভয়েতে তো কেউ ঘোড়া বাধার সাহস

পায়নি। তখন মহর্ষি চুনক এই কথা জানতে পেরে ভাবলেন রাজার তো অনেক অভিমান হয়। তাই চুনক মহর্ষি বললেন, মানধাতা রাজার সাথে যুদ্ধ করতে আমি স্বীকার করলাম, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মানধাতা রাজার ৭২ কোটি সেনা ছিল। তাকে চার ভাগ করে এক এক ভাগে ১৮ কোটি সেনা দিয়ে মহর্ষি চুনকের উপর আক্রমণ করে দেয়। অন্য দিকে মহর্ষি চুনক সাধনার পূঁজি (কামাই) তে চার বোম্ পুতুল বানিয়ে চার ভাগ সেনার উপর চার পুতুল বোম্ ছেড়ে বিনাশ করে দেয়।

বিশেষ ঃ- ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, ব্রহ্ম কাল ও পরব্রহ্মর ভক্তি সাধনাতে পাপ পুনঃ দুটোই ভোগ করতে হয়। পূর্ণ্যে স্বর্গে, আর পাপ করলে নরকে চুরাশী লাখ প্রাণীর শরীরে জন্ম নিয়ে যাতনা ভোগ করতে হয়। যেমন জ্ঞানী আত্মা মহর্ষি চুনক ব্রহ্ম(কাল)-এর মন্ত্র ওঁ জপের সাধনা করে যে পুন্য কামাই করেছিল, তাতে কিছু সিদ্ধি শক্তি হয়েছিল (চারপুতুল বোম্ বানিয়ে) ৭২ কোটি মানুষ বধ করে সমাপ্ত করে দিয়েছিল একে মহর্ষি বলে। কিছু সাধনা সিদ্ধি লাভ করে ফল ভোগার জন্য মহাস্বর্গে যাবে কিছুদিন স্বর্গের আনন্দ ভোগার পুঁজি (সঞ্চয়) শেষ হলে আবার নরকে যেতে হবে। চুরাশী লক্ষ প্রাণীর শরীরে কষ্ট ভুগতে ভুগতে যদি কোনদিন কোন পুন্যির ফলে আবার মানব জনম হয় তা হলে আজ আমাদের মধ্যে, গীতা জ্ঞানে ব্রহ্ম (কাল) অর্জুনকে যে তত্বদর্শীর কথা বলেছিলেন, (সেই তত্বদর্শীকে পরমাত্মা আজ কলিযুগে এমন সময়ে আমাদের হয়তো কোন বিরাট পুর্ণ্যি ছিল তাই আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং নিজেকে বিরাট সৌভাগ্যবান মনে করছি)। এই রকম তত্বদর্শী মেলে তবেই জন্ম মরনের হাত থেকে মুক্তি হয়ে মোক্ষ প্রাপ্তি হতে পারবে নয়তো যুগে যুগে ঘুরে সেই সুযোগ হবে কিনা। একমাত্র পরমাত্মাই বলতে পারবেন। ওই চুনক ঋষি বেদ পড়ে সিদ্ধি ই প্রাপ্ত করেছে, ৭২ কোটির প্রাণীর (সৈনিক) র সংহার বচন দ্বারা করেছিল, তার ভোগও ভুগতে হবে। চাহে অস্ত্র দিয়ে হত্যা কর বা বচন রূপী তলবার দিয়ে হত্যা কর। দুজনেরই সমান দন্ড প্রভু দেবে। যখন ওই চুনক মহর্ষির জীব কুকুরের মধ্যে হবে আর তার মাথায় কেউ আঘাত করে সেই জায়গায় ক্ষত হয়ে পোকা হবে ঐ সৈনিকের জীব পোকা হয়ে খুড়ে খুড়ে ওই কুকুরের আত্মা হওয়া ঋষির প্রতিশোধ নেবে। কখনও পা কেউ ভেঙে দেবে কখনও পিছনের পা দিয়ে ঘেসে ঘেসে চলবে। কখনও গরম ও শীতে যন্ত্রণা ভোগ করবে এইভাবে কষ্ট পেতে হবে।

এই জন্য পবিত্র গীতা বলা ব্রহ্মকাল গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ১৮ তে স্বয়ং বলছে, এই সর্বজ্ঞানী আত্মারা তো উদার ও ভালো কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মার তিনমন্ত্রের বাস্তবিক সাধনা বলার তত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণ, এসব ভালো আত্মারা আমারই (অনুত্তমাম্) অতি নিকৃষ্ট বা অশ্রেষ্ঠ মুক্তি (গতি)-র আশাতেই আশ্রিত হয়ে আমার অশ্রেষ্ঠ সাধনা করে থাকে। এইজন্য পবিত্র গীতার অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলেছে, হে অর্জুন ! তুই সর্বভাব দিয়ে ওই পরমাত্মার শরণে যা, যার কৃপায় তুই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম (সতলোক/ঋতুধাম)-কে প্রাপ্ত হবি। পবিত্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবশ হয়ে ব্রহ্ম কাল বলেছিল, পরে কয়েক বর্ষ উপরান্ত পবিত্র গীতা ও চারি বেদকে, মহর্ষি বেদের শরীরে প্রেতবত প্রবেশ করে (স্বয়ং ব্রহ্ম (ক্ষরপুরুষ/কাল) দ্বারা লিপিবদ্ধ স্বয়ংই করেছে। এই সব গ্রন্থে , পরমাত্মা কেমন কেমন করে ভক্তি করতে হয় ? এই সব জ্ঞান তো পূর্ণ দিয়েছে বা বর্ণন করেছে। পরন্তু পূজা বিধি কেবল ব্রহ্ম (কাল) পর্যন্তই অর্থাৎ কাল জ্যোতিনিরঞ্জন পর্যন্ত্য সীমিত রেখেছে। তবে কিছু গুঢ়ত্তত্বর সংকেত দিয়েছে।

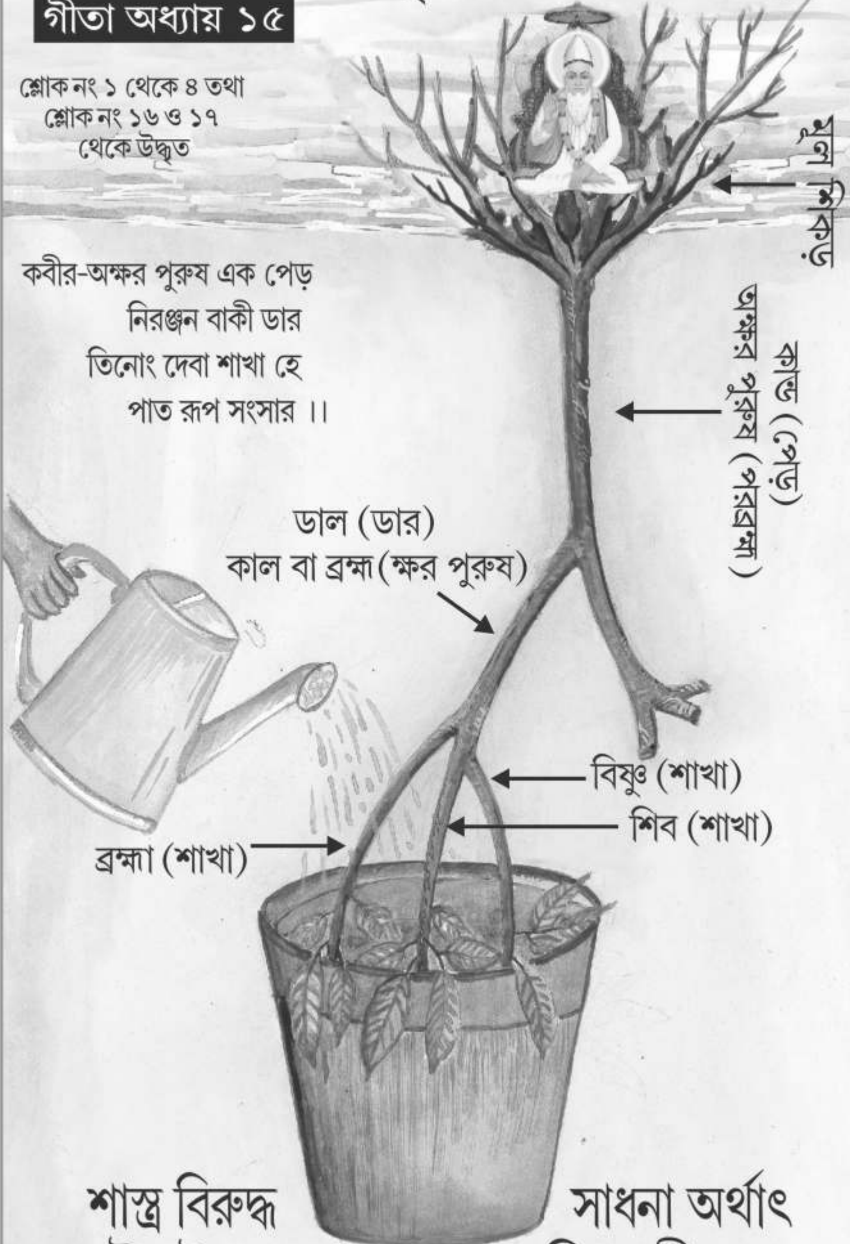
পূর্ণ ব্রহ্মার ভক্তির জন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ তে পবিত্র গীতা বলা প্রভু (ব্রহ্ম/কাল) স্বয়ংই বলছে, পূর্ণপরমাত্মার ভক্তি ও তাকে প্রাপ্তির জন্য, কোনো তত্বদর্শী সন্তকে খুঁজে পরে যেমন সে ওই বিধি বলবে ঠিক তেমন করবে। আরও বলেছেন, পূর্ণ জ্ঞান ও ভক্তি বিধি আমি জানি না। তবে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল/ ব্রহ্ম) নিজের সাধনার জন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ১৩ তে বলেছে আমার ভক্তিতো কেবল এক অক্ষর ওঁ আছে, যার উচ্চারণ অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত করলে আমার পরমগতি প্রাপ্ত হবে। আবার গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮-তে বলেছে, আর যারা পরমাত্মা প্রেমী আত্মা, যখন তারা তত্বদর্শী সন্তকে না পেয়ে থাকে যে সন্ত পরমাত্মার খবর জানে, তখন ওই উদারাত্মারা আমারই (অনুত্তমাম্) অতি অনুত্তম (খারাপ) বা অশ্রেষ্ঠ পরমগতিরই আশ্রিত হয়ে থাকে। (পবিত্রগীতা বলা প্রভু নিজেই বলছে, আমার সাধনা থেকে হওয়া গতিও অর্থাৎ মুক্তি অতি অশ্রেষ্ঠ হয়।

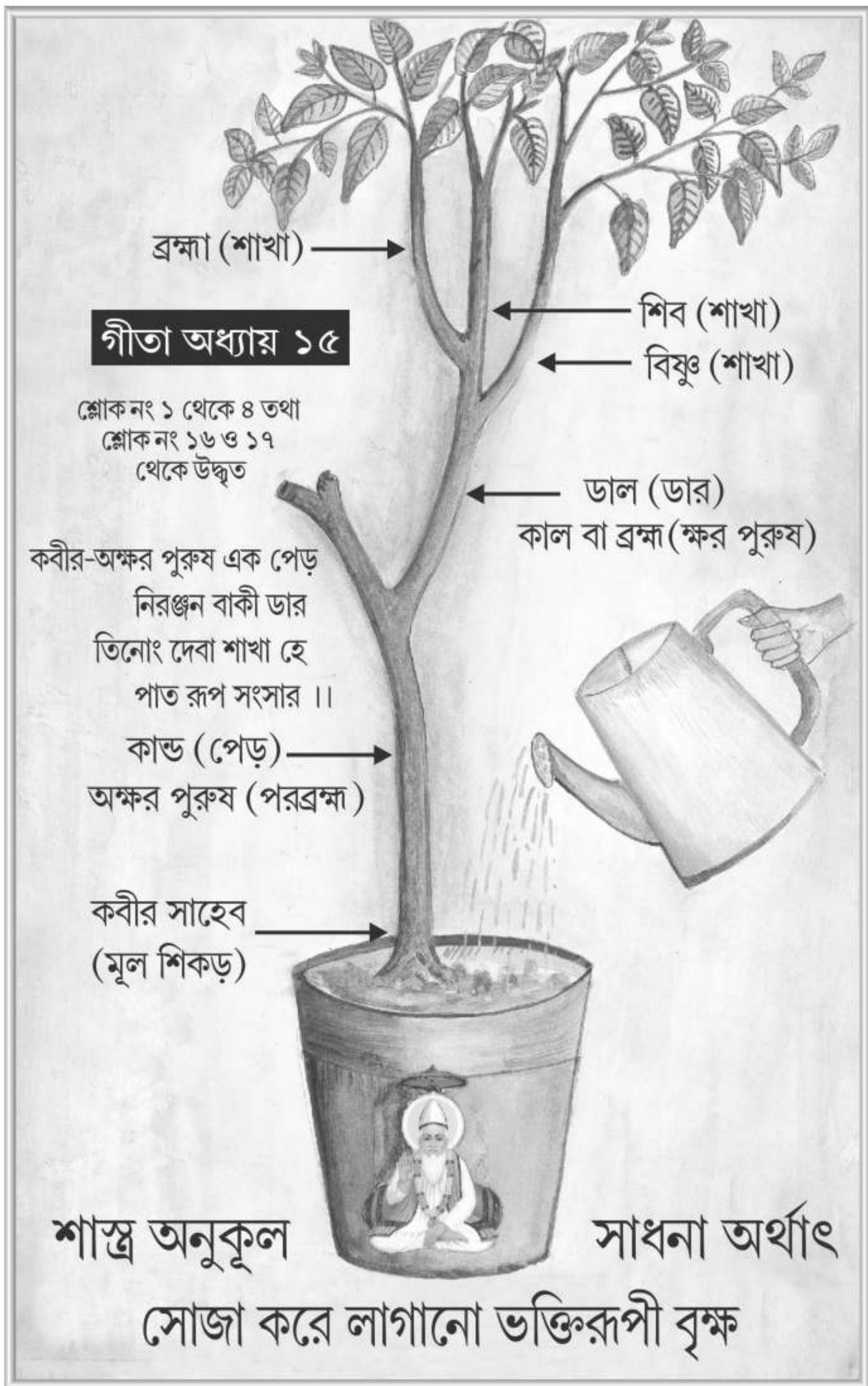
।। অন্য দেবতাদের (রজগুণ ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের) পূজা না জেনেই করে।।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২০ তে বলেছে যে, যার সম্বন্ধ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৫তে বার বার আছে ১৫ তে বলেছে যে ত্রিগুণ মায়া (যেকি রজগুণ ব্রহ্মা সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণী শিবের পূজা পর্যন্ত্যই সীমিত আছে, অতএব এদের থেকে প্রাপ্ত ফল ক্ষণিকের জন্য)-র দ্বারা যার জ্ঞান হরণ করা হয়েছে। এই প্রকারের অসুর স্বভাব ধারণ করা নীচ ব্যক্তি দুষ্কর্ম করা মূর্খ আমায় ভজে না। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২১ তে বলেছে যে, যে যে ভক্ত যেই যেই দেবতার সরূপকে শ্রদ্ধা দিয়ে পূজা করতে চায়, ওই ওই ভক্তের শ্রদ্ধাকে আমি ওই দেবতার মধ্যে স্থির করে দিই।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২২তে বলা হয়েছে, যে সাধক যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে দেবতার পূজা করে, ওই দেবতা থেকে আমার দ্বারাই বিধান করা কিছু ইচ্ছিত ভোগকে প্রাপ্ত করে। যেমন মুখ্যমন্ত্রী বলে নীচের অধিকারী আমারই নকর (চাকর)। আমি ওকে কিছু অধিকার দিয়ে রেখেছি, তার (অধিকারীর)র আশ্রিত যে ও লাভও আমার দ্বারাই দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ণ লাভ দেওয়া হয় না। গীতা অধ্যায় ৭-এর শ্লোক নং ২৩তে বর্ণন আছে যে ওই অল্প বুদ্ধিবালার ওই ফল নাশবান হয়ে থাকে। দেবতাদের পূজনে বালা দেবতাদের প্রাপ্ত হয়। (মতাবলম্বী) মদভক্ত যারা তারা বেদে বর্ণিত যে ভক্তি বিধি, সেই অনুসার ভক্তি করা ভক্তও আমাকেই প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তারা কাল জালের বাইরে যেতে পারে না।

বিশেষ ঃ- গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২০থেকে ২৩তে বলা হয়েছে, তারা যে কোনো পূজা (সাধনা) যেমন পিতর পূজা, ভূত পূজা, দেবদেবীর আদি পূজা স্বভাব বশত করে। আমি (ব্রহ্ম/কাল) -ই ওই অল্পবুদ্ধি লোক (ভক্ত) কে ওই দেবতার প্রতি আসক্ত করে থাকি। ওই নাদান (অবুঝ) সাধকরা দেবতাদের থেকে যে লাভ পায়। আমি (কাল/ব্রহ্ম)-ই দেবতাদের কিছু শক্তি দিয়ে রেখেছি) তার আধারে ওদের (দেবতাদের) পূজারী, দেবতাদেরকে প্রাপ্ত হয়ে যায়। পরন্ত ওই বুদ্ধিহীন সাধকের ওই পূজা চুরাশী লক্ষ যোনীতে তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়, তথা যে আমায় (কালকে) ভজনা করে, সে তপ্ত (গরম) শিলার উপর যন্ত্রনা ভুগে পরে আমার মহাস্বর্গে (ব্রহ্মলোকে) চলে যায়। আর পরে জন্ম মরণেরই চক্রতে ঘুরে বেড়ায়, মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।


পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব
গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ তথা
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
মূল শিকড়
কবীর-অক্ষর পুরুষ এক পেড়
নিরঞ্জন বাকী ডার
তিনোং দেবা শাখা হে
পাত রূপ সংসার ।।
কান্ড (পেড়)
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)
বিষ্ণু (শাখা)
শিব (শাখা)
ব্রহ্মা (শাখা)
শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা অর্থাৎ
উল্টো করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ


ব্রহ্মা (শাখা)
শিব (শাখা)
গীতা অধ্যায় ১৫
বিষ্ণু (শাখা)
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ তথা
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)
কবীর-অক্ষর পুরুষ এক পেড়
নিরঞ্জন বাকী ডার
তিনোং দেবা শাখা হে
পাত রূপ সংসার ।।
কান্ড (পেড়)
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)
কবীর সাহেব
(মূল শিকড়)
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা অর্থাৎ
সোজা করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

ভাবার্থঃ - যে দেবী দেবতারা ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আর মাতা থেকে ভগবান ব্রহ্মর সাধনায় বেশী লাভদায়ক। যদিও মহাস্বর্গতে যাওয়া সাধকের স্বর্গ সময় এক মহাকল্প পর্যন্ত্য ও হতে পারে। তবে মহাস্বর্গে শুভকর্মের সুখ ভোগ করে, আবার নরক বা অন্য প্রাণীর যোনিতেও কষ্ট থেকেই যাবে, পূর্ণ মোক্ষ কোনদিন পাবে না, ব্রহ্মের সাধনা বা দেব দেবীর সাধনা কর, সেই কালের জালেই বন্দি থাকতে হবে।

।। অন্য প্রমাণ।।

পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদেতে অন্য দেবতার পূজা তথা পিত্তর পূজা (শ্রাদ্ধ) করা এবং ভূত পূজা (অস্থি উঠানো কাঁধে করে হরিবোল বলা পিন্ড দেওয়া) ইত্যাদি পূজা করতে মানা আছে।

।। পবিত্র চার বেদ অনুসার সাধনার পরিণাম কেবল স্বর্গ-মহাস্বর্গ প্রাপ্তি মুক্তি হয় না।।

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক নং ২০-২১-তে বলা হয়েছে, যদি কেউ মনোকামনা সিদ্ধির জন্য আমার পূজা তিনবেদের বর্ণিত সাধনা শাস্ত্র অনুকুল করে থাকে, সে নিজের কর্মের আধার পর মহাস্বর্গতে আনন্দ মানিয়ে পরে আবার জন্ম মরনতে ফিরে আসতে হয়, অর্থাৎ যজ্ঞ যদি শাস্ত্রানুকুলও হয়, তার এক মাত্র লাভ সাংসারিক ভোগ, স্বর্গ মহাস্বর্গ পরে আবার চুরাশী লক্ষ যোনীতে ফিরে আসে, যতক্ষণ না তিন মন্ত্র **(ওঁ তথা তৎ ও সৎ সাংকেতিক)** পূর্ণ সন্ত থেকে প্রাপ্ত না হয়। গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক নং ২২ তে বলেছে, যে নিষ্কাম ভাব দিয়ে আমার শাস্ত্রানুকুল পূজা করে তার পূজার সাধনার রক্ষা আমি স্বয়ং করি, মুক্তি নয়।

।। শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধে সাধনা করা পতনের কারণ।।

পবিত্র গীতা অধ্যায় ৯-শ্লোক নং ২৩-২৪-তে বলেছে যে ব্যক্তি অন্য দেবতাদের পূজা করে, সেও আমার (কাল জালে থাকা) পূজাই করে থাকে। কিন্তু তার পূজা অবিধিপূর্বক জানবে (অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ভাবার্থ হল যে অন্য দেবতার পূজা করতে নেই। কেননা সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও স্বামী আমিই আছি। ওই ভক্ত আমায় ভালভাবে জানে না। সেইজন্য পতনই প্রাপ্ত হয়। নরক ও চুরাশী লক্ষ যোনীর কষ্ট, যেমন গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক নং ১৪-১৫-তে বলেছে যে, সর্ব যজ্ঞতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সন্মানিত যার যজ্ঞ সমর্পণ করা হয়, তিনিই হলেন পরমাত্মা (সর্বগতম্ব্রহ্ম) পূর্ণ ব্রহ্ম। তিনিই কর্মাধার হয়ে সব প্রাণীতে প্রদান করে, কিন্তু পূর্ণ সন্ত না মিলা পর্যন্ত্য সর্বযজ্ঞের ভোগ (আনন্দ) কাল (মন রূপে থাকে)-ই ভোগ করে, এই জন্য বলছে সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও স্বামী আছি।

।। শ্রাদ্ধ করা (পিতরপূজা) ব্যক্তি পিতরই হবে মুক্তি নয়।।

গীতা অধ্যায় ৯-শ্লোক নং ২৫-তে বলেছে যে, দেবতাদের পূজা করা ব্যক্তি দেবতাদের প্রাপ্ত হয়, পিতর পূজা ব্যক্তি পিতরদের পায়, ভূতদের পূজা (পিন্ডদান করা) ব্যক্তি ভূতদেরই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভূত হয়ে যায়, শাস্ত্রানুকুল (পবিত্র বেদ ও গীতা অনুসার)পূজা করনেবালা আমাকেই (কালকে) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কাল দ্বারা তৈরী করা স্বর্গ ও মহাস্বর্গ আদি কিছুদিন বেশী মৌজ মজা করতে পারে।

বিশেষ ঃ- যেমন যদি কেউ তহশীলদারের চাকরি (সেবা পূজা) করে তবে সে তহশীলদার কিন্তু হতে পারবে না, হাঁ তার দ্বারা রোজী রুটি (ইনকাম) করা চলবে, অর্থাৎ তার অধীন হয়ে থাকতে হবে। ঠিক এই প্রকার, যে যেই দেবতার পূজা (ব্রহ্মাদেব, বিষ্ণুদেব, অর্থাৎ ত্রিদেব)-এর পূজা (চাকরী) করবে, তার দ্বারাই তার কিছুক্ষণের লাভ হবে। ত্রিগুণময়ী মায়া অর্থাৎ তিন গুণ (রজোগুণী ব্রহ্মা সতগুণী বিষ্ণু তমোগুণী শিব)-এর পূজা পবিত্র গীতায় নিষেধ, গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২থেকে ১৫ এবং ২০ থেকে ২৩ পর্যন্ত্য আছে। এই প্রকার কোন ব্যক্তি পিতরের পূজা (চাকরী সেবা) করে, তাহলে পিতরের কাছে ছোট পিতর হয়ে, তার কাছে কষ্ট উঠাতে হবে। এই প্রকার কেউ যদি ভূতদের (প্রেতদের)পূজা (সেবা) করে তবে সে ভূতই হবে, কেননা সারা জীবন যার ভিতর অসক্তৃতা হয়েছিল পরে তার মধ্যে মন ফেঁসে থাকে। তার কারণ তার কাছে চলে যায়। কিছু লোক বলে যে , পিতর ভূত দেব পূজাও করতে থাকবে আর আপনার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে সাধনাও করতে থাকব। কিন্তু এই রকম চলতে পারে না। কেন কি, যে পূজা পবিত্র গীতা ও চার বেদে মানা করা আছে। সেটা করা শাস্ত্র বিরুদ্ধে যা কিনা পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩-২৪-তে মানা করা আছে, যে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামত আচরণ (পূজা) করে, সে না তো সুখকে প্রাপ্তি করে, না তো পরমগতি তথা না তো কোনো কার্য সিদ্ধ করা সিদ্ধি কে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজের জীবনই ব্যর্থ হয়। এই জন্য অর্জুন তোর জন্য কর্ত্তব্য (যে সাধনার কর্ম করার মত যোগ্য) তথা অকর্ত্তব্য (যে সাধনা করার মত যোগ্য নয়)-র ব্যবস্থা (নিয়মে) শাস্ত্রই প্রমাণ। অন্য সাধনা বর্জিত (নিষেধ) আছে।

এরই প্রমাণ মার্কণ্ডে পুরাণে (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠ ২৩৭-তে যাতে মার্কণ্ডে পুরান এবং ব্রহ্মপুরানংক একসঙ্গে বাঁধানো করা আছে) তাতেই আছে যেকি, এক সাধক ব্রহ্মচারী নাম তার রুচী, সে বেদের অনুসার সাধনা করত, যখন তার বয়স ৪০ বৎসর হয়েছে, তখন তার চার বংশের পূর্বজ (বাবা, বাবার বাবা, তার বাবা, এবং তারও বাবা) এই রকম তারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে পিতর হয়ে (ভূত প্রেত হয়ে) গিয়েছেন, এবং কষ্টও পাচ্ছেন। এসব দেখা দিয়েছে। পূর্ব পুরুষরা বলছেন পুত্র রুচী তুই বিয়ে কর, আর আমাদের শ্রাদ্ধ কর। আমরা তো খুব দুখী আছি এবং কষ্ট পাচ্ছি। রুচী ঋষি বলছেন পিত্রমহ বেদে কর্মকান্ড মার্গ (শ্রাদ্ধ করা, পিন্ড দান আদি মানা আছে) এ সব মূর্খ ব্যক্তির সাধনা বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি কেন ওই ভুল (শাস্ত্র বিধি ছাড়া) সাধনা করতে বলছেন? পিতর বললেন পুত্র, একথা তো তোর সত্য যে কি বেদে পিতর পূজা ভূত পূজা, দেবী দেবতার পূজা (কর্মকান্ড)কে অবিদ্যাই বলেছে, একথা মিথ্যা নয়। এই উপরোক্ত মার্কণ্ডে পুরানে এই লেখার মধ্যে বলা হয়েছে পিতররা বলছেন তবুও তো কিছু তো লাভ হবে।

বিশেষ ঃ- এখানে এই পিতৃপুরুষরাই সর্বনাশ (ঝামেলা) পাকিয়েছেন, সেসব আমাদের পালন করতে হবে না, কেননা পুরানে ঐ আদেশ কোনো এক ঋষির যে কিনা পিতর পূজা (পূর্ব পুরুষগণ) ভূত পূজা বা অন্য দেবতাদের পূজা করতে বলেছেন। কারণ বেদে প্রমাণ না হওয়ার কারণ প্রভুর আদেশ নেই। এইজন্য কোন ঋষি ও সন্তের আজ্ঞায় শুনা কথা, প্রভুর আজ্ঞাকে উলঙ্ঘণ করার শাস্তি ভুগতে হবে।

এক সময় এক ব্যক্তির বন্ধুত্ব কোন এক দারোগা থানায়ালার সাথে হয়েছে। ঐ ব্যক্তি তার বন্ধু দারোগাকে বলছে আমার প্রতিবেশী আমাকে খুব জ্বালাতন করছে। দারোগা (S.H.O) ওকে লাঠি দিয়ে খুব মারতে বলেছে আমি তোমার সাথে আছি। দারোগা বন্ধুর আজ্ঞা পেয়ে ঐ ব্যক্তি প্রতিবেশীকে লাঠি দিয়ে মারার পর, মাথায় আঘাৎ হঠাৎ লেগে প্রতিবেশীর মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। ওই এলাকার অধিকারী হওয়ার কারণে ওই থানার দারোগা নিজের বন্ধুকে ধরে নিয়ে আসে এবং জেলে ঢুকিয়েছে এবং ঐ ব্যক্তির বিচারে মৃত্যু দন্ডই হয়ে যায়। তার বন্ধু দারোগা কিছু করতে পারেনি। কেননা রাজার সংবিধান আছে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে তারও মৃত্যু দন্ডই প্রাপ্ত হয়। ওই অবুঝ ব্যক্তি দারোগা বন্ধুর কথা শুনে রাজার সংবিধান ভঙ্গ করে দেয়। যার কারণ তার জীবন দিতে হয়েছে। ঠিক এই প্রকার পবিত্র গীতায় ও পবিত্র বেদে প্রভুরই সংবিধান রয়েছে যাতে এক পূর্ণ পরমাত্মারই পূজার বিধান আছে অন্য দেবতার, পিতরের, ভূতের পূজা করা নিষেধ। পুরানে ঋষিদের (দারোগার) আদেশ আছে। যার আজ্ঞা পালন করলে, প্রভুর সংবিধান ভঙ্গ হয়, তাতে শুধু কষ্টের পরও কষ্ট ভুগতে হয়। এইজন্য পরমাত্মা ছাড়া মোক্ষ লাভ পাওয়া যায় না।

।। সত্য কথা ।।

আমার পূজ্য গুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দজী কমপক্ষে ষোল বর্ষ আয়ুতে পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রোজদিন পরার যে কাপড় সে কাপড় নিজেদের জমির পাশে জঙ্গলে এক পশুর মৃত শরীরের উপর ফেলে দিয়েছিলেন রাত্রে ঘরে না ফেরার কারণে জঙ্গলে তলাশ (খোঁজ) করেছে, রাত্রির সময় ছিল, নিজের সন্তানের কাপড় ও পশুর হাড়কে নিজের সন্তানের হাড় ভেবে, দুখী মনে সেই অস্থি কাপড় ফিরিয়ে ঘরে এনেছিল, ভেবে নিয়েছে রাত্রে হয়তো জঙ্গলে গিয়েছিল, তাই হিংস্র জন্তু খেয়েছে। অন্তিম সংস্কার করেও দিয়েছে। শ্রাদ্ধও হয়েছে এক বৎসর পরে বাৎসরিকও করেছে এই করতে করতে সেই গুরুদেব রামদেবানন্দ মহারাজের বয়স যখন ১০৪ বৎসর পরে হঠাৎ নিজের গ্রাম পৈতা বাস জেলা ভিমানী, তহশীল চরখী দাদরী হরিয়াতে পৌঁছে যান। আমার গুরুদেবের ছোটবেলায় নাম শ্রী হরিদ্বারী ছিল পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ছিল। আমি (এই দাসকে) খবর হল তো আমিও দর্শন করতে পৌছিয়ে গিয়েছিলাম। স্বামীজির বৌদির বয়স ৯২ বৎসর ছিল। আমি ওই বৃদ্ধার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার গুরুদেব ঘর ত্যাগ করার পরে আপনার কেমন অনুভব হচ্ছিল ? ওই বৃদ্ধা বললেন, যখন এই ঘরে বিয়ে হয়েছে, তখন আমাকে বলেছিল, তার এক ভাই হরিদ্বারীও ছিল, কোন হিংসক জন্তু তাকে খেয়ে নিয়েছে, তার শ্রাদ্ধই হচ্ছে। আমাকেও তার শ্রাদ্ধ করতে বললেন বৃদ্ধা বললেন ৭০ বার শ্রাদ্ধতো আমি আমার এই হাতেই করা হয়ে গিয়েছে। যখন কোনো বার ফসল ভাল না হত, বা ঘরের কেউ অসুখে পড়ত তখন গুরু পুরোহিতের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন হরদ্বারী পিতর (প্রেত) হয়ে গিয়েছে, তাই তোমাদের দুঃখী করাচ্ছে।

শ্রাদ্ধ করাতে কোনো অশুদ্ধি থেকে গিয়েছে হয়তো, এবার সর্ব ক্রিয়া আমি স্বয়ং নিজের হাতেই করব। আগে আমার সময় হত না বা সময় পেতাম না, কেননা একই দিনে অনেক জায়গায় শ্রাদ্ধ করতে যেতে হতো। এই জন্য ছেলেকে পাঠাতাম। ততক্ষণ কিছু দান দাও যাতে তাকে শান্ত

করতে পারি। তারপর ২১ বা ৫১টাকা যা বলা হত ভয়েতে দিতাম। কিন্তু পুরোহিত নিজে শ্রাদ্ধ করতেন। তখন আমি ওই বৃদ্ধাকে বললাম মাতা এখন তো ঐ শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা তো ছেড়ে দেন। নয়তো আপনিও প্রেত হয়ে যাবেন। গীতা অধ্যায় ৯-শ্লোক নং ২৫-তে শুনিয়েছে। তখন ওই বৃদ্ধা বললেন গীতা আমিও পড়ি। তখন (এই দাস) বললাম আপনি পড়েছেন ঠিকই কিন্তু বোঝেননি, এখন থেকে তো বন্ধ করেন এই নাদান (অবুঝ) সাধনাকে। বৃদ্ধা উত্তর দিলেন না ভাই কি করে ছাড়ব এই শ্রাদ্ধ এটাতো পুরানো যুগ ধরে করে আসছে এতো পরম্পরা। এই দোষ ভোলা সরল আত্মার নয় এ দোষ মূর্খ গুরু পুরোহিতদের। যারা আমাদের পবিত্র শাস্ত্রকে না বুঝে নিজের মনগড়িয়ে আচরণ (পূজার মার্গ) করতে বলে গিয়েছেন। তার জন কোনো কার্য্য সিদ্ধ হয় না। না পরমগতি না সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬-শ্লোক নং ২৩-২৪-তে।।

এখন এই দাসের প্রার্থনা যে কি, শিক্ষিত বর্গের মানুষ অবশ্য ধ্যান দেবেন, এবং শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা করে পূর্ণ পরমাত্মার সনাতন পরমধাম (শাশ্বতম্ স্থানম্) অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত করেন, যাহাতে পূর্ণ মোক্ষ ও পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। (গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২) তে এর জন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের তালাশ (খোঁজ) করো। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪তে দেখুন।

এক শ্রদ্ধালু বললেন যে, আপনার কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে সাধনাও করব, এবং শ্রাদ্ধ শান্তিও করব এবং ঘরে যত দেব-দেবীর মূর্তি তাদেরও মনে মনে স্মরণ করে পূজা করব। এতে কি দোষ হবে?

এই দাসের প্রার্থনা ঃ- সংবিধানের কোনো ধারা উলঙ্ঘণ করলে তার সাজাও অবশ্য পাবে। এই জন্য পবিত্র গীতা ও পবিত্র চারি বেদে বর্ণিত ও বর্জিত বিধি (নিষেধ বিধি) -র বিপরীত সাধনা করা ব্যর্থ (প্রমান পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩-২৪-তে)। পবিত্র গীতা ও চারিবেদ এই মানব আত্মকল্যাণের গাড়ি, এই গাড়ীর চাকা যদি কেউ পৈঞ্চর করে, তাহলে এই রাম নামের গাড়ি কি করে চলবে? তাই এই রাম নামের গাড়ি পৈঞ্চর করা মানা, ঠিক এই প্রকার শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা হানিকারক।

এক শ্রদ্ধালু বলছেন, আমি কোন দূর্নিতী কাজ (বিকার) (মদ-মাংস, আদি) করি না। কেবল তামাকের মধ্যে বীড়ি, সিগরেট হুকা সেবন করি। আপনার দ্বারা বলা জ্ঞান অতি উত্তম, আমি গুরুও বানিয়েছি, কিন্তু এই জ্ঞান আজ পর্যন্ত্য কোন গুরুর কাছে শুনতে পাতিনি, বা কারর কাছে নেই, অমি ২৫ বৎসর ধরে ঘুরছি, তিন গুরু বদলিয়েছি, কৃপা, আমায় তামাক সেবন করার অনুমতি দেন। তামাকে ভক্তিতে কি বাধা হতে পারে?

এই দাসের প্রার্থনা ঃ- এই মানব দেহে অক্সিজেনের আবশ্যকতা আছে। তামাকের ধূয়ার কার্বন-ডাই-অক্সাইড যাহা ফুসফুসকে দূর্বল করে, রক্ত দূষিত করে দেয়।

এই মানব ধারণ করা মানে হল এই সুযোগে প্রভু প্রাপ্তি করার জন্য নিজের আত্মকল্যাণের চেষ্টা করা, পরমাত্মাকে পাওয়ার রাস্তা সুষ্মনা নাড়ী থেকে প্রারম্ভ হয়। যে কিনা নাকের দুটো ছিদ্র, ডানধারের ছিদ্রকে ইরা বলে বাঁয়ের ছিদ্রকে পিঙ্গলা বলে। এই দুই ছিদ্রের মধ্যতে সুষ্মনা নাড়ী আছে, যাকিনা একটা ছোট সুঁই (সুঁচের ছিদ্রের মত) একটা দুয়ার (দ্বার) আছে। তামাক বিড়ির

ধূয়োতে ঐ ছিদ্র (রাস্তা) বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের জীবন বৃথা। যার জন্য প্রভু ভক্তির মার্গে অবরোধ হয়ে থাকে। ওইটাই প্রভু প্রাপ্তির মার্গ (রাস্তা)। এই জন্য প্রভু ভক্তি করা সাধককে প্রত্যেক নশিলা (নেশা জাতীয় পদার্থ) সর্বদা নিষেধ।

অন্য এক শ্রদ্ধালু বলছেন, আমি তামাক, বিড়ি খাই না। মাংস ও মদ কিন্তু খাই, এতে ভক্তিতে কিসের বাধা ? এসব তো খাওয়ার জন্যই বানানো হয়েছে, এবং গাছপালাও তো জীব ওটা খেলেও তো মাংস ভক্ষণ তুল্যই হয়।

এই দাসের প্রার্থনা ঃ- যদি কেউ আমার মাতা পিতা, ভাই বোন ও বাচ্চাদের মেরে কেটে খায় তো কেমন লাগবে ? অতএব যেমন ব্যথা নিজের হয় অন্য প্রাণীরও ওই ব্যথা হয়ে থাকে। কবীর বলেন, কহে কবীর বে যায় নরক মে, জো কাটে শিশা খুরানে" যে ব্যক্তি পশুদের মারার সময় খুরো তথা মাতা বেরহমী ভাবে কেটে মাংস খায়, সে নরকের ভাগী হবে। যেমন দুঃখ আমাদের সম্বন্ধী ও বাচ্চাদের হত্যা করলে হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই অন্যজীবকে ভাবা উচিৎ। এবার গাছপাতা খাওয়ার কথা এ সব খাওয়ার প্রভুর আদেশ আছে, এবং এসব জড় যোনীতে আছে। অন্য চেতন প্রাণীদের বধ প্রভুর আদেশ বিরুদ্ধে, এই জন্য অপরাধ ও পাপ আছে। মদ খাওয়াও প্রভুর আদেশ নেই, তবে স্পষ্ট মানাও আছে, এবং মানব জীবনকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। মদ খাওয়া মানুষ যে কোনো ভুল করতে পারে। মদ খাওয়া ধন শরীর (তন) ও পারিবারিক শান্তি এবং সমাজ সভ্যতার মহাশত্রু আছে। ছোট ছোট ফুট ফুটে ফুলের মত বাচ্চার ভাবি চরিত্র পর কুপ্রভাব পড়ে। মদ খাওয়া লোক যতই না ভাল হোক, ওর না ইজ্জৎ থাকে না তার বিশ্বাস।

এক সময় এই দাস এক গ্রামে সৎ সঙ্গ করতে গিয়েছিল। ওই দিন নেশা নিষেধ নিয়ে তারই সৎসঙ্গ করেছি। সৎসঙ্গের পরে এক এগারো বর্ষীয় কন্যা ফুট ফুট করে কান্না করছিল, তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েটা বলল, গুরুজি মহারাজ আমার পিতা পালম এয়ার পোর্টে ভালই চাকরি করেন, কিন্তু সব পয়সা কড়ির মদই খাওয়া হয়ে যায়। আমার মা মানা করলে খুব পিটাতেন শরীরে কালো কালো দাগ হয়ে যেত। একদিন আমার পিতা মাকে মারছিল, আমি মাকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও মার খেয়েছি, আমার ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল। দশ বারোদিন পরে ঠিক হয়। আমার মা আমাকে ছেড়ে মামার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, পরে আমার ঠাকুরমার কাছেই থাকতাম। পিতা ঔষধও এনে দেয় নাই, সকালে উঠে চাকরিতে চলে গেলেন। বিকালে আবার মদ খেয়ে আসতেন, আমরা তিন বোন দুই বোন আমার ছোট। আর যখন আমার পিতা সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরতেন আমরা তিন বোন, খাটের তলায় লুকিয়ে পড়তাম। বিচার করুন পুন্যাত্মারা, যে বাচ্চাদের তার পিতা বুকে জড়িয়ে রাখে, বা রাখা উচিৎ কিংবা বাচ্চারা তার পিতা ঘরে আসার প্রতীক্ষা করে যে, কখন পিতা ঘরে আসবেন ? ফলফলাদি নিয়ে আসবেন এসব ভাবে। আজ এই মানব সমাজের শত্রু এই সুন্দর মানব সমাজকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে? মদ খাওয়া ব্যক্তির নিজের তো ক্ষতি হয়, সাথে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আত্মাকে কষ্ট দিয়ে পাপ, নিজের মাথায় নেয়। যেমন পত্নীর দুঃখে তার মাতা পিতা ভাই বোন, দাদা, ঠাকুরমা আদি সবাই দুঃখী হয়ে থাকে। শুধু একটা মাত্র মদ খাওয়া ব্যক্তির কারনে, আসে পাশে ভদ্র সমাজের অশান্তির কারণ হয়ে থাকে। কেননা তার ঘরে ঝগড়া সর্বক্ষণ লেগেই থাকে, পত্নী ও বাচ্চাদের কান্নায় আশে পাশের ব্যক্তি ঠেকাতে

গিয়েও গালাগালি অনেক সময় তারাও মার খেয়ে থাকেন। যারা ভাল আত্মা তারা অশান্তি চায় না। এই দাস থেকে নাম (উপদেশ) নেওয়ার পরে অনেক ব্যক্তিরা কমপক্ষে এক দেড় লাখ মদ খাওয়া ব্যক্তি এবং মাংস ভক্ষণ করা ব্যক্তি পূর্ণ রূপে ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব যে সন্ধ্যার বেলার সময় মদ খেয়ে ভূতের নৃত্য করত, আজ সেই সময় পুন্যআত্মারা নিজের বাচ্চাদের নিয়ে বসে সন্ধ্যা আরতী করেন। হরিয়ানা প্রদেশ ও নিকটবর্তী প্রান্ততে কমপক্ষে, দশ হাজার ব্যক্তি সববিকার ত্যাগ করে সুখী জীবনযাপন করছেন।

কোনো কোনো ব্যক্তি বলেন আমি আগের মত বেশী খায় না, ব্যস্ কখনও কখনও খেয়ে থাকি তবে বিষ তো এক ফোঁটাও হানিকারক, যাহা খেলে ভক্তি ও মুক্তিতে বাধা উৎপন্ন করে।

ধরে নেন দুই কিলোগ্রাম ঘিয়ের হালুয়া বানানো হয়েছে কিংবা খীর (সতভক্তির) বানানো হয়েছে, পরে তার মধ্যে ২৫০ গ্রাম বালি (মদ্-মাংস, তামাক পদার্থ) আন উপাসনা (দেবদেবীর পূজা) ঢেলে দাও, তাহলে বানানো (তৈরী) করা সেই খীর বা হালুয়া ব্যর্থই হয়ে যাবে কারণ তাহা খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না, ঠিক পরমাত্মা পেতে হলে সেই ভাবে সত ভক্তি করতে হবে। এইজন্য পূর্ণ পরমাত্মা (পরমঅক্ষর ব্রহ্ম)র পূজা করতে হলে, পূর্ণ সন্তের কাছ থেকে নাম উপদেশ প্রাপ্ত করে আজীবন মর্যাদার মধ্যে থেকেই তবে পূর্ণ মোক্ষ সম্ভব।

।। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির পশ্চাৎই ভক্তি প্রারম্ভ হয়ে থাকে।।

গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক নং ২৬-২৭-২৮-তে ভাব আছে যে, যদি কেউ আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক কাজ করে আমার মতানুসার বেদে বর্ণিত পূজা বিধি অনুসারই কর্ম করে ওই উপাসক আমারই (কাল) দ্বারাই লাভন্বিত হয়। এর বর্ণন এই গীতা অধ্যায় শ্লোক নং ২০-২১ করেছে। গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক নং ২৯-ভগবান বলছেন, আমার কাহারও প্রতি দ্বেষ বা ভালবাসা নেই। কিন্তু আবার তখনই বলছেন যে আমাকে ভক্তি করে বা ভালবাসে সে আমার প্রিয় এবং আমি তার প্রিয়। অর্থাৎ আমি তারমধ্যে এবং সে আমার মধ্যে। রাগ ও দ্বেষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যেমন - প্রহলাদ বিষ্ণু ভগবানের আশ্রিত ছিল, আর হিরণ্যকশিপু দ্বেষ করত। তখন নরসিংহ রূপ ধারণ করে ভগবান বিষ্ণু নিজের প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করেন আর রাক্ষস হিরণ্যকশিপুরকে পেট চিরে সমাপ্ত করেন। এতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রহলাদ কে প্রেম ও হিরণ্যকশিপুর থেকে দ্বেষ সিদ্ধ হয়েছে। এইজন্য পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ৫৩তে বলেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর নানা প্রকারের ভ্রমিত হওয়া বচন থেকে, বিচলিত হওয়া তোর বুদ্ধি এক পূর্ণ পরমাত্মাতে দৃঢ়তাতে স্থির হয়ে যাবে। তখন তুই যোগী হতে পারবি। অর্থাৎ তখন তোর অনন্য মন থেকে নিঃশংস্য হয়ে, এক পূর্ণ প্রভুর ভক্তি প্রারম্ভ হবে।

পবিত্র গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ৪৬-তে বলেছে যে, যেমন অনেক বড় জলাশয় (যে স্থানের জল দশ বৎসর বৃষ্টি না হলেও শুকায় না বা সমাপ্ত হয় না)-কে প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও ছোট জলাশয়ের যত (যার জল এক বৎসর না হলে সমাপ্ত হয়ে যায়)-টুকু প্রয়োজন রয়ে যায়। এই প্রকার পূর্ণ পরমাত্মা (পরম অক্ষর পুরুষ)-র গুণের জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয়ে যাওয়ার পরও আপনার আস্থা অন্য জ্ঞানে তথা অন্য ভগবানে (অন্য দেবতাদের যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ক্ষর

পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মতে তথা অক্ষর পুরুষ বা পরব্রহ্ম)-তে ততটাই থেকে যায়। যেমন ছোট জলাশয়ও খারাপ লাগে না পরন্তু তার ক্ষমতার আভাস বোঝা এই সব কাজ যায় যেকি এই সব কাজ চালানোর জন্য সাহারা আছে তবে এ সব জীবনের জন্য যথেষ্ট নয়, যদি অকাল পড়ে বা খরা হয় এক বৎসরে যদি ওই ছোট জলাশয় শুকিয়ে যায়, তাহলে আমরা কেন ওই ছোট জলাশয়েয় মায়া করব? আমরা তো ওই বড় জলাশয়েই তো স্নানআদি করতে পারব, এই জন্য বড় জলাশয় পেলে ছোট জলাশয়ের পরে দরকার হয় না। এই প্রকার তত্ত্বদর্শী সন্ত থেকে পূর্ণ পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মের মহিমার পরিচিত হয়ে যাওয়ার পরে সাধক পূর্ণ রূপ থেকে (অনন্য মন থেকে) ওই পূর্ণ পরমাত্মা (পরমেশ্বর)-র উপর সর্ব ভাব থেকে আশ্রিত হয়ে যায়।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-তে বলা হয়েছে, হে অর্জুন তুই সর্ব ভাব থেকে ওই পরমেশ্বরের শরণে যা, ওই পরমেশ্বর (পরমাত্মা)-র কৃপাতেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হবে আর শাশ্বত্ স্থান অর্থাৎ সনাতন পরমধাম্ অতএব যাহা কোনদিন নষ্ট হয় না সেই সতলোক স্থান প্রাপ্ত হবে।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬৩-তে বলেছে, আমি এই রহস্যময় অতি গোপনীয় (গীতার) জ্ঞান তোকে বলে দিয়েছি, এখন যেমন তোর ইচ্ছা তেমন তুই কর। (কেননা এই কথা গীতার অন্তিম অধ্যায় আঠারোর অন্তিম শ্লোক চলছিল, এই জন্যই বলেছিল।

।। গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্মের (কালের) ইষ্ট (পূজ্য) দেব পূর্ণ ব্রহ্ম ।।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬৪-তে বলেছে, এক সব থেকে গুপ্ত থেকেও গুপ্ত জ্ঞান এক বার আরও শোন, ওই পূর্ণ পরমাত্মা (যার বিষয়ে অধ্যায় আঠারো শ্লোক ৬২-তে বলা হয়েছে আমার পাকা পূজ্য দেব আছেন অর্থ্যাৎ আমি (ক্ষর পুরুষ/ ব্রহ্ম/কাল) ও তারই পূজা করে থাকি। আমি তোর ভালোর জন্য বলছি। (কেন কি এই সংবাদ গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু নিজে, গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ তে দিয়েছে যেখানে। যাতে বলা হয়েছে যে ওই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আমিও আছি। এইজন্য বলেছে এখানে যেকি, এই জ্ঞানই গুপ্ত থেকে অতি গুপ্ত জ্ঞান আবার শোন।

বিশেষ ঃ- অন্য গীতার অনুবাদ কর্তারা ভুল অনুবাদ করেছেন। ইষ্টঃ অসি তে দৃঢ়ম্ ইতি'র অর্থ করে দিয়েছে, তুই আমার প্রিয়। যার অর্থ এই যে

।। গীতা অধ্যায় ১৮-এর শ্লোক নং ৬৪-তে।।

সর্ব গুহ্য তমম্, ভূযঃ, শৃনু মে পরমম্, বচঃ ইষ্টঃ
অসি, মে, দৃঢ়ম্, ইতি, ততঃ বক্ষামি; তে, হিতম্।। ৬৪ ।।

অনুবাদ ঃ- (সর্বগুহ্যতমম্) সম্পূর্ণ গোপনীয় থেকেও অতি গোপনীয় (মে) আমার (পরমম্) পরমরহস্য যুক্ত (হিতম্) হিতকারক (বচঃ) বচন (তে) তোকে (ভূয়ঃ) আবার (বক্ষামি) বলব (ততঃ) ইহা (শ্রনু) শোন (ইতি) এই পূর্ণব্রহ্ম (মে) আমার (দৃঢ়ম) পাকাপাকি (নিশ্চি ত) (ইষ্ট) পূজ্য দেব (অসি) আছেন।। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৫-তে গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু (কাল ভগবান ক্ষর পুরুষ)বলছে যে কি, যদি আমার শরণে থাকতে ইচ্ছা হয়, তাহলে আমার পূজা অনন্য মন দিয়ে কর, অন্যান্য দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) এবং পিতরদের (পূর্বপুরুষদের) ভূতদের পূজা করা ত্যাগ কর, তাহলে আমাকেই প্রাপ্তি হবি অর্থাৎ ব্রহ্ম লোক মহাস্বর্গ তে চলে যাবি। আমি

তোকে সত প্রতিজ্ঞা করছি, তুই আমার প্রিয়।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬৬-তে বলেছে যে, যদি (একম্) ওই অদ্বিতীয় অর্থাৎ যার তুলনা কাহার সাথে হয় না, ওই এক সর্ব শক্তিমান, সমস্ত ব্রহ্মান্ডের রচনহার (রচনার কর্ত্তা) সর্বকে ধারণ পোষণ করে থাকা, ওই পরমেশ্বরের শরণে যেতে হলে, আমার স্তরের সাধনা যে ক্তঁ আছে, এই নামের জপের কামাই, তথা অন্য ধার্মিক শাস্ত্র অনুকুল যজ্ঞ অদ্বিতীয় অর্থাৎ যার উপরে কোন সেয়ানা (উপরে আর কেউ) নেই, তার শরনে (ব্রজ) জা। আমি তোকে সর্ব পাপ (কালের ঋণ) থেকে মুক্ত করে দেব, তুই চিন্তা করিস না।

বিশেষ ঃ- গীতার অন্য অনুবাদ কর্ত্তারা শ্লোক নং ৬৬-র অনুবাদ ভুল করে দিয়েছে। ব্রজের অর্থ আসার করে দিয়েছে। যে কিনা ব্রজর অর্থ হল যাওয়া হয়ে থাকে। কৃপা করে বাস্তবিক নীম্নে পড়ুন —

।। গীতা অধ্যায় ১৮শ্লোক নং ৬৬ তে।।

সর্বধর্মান্, পরিত্যজ্য, মাম্, একম্, শরনম্, ব্রজ,
অহম্, ত্বা, সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়ি ষ্যামি, মা, শুচঃ।। ৬৬।।

অনুবাদ ঃ- (মাম্) আমার (সর্বধর্মান্) সম্পূর্ণ পূজা (পরিত্যাজ্য) ত্যাগ করে তুই কেবল (একম্) এক ঐ পূর্ণ পরমাত্মার (শরনম্) শরণে (ব্রজ) যা। (অহম্) আমি (ত্বা) তোকে (সর্বপাপেভ্যঃ) সম্পূর্ণ পাপ থেকে (মোক্ষায়িষ্যামি) ছাড়িয়ে দেব তুই (মা, শুচঃ) শোক (দুঃখ) করিস না।

।। ব্রহ্মের সাধক ব্রহ্মকে এবং পূর্ণ ব্রহ্মের সাধক পূর্ণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৫ থেকে ১০ এবং ১৩ তথা গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২৩-তে নির্ণায়ক জ্ঞান আছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১৩-তে বলেছে যে, এই আমার (ব্রহ্মের) সাধনা তো কেবল ক্তঁ অক্ষর আছে, যাহা উচ্চারণ করে জপ করতে হয়। যে সাধক অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত্য এই জপ করে থাকে, সে আমার পরমগতি প্রাপ্ত করে থাকে। নিজের পরমগতিকে গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ তে অতি অনুত্তম অর্থাৎ ভীষণ খারাপ বলেছে।

গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২৩ সে বলেছে যে, পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি কেবল তিন মন্ত্র **ক্তঁ-তৎ সৎ**-এর জপেরই নির্দেশ দেওয়া আছে। (যাতে ক্তঁ জপ ব্রহ্মের আছে, তৎ এ হল সাংকেতিক যেটা পরব্রহ্মের জপ, সত্ এও সাংকেতিক আছে ইহা পূর্ণ ব্রহ্ম ব্রহ্মের জপ আছে)। ওই পূর্ণ পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী সন্তই কেবল জানে, তার কাছ থেকে প্রাপ্ত কর। আমি (গীতা জ্ঞান দাতা ক্ষর পুরুষ) জানি না।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৬-তে বলেছে যে, এই বিধান আছে যে কি অন্ত (শেষ মুহুর্ত)-এর সময়ে সাধক যে প্রভুর নাম জপ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে থাকে, সে সেই প্রভুই প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৫ থেকে ৭ তে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ শেষ নিশ্বাস মুহুর্তে (অন্তিম) সময়ে আমার নাম স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে, সে আমার (ব্রহ্মের)র ভাবে ভাবিত

হয়ে থাকে। আবার কোনদিন যদি মানব জন্ম হয় তাহলে ওই সাধক আমার সাধনা ব্রহ্মের সাধনা থেকেই প্রারম্ভ করে থাকে। তার স্বভাব ঠিক তেমনই হয়ে যায়। (তার প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬-১৭-তেও আছে যে কি, যে সাধক পূর্ব জন্ম যেমন সাধনা করে থাকে পরের জন্মেও স্বভাববশতঃ সেই সাধনা করে থাকে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৭ তে বলেছে যে তুই সব সময়ে আমার স্মরণ কর এবং যুদ্ধও কর নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্ত করবি।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত তে স্পষ্ট করেছে যে কি? যে সাধক অনন্য মন থেকে পরমেশ্বরের নাম জপ করে, সে সদা তাকেই স্মরণ করা (পরম দিব্যম্ পুরুষ যাতি)-র ওই পরম দিব্য পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর (পূর্ণব্রহ্ম) কে প্রাপ্ত হয় (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৮)।

যে সাধক অনাদি, সর্ব নিয়ন্তা, সুক্ষ থেকেও অতিসুক্ষ সবকে ধারণ পোষণ করে, বালা, সূর্যের মত স্বপ্রকাশিত অর্থাৎ তেজোময় শরীর যুক্ত, অজ্ঞান রূপ অন্ধকার থেকে উপরে (অনেক দূরে) (কবিম্) কবিদেব্ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের স্মরণ করে। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৯-তে)।

ওই ভক্তি যুক্ত সাধক তিন মন্ত্রের জপের সাধনার শক্তি (নাম জপের কামাই) দিয়ে শেষ সময়ে শরীর ত্যাগের সময়ে ত্রিকুটির উপর পৌছিয়ে অভ্যাসবশ সারনামের স্মরণ করে ওই দিব্য পুরুষ রূপ অর্থ্যাৎ তেজোময় কিংবা সাকার (পরমপুরুষ) পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত হয়েথাকে। (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১০)

।। ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ) এর সাধনা অনুত্তম (খারাপ /অশ্রেষ্ঠ)।।

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২ তথা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৫ এবং গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ তে বলেছে যে, আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) নাশবান আছি। জন্ম মৃত্যু আমার ও তোর সদা হতে থাকবে। কেবল নিজের করা কর্মই প্রাপ্ত হবে, মোক্ষ হবে না। আমার সাধনা করা মনুষ্য যতই উদ্ধার সাধক হোক কিন্তু সেও আমার এই অতি খারাপ (অতি অশ্রেষ্ঠ) বা (অনুত্তমাম) সাধনাতেই ব্যস্ত আছে। এই জন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-৬৪-৬৬-তে বলছে, ওই পরমেশ্বরের শরণে যা তথা আমার পূজ্য দেবও তিনি।

প্রার্থনা ঃ-উপরোক্ত তিন মন্ত্রের সাধনা আমি এই দাসেরও দাস (রামপাল দাস) এর কাছে উপলব্ধ আছে, যাহা স্বয়ং পূর্ণ দয়ালু পরমাত্মা কবির্দেব তার প্রিয় আত্মাদের উপর রহম (কৃপা/দয়া) করে প্রদান করেছেন, কেননা এখন বিচলী (মধ্যবালী/কলি যুগের মধ্যম পিঢ়ি) চলছে। কেননা কলিযুগের প্রারম্ভে আমাদেরপূর্ব পুরুষরা খুবই অশিক্ষিত ছিলেন। ওই সময় আমাদের প্রিয় দয়ালু পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞান কে নকল সন্তরা, গুরুরা, মহন্তেরা আচার্যরা, নিজেদের খুব জ্ঞানী মনে করে সবার প্রিয় তত্ত্ব জ্ঞানকে সবার সন্মুখে আসতে দেন নি। অতএব কলিযুগের অন্ততে (শেষের দিকে) সর্ব ব্যক্তি ভক্তিহীন ও মহাবিকারী হয়ে যাবে। এখন এই যে বর্তমান সময় ২০ শতী থেকে শিক্ষিত সময় আরম্ভ হয়েছে এবং এখন বিচলী পীঢ়ী (মধ্য পীঢ়ী) মনুষ্য বংশ চলছে।

বাস্তবিক জ্ঞান আমাদের সদগ্রন্থে বিদ্যমান আছে, যাকে নকল সন্ত, গুরু ও আচার্য্যরা ও মহন্তরা বুঝতে পারেননি। যার কারণে সমস্ত ভক্ত সমাজ শাস্ত্র বিরুদ্ধের জ্ঞানের আধার থেকে

দন্তকথা (লোকবেদ) উপর আধারিত হয়ে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমানী আচরণ (পূজা) করে অনমোল (দূর্লভ) মানব জনমের জীবনকে ব্যর্থ করছেন।

।। শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা ।।

(১) প্রথম চরণে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয় যার দ্বারা পাপড়ি (কমল)কে খোলে। উপদেশ প্রাপ্ত করা ভক্তাত্মা ভাববেন, গুরুজী তো বলছেন যে কি, তিনগুণ (রজগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) এর পূজা করবে না বা করতে নেই। আর মন্ত্র জপ তাদেরই নামের দিচ্ছেন। তারজন্য নিবেদন হল যে, এটা কিন্তু পূজা নয় কারণ আমরা ভুলবশে পরমাত্মা থেকে আলাদা হয়ে কালের লোকে কালের সঙ্গে থাকতে এসেছি অতএব তার লোকে (রাজ্যে) থাকি। এখানে আমাদের যে সুবিধা দরকার সে সব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদিই প্রদান করবেন।

যেমন আমি কারেন্টের কানেকশ্ন (লাভ) নিয়েছি। তার বিল আমাদেরই ভরতে হয়। আমরা কিন্তু বিদ্যুৎ মন্ত্রি বা তার বিভাগের পূজা করি না বা করছিও না। আমাদের তার বিল (খরচ) ভরতে হবে তাহলে কারেন্টের লাভ পাব। এই প্রকারে টেলিফোন (দূরাভাষ)-এর বিল বা জলের বিল দিতে থাকলে আমরা সুবিধা পেতে থাকব। আপনারা সব শাস্ত্র বিরুদ্ধে সাধনা করে ভক্তিহীন হয়ে গিয়েছেন বা পূণ্যহীন হয়ে গিয়েছেন। তার কারণে আপনার ধনলাভ আদি হচ্ছে না। এই দাস (রামপাল দাস) আপনাদের গ্যারেন্টি (জিম্মেদারী) হয়ে, এই কাল লোকের কেবল এক ব্রহ্মান্ডের শক্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব-গণেশ-মাতা আদি)-র দ্বারা আপনাদের সর্ব সুবিধা পুনঃ প্রারম্ভ করাব তথা আপনারা এই মন্ত্রের জপ দ্বারা এদের বিল ভরতে থাকবেন। যে মন্ত্রের প্রথম (সত সুকৃত অবিগত কবীর) আছে এটাই আপনাদের পূজা, ইনিই পূর্ণ পরমাত্মা, ও সতম্ লাভ (ফল) প্রাপ্ত হবে। সতমের অর্থ অবিনাশী অতএব আমাদের অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করতে হবে। এই মন্ত্রের চার মাস পরে আপনাকে সতনাম (সত্যনাম) আরও দেওয়া হবে। যাহা দুই মন্ত্রের হবে। তার এক মন্ত্র কালের একুশ ব্রহ্মান্ডের ঋণ শোধ করে অর্থাৎ তার কামাই করে আমরা ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ) অর্থাৎ কালের ঋণ শোধ করবো। পরে এই কাল আমাদের সব পাপ থেকে মুক্ত করবে।

।। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-তে ।।

তম এব, শরনম্, গচ্ছ, সর্বভাবেন, ভারত,
তৎপ্রসাদাৎ, পরাম্, শান্তিম্ স্থানম্ প্রাপস্যাসি, শাশ্বতম্ ।। ৬২ ।।

অনুবাদ ঃ-(ভারত) হে ভারত! তুই (সর্বভাবেন) সর্ব প্রকারে (তম) ওই অজ্ঞান অন্ধকারে লুকানো পরমেশ্বরের (এব)-ই (শরনম্) শরণে (গচ্ছ) যা। (তৎপ্রসাদাৎ) ওই পরমাত্মার কৃপাতেই তুই (পরাম্) পরম (শান্তিম্) শান্তিকে তথা (শাশ্বতম্) সব সময় থাকা সত (স্থানম্) স্থান-ধাম-লোককে (প্রাপস্যাসি) প্রাপ্ত হবে।

অনুবাদ ঃ- হে ভারত! তুই সব প্রকার থেকে ওই অজ্ঞান অন্ধকারে লুকানো পরমেশ্বরের শরণে যা। ওই পরমেশ্বরের কৃপাতেই তুই পরম শান্তিকে তথা সদা থাকা যায় সেই সতস্থান ধাম লোককে প্রাপ্ত হবি।

।। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬৬ তে ।।

সর্বধর্মান, পরিত্যজ্য, মাম, একম্, শরনম্, ব্রজ,
অহম্, ত্বা, সর্বপাপেভ্যঃ, মোক্ষয়িষ্যামি, মা, শুচঃ।।

অনুবাদ ঃ- (মাম্) আমার (সর্বধর্মান) সর্ব পূজাকে (পরিত্যজ্য) ত্যাগ করে তুই কেবল (একম্) একমাত্র ঐ পূর্ণ পরমাত্মার (শরনম্) শরনেতে (ব্রজ্) যা (অহম্) আমি (ত্বা) তোকে সর্বপাপেস্যঃ সম্পূর্ণ পাপ থেকে (মোক্ষয়িষ্যামি) ছাড়িয়ে/মুক্তি দেব তুই (মা, শুচঃ) শোক করিস্ না।

অনুবাদ ঃ- আমার সমস্ত পূজা ত্যাগ করে তুই কেবল এক ঐ পূর্ণ পরমাত্মার শরণে যা। আমি তোকে সমস্ত (সম্পূর্ণ) পাপ থেকে ছাড়িয়ে দেব। তুই শোক করিস না।

উপরোক্ত শ্লোকের ভাবার্থ হল যে, কাল (ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষ) বলছে, হে অর্জুন তুই আমার শরণে থাকতে চাইলে, জনম মরণে থেকেই যাবি। যদি পরমশান্তি বা সতলোকে যেতে চাস্ তাহলে ওই পূর্ণ পরমাত্মার স্মরণে চলে যা। তার জন্য আমার সর্ব ধার্মিক পূজা অর্থাৎ সতনামের প্রথম মন্ত্রের জপের কামাই আমাকে দিয়ে (আমার মধ্যে ছেড়ে) পরে সর্ব ভাব থেকে ওই এক (সর্বশক্তিমান বা যার সমানে দ্বিতীয় কেউ নেই, ওই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর)-এর শরনে চলে যা, তারপরে আমি তোকে সর্ব পাপ (ঋণ) থেকে মুক্ত করে দেব, তুই চিন্তা বা শোক করিস না! অতএব সতনামের দ্বিতীয় মন্ত্রের কামাই আমরা পরব্রহ্মঅর্থাৎ অক্ষর পুরুষকে ছেড়ে দেব, কেননা আমাদের অক্ষর পুরুষের লোক থেকে হয়েই সতলোকে যেতে হবে। তাকেও তো ভাড়া দিতে হবে। আর তৃতীয় মন্ত্র সত শব্দ অর্থাৎ সারনাম পাবে, যে কিনা সতলোকে স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত করাবে।

যেমন কোন ব্যক্তি বিদেশ গিয়ে থাকে আর ওই খানের সরকারের কাছে যদি ঋণ থাকে এবং পরে স্বদেশ আসতে চায় তাহলে তাকে আগে ওই দেশের ঋণ থেকে মুক্তি নিতে হবে। পরে (No Due Certificate) ঋণ মুক্ত প্রমাণ পত্র প্রাপ্ত করতে হবে, তাহলে তার স্বদেশ ফেরার পাসপোর্ট হবে, তা না হলে তাকে স্বদেশ ফিরতে দেবে না।

ঠিক এই প্রকারে আপনারা এই কাল লোকে শাস্ত্র বিরুদ্ধে সাধনা করে ভক্তিহীন হয়ে ঋণী হয়ে গিয়েছেন। প্রথমে আপনাকে নামের পূঁজি দিয়ে ধনী বানাতে হবে। তারজন্য কবির্দেব (কবির্ সাহেব বা কবীর সাহেব) আমার মত দাস (সন্ত রামপাল দাস)কে আপনাদের প্রতিনিধী (Representative) বানিয়ে পাঠিয়েছেন। ওই পরমেশ্বরের তরফ থেকে এই দাসকে আপনাদের (Guaranter) জামিনদার বানিয়ে তথা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি শক্তিদের থেকে আপনাদের পুনঃ কানেকশন (সম্পর্কর লাভ) কে প্রারম্ভ করাবে। যার কারণ আপনারা এদের মন্ত্রের কামাই করে কিস্তিতে বিল চুকাতে পারবেন। যতক্ষণ আপনারা এখান থেকে মুক্ত না হবেন, ততক্ষণ আপনাদের সর্ব ভৌতিক সুবিধা জোর শোর ভাবে পেতে থাকবেন। তথা আপনারা পুন্যদান আদি করে অধিক ভক্তির ধনী হয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় শব্দতে যেমন আমাদের শরীরের মধ্যে পদ্মফুলের পাপড়ি বানানো আছে। যখন আমরা শরীর ত্যাগ করে পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছিয়ে যাব, তখন আমাদের এই পদ্মফুলের মত (কমলের) পাপড়ির কাছ হয়েই যেতে হবে। যেমন **(১) মূল কমলে গনেশজি, (২) স্বাদ কমলে সাবিত্রী ব্রহ্মাজি (৩) নাভি কমলে লক্ষী বিষ্ণু জি (৪) হৃদয় কমলে পার্বতী শিবাজী**

(৫) কণ্ঠ কমলে দুর্গা (অষ্টাঙ্গী) আছে। এই সব কমল পেরিয়ে তবেই আমরা যেতে পারব, যখন তাদের ঋণ আমরা শোধ করে দিতে পারব। প্রথম উপদেশে (নামে) আপনাদের সব কমল খুলে যাবে, (ফুটে উঠবে) আপনি ঋণ মুক্ত হয়ে যাবেন। যখন আপনি অন্তিম সময়ে শরীর ছেড়ে চলে যাবে, তখন আপনাদের রাস্তা পরিস্কার পাবেন অতএব আপনি যে ঋণ মুক্ত হয়েছেন, তার প্রমাণ পত্র তৈরীই পাবেন।

তবে আমাদের পূজা কেবল ঐ মূল মালিক কবির্দেবেরই (কবিরসাহেব) করতে হবে। যেমন পতিব্রতা নারীর (পত্নী) পূজা তার স্বামী (পতি), অতএব তাহাকেই করে থাকে, কিন্তু আদর সৎ ভাব সবাই কেই করে। যেমন দেওরকে পুত্র স্নেহ দিয়ে ভাসুর কে বড় ভাইয়ের সম্মান দিয়ে, শ্বশুড় ও শাশুড়ীকে মাতা পিতা জ্ঞানে করে। তবে যে এক ভাব স্বামীর প্রতি থাকে, সে ভাব অন্যদের প্রতি থাকে না কেবল স্বামীরই পূজা করে। ঠিক ওই রকম পূজা কেবল পরমেশ্বর কবির্দেবকেই করে ভক্তি সফল করতে হবে। এইজন্য কোনো অজানা ব্যক্তির ফোসলানোতে যেও না। পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এই দাস দ্বারা বলা ভক্তি মার্গে চলতে থাকবেন এই ভক্তি সর্বশাস্ত্রের আধার।

(২) দ্বিতীয় চরণে সতনাম প্রদান করা হয়ে থাকে, যা কিনা দুই মন্ত্রের হয়ে থাকে। এক হল ক্তঁ এবং দ্বিতীয় তৎ যা সাংকেতিক আছে কেবল সাধককেই বলা হয়ে থাকে।

(৩) তৃতীয় চরণে সারনাম দেওয়া হয়ে থাকে, যে কিনা তিন মন্ত্রের আছে। **ক্তঁ-তৎ-সৎ (তৎ-সৎ সাংকেতিক আছে যাহা সাধককেই বলা হয়ে থাকে)।**

বিশেষ ঃ- বর্তমান এই হল বাস্তবিক সাধনা আমার (এই দাসের) ছাড়া (অতিরিক্ত)কাহারও কাছে নেই। যদি কেউ এই দাসের কাছ থেকে কেউ চুরি করে, স্বয়ং গুরু সেজে নকল শিষ্য বানায় তবে ওই মনুষ্য (জীবনের শত্রু) থেকে সাবধান থাকবেন। সে অধিকারী না হওয়ার কারণ আপনার জীবনও নষ্ট করে দেবে। তাছাড়া যারা তার অনুযায়ী হবে তাদেরকেও নরকের ভাগী বানাবে, তাকেই জানবেন কালের পাঠানো দূত।

।। শঙ্কা সমাধান।।

(১) প্রশ্ন ঃ- উপরোক্ত গীতা সার থেকে সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু তথা শিবের পূজা করা ব্যর্থ। পরন্তু আমি তো ত্রিশ বৎসর ধরে শিবের পূজা করে আসছি, এবং শ্রীকৃষ্ণ আমার খুব প্রিয়, আমি এই প্রভুদের ছাড়তে পারছি না, এদের প্রতি আমার ভালবাসা হয়ে গিয়েছে। গীতা পাঠ আমি প্রতিদিনই করে থাকি। হরে রাম, হরে কৃষ্ণ রাধেশ্যাম, সীতা রাম, ক্তঁ নমং শিবায় ক্তঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নম; আদি জপ রোজ করে থাকি। সোমবারের ব্রত পালন করি, প্রতি বছর শিবের মাথায় জল ঢালি, তীর্থে গিয়ে দানও করি। ঘরের আসনে মূর্তি বসিয়ে পূজা করি এবং স্বর্গ প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখি। পরম্পরাগত পূজার কারণ এক গুরুর কাছ থেকে নাম উপদেশও নিয়েছি।

উত্তর ঃ- কৃপা করে আপনি পুনরবার উপরোক্ত গীতা সারকে পড়ুন, যতক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পূর্ণ পরিচিত না হবেন, ততসময় পর্যন্ত্য আপনার শঙ্কারূপী কাটা চুভতে থাকবে। যেমন আগে উদাহরণ আছে যে, উল্টো ঝুলানো সংসার রূপী বৃক্ষ আছে, যার মূলে (শিকড়ে) রয়েছেন পূর্ণ

পরমাত্মা পরমেশ্বর। তিনগুণ রূপী (রজগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব) শাখা আছে। আপনি ধরুন কোন আমের গাছ লাগান, যদি তার মূল (শিকড়ে)-এ জল ঢেলে যত্ন নেন অর্থাৎ (পূজা) করেন, তাহলে বড় হয়ে তার শাখায় প্রশাখায় ফল ধরবে, শাখা ভেঙে ফেলতে তো বলা হয়নি। আগের পৃষ্ঠায় তে চিত্র দেখবেন সোজা লাগানো ভক্তিরূপী গাছ অর্থাৎ শাস্ত্র বিধি অনুসার সাধনা।

এই প্রকার পূজা তো পূর্ণ পরমাত্মার অর্থাৎ মূল (শিকড়ের) করতে হয়, পরে কর্মফল এই তিন গুণ (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে) রূপী শাখাতে ফল হবে। সেইজন্য আদর সৎকার যেমন দেওর ভাসুর শ্বশুড় আদিদের করা হয় ঠিক তেমনই পতিব্রতা নারীর মত এক প্রভু (স্বামী) কেই পূজা করতে হয়। তাই শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা প্রারম্ভ (শুরু) করতে হবে, অতএব ভক্তি দিয়ে মূলকে পূজা করতে হবে।

বর্তমান সমস্ত পবিত্র ভক্ত সমাজ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমানী আচরণ করছেন অর্থ্যাৎ ভক্তিরূপী গাছকে উলটো লাগিয়ে মূলকে (শিকড়কে) যত্ন না করে ডালপালাকে আগে যত্ন করছেন, এদেরকে মূর্খ বলা হয়ে থাকে। কৃপা করে উল্টো লাগানো চিত্র ভক্তিরূপী গাছ আগের পৃষ্ঠা চিত্রে দেখুন। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৮ পর্যন্ততে, তিন গুণ (রাজাগুণ ব্রহ্মাসতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব)-এর পূজা পর্যন্ত্যই সীমিত বুদ্ধি রাখে যারা এদের ছাড়া কাউকে পূজা করে না, এরা রাক্ষস স্বভাব ধারণ করে আছে, মনুষ্যর মধ্যে নীচ, দুষ্কর্ম করে মূর্খ বলা হয়েছে, থাকা বলেছে এরা আমায়ও পূজা করে না। তাছাড়া নিজের সাধনাকেও গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু (ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ) অতি খারাপ (অনুত্তমাম্) অর্থাৎ ব্যর্থ বলেছে। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২-৬৪-৬৬ তথা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ থেকে ৪-তে বলেছে যে ওই পূর্ণ পরমাত্মা (উল্টো লটকানো (ঝুলানো) বৃক্ষের মূলকে পূজা কর)-র শরনে যা। তার পূজা বিধি তত্ত্বদর্শী সন্তের দ্বারা বলা মার্গ অনুসারে কর (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪-তে তত্ত্বদর্শী সন্তের দিকে সংকেত) করা হয়েছে, ওই পূর্ণ পরমাত্মাকে শাস্ত্র বিধি অনুসার সাধনা করলেই সাধক পরম শান্তি এবং সতলোক প্রাপ্তি হয়ে থাকে, অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি করেন। গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু (ক্ষর পুরুষ/কাল) বলছে যে, আমিও তাহার শরণে আছি, অর্থাৎ আমারও ইষ্ট দেব, ওই পরমাত্মা, আমিও তার পূজা করি, অন্যদেরও তার পূজা করা উচিৎ। আপনি গীতার নিত্য পাঠও করেন এবং সাধনা গীতায় বর্ণিত বিধির বিরুদ্ধে করছেন। যে (হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, রাধে শ্যাম, সীতা রাম, ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নম ভগবতে বাসুদেবায় নম) এই ইত্যাদি মন্ত্র আপনি জপ করেছেন তাছাড়া অন্যসাধনা ব্রত, তীর্থে দান করা, বাঁক নিয়ে জল ঢালতে যাওয়া গঙ্গা স্নান তীর্থ ধামে স্নান, এইসব পবিত্র গীতাতে বর্ণিত না থাকার কারণ, শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমানী আচরণ (পূজা)ই করা হচ্ছে। এইসব মনমানী আচরণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩-২৪-তে ব্যর্থ বলা হয়েছে।

।। গদ্দী ও মহন্ত পরম্পরায় নিয়ম বিষয় ।।

মহন্ত ও গদীর পরম্পরা নিয়ম বিষয়ে জানকারী ঃ- কোন একান্ত স্থানে বা শহরে কিংবা গ্রামে হয়তো এক মহান আত্মা সন্ত বা সাধক হয়তো এক থাকতেন। তার শরীর ত্যাগ হওয়ার পরে স্মৃতি বানিয়ে রাখার জন্য, তার শরীরের অন্তিম সংস্কার স্থলের উপর এক পাথর বা ইট স্মৃতির জন্য বানানো হয়ে থাকে। পরে ঐ পবিত্রাত্মার ভক্তবৃন্দ বা তার বংশের সদস্যরা তাহারই পাথরের

মূর্ত্তি বানিয়ে সেখানে রেখে দেন। কিছু সময় বা কয়েকদিন পরে শ্রদ্ধালু সেখানে গিয়ে ধন দান করে, পরে সেই স্থানকে মন্দিরের রূপ বানিয়ে দিয়ে থাকে, এবং ওই ঋষি বা বংশের সদস্যদের ধন উপার্জন করার লালচ জাগে। তারপর থেকে লোককে ঠকানো জন্য বলে, যে এখানে এসে পূজা ও দর্শন করবে তার মনো বাসনা পূর্ণ হয় এবং মোক্ষপ্রাপ্তি হয়ে যায় সর্ব লাভ মিলবে, এই মহাপুরুষের জীবন কালে তার শিষ্যেরা সেই লাভ পেতেন। এই মূর্ত্তি ওই মহাপুরুষের যে এখানে না আসবে তার মোক্ষ সম্ভব হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওই নাদান (অবুঝ) কে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, যেমন মনেকর এক বৈদ্য ছিল, সে নাড়ী দেখে ঔষধ দিত এবং রোগী ঠিক হয়ে যেত। ওই বৈদ্যের মৃত্যুর পরে তার মূর্ত্তি বানিয়ে কোন লালচী ব্যক্তি বলে এই মূর্ত্তি ঐ বৈদ্যের মত কাজ করবে। যারা এর দর্শন করবে সে পূর্ণ স্বাস্থ্য হয়ে যাবে, কোনো একদিন পড়ে নিজেই নকলী বৈদ্য হয়ে বসে পড়ল এক জায়গায় আর সবাইকে বলতে লাগল, আমিও ঔষধ দিয়ে থাকি। কিন্তু সর্ব উপাচার ঔষধী গ্রন্থের বিপরীত দিতে শুরু করে। পরে সে ধন উপার্জনের জন্য সবাইকে ঠকাতে শুরু করে দেয়। কোনো সন্ত বা প্রভুর মূর্ত্তি আদরনীয় ও স্মরণীয় হতে পারে কিন্তু পূজনীয় নয়, সবার পূজার মালিক কেবল এক পরমেশ্বর, যাহা শাস্ত্রে প্রমাণ আছে শুধু তাকেই পূজা কর।

এই রকমই কোনো সন্ত বা প্রভুর মূর্ত্তি বানিয়ে তার আড়ালে কোনো মহন্ত বা পূজারী বলে যে আমি নাম দিই। ওই মহানুভাব সর্ব সাধনা ওই পবিত্র শাস্ত্রের বিপরীত দেয় যে কিনা ওই মহান সন্ত নিজের অনুভবে লিখেছিলেন। তবে ওই নকলী সন্ত বা মহন্ত স্বয়ং ও দোষী এবং অনুযায়ীদেরও জীবন ব্যর্থ করার ভার নিজের মাথায় নিচ্ছে অতএব। সন্ত তো একসময়ে একজনই আসেন। তার মার্গে কোটি নকল সন্ত, মহন্ত ও আচার্যরা বাধক হয়।

কোনো সন্তের শরীর ত্যাগের পর সন্ত বা মহন্ত পরম্পরা প্রারম্ভ হয়ে থাকে। পূর্ব সন্তের স্থানে বা রক্ষার্থে এক প্রবন্ধককে বাছা হয়ে থাকেন। যাকে মহন্ত বলা হয়ে থাকেন। তাকে কেবল ওই পবিত্র স্মৃতির দেখাশুনার জন্যই নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। পরে লালচ বশে তিনি স্বয়ংই গুরু হয়ে বসেন তথা ভক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখা ভোলা সরল আত্মারা তার উপর আধারিত হয়ে নিজের জীবনই ব্যর্থ করে দেয়। মহন্ত পরম্পরার নিয়ম বানিয়ে রাখা আছে যে পূর্বের মহন্তের প্রথম পুত্রই মহন্ত পদের অধিকারী হবে, তাতে সে মদখোর হোক বা অজ্ঞানী হোক না কেন।

কেবলমাত্র পূর্ণ সন্তই এই ভক্তি মার্গের দ্বারা জীব উদ্ধার করতে পারেন এই দাস দুই তিন মহন্তদের পরম্পরার পুস্তক পড়েছেন। তাতে দেখেছেন যে **(১)** এক দুই বৎসরের বাচ্চাকে গদিতে বসিয়ে দিয়েছেন। পরে সে বড় হয়ে নাম দান দিতে শুরু করে। দ্বিতীয় পুস্তকে পড়েছি এক পাঁচ বৎসরের বাচ্চার পিতা মহন্ত ছিলেন হঠাৎ মারা গেলে, পরে সঙ্গত লোক ও তার মাতা ওই পাঁচ বর্ষীয় বাচ্চাকে মহন্ত পদে বসিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে সে গুরু হয়ে যায়।

(২) এক মহন্তের ইতিহাস তার পরম্পরা পড়েছি যে, ওই মহন্তের কোন সন্তান হয়নি, এবং তার মৃত্যু হয়ে যায় গদী সামলে রাখার জন্য ঐ কুলে কোনো সন্তান না হওয়া পর্যন্ত্য কোনো এক সেবককে অস্থায়ী রূপে গদিতে নিযুক্ত করে দিলেন। কয়েকদিন যাওয়ার পরে সেই মহন্তের কুলে এক ছেলে হয় তখন সেই, অস্থায়ী মহন্ত গদি নিয়ে কোন অন্য এক শহরে পালিয়ে গিয়ে স্বয়ংই

গদি স্থাপনা করে মহন্ত হয়ে সেজে, ওখানে নতুন দোকান খুলে নিলেন তথা পূর্ব স্থানে এক আড়াই বৎসরের বাচ্চাকে মহন্ত বানিয়ে বসিয়ে দিলেন।

(৩) এক মহন্তের পরম্পরার ইতিহাস দেখেছি যে কি বড় ছেলে ঘর ত্যাগ করে চলে যায়, তার ছোট ভাইকে মহন্তের পদে নিযুক্ত করে কয়েক বছর পরে সেখানে মন্দির বানিয়ে দেওয়ার কারণে অনেক ধন দান মন্দিরে আসা শুরু হয়েছে ঐ বড় ছেলের সন্তানরা বলে, এই মন্দিরে আমাদের অধিকার এর কারণে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। গদীর উপর যে মহন্ত ছিল তাকে হত্যা করে দেওয়া হয় পরে ঐ বড় ছেলেকে গদীর অধিকারী নিযুক্ত করে দেয় তারও হত্যা করে দেওয়া হল, পরে দ্বিতীয় ভাইকে গদীর উপর বসায়। দ্বিতীয় জন যে নিজেকে অধিকারী বলত পরে সে নতুন স্থানে নতুন দোকান (গদী) খুলে বসে। এই ধন উপার্জনের লালচে একজনের উপর আরেকজনের কেস্ চলতে চলতে সুখময় জীবনকে নষ্ট ও নরক বানিয়ে দিল এখন ওই ধাম কোথায় থাকল? ওতো কুরুক্ষেত্রবালা মহাভারতের যুদ্ধে র ময়দান হয়ে গিয়েছে। কিছু মহন্তরা সন্ত বানানোর এজেন্সী নিয়ে রেখেছে, লাল বস্ত্র ধারণ করে আগের নাম বদলে অন্য নাম রেখে নেয়। পরে ঐ নকল মহন্তর নকল শিষ্য নকল সন্ত (সাধু /গুরু) হয়ে সরল সোজা আত্মাদের জীবনের সাথে খেলা করে, অতএব দূর্লভ মনুষ্য জনমকে স্বয়ং তো ব্যর্থ করেই তথা সরল সোজা আত্মাদেরও জীবনসর্বনাশ করে মহাপাপের ভাগীদার হয়ে পড়ে।

যে সময় রাজা পরীক্ষিতকে সাপে দংশন করার কথা ছিল। ওই সময় পূর্ণ গুরুর আবশ্যকতা ছিল, কেননা পূর্ণ সন্ত ছাড়া আত্ম কল্যাণ অসম্ভব ছিল। ওই সময় পৃথিবীর সমস্ত ঋষিরা পরীক্ষিৎ রাজাকে দীক্ষা ও সাতদিন শ্রীমদভাগবত সুধাসাগেরের কথা শুনাতে মানা করেছিলেন। কেননা সাতদিনের দিন অবশ্যই তার পোল খোলার কথা বা সত্য প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কোন মিথ্যা গুরুগিরিতে কাজ হবে না তার মৃত্যু অনিবার্য। তাই সামনে কোনো ঋষি আসতে সাহস পায়নি, ব্যাসদেবও না। ব্যাসদেব স্বয়ংই শ্রীমদভাগবৎ সুধাসাগেরের লেখক ছিলেন। কেননা সে সময়ের ঋষিরা প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় পেতেন। তাই রাজা পরীক্ষিতের জীবনের সঙ্গে খেলা করতে সাহস হয়নি বা উচিৎ মনে করেনি।

রাজা পরীক্ষিতের কল্যানের জন্য মহর্ষি শুকদেবকে স্বর্গ থেকে ডাকা হয়েছিল। তিনি রাজা পরিক্ষীৎকে দীক্ষা দিলেন তথা সাতদিন পর্যন্ত কথা শুনিয়ে রাজা পরীক্ষিৎকে যতটা উদ্ধার শুকদেব করতে পেরেছে করেছে। বর্তমান গুরু মহন্ত ও আচার্য্য ব্রাহ্মণরা স্বয়ং নিজেরাই প্রভুর সংবিধান থেকে অপরিচিত, সেই জন্য ভয়ঙ্কর দোষের পাত্র হয়ে দোষী হচ্ছেন।

ওরং পথ বতাবহীং স্বয়ং ন জানে রাহ।
অন অধিকারী কথা পাঠ করে ও দীক্ষা দেবেং বহুত করত গুনাহ।।

বর্তমানে সতসঙ্গ কথা ও গ্রন্থ পাঠ ব্যক্তি ও নাম দান ব্যক্তি যেন বন্যার মত সব ভেসে এসেছে। কেননা সর্ব পবিত্র ধর্মের পবিত্রাত্মারা তত্ত্বজ্ঞান থেকে অপরিচিত আছেন। যার কারণ নকল গুরুরা ও মহন্ত সন্তেরা প্যাচ লাগিয়েরেখেছে। যে সময় পবিত্র ভক্ত সমাজ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে যাবেন। ওই সময় এই নকল গুরুরা ও আচার্য্যরাও ব্রাহ্মণরা পালানোর জন্য জায়গা খুঁজে বেড়াবেন তবে পাবে কিনা সম্ভব।

।। পবিত্র তীর্থ তথা ধামের পরিচয়।।

এক সাধক ঋষি কোন এক স্থানে বা জলাশয়ে বসে সাধনা করেছেন বা নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রদর্শন করেছেন পরে। তিনি তার ভক্তি কামাই করে সাথে নিয়ে। তার ইষ্ট লোকের প্রাপ্ত হয়েছেন। ওই সাধনা স্থলে পরে তীর্থ বা ধাম নামে পরিচিত হয়। এখন কেউ যদি ওই স্থান দেখতে যায় তখন তাকে বলবে, এখানে কোন সাধক থাকতেন, তিনি অনেক লোকের কল্যাণ করেছেন। তবে এখন না সেই ঐ ঋষি বা মহাপুরুষ আছেন যে যিনি উপদেশ দেবেন। সে তো নিজের যা কামাই করার ছিল তাহা করে চলে গিয়েছেন।

বিচার করুন ঃ- কৃপা করে ওই ধাম বা তীর্থকে হমামদস্তা জানবেন। (এক দেড় ফুট গোল লোহার পাত্র কমপক্ষে নয়ইঞ্চি পরিধি, আর একটা দেড়ফুট লম্বা দুই ইঞ্চি চওড়া লাঠির মত লোহা গোল আকার। যে ব্যক্তির কিছু আটার মত ফিনিস বা মিহি করতে হলে বা কোনো গাছ গাছ্রা লতা পাতার রস বের করলে তাহা কাজে লাগে। একেই হমামদস্তা বলা হয়। এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে হমামদস্তা চেয়ে নিয়ে আসে, পরে কিছু তাতে কুটে, ধুয়ে মুছে তার ঘরে আবার ফিরিয়ে দেয়। পরে ঐ ঘরের সদস্য ভাবল এই সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে? ঘরে গিয়ে দেখে যেখানে হমামদস্তা ছিল ঐখান থেকেই সুগন্ধ আসছে। হয়তো কোনো সুগন্ধযুক্ত কোন পদার্থ ওই হমাম দস্তায় কুটেছিলেন। একদিন সে সুগন্ধও আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ঠিক এই প্রকার তীর্থ ও ধামকে হমামদস্তাই জানবে। যেমন সামগ্রী কুটা ব্যক্তি নিজের সব বস্তু ধুয়ে মুছে রেখে নিয়েছে এবং খালি হমামদস্তা ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন কেউ যদি ঐ হমামদস্তার সুগন্ধ শুঁকে শুঁকে নিজেকে কৃতার্থ মানে, তাহলে তাকে অবুঝ ছাড়া কি বলা যায়। তবে তাকেও সামগ্রী নিয়ে আসতে হবে। তবেই পূর্ণ লাভ হবে। ঠিক এই প্রকার কোন ধাম ও তীর্থে থাকতেন কোন পবিত্র আত্মা তিনি রাম নামের সামগ্রী কুটে ঝেড়ে মুছে নিজের সব কামাই সাথে নিয়ে গিয়েছেন। পরে ওই স্থানে অজানা অবুঝ শ্রদ্ধালু যেতেই কল্যাণ হবে ভেবে নেয়, তবে তার মার্গ প্রদর্শনের গুরুর শাস্ত্রবিধি রহিত বলা সাধনার ই পরিণাম জানবে। ওই মহান আত্মার সন্তের মতো প্রভু সাধনা করলেই কল্যাণ সম্ভব। তার জন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ করে তার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে আজীবন ভক্তি করে মোক্ষ প্রাপ্ত করার দরকার। শাস্ত্র বিধি অনুকুল সত্সাধনা আমার (এই দাসের) কাছে উপলব্ধ আছে, কৃপা করে বিনা মূল্যে (নিঃশুল্ক) প্রাপ্ত করেন।

।। শ্রী অমর নাথ ধামের স্থাপনা কি করে হয়েছে?।।

ভগবান শঙ্কর পার্বতীকে একান্ত স্থানে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার কারণে পার্বতী এতটাই মুক্ত হয়েছিল যে কিনা যতদিন প্রভু শিব (তমোগুণ)-এর মৃত্যু না হবে ততদিন উমা পার্বতীর ও মৃত্যু হবে না। সাত ব্রহ্মা (রজোগুণ)-এর মৃত্যুর পরে ভগবান বিষ্ণু (সতগুণ)-এর মৃত্যু হবে। সাত বিষ্ণুর মৃত্যুর পরে শিবের মৃত্যু হবে। তখনই মাতা পার্বতীর মৃত্যু হবে। পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি হবে না। তবুও যতটা লাভ পার্বতীকে হয়েছে তাহা অধিকারী থেকে উপদেশ মন্ত্র নিয়েই হয়েছে। পরে শ্রদ্ধালুরা ওই স্থানের স্মৃতি রাখার জন্য তাকে সুরক্ষিত রেখেছে এবং দর্শনেও যেতে শুরু করে।

যেমন এই দাস (রামপাল সন্ত) স্থানে স্থানে গিয়ে সৎসঙ্গ করতেন। সেখানে ক্ষীর ও হালুয়াও বানানো হতো। যে ভক্তাত্মা উপদেশ প্রাপ্ত করতেন, তার কল্যাণ হয়ে যেত। সৎসঙ্গ সমাপ্ত হয়ে গেলে যাবতীয় সৎসঙ্গের সামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য স্থানে চলে যায়, পূর্বের স্থানে কেবল উনান, মাটি ইট পড়ে থাকে। এবার কেউ যদি বলে এখানে এসো আমি ওই স্থান দেখাব, যেখানে সন্ত রামপালজির সতসঙ্গ হয়েছিল, ক্ষীর হালুয়া বানিয়েছিল। পরে ওই উনারের ইট আর উনান দেখতে যাওয়ার ব্যক্তি না ক্ষীর পাবে না সৎসঙ্গের অমৃত বচন শুনতে পাবে না ওই সন্ত রামপালজিকে পাবে, যাতে কিনা তার কল্যাণ হতে পারবে। তার জন্য সন্তকেই খুঁজতে হবে এবং যেখানে সতসঙ্গ চলতে থাকে, সেখানে গেলেই সর্ব কার্য সিদ্ধি হয়। উনান ও মাটি ইট দেখে হারও কল্যাণ হতে পারে না।

ঠিক এই রকম তীর্থ ও ধামে যাওয়া মানে স্মৃতিমাত্র স্থান রূপী উনান দেখাই মাত্র হয়ে থাকে। এ সব পবিত্র গীতাতে বর্ণিত না থাকার কারণ শাস্ত্রের বিরুদ্ধই হয়। যাতে কোন লাভ হয় না। (প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র নং ২৩-২৪)।

তত্ত্বজ্ঞান হীন সন্ত মহন্ত ও আচার্য্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা ভ্রমিত শ্রদ্ধালুরা তীর্থ ও ধামে আত্মকল্যাণ হয়ে থাকে ভেবেই যায় আত্মকল্যাণ তো হয় না। অমরনাথ যাত্রায় যাওয়া শ্রদ্ধালুরা তিন চার বার বরফের তুফানে পড়ে মৃত্যু প্রাপ্ত ও হয়েছে, প্রত্যেক বার মরার সংখ্যা হাজার হয়ে থাকে। বিচার করার বিষয়, যদি অমরনাথ দর্শন লাভ দায়ক হতো, তাহলে ভগবান শিব ওই শ্রদ্ধালুদের রক্ষা কি করতে পারত না ? কেননা ভগবান শিবও শাস্ত্র বিরুদ্ধে সাধনাতে অপ্রসন্ন আছেন।

।। বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরের স্থাপনা কেমন ভাবে হয়েছে?।।

যখন দেবী সতী (উমা) আপন পিতা রাজা দক্ষের যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল, তাই ভগবান শিব সতীর কঙ্কাল দেহকে মোহবশে সতী (পার্বতী) ভেবে দশ হাজার বর্ষ পর্যন্ত্য কাঁধে নিয়ে পাগলের মতো ঘুরতে থাকে। ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর কঙ্কালকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। যেখানে ধড় পড়েছিল সেইখানের মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। এই ধার্মিক ঘটনাকে মনে রাখার জন্য, তার উপর এক মন্দির বানিয়ে স্মৃতি রেখেছে এইজন্য যে কি, কোনদিন কেউ এসে এই কথা পরে না বলে যে যে পুরানের লেখা সব ভুল। তাই মন্দিরে এক স্ত্রীর চিত্র রেখে দিয়েছে তাকেই বৈষ্ণোদেবী বলতে লেগেছে। তার দেখাশুনা করার ও শ্রদ্ধালু দর্শককে ঐ কাহিনী বলার জন্য এক সৎ লোক নিযুক্ত করে দিয়েছিল। তাকে অন্য ধার্মিক ব্যক্তি কিছু বেতন দিত। পরে তার বংশের লোক, ওইখানে দান নেওয়া আরম্ভ করে দেয় আর কাহিনী বলা শুরু করে, যে এক ব্যক্তির ব্যাপার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মাতাকে একশো টাকা দেওয়ার সংকল্প করে নারকেল চড়িয়েছে, আজ সে অনেক বড় ধনী হয়ে গিয়েছেন আরেক কাহিনী বলে এক দম্পতি ছিল তাদের সন্তান হত না, সে সন্তানের জন্য কামনা (সংকল্প) করেছিল দুশো টাকা, এক সাড়ী ও একটা সোনার মালা চড়িয়েছে তার পুত্র হয়েছে।

এইভাবে কাহিনী বলে বলে সরল মানুষের কাছ থেকে দান নিতেন। এইভাবে এই সরল আত্মারা গীতার ও পবিত্র বেদের বিধি ভুলে গিয়েছেন, তার কারণ মানুষ সব শাস্ত্র বিধি রহিত সাধনায় মেতে গিয়ে, পবিত্র গীতা ও বেদের বাণী ভুলে গিয়েছেন। তার জন্য না কোনো সুখ হয়,

না কোনো কার্যসিদ্ধি হয়, না পরমগতি হয় বা মোক্ষলাভ হয়। (প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র নং ২৩-২৪-তে)।

এই প্রকারে যেখানে দেবীর চোখ পড়েছে সেখানে নৈনাদেবী নামে মন্দির যেখানে জিহ্বা পড়েছে সেখানে জ্বালাদেবী মন্দির এবং যেখানে ধড় পড়েছে সেখানে বৈষ্ণো ইত্যাদি মন্দির এইভাবে স্থাপনা হয়েছে।

।। পুরীতে শ্রী জগন্নাথ মন্দির অর্থাৎ ধাম কিভাবে হয়েছে।।

উড়িষ্যা প্রান্তে এক ইন্দ্রদমন নামের রাজা ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত ছিলেন। একদিন রাত্রে শ্রী কৃষ্ণ রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, যে, জগন্নাথ নামের এক মন্দির আমার বানিয়ে দাও। শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেছিলেন যে, এই মন্দিরে মূর্ত্তি পূজা করবে না। কেবল এক সন্তকে রাখবে যে কিনা পবিত্র গীতার জ্ঞান প্রচার করবে। সমুদ্রের পাশে সে স্থানও দেখিয়েছেন, যেখানে মন্দির বানাতে হবে। সকালে উঠে রাজা তার পত্নীকে বললেন, আজ রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন। মন্দির বানানোর জন্য বলেছেন। রানী বললেন শুভকার্য্য দেরী কেন? সমস্ত সম্পত্তি তো ভগবানেরই দেওয়া দান। তাকে সমর্পিত করবেন এতে কি ভাবার আছে? রাজা ওই স্থানে মন্দির বানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন। সমুদ্রের পাশেই সেই মন্দির হয়েছে, মন্দির হয়ে যাওয়ার পর সমুদ্রের ঢেউ এসে মন্দিরকে ভেঙে দিয়েছে। নিশানও রাখেনি যে, কোথায় বানানো হয়েছিল মন্দির। এইভাবে পাঁচ বার মন্দির বানিয়েছেন, আর পাঁচ বারই সমুদ্রে ভেঙে দিয়েছে।

রাজা নিরাশ হয়ে মন্দির না বানানোর নির্ণয় নিয়ে নিয়েছেন। ভাবলেন না জানি কোন জন্মের প্রতিশোধ সমুদ্র আমার নিচ্ছে। কোষাগার খালি হতে চলেছে কিন্তু মন্দির হয় নি। কিছুদিন পরে পূর্ণ পরমেশ্বর (কবির্দেব) জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল)কে দেওয়া বচন অনুসার ইন্দ্রদমনের কাছে এসেছেন তথা রাজাকে বললেন আপনি মন্দির বানান এবার সমুদ্র মন্দির ভাঙবে না। রাজা বললেন মহারাজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই মন্দির বানিয়েছিলাম, শ্রী কৃষ্ণই সমুদ্রকে থামাতে পারছেন না পাঁচ বার মন্দির বানিয়েছি। ভেবেছি হয়তো ভগবান আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন কিন্তু এখন মন্দির বানানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর বললেন ইন্দ্রদমন, যে পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচনা করেছেন, সে সমস্ত কার্য্য করতে সক্ষম, তবে অন্য প্রভু নয়। আমি ওই পরমেশ্বরের বচন শক্তি প্রাপ্তি আছি, আমি সমুদ্রকে থামাতে পারি। (ভগবান/পরমেশ্বর/কবির্দেব) সন্ত রূপে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন সেই ভাবেই বললেন। রাজা বললেন মহারাজ, (গুরু) জি আমি মানতে পারছি না যেকি, শ্রীকৃষ্ণ থেকে কেউ প্রবল শক্তি যুক্ত প্রভু আছেন যখন তিনিই থামাতে পারছেন না, তো আপনি কোন ক্ষেতের মূলি? এক নম্বর কথা তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, দ্বিতীয় কথা আমার মন্দির বানানোর পরিস্থিতি নেই। সন্ত রূপে আসা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) বললেন, রাজন্ যদি মন্দির বানাতে মনে ইচ্ছা জাগে তো আমার কাছে আসবে, আমি অমুক স্থানে থাকি। এখন আর মন্দিরকে সমুদ্র ভাঙবে না, এই বলে প্রভু চলে গেলেন।

ওই দিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ আবার ইন্দ্রদমন রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, একবার আবার মন্দির বানাও (মহল বানাও)। তোর কাছে যে সন্ত এসেছিল তার সঙ্গে সম্পর্ক করে সহায়তার

জন্য যাঞ্চনা করিস। তিনি সাধারণ সন্ত নয়, তার ভক্তিশক্তির কোন পাড়াপাড় নেই।

রাজা ইন্দ্রদমন ঘুম থেকে জেগে, স্বপ্নের পুরো বর্ণনা নিজের পত্নী রাণীকে বললেন। রাণী বললেন প্রভু যখন বলছেন তাহলে আর বাদ দিও না, প্রভুর মহল আবার বানিয়েই দাও। রাণীর সদভাবনা যুক্ত বাণী শুনে, বললেন, এবার তো কোষও খালি হয়ে গিয়েছে। আর যদি মন্দির (মহল) না বানানো হয় তাহলে প্রভু অপ্রসন্ন হবেন, আমি তো ধর্মসঙ্কটে পড়ে গিয়েছি। রাণী বললেন, আমার কাছে গহনা আছে, এতেই ভালভাবেই মন্দির (মহল) হয়ে যাবে। আপনি এই গয়না নিন আর প্রভুর আদেশ পালন করেন, এই কথা বলে রাণী নিজের শরীরের যত গয়না পড়া ছিল, এবং ঘরের সিন্দুকের মধ্যে যত গয়না ছিল, প্রভুর উদ্দ্যেশে, স্বামীর চরণে সমর্পিত করে দিলেন। রাজা ইন্দ্রদমন ঐ স্থানে গেলেন, যেখানে পরমেশ্বর সন্ত রূপে এসে বলেছিলেন। কবীর প্রভু অর্থাৎ অপরিচিত সন্তকে খুঁজে সমুদ্রকে থামার জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রভু কবীর (কবির্দেব) বললেন, যে দিক থেকে সমুদ্রের ঢেউ আসে, সেই কিনারায় বসার কোনো একটা সিলাপ (চবুতরা) বানিয়ে দাও। যার উপর বসে আমি প্রভুর ভক্তি করব এবং সমুদ্রকে থামাব। রাজা একটা বড় পাথরকে কারিগর দিয়ে চবুতরা (সিলাপ) মত বানিয়েছেন, পরমেশ্বর কবির তার উপর বসে গেলেন। ষষ্ঠমবার মন্দির বানানো প্রারম্ভ হয়। ওই সময় এক নাথ পরম্পরার সিদ্ধ মহাত্মা এসে গেলেন। নাথ রাজাকে বললেন রাজা খুব সুন্দর মন্দির বানাচ্ছে এতে মূর্ত্তিও স্থাপিত করা দরকার। মূর্ত্তি বিনা মন্দির কিসের জন্য? এ আমার আদেশ। রাজা ইন্দ্রদমন হাত জোড় করে বললেন নাথজি, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়ে মন্দির বানাতে বলেছেন আর একথা বললেন যে এই মহলে না তো কোনো মূর্তি রাখবে। আর না তো পাখন্ডি পূজা করবে। রাজার কথা শুনে নাথজি বললেন, স্বপনও কখনও সত্য হয়? আমার আদেশ পালন কর, তথা চন্দনের কাঠ দিয়ে মূর্ত্তি অবশ্যই স্থাপিত করবে। এই কথা বলে কোন জলপান না করেই চলে গেলেন। রাজা ভয়ে চন্দনের কাঠ এনে কারিগর দ্বারা মূর্ত্তি বানানোর আদেশ দিলেন। এক মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্থাপিত করার আদেশ শ্রীনাথজী দিয়েছিলেন। পরে অন্য গুরুরা ও আচার্য্যরা রাজাকে রায় দিলেন একেলা প্রভু কিভাবে থাকবেন? সেতো শ্রী বলরামের সাথে সব সময় থাকতেন। একজন বললেন তিনি তো আদরের বোন সুভদ্রাকেও খুব ভালবাসতেন, সে কেমন করে তার ভাই বিনা থাকতে পারে? পরে তিন মূর্ত্তি বানানো নির্ণয় নেওয়া হল। তিন কারিগর নিযুক্ত করা হল মূর্ত্তি তৈরী হয়ে যাওয়া মাত্রই টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই রকম তিন বা খন্ড খন্ড হয়ে গিয়েছিল। রাজা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে, ভাবলেন আমার ভাগ্যে এই যশ বা পূণ্য নেই। মন্দির হয় এবং ভেঙে যায়, এখন আবার মূর্তিও টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। নাথজি তো রাগ করে চলে গিয়েছেন, যদি বলি যে কি মূর্ত্তি ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে বলবেন, রাজা বাহানা করছে, তাহলে কিনা আমাকে অভিশাপ দেয়। চিন্তা গ্রস্থে রাজা না তো ঠিক করে খায়, না ঘুমাতে পারে। সকালে ক্লান্ত হয়ে রাজসভায় গিয়েছেন। ওই সময় পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর প্রভু এক আশি বছরের বৃদ্ধ কারিগর সেজে রাজ দরবারে গিয়েছেন। কোমরে এক ব্যাগ ছিল, তার ভিতরে করাতের কিছু অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল, তার মানে বলার দরকার পড়বে না থলিতে করাত দেখতে পেলেই সবাই বুঝবে, এ ব্যক্তি মিস্ত্রি (কারিগর) আরও যন্ত্রপাতি তাতে ছিল ভরা। কারিগর বেশে প্রভু রাজাকে বললেন, শুনেছি মন্দিরের



পরমেশ্বর কবীর সাহেব দ্বারা জগন্নাথ মন্দিরকে সমুদ্রদেবের ভাঙার হাত থেকে রক্ষা

মূর্ত্তি নাকি বার বার ভেঙে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ হচ্ছে না। আমার ৮০ বৎসর বয়স তবে ৬০ বৎসরের মূর্ত্তি বানানোর অনুভব আছে চন্দনের কাঠের মূর্ত্তি সব কারিগর বানাতে পারে না, যদি আপনার আজ্ঞা হয় তো সেবক উপস্থিত আছে। রাজা বললেন, কারিগর আপনি আমার জন্য ভগবানই কারিগর হয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে। আমি খুব চিন্তিত ছিলাম, ভাবছিলাম কোন অনুভবি কারিগর পেলে, সমস্যার সমাধান হত। আপনি শীঘ্রই মূর্ত্তি বানান, বৃদ্ধ কারিগর রূপে আসা কবির্দেব (কবীর প্রভু) বললেন রাজন, আমাকে একটা কামরা (রুম) দেও, যেখানে বসে আমি প্রভুর মূর্ত্তি তৈরী করতে পারব। আমি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে সচ্ছভাবে মূর্ত্তি বানাবো। এ মূর্ত্তি যখন তৈরী হয়ে যাবে তখনই দরজা খুলব। যদি মাঝখানে কেউ এসে খুলে দেয়, তাহলে যতটা বানানো হবে ততটাই মূর্ত্তি হয়ে থাকবে। রাজা বললেন যেমন আপনার উচিৎ মনে হয় তেমনই করেন।

বারোদিন মূর্ত্তি বানাতে হয়ে গেছে, একদিন নাথজি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্রদমন, মূর্ত্তি তৈরী হয়ে গিয়েছে? রাজা দুই হাত জোড় করে বললেন, আপনার আজ্ঞার পূর্ণ পালন করা হয়েছিল মহাত্মাজি। পরন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে কি মূর্ত্তি বানানো হচ্ছে না, অর্ধেক বানাতে বানাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, চাকরের দ্বারা সেই টুকরোগুলো এনে নাথ মহাত্মাকে দেখানো হল। নাথজি বললেন মূর্ত্তি অবশ্যই বানাতে হবে। এখন বানাও দেখি মূর্ত্তি কি করে ভাঙে? রাজা বললেন মহাত্মাজি প্রয়ন্ত্য করা হচ্ছে। প্রভুর পাঠানো এক ৮০ (আশি) বৎসরের বৃদ্ধ কারিগর বন্ধ ঘরে মূর্ত্তি বানাচ্ছেন তিনি বললেন মূর্ত্তি তৈরী হলেই আমি দরজা খুলে দেব। যদি মাঝখানে কেউ দরজা খোলেন, তাহলে যেমন মানে যত পর্যন্ত্য তৈরী হওয়া ঠিক তত পর্যন্ত্যই থেকে যাবে। আজ তার মূর্ত্তি বানাতেবারো দিন হয়ে গিয়েছে। না তো বাইরে বেরিয়েছেন না তো কোনদিন জলপান আহার করেছেন। নাথজি বললেন মূর্ত্তি দেখার দরকার কেমন বানিয়েছে? বানানো হয়ে গেলে আর কি দেখার আছে। ঠিক যদি বানানো না হয়, তো ঠিক বানাবে। এই কথা বলে নাথজি রাজাকে নিয়ে যে ঘরে মূর্ত্তি বানাচ্ছেন, সেই কামড়ার (রুমের) সামনে গিয়ে আওয়াজ দিচ্ছেন, করিগর দরজা খোলো। কয়েকবার বলার পর দরজা খোলেনি কিন্তু ভিতর থেকে খট্ খট্ আওয়াজ বাইরে শোনা যাচ্ছিল, সেটাও এবার বন্ধ হয়ে গেল। নাথজি বললেন, ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ বারোদিন খাবার খাতিনি। এখন আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল, মরে তো যাতিনি ? ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে ফেলেছে, দেখা যাচ্ছে তিন মূর্ত্তি রয়েছে, তিনজনের হাত পায়ের পাতা বানানো হয়নি আর কারিগর অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছেন।

মন্দির (মহল) বানানো হয়ে গিয়েছে, আর কোন উপায় না দেখে, নিজের জিদের কারণে নাথজি বললেন, এইরকম মূর্ত্তিই স্থাপিত করে দাও, হতে পারে প্রভুর এই ইচ্ছা ছিল, মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণই এই মূর্ত্তি বানিয়ে চলে গিয়েছেন।

মুখ্য পান্ডে শুভ মুহুর্ত বের করে পরের দিন মূর্ত্তি স্থাপনা করে দিয়েছে। সমস্ত পান্ডে, রাজা, সৈনিক ও শ্রদ্ধালুরা মূর্ত্তিতে প্রাণ স্থাপনা করার জন্য রওনা দিয়েছে। পূর্ণ পরমেশ্বর কবির্দেব (কবীর সাহেব) এক শুদ্রের রূপ ধারণ করে, মন্দিরের মুখ্য দ্বারের মাঝখানে, মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। এই রকম লীলা করছেন, যেন কি তার জ্ঞানই নেই যে কি, পিছনে প্রভুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেনারা আসছে। আগে আগে মুখ্য পান্ডা চলছে, পরমেশ্বর তাও দরজার

মধ্যখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে এসে মুখ্য পান্ডে শুদ্র রূপের পরমেশ্বরকে ধাক্কা মারতেই দূরে ছিটকে পড়ে গিয়ে একান্ত স্থানে শুদ্র রূপী পরমেশ্বর লীলা করতে বসেছেন, রাজা সহিত সমস্ত শ্রদ্ধালুরা মন্দিরে গিয়ে দেখে। তিন মূর্ত্তিই ওই দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকার মত শুদ্রের রূপ ধরে রয়েছে। এই কৌতুককে দেখে উপস্থিত ব্যক্তি অচম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। মুখ্য পান্ডা বলছেন প্রভু ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছেন, কেননা মুখ্য দরজাকে ওই শুদ্র অশুদ্ধ করে দিয়েছে। এই জন্য সমস্ত মুর্ত্তি শুদ্র রূপ ধরেছে। বড় অনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে, কিছু সময় পরে মূর্ত্তি শুদ্র রূপ ছেড়ে বাস্তবিক রূপ নিয়েছেন। গঙ্গা জলে কয়েকবার ছিটাছাটা দিয়ে শুদ্ধ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। কবির্দেব বললেন, অজ্ঞানতা ও পাখন্ডি বাজের চরম সীমা দেখো। কারিগররা মূর্ত্তির ভগবান করেন, ফির পূজারীরা বা অন্য সন্ত মহন্তরা তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন বা প্রভুর নাকি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে নাকি ওই কাঠের মুর্ত্তি বা মাটির বা পাথরের মুর্ত্তি নাকি সিদ্ধ হয়, বাহঃ রে বাহঃ পাখন্ডীরা খুব মুর্খ বানাচ্ছ এই সরল আত্মাদেরকে।

ওই মন্দিরে মুর্ত্তি স্থাপনা হওয়ার কিছুদিন পরে কমপক্ষে ৪০ফুট উঁচু সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে যাকে সমুদ্রের তুফান বলা হয়, তথা খুব দ্রুতবেগে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে। সামনে ওই রাজার কারিগর দিয়ে বানানো পাথরের সিলাপে সমুদ্রের সামনে পরমেশ্বর কবীর বসে আছেন। নিজের এক হাত উঠালেন, যেমন আশির্বাদ দেওয়া হয়। সমুদ্রের ৪০ ফুট ঢেউ ওই ভাবেই পাহাড়ের মত উঁচু হয়েই রইল, আগে বাড়তে পারল না। সাধু রূপ ধরে সাগর (সমুদ্রদেব) সিলাপের উপর বসা প্রভুর সামনে হাত জোড় করে বললেন, ভগবান আপনি আমায় রাস্তা দেন, আমি মন্দির ভেঙে দেব। ভগবান কবির্দেব বললেন, এ মন্দির নয়, এতো মহল (আশ্রম)। এখানে বিদ্যান পুরুষ থাকবেন এবং পবিত্র গীতার জ্ঞান দেবেন। আপনি একে বিধংস করবেন এ শোভা দেয় না। সমুদ্র বলল, আমি একে অবশ্যই ভাঙব, প্রভু কবীর সাহেব বললেন ভাঙুন কে মানা করছে? সমুদ্র বললেন আমি বিবশ হয়ে গিয়েছি, আপনার শক্তি অপরাম্পর, প্রভু আমাকে রাস্তা দিন। কবীর পরমেশ্বর বললেন, আপনি কেন এমণ করে ভেঙে দিচ্ছেন? সাধু রূপী সমুদ্র বললেন, এই শ্রীকৃষ্ণ ত্রেতা যুগে রাম হয়ে এসেছিল, এ আমাকে অগ্নিবান দিয়ে ভস্ম করে দেবে ভেবেছিল, এবং অনেক খারাপ ব্যবহার করেছিল। আমাকে অপমানিত করেছিল তাই সেই প্রতিশোধ নিতে চাই।

পরমেশ্বর কবীর বললেন বদলা (প্রতিশোধ) তো আপনি নিয়েছেন, আগেই আপনি দ্বারকা ডুবিয়ে রেখেছেন। সমুদ্র বললেন এখনও সম্পূর্ণ ডুবাতে পারিনি। অর্ধেক বাকী রয়েছে, সেও কোনও প্রবল শক্তি যুক্ত সন্ত সামনে এসে গিয়েছিলেন দ্বারকাকে আমি পূর্ণ রূপে পারিনি। এখনও চেষ্টা করছি ওদিক যেতে পারছি না, ওদিকে থেকে কেউ বেঁধে রেখেছে। তখন পরমেশ্বর বললেন ওখানেও আমি পৌঁছেছিলাম। আমিই ওই অবশেষ বাঁচিয়েছি এখন যা ওই শেষ বাঁচাকে খেয়ে ফেল, কিন্তু ওই স্মৃতিকে ছেড়ে দিস্, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম সংস্কার করা হয়েছিল (শ্রী কৃষ্ণের অন্তিম সংস্কার স্থলের উপর বড় মন্দির বানিয়ে দিয়েছে। এ স্মৃতি প্রমাণ হয়ে থাকবে যে কি, বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণর মৃত্যু হয়েছিল অতএব পঞ্চ ভৌতিক শরীর রেখে গিয়েছে। নয়তো সামনের দিনে আসা ব্যক্তিরা ভাববে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুই হয়নি)। সমুদ্র কবীর পরমেশ্বরের কাছ থেকে আজ্ঞা পেয়ে শেষ দ্বারকাও ডুবিয়ে নিয়েছিল। পরমেশ্বর কবীর সাহেব বললেন, এখন আগে কোনদিনও

এই জগন্নাথ মন্দিরকে ভাঙার চেষ্টা করবেনা। এই আশ্রম (মহল) থেকে দূরে যাও। এই আজ্ঞাকে প্রভুর মেনে প্রণাম করে, মন্দির থেকে কমপক্ষে দেড় কিলোমিটার দূরে পিছিয়ে গেল। এইভাবে শ্রী জগন্নাথ ধাম স্থাপিত হয়।

।। শ্রী জগন্নাথ ধামে ছুয়াছুত আগে থেকেই ছিল না।।

কয়েকদিন পশ্চাৎ যে পান্ডা প্রভু কবির পরমেশ্বরকে (শুদ্র রূপীকে) ধাক্কা মেরেছিল, তার কুষ্ঠ রোগ হয়। সর্ব প্রকার চিকিৎসা করার পরও সুস্থ হয় নি। কুষ্ঠ রোগের কষ্ট অধিক থেকে অধিক বাড়তেই চলেছে। সর্ব উপাসনা করেছে, শ্রী জগন্নাথের কাছে কেঁদে কেঁদে, কষ্ট নিবারণের জন্য প্রার্থনা করেছে, কিন্তু সবই নিষ্ফল, হয়। একদিন স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে বললেন পান্ডে, ওই সন্তের চরণ ধূয়ে চরণ অমৃত পান কর, যাকে তুই মন্দিরের মুখ্য দ্বারে ধাক্কা মেরেছিলি। তাহলে তার আশির্বাদে হয়তো তোর কুষ্ঠরোগ ঠিক হতে পারে। যদি তিনি তোকে হৃদয় দিয়ে ক্ষমা করে তবে, আর নয়তো হবে না। মৃত্যু সময় মানুষ কিনা করতে পারে?

ওই মুখ্য পান্ডা সকালে উঠে কিছু সহযোগী পান্ডাকে সঙ্গে নিয়ে ওই জায়গায় গেলেন, যেখানে কবীর পরমেশ্বর শুদ্র রূপে বিরাজমান ছিলেন। যেই ওই পান্ডা প্রভুর কাছে এসেছে, পরমেশ্বর উঠে হাঁটা দিলেন, আর বললেন হে পান্ডা আমার কাছে আসবে না, আমি অছুত, কেননা তুমি অপবিত্র হয়ে যাবে। পান্ডা কাছে যাচ্ছে, পরমেশ্বর দূরে সরে যাচ্ছেন। তখন পান্ডা ফুট ফুট করে কাঁদতে লাগল, আর বলল পরবরদিগার আমার দোষ আপনি ক্ষমা করে দিন। তখন দয়ালু প্রভু দাঁড়িয়ে পড়লেন, তখন পান্ডা এক সচ্ছ বস্ত্র মাটিতে বিছিয়ে প্রভুকে বসতে প্রার্থনা করলেন। প্রভু ওই বস্ত্রে বসে গেলেন, আর পান্ডে স্বয়ং চরণ ধূয়ে চরণামৃতকে এক পাত্রে ঢাললেন। প্রভু বললেন পান্ডে চল্লিশ দিন পর্যন্ত্য এই জল, এবং স্নান করা জলে দুই এক ফোঁটা চরণামৃত ঢেলে ৪০ (চল্লিশ) দিন স্নান করতে থাকবে। চল্লিশ দিনে তোর কুষ্ঠ ঠিক হবে আর ভবিষ্যতে এই জগন্নাথ মন্দিরে কেউ যদি ছুয়াছুত করে, তারজন্যও তার দন্ত ভুগতে হবে। সর্ব উপস্থিত ব্যক্তিরা বচন করেছে যে কি, আজ থেকে এরপরে কাহারও এই মন্দিরে ছোঁয়াছুত করা হবে না।

বিচার করুন ঃ- হিন্দুস্থানে একমাত্র এই এক মন্দির যেখানে প্রথম থেকেই ছোঁয়াছুত নেই। আমি এই দাসকেও ওইস্থান দেখার অবসর প্রাপ্ত হয়েছে। কিছু সেবকের সাথে ওই স্থানে দেখতে গিয়েছিলাম কারণ কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত করব বলে। সেখানে সর্ব প্রমাণ আজও আছে। যে পাথরের সিলাপে বসে কবীর পরমেশ্বর মন্দির বাঁচানোর জন্য বিরাজমান ছিলেন। তার উপর এক স্মৃতি চিহ্ন রাখার জন্য গুম্বজ বানিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানে অনেক পুরানো পরম্পরার মহন্তর এক আশ্রমও বিদ্যমান আছে। ওখানের এক ৭০/৭২ বৎসরের বৃদ্ধ মহন্তর কাছ থেকে উপরোক্ত মন্দিরের সমুদ্র থেকে রক্ষার বিবরণ চাওয়া হল তিনি তাই বলেছেন, যে কি আমার কয়েক বংশের লোক এখানে মহন্ত (রক্ষা করার ভারবহন) থেকে গিয়েছেন। এই জায়গায় শ্রী ধর্মদাস সাহেব ও তার পত্নী ভক্তিমতি আমনি দেবী ও শরীর ত্যাগ করেছেন। দুজনেরই সমাধি সাথে সাথে রয়েছে দেখেছি।

পরে আমরা শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে গেলাম। সেখানে মূর্ত্তি পূজা আজও নেই। কিন্তু প্রদর্শনী করা অবশ্য লেগে রয়েছে।

যে তিন মূর্ত্তি ভগবান শ্রী কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মন্দিরের ভিতরে স্থাপিত আছে, তাদের দুটো হাতেরই পাঞ্জা নেই, দুটো হাতই টুন্ডো। সেই মূর্ত্তিরও পূজা হয় না। কেবল দর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। ওখানকার এক গাইড পান্ডা থেকে জিজ্ঞাসা করলাম। এই মন্দির পাঁচ বার সমুদ্র ভেঙে দিয়েছিল এবং পাঁচ বার গড়ানো হয়েছে। সমুদ্র কেন ভেঙে ছিল? পরে কে সমুদ্রকে থামিয়ে রেখেছিল। পান্ডা বলল আমি এতকিছু বলতে পারব না। ঐ কৃপা জগন্নাথেরই ছিল , তিনিই হয়তো সমুদ্রকে থামিয়ে রেখেছিলেন, তবে শুনেছি তিনবার মন্দির ভেঙে ছিল। পরে আমি প্রশ্ন করলাম প্রথমবারই কেন সমুদ্রকে ঠেকাতে পারল না প্রভু? পান্ডা বলল এ সব জগন্নাথ প্রভুর লীলা।

আবার আমি প্রশ্ন করলাম এই মন্দিরে ছোঁয়াছুত আছে কি নেই? যখন থেকে মন্দির বানানো হয়েছে এই ছোঁয়াছুত ছিল না। মন্দিরে শুদ্র ও ব্রাহ্মণ (পান্ডা) এক থালাতে বা এক পাতায় খেতে পারে কোনো মানা নেই। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, পান্ডে জি, অন্য মন্দিরে তো খুব ছোঁয়াছুত ছিল, এতে কেন নেই? প্রভু তো তিনিই একমাত্র। পান্ডার উত্তর ছিল লীলা জগন্নাথের।

এখন পুন্যাত্মারা বিচার করেন সত্যকে কত দাবিয়ে রাখা যায়, এ লীলা জগন্নাথের কথা বলে। পবিত্র স্মৃতি আদরনীয় কিন্তু আত্মকল্যাণ তো কেবল পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদে বর্ণিত এব ং পরমেশ্বর কবীর দ্বারা দেওয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসার ভক্তি সাধনা করার পরেই সম্ভব হবে, আর নয়তো শাস্ত্র হলে মানব জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ মন্ত্র নং ২৩-২৪ তে শ্রী জগন্নাথের মন্দিরে প্রভুর আদেশ অনুসার পবিত্র গীতার জ্ঞানের মহিমার গুণগান হওয়াই শ্রেয়কর তথা যেমন শ্রীমদভাগবত গীতাতে ভক্তি বিধি আছে, ওই প্রকার সাধনা করলে পরেই আত্মকল্যাণ সম্ভব, আর নয়তো জগন্নাথের দর্শন মাত্র বা খীচুড়ী প্রসাদ খেলেই কোন লাভ নেই, কেননা এই ক্রিয়া পবিত্র গীতা তে বর্ণিত না হওয়াতে ইহা হল শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে অধ্যায় ১৬ মন্ত্র নং ২৩-২৪ -তে আছে।

।। স্বর্গের পরিভাষা আছে কি?।।

উদাহরণার্থে স্বর্গকে এক হোটেল (রেষ্টুরেন্ট) জানবে। যেমন কোন ধনী ব্যক্তি গরমের সময় সিমলা বা কুল্লু মনালীর মত শহরে ঠান্ডা স্থানে গিয়েছেন এবং সেখানে কোনো এক হোটেল ভাড়া নিয়েছেন। সেখানে রুম ভাড়া ও খাওয়ার খরচ দিতেই হয়। দুইমাস বা তিন মাস থেকে ২০/৩০ হাজার টাকা খরচ করে নিজের কর্ম ক্ষেত্রে আসতে হয়। আবার দশ বারো মাস মজদুরী করো। এই ভাবে আনন্দ নেওয়ার জন্য দশ মাস এক বছর আয় করা পয়সা দিয়ে, দুই মাস সিমলা কাশ্মিরের মত স্থানে গিয়ে পূঁজি শেষ করে, ঘুরে আবার কামাই করার জন্য আসতে হয়।

যদি কোনো বছর ভাল কামাই না হয় তাহলে, ঐ বছর ঘোরা হয় না, অফসোস করে থাকতে হয়। ঠিক ওই প্রকার স্বর্গকে মনে করবে। এই পৃথিবী লোকে সাধনা করে, কিছু সময়ের জন্য স্বর্গরূপী হোটেলে গিয়ে থাকে। পরে নিজের পুন্য কামাই (পুঁজি) খরচ করে আবার নরক তথা চুরাশী লাখ প্রাণীর শরীরে পাপের কর্মফলের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়।

যতদিন তত্ত্বদর্শী সন্ত না মিলবে, ততদিন উপরোক্ত জন্ম মৃত্যু তথা স্বর্গ নরক এবং চুরাশী

লাখ যোনীর কষ্ট লেগেই থাকবে। কেবল পূর্ণ পরমাত্মার সতনাম ও সারনামই পাপকে নাশ করবে। অন্য দেব/দেবতা/প্রভুদের পূজাতে পাপ নষ্ট হয় না। যেমন কর্ম তেমনই কর্মের ফল পেতেই থাকবে।

এই জন্য গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১৬ তে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মলোক (মহাস্বর্গ) পর্যন্ত সর্বলোক নাশবান (একদিন না একদিন নাশ হবেই)। যখন স্বর্গ মহাস্বর্গই থাকবে না, সেদিন সাধকের কোথায় ঠিকানা (স্থান) হবে, কৃপা করে বিচার করবেন।

প্রশ্ন ঃ- তবে গীতা পাঠ নিত্য করলে কি কোনো লাভ নেই ? যে দান করে, যেমন কুকুরকে রুটি খাওয়ানো, অনাহারীকে খেতে দেওয়া, পিঁপড়েকে আটা খাওয়ানো, তীর্থে ভান্ডারা করে যাত্রীদের খাওয়ানো সেবা করা, এসব কি ব্যর্থ ?

উত্তর ঃ- ধার্মিক সদ্‌গ্রন্থের পঠন-পাঠনের দ্বারা জ্ঞান যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। যজ্ঞ করা ফল কিছু স্বর্গ বা যে উদ্দেশ্যে করেছ তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু মোক্ষ লাভ পাওয়া যায় না। নিত্য পাঠ করার মুখ্য কারণ এই হয় যে কি সদ্‌গ্রন্থে যে সাধনা করার নির্দেশ আছে এবং যা না করার নির্দেশ আছে, তার স্মৃতি তাজা রাখে। কোনদিন কোন ভুল না হয়ে যায়, যাতে আমি বাস্তবিক উদ্দেশ্য ত্যাগ করে, গাফিলতি হয়ে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামত আচরণ (পূজা) না করতে থাকি তথা মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যর স্মৃতি থেকে যায় যে কি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য আত্মকল্যাণ, শাস্ত্র অনুসার সাধনা দ্বারাই সম্ভব হবে।

যেমন এক জমিদারের বৃদ্ধাবস্থায় এক পুত্র হয়। জমিদার কিষাণ ভাবছে, যতদিন পর্যন্ত্য না বাচ্চা যুবক হবে, নিজের ক্ষেতী বাড়ি সামলাবার যোগ্য হবে, তার আগে কেননা আমার মৃত্যু না হয়ে যায়, তাই সে তার নিজের অনুভব লিখে রেখেছে। আর পুত্রকে বলছে পুত্র যখন তুই যুবক হবি, তখন তোর ক্ষেতী বাড়ির কার্য বোঝার জন্য এই আমার অনুভব লেখার কাগজ প্রত্যেকদিন পড়বি আর কৃষিকার্য্য করবি। পিতা মারা গেলে পরে প্রত্যেকদিন ওই ছেলে তার পিতার লেখা কাগজ রোজ পড়ত। কিন্তু তাতে যা লেখা ছিল, সে ধরনের কাজ কোনদিন করত না। ওই জমিদারের পুত্র কি ধনী হতে পারবে ? কোনদিন না, তার সে রকমই করা উচিৎ যেমন কাগজে লেখা আছে।

ঠিক ওই প্রকার পবিত্র গীতা নিত্য পাঠতো শ্রদ্ধালু সাধনা সদ্‌গ্রন্থের বিপরীত করছে তাহাতে তার কোন লাভ হবে না। এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩-২৪ অনুসার ব্যর্থ সাধনা।

যেমন তিনগুণ (রজগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু, তমগুণ-শিব)-এর পূজা গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫ এবং ২০ থেকে ২৩ তে মানা আছে এবং শ্রাদ্ধ করা অর্থাৎ পিতর পূজা, পিন্ড দেওয়া মরার অস্থি উঠানো, পরে গঙ্গায় ক্রিয়া করে ভাসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি মানা। গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক নং ২৫ তে আছে। ব্রত রাখা গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১৬তে মানা আছে। লেখা আছে হে অর্জুন ! যোগ (ভক্তি) না তো উপবাস ব্যক্তির (ব্রত রাখা ব্যক্তির সংকেত) কোনো কিছু সিদ্ধ হয় অতএব ব্রত রাখা ব্যক্তির ব্রত রাখতে মানা।

ক্ষুদার্ত ব্যক্তিকে খেতে দেওয়া, কুকুর জীব জন্তুকে খাবার দেওয়া এসব খারাপ নয়, তবে পূর্ণ সন্তের মাধ্যমে তাহার আজ্ঞা অনুসারে দান বা যজ্ঞ আদি করাই পূর্ণ লাভদায়ক হয়।

যেমন এক কুকুর গাড়ীর ভিতর মালিকের সীটে বসে যাত্রা করে থাকে, কুকুরের ড্রাইভার মানুষই হয়ে থাকে, ওই পশু সাধারণ মানুষ থেকেও অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আলাদা রুম, পাখা বা কুলার/এয়ার কন্ডিশন্ ইত্যাদি সুবিধা। যখন ওই অবুঝ প্রাণী মানব শরীরে ছিল, দানও করেছিল কিন্তু মনমানী (পূজা) আচরণের মাধ্যমে করেছিল। শাস্ত্রবিধির বিপরীত সাধনা করাতে লাভদায়ক হয়নি, প্রভুর বিধান যেমন কর্ম প্রাণী করবে তার ফল অবশ্যই পাবে। এই বিধান তত সময় পর্যন্ত্য চালু থাকবে যতক্ষণ না তত্ত্বদর্শী সন্তের দ্বারা পূর্ণ পরমাত্মার সঠিক মার্গ না পাবে।

যেমন কর্ম প্রাণী করে তেমনই ফল সে পেয়ে থাকে। ওই বিদ্যানের অনুসার সে তীর্থ বা ধামেতে তথা অন্য স্থানে ভান্ডারা করে এবং কুকুর গাই বা অন্য পশুআদিকে রুটি দেওয়া কর্ম আধারে কুকুরের যোনিতে চলে গিয়েছে। সেখানেও তার নিজের করা কর্ম পেয়েছে। কুকুরের জীবনে নিজের পূর্ব জন্মের শুভ কর্মর কামাই সমাপ্ত করে পরে গাধার যোনীতে চলে যাবে। ওই গাধার জীবনে সব সুবিধা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। সারাদিন মাটি, কাঁচা পাকা ইট বয়ে বেড়াবে। পরে অন্য অন্য যোনীতে কষ্ট ভোগ তথা নরক ভুগতে হবে। চুরাশী লাখ যোনীর কষ্ট ভুগে পরে মানব শরীর হবে। আবার কখন মানুষ জনমে ভক্তি করতে পারবে কিনা, কেননা যারা তীর্থ ভ্রমণে চলতে চলতে যায়, তাদের পায়ের তলায় না জানি, কত ছোট ছোট পোকা মাকড় দাবিয়ে মারা যায়, সে পাপও তার ভোগ করতে হয়। যত পর্যন্ত্য না পূর্ণ সন্ত থেকে পূর্ণ পরমাত্মার সত সাধনার কথা না জানতে পারবে, ততদিন পাপের নাশ (ক্ষমা) হতে পারবে না। কেননা, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ, ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ/কাল/ জ্যোতিনিরঞ্জন) তথা পরব্রহ্ম(অক্ষর পুরুষ) এর সাধনাতে পাপ নাশ (ক্ষমা) হবে না, পাপ ও পূন্য দুটোর ফল ভোগ করতে হয়। যদি সেই প্রাণী গীতা জ্ঞান অনুসার পূর্ণ সন্তের শরন প্রাপ্ত করে, পূর্ণ পরমাত্মার সাধনা করে তবে কিংবা সতলোকে গিয়ে থাকেন আর সাধনা অপূর্ণ থাকলে সে দ্বিতীয় বার মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত করেন। পূর্ব পুণ্যের আধারে যদি আবার কোনো সন্ত ভাগ্যে মিলে যায়, সে প্রাণী পরে শুভ কর্ম করে পাড় হয়ে যেতে পারবে।

এই জন্য উপরোক্ত মনমানী আচরণ (পূজা/ব্রত ইত্যাদি) লাভ দায়ক নয়।

প্রশ্ন ঃ- গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক নং ৩৫ এবং গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৪৭-তে বলা হয়েছে যে, ভাল প্রকার আচরণে নিয়ে আসা অন্য ধর্মের থেকে গুণ রহিত নিজের ধর্ম অতি উত্তম। নিজের ধর্মে মরাও কল্যাণ কারক অন্য ধর্ম ভয়াবহ দিয়ে থাকে। এতে সিদ্ধ হয়, যে যেমন পূজা করে, সেটা ত্যাগ করতে নেই নিজের ধর্মে মরাও ভাল বা কল্যাণ কারক।

উত্তর ঃ- যদি গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক নং ৩৫ ও গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৪৭-এর অর্থ এই যে কি, যে যেমন পূজা করে করতে থাকো তাকে ত্যাগ করো না তাহলে পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার জ্ঞানের কি আবশ্যকতা ছিল ? এক শ্লোক অনেক ছিল, শ্রী গীতার এই শ্লোকের ভাবার্থ ঠিক আছে, কিন্তু অনুবাদ কর্ত্তারা বিপরীতার্থ করে দিয়েছে। কৃপা করে নীম্নে পড়ুন উপরোক্ত দুটো শ্লোকেরই বাস্তবিক অর্থ —

।। গীতা অধ্যায় ৩-এর শ্লোক নং ৩৫।।

শ্রেয়ান্, স্বধর্মঃ, বিগুণঃ, পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাৎ,
স্বধর্মে, নিধনম্, শ্রেয়ঃ, পরধর্মঃ, ভয়াবহঃ।।৩৫।।

অনুবাদ ঃ- (বিগুণঃ) গুণরহিত অর্থাৎ শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে (স্বনুষ্ঠিতাৎ) স্বয়ং ইচ্ছামত ভালো প্রকার আচরণ করা (পরধর্মাৎ) অন্য কোনো ধার্মিক পূজা থেকে (স্বধর্মঃ) নিজের শাস্ত্রবিধি অনুসার পূজা হল (শ্রেয়ান্) অতি উত্তম। শাস্ত্রানুকুল (স্বধর্মে) নিজের পূজাতে তো (নিধনম্) মরাও (শ্রেয়ঃ) কল্যাণকারক আর (পরধর্ম) অন্যের পূজা (ভয়াবহঃ) ভয়ের কারণ বা ভয়ানক।

।। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৪৭।।

শ্রেয়ান্, স্বধর্ম, বিগুণঃ, পরধর্মাৎ, স্বনুষ্ঠিতাৎ,
স্বভাবনিয়তম্, কর্ম, কুর্বন্, ন, অপ্নেতি, কিল্বিষম্।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ- (বিগুণঃ) গুণহীন (স্বনুষ্ঠিতাৎ) স্বয়ং ইচ্ছামত আচরণ শাস্ত্রবিধি ছাড়া ভাল প্রকার আচরণ করা হলেও (পরধর্মাৎ) অন্যের ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক পূজা থেকে (স্বধর্মঃ) নিজের ধর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসার ধার্মিক পূজা (শ্রেয়ান্) শ্রেষ্ঠ আছে(স্বভাব নিয়তম্) স্বয়ংই নিজের স্বভাব অনুসার ইচ্ছামত আচরণ দ্বারা (কর্ম) ভক্তি কর্ম (ন) না (কুর্বেন) করো (কিল্বিষম্) যাতে পাপের (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয়। বিশেষঃ-এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৭ তে শ্লোক নং ১ থেকে ৬-তে স্পষ্ট আছে।

উপরোক্ত শ্লোকে স্পষ্ট আছে যে, নিজের শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা শ্রেষ্ঠ। অন্য ধর্মের সাধনা যতই চমক ধমক হোক না কেন, তাহা হানিকারক। দেবী মাতাকে জাগরণ করা সুরীলি আবাজ গান গেয়ে স্তুতি, কবিতা দ্বারা পুরো সাজিয়ে বাজিয়ে করুক না কেন, ওই (স্বনুষ্ঠিতাৎ) স্বয়ং নির্মিত শাস্ত্রবিধি ছাড়া সাধনাতে আকৃষ্ট হয়ে, নিজের শাস্ত্র অনুকুল সাধনা ত্যাগ করতে নেই। যদি কোনো সাধক সৎসাধনা করে থাকে তো, সে পূর্ব শাস্ত্রবিরুদ্ধ পূজা ত্যাগ দিয়ে থাকে, যেমন পিতরপূজা, মন্দিরে গিয়ে পূজা ইত্যাদি। তখন অন্য শাস্ত্র বিধি অনুসার সাধনা করা ব্যক্তি বলে, তুমি সব পূজা ত্যাগ করে দিয়েছো। তাই সব দেবতা রুষ্ট হয়ে যাবে। একজন এই রকম করেছিল তাই তার একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে। এইভাবে অন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা ভয়ই জন্ম দেয়, কিন্তু নিজের শাস্ত্র অনুকূল সাধনা অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত্য করতে থাকা কল্যাণকারক।

প্রশ্ন ঃ- আমি গীতা অধ্যায় ৬শ্লোক নং ১০ থেকে ১৫তে বর্ণিত বিধি অনুসার এক আসনে বসে মাথা আদি অঙ্গকে সম করে ধ্যান করি, একাদশীরও পালন করি এভাবে শান্তি প্রাপ্ত করতে পারব?

উত্তর ঃ- কৃপা করে আপনি গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১৬-তে পড়ুন, যাতে লেখা আছে, হে অর্জুন এ যোগ (সাধনা) না তো অধিক ভোজন করনেবালা, না একান্ত অনাহারী, (ব্রত রাখনেবালা)-র সিদ্ধ হয় না অতি নিদ্রাবালা, না অতি জাগরণ বালা ব্যক্তির সমাধী হয় না। আবার এক স্থানে বসে সাধনা কারীর ও সিদ্ধ হয় না। গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১০থেকে ১৫ পর্যন্ত্য বর্ণিত বিধির খন্ডন গীতা অধ্যায় ৩-এর শ্লোক নং ৫ থেকে ৯ করে দিয়েছে, যে মূর্খ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম ইন্দ্রিয়কে হঠ্পূর্বক থামিয়ে অর্থাৎ এক স্থানে বসে চিন্তন করে তাকে পাখন্ডী বলা হয়। এই জন্য কর্মযোগী (কার্য্য করতে করতে সাধনা করা সাধক)-ই শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক ভক্তিবিধির জন্য গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু (ব্রহ্ম) কোন তত্ত্বদর্শীর খোঁজ করতে বলেছে(গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪) এতে

সিদ্ধ হয় যে গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম) দ্বারা বলা ভক্তিবিধি সম্পূর্ণ নয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত্য ব্রহ্ম (ক্ষরপুরুষ/কাল)-এর নিজের সাধনার বর্ণনা করা আছে এবং তার সাধনাতে হওয়া শান্তিকে অতি অশ্রেষ্ঠ বা খারাপ (অনুত্তমাম্) গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ -তে বলেছে উপরোক্ত অধ্যায়ে ৬ শ্লোক নং ১০থেকে ১৫ পর্যন্ত তে বলেছে যে, মন ও ইন্দ্রিয়কে বশ করে রাখা সাধক এক বিশেষ আসন তৈরী করবে, সেটা যেন না উঁচু এবং না নীচু হয়, ওই আসনে বসে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে মনকে একাগ্রতা করে অভ্যাস করবে। সোজা বসে ব্রহ্ম চর্য্য পালন করা মনকে স্থির করলে প্রয়াণ হবে। এই প্রকার সাধনাতে লাগা সাধক আমাতে থাকা (নির্বান পরমাম্) অতি বে জান অর্থাৎ একদম মরার মত (নাম মাত্র) শান্তিকে প্রাপ্ত হয়। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ তে নিজের সাধনাতে হওয়া গতি (লাভ) কে অতি খারাপ/অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তমাম্) বলেছে। এই গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২ তথা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ তে বলেছে যে, হে অর্জুন ! তোর পরম শান্তি তথা সতলোক প্রাপ্ত হবে, ফির পুনরজনম হবে না, পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে যায়। আমি (গীতা জ্ঞান দাতা)-ও ওই আদি নারায়ণ পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি, এইজন্য দৃঢ় নিশ্চয় করে তার সাধনা ও পূজা করতে হয়।

নিজের সাধনার চালাকী বাজী যুক্ত জ্ঞানের আধারের উপর পর বলা মার্গকে গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ৪৭-তেও স্বয়ং (যুক্ততমঃ মতঃ) অর্থাৎ অজ্ঞান অন্ধকারের মত বিচার বলেছে। অন্য অনুবাদ কর্ত্তারাও "আমি" মে যুক্ততমঃ মতঃ-র অর্থ "পরম শ্রেষ্ঠ মান্য আছে, করে দিয়েছে, তবে করা উচিৎ ছিল যে, এ আমার অটকল প্যাচ লাগানো অজ্ঞান অন্ধকারের আধারের পর দিয়া মত। কেননা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ে কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে জানাতে বলেছে, (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪-তে) বাস্তবিক অনুবাদ গীতা অধ্যায়।

।। গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ৪৭।।

যোগীনাম্, অপি, সর্বেষাম্, মদ্গতেন, অন্তরাত্মনা,
শ্রদ্ধাবান, ভজতে, যঃ মাম্, সঃ মে, যুক্ততমঃ মতঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ ঃ- আমার দ্বারা দেওয়া যে ভক্তি বিচার যা অটকল (প্যাচ্) লাগানো আছে শ্লোক নং ১০ থেকে ১৫ তে বর্ণিত পূজা যা আমি অনুমান করে বলেছি, পূর্ণ জ্ঞান নয় কেননা (সর্বেষাম্) সর্ব (যোগীনাম্ সাধকদের মধ্যে (যঃ) যে (শ্রদ্ধাবান্) পূর্ণ বিশ্বাস রেখে (অন্তরাত্মনা) সত্য নিষ্ঠাভাবে (মদ্গতেন)আমার দ্বারা দেওয়া ভক্তি মত অনুসার (মাম্) আমায় (ভজতে) ভজনা করে (সঃ) সে (অপিঃ) ও (যুক্ততমঃ) অজ্ঞান অন্ধকার জন্ম জন্ম মরণ স্বর্গ নরক বালা সাধনাতে লীন আছে। এ (মে) আমার (মতঃ) বিচার আছে।

এই প্রমাণ, পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ তথা অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ২৯ তথা গীতা ৬ শ্লোক নং ১৫-তে স্পষ্ট আছে। সেইজন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২ তে বলেছে যে, হে ভারত! তুই সর্ব ভাব দিয়ে ওই পরমাত্মার শরণে যা, তার কৃপাতেই তুই পরম শান্তিকে তথা পরমধাম অর্থাৎ সতলোককে প্রাপ্ত হবি। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ তে বলেছে, যখন তোকে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ বর্ণিত তত্ত্বদর্শী সন্ত মিলে যাবে তারপরে ওই পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিৎ। যেখানে গেলে সাধক আবার ফিরে ওই সংসারে আসে না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু

থেকে সদাকালের জন্য মুক্তি পেয়ে থাকে। যে পরমেশ্বর সংসার রূপী বৃক্ষকে বানিয়েছেন, আমিও ওই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি। তারই ভক্তি করা উচিৎ।

গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক নং ৫ থেকে ৯ এতে গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১০ থেকে ১৫-এর জ্ঞানকে ভুল সিদ্ধ করেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিল প্রভু, মনকে বশ করে রাখা খুব কঠিন, তার উত্তরে বললেন, অর্জুন! মনকে বশ করা অর্থাৎ বায়ুকে বশ করার মত সমান। পরে একথাও বললেন নিঃসন্দেহে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে ক্ষণ মাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। যে মহামূর্খ মনুষ্য তারা সমস্ত কর্ম ইন্দ্রিয়কে হঠপূর্বক উপর থেকে বন্ধ করে মনে কিছু না কিছু ভাবতে থাকে। সেইজন্য একস্থানে হঠযোগ করে না বসে, সাংসারিক কার্য্য করতে করতে (কর্মযোগ) সাধনা করাই শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করে অর্থাৎ হঠযোগ দ্বারা এক স্থানে বসে সাধনা করা অপেক্ষা কর্ম করতে করতে সাধনা করা শ্রেষ্ঠ। একস্থানে বসে সাধনা (অকর্মনা / করলে তোর শরীর নির্বাহ কিভাবে হবে? শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাধনা (হঠযোগ এক স্থানে বসে) করলে কর্ম বন্ধনের কারণ হবে, দ্বিতীয় শাস্ত্র অনুকূল কর্ম করতে করতে সাধনা করাই শ্রেষ্ঠ। এইজন্য সংসারিক কার্য্য করতে করতেই সাধনা কর। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৭-তে বলেছে, যে যুদ্ধ ও কর, আমার স্মরণও কর। এইভাবে আমাকে পাবি। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ তথা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২ -তে বলেছে, পরন্তু আমার সাধনাতে হওয়া (গতি) লাভ অতি খারাপ (অনুত্তমাম্) অশ্রেষ্ঠ। এইজন্য ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা, যার কৃপাতে তুই পরমশান্তি তথা (শাশ্বতম্ স্থানম্) সতলোককে প্রাপ্ত হবি। ওই পরমেশ্বরের ভক্তিবিধি তথা পূর্ণ জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের । খোঁজ করে তাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি (গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম/ক্ষরপুরুষ) ও জানি না।

প্রশ্ন ঃ- গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৮-বলছে যে আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ আছি। এতে তো প্রসিদ্ধ হচ্ছে যে গীতা জ্ঞান দাতা প্রভুই সর্বশক্তিমান তথা গীতা অধ্যায় ১২ তে সম্পূর্ণ গীতা জ্ঞান দাতার মহিমা বলছেন।

উত্তর ঃ- গীতাতে, গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু, নিজের সাধনা বা নিজের সমর্থতা কতুটুকু সে কথা বলছে, সাথে সাথে আবার ও পূর্ণ পরমাত্মারও মহিমাও করছে তথা ওই পরমেশ্বরের সাধনা করার জন্য তত্ত্বদর্শী সন্তের দিকে সংকেতও করছে। গীতা অধ্যায় ১২ তে পুরো ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ/কাল) এর মহিমাতে পরিপূর্ণ আছে এবং গীতা অধ্যায় ১৩-তে সব ওই পূর্ণ পরমাত্মার অর্থাৎ আদি পুরুষ পরমেশ্বরের মহিমাতে পরিপূর্ণ আছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ তথা ১৬ থেকে ১৭-তে পূর্ণ পরমাত্মার, ব্রহ্মর ও পরব্রহ্মর আদির নির্ণয়জ্ঞান আছে।

শ্লোক নং ১৬ তে বলছে যে, পৃথিবীর তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত লোক (ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মান্ত এবং পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডপৃথিবী তত্ত্বদারা বানানোর কারণে এক লোকই বলা হয়) এক ক্ষরপুরুষ মানে ব্রহ্ম, দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ মানে পরব্রহ্ম। এই দুই প্রভুর অন্তর্গত যতগুলো প্রাণী আছে আর এই দুই প্রভুর স্থূল শরীর তো নাশবান তবে জীবাত্মাকে অবিনাশী বলা হয়েছে।

শ্লোক নং ১৭ তে বলা হয়েছে যে বাস্তবে পুরুষোত্তম অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর তো এই উপরোক্ত দুই প্রভু থেকে অন্য একজনই আছেন, যাকে পরমাত্মা বলা হয়। যিনি তিনলোকে প্রবেশ করে সবার ধারণ পোষণ করেন। তাকেই বাস্তবিক অবিনাশী পরমেশ্বর বলা হয়।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৮-তে গীতা জ্ঞান দাতা (ক্ষরপুরুষ/ব্রহ্ম) নিজের স্থিতি নিজেই বলছেন, যে কি, আমাকে তো লোকবেদ (দন্ত কথা) এতে আধার মাত্র পুরুষোত্তম বলে, কেননা আমি আমার একুশ ব্রহ্মাণ্ডের যত প্রাণী আমার অধীন আছে, সে যদি স্থুল শরীরে নাশবান হোক বা চাহে আত্মারূপে অবিনাশী, আমি ওদের থেকে উত্তম (শ্রেষ্ঠ) আছি। এই জন্য আমি লোকে ও বেদের আধারে পুরুষোত্তম প্রসিদ্ধ আছি। বাস্তবে পুরুষোত্তম তো অন্য কোন পরমেশ্বর আছেন, যা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭ তে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ- গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ২-তে এবং ৩-এতে বলছে, আমার উৎপত্তির খবর কেউ জানে না। যারা আমায় অনাদি অজন্মা তত্ত্ব দ্বারা জানে, তারা সর্ব পাপ থেকে মুক্তি পায়। এতে বোঝাচ্ছে স্পষ্ট যে ব্রহ্মের জন্ম হয় না তথা সর্ব পাপ নষ্ট করে দেন।

উত্তর ঃ- গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ২ আবার পড়ুন যাতে বলছে, আমার উৎপত্তি না দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আদি) তথা মহর্ষি জানে, কেননা তারা সব আমার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।

এই শ্লোকে স্বতঃসিদ্ধ যে গীতা জ্ঞান দাতা প্রভুর উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম তো হয়েছে তবে কাল (ব্রহ্ম) থেকে উৎপন্ন দেবতা হয়েছে এসব ঋষিরা জানে না যে এই দেবতারা কাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন পিতার জন্মের বিষয়ে সন্তানরা জানে না। তবে পিতার পিতা তার ঠাকুর দাদাই বলতে পারবে।

পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং কাল লোকে প্রকট হয়ে ব্রহ্মের উৎপত্তির বিষয়ে বলেছেন। কৃপা করে পড়ুন সৃষ্টি রচনা এই পুস্তক **"জ্ঞান গঙ্গার"** পৃষ্ঠা ২৫-৩১ পর্যন্ত্য।

গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ৩-এর অনুবাদ ভুল করেছে যেমন গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২ তথা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৫ -তে নিজে নিজেকেই নাশবান তথা জন্ম মৃত্যু বার বার প্রাপ্ত হয়েছে বলা আছে তথা গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১৭ তথা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ৩, ৮ থেকে ১০ ও ২০, গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪, ১৬, ১৭ তে অন্য কোনো অবিনাশী অনাদি পরমাত্মা বিষয়ে বলেছে।

তাই গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ৩-এতে বলছে যে মনুষ্যর মধ্যে বিদ্বান বা তত্ত্বদশী সন্ত আমায় তথা ওই অনাদি, বাস্তবে জন্ম ছাড়া, সর্ব লোকের মহেশ্বর বা পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানে। ওই তত্ত্বদর্শী সন্ত, সৎজ্ঞান উচ্চারণ করে, যাতে সৎসাধনা করে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪-তে আছে। কৃপা করে পড়ুন গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ৩-এতে যথার্থ অনুবাদ—

।। গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং-২।।

ন, মে, বিদুঃ, সুরগণা:, প্রভবম্, ন, মহর্ষয়;
অহম, আদিঃ, হি, দেবানাম্, মহর্ষিণাম, চ, সর্বশঃ।। ২।।

অনুবাদ ঃ- (মে) আমার (প্রভবম্) উৎপত্তিকে (ন) না (সুরগনাঃ) দেবতারা জানে আর (ন) না (মহর্ষয়ঃ) মহর্ষিগণও (বিদুঃ) জানে (হি/কেননা (অহম) আমি (সর্বশঃ) সব প্রকারে

(দেবানাম্) দেবতাদের (চ) আর (মহর্ষিনাম্) মহির্ষদেরও (আদিঃ) আদি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ আছি।

।। গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ৩।।

যঃ মাম্, অজম্, অনাদিম্, চ, বেত্তি, লোকমহেশ্বরম্,
অসম্মুঢ়ঃ, সঃ, মর্ত্যেষু, সর্বপাপৈঃ, প্রমুচ্যতে।।

অনুবাদ ঃ - (যঃ) যে বিদ্বান ব্যক্তি (মাম্) আমায় (চ) তথা (অনাদিম্) সদা থাকেন যিনি, অর্থাৎ অনাদি পুরাতন (অজম্) যার কোনদিন জন্ম হয় না (লোক মহেশ্বরম্) সর্ব লোকের মহান ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরমেশ্বরকে (বেত্তি) জানেন (সঃ) সে (মর্ত্যেষু) শাস্ত্রকে সঠিক জানেন অর্থাৎ বেদের অনুসার জ্ঞান যার আছে (অসম্মুঢ়ঃ) অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী বিদ্যান (সর্বপাপৈঃ) সম্পূর্ণ পাপঢ়ক (প্রমুচ্যতে) বিস্তৃত বর্ণের সাথে বলেন অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির জ্ঞান ও কর্মের সঠিক বর্ণন করেন অর্থাৎ অজ্ঞানকে পূর্ণ রূপে মুক্ত করে দেন। যার কারণ তত্ত্বদর্শী সন্তের দ্বারা বলা বাস্তবিক সাধনার আধারে ভক্তি করা ব্যক্তি সর্বপাপ নষ্ট হয়ে থাকে।

।। গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্মর (কালের) উৎপত্তি সংকেত।।

গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ২-এতে বলেছে যে, হে অর্জুন আমার উৎপত্তি (জন্ম)-কে না তো দেবতারা জানে না তো মহর্ষিজন জানে, কেননা তারা আমার দ্বারা উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ জন্ম হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে ব্রহ্মের (কালের) উৎপত্তি তো হয়েছে, সে তত্ত্ব দেবতা বা ঋষিরা জানে না। যেমন পিতার জন্ম পুত্র বলতে পারে না, ঠাকুরদাদাই বলতে পারে। এই প্রকার একুশ ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব দেবতাদের ও ঋষিদের আদি জ্যোতি নিরঞ্জন(ব্রহ্ম বা কাল) এবং প্রকৃতি (মায়া দূর্গা / অষ্টাঙ্গী) এর সংযোগে সবার উৎপত্তি হয়েছে। এই জন্য বলছে, আমার উৎপত্তি-কে একুশ ব্রহ্মাণ্ডের কেউ জানে না, কেননা সমস্ত উৎপত্তি আমার থেকে হয়েছে। কেবল পূর্ণ পরমাত্মা/পরম অক্ষর ব্রহ্মই, কালের (ক্ষরপুরুষ/ব্রহ্ম)-এর উৎপত্তির কথা বলতে পারবেন। কেননা এই ব্রহ্ম (কাল)-এর উৎপত্তি পরম অক্ষর ব্রহ্ম(পূর্ণব্রহ্ম)-র দ্বারা হয়েছে। যা গীতা অধ্যায় ৩-এর শ্লোক ১৪-১৫ তে ব্রহ্মর উৎপত্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ৩ তে যে তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ যে বিদ্বান ব্যক্তি কোনদিন জন্ম না নেওয়া সর্ব লোকের মহেশ্বর অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মাকে জানে, সে তিন বেদ (ঋক্‌বেদ, সামবেদ, ও যজুর্বেদ)-কে জানেন সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত আছেন। তার দ্বারা বলা ভক্তি মার্গের সাধনা করলে সর্ব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭-১৮-তে বর্ণন আছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা অবিনাশী তো অন্যই আছেন। তিন লোকে প্রবেশ করে সবার ধারণ-পোষণ করে থাকেন। আমা (কাল)-কে তো কেবল এইজন্য পুরুষোত্তম বলে, কেননা আমার একুশ ব্রহ্মাণ্ডের আধীন স্থুল শরীরে নাশবান আছে। প্রাণীদের তথা অবিনাশী জীবাত্মাদের থেকে আমি উত্তম আছি। এইজন্য আমাকে লোক বেদ অর্থাৎ দন্ত কথা (রূপকথা)-র আধারে পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। পরন্তু বাস্তবে আমি অবিনাশী পালন কর্ত্তা নই। গীতার অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫ তে বলেছে, সর্ব জীব অন্ন থেকে উৎপন্ন; অন্ন বর্ষা থেকে উৎপন্ন, বর্ষা যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন। যজ্ঞ শুভকর্ম থেকে আর কর্ম ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ওই অবিনাশী সর্বব্যাপক পরমাত্মাই যজ্ঞতে প্রতিষ্ঠিত আছে, যজ্ঞতে পূজ্য। তিনিই

যজ্ঞের ফলও দেন, অর্থাৎ বাস্তবে অধিযজ্ঞই তিনি আছেন।

আবার গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ২-তে বলেছে, আমার উৎপত্তি (প্রভবম্) কেউ জানে না। এতে সিদ্ধ হচ্ছে যে, কাল (ব্রহ্ম)-ও উৎপন্ন হয়েছে। এই জন্য এ কোথাও কোথাও আকারেও আছে। তা নাহলে কৃষ্ণ তো অর্জুনের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে তো বলতেই পারে না যে, আমি অনাদি অজম (অজন্মা) আছি। এ সর্ব কাল (অদৃশ্য ব্রহ্ম)-ই কৃষ্ণের শরীরে জীবস্থ (প্রেতবশ প্রবেশ করে)-ই বলেছিল এবং তার নিজের প্রতিষ্ঠা (স্থিতি)-র সঠিক বিবরণ গীতাতে বর্ণনা করে দিয়েছে।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে সঠিক সিদ্ধ হয়েছে যে ব্রহ্মের উৎপত্তি পূর্ণ ব্রহ্ম দ্বারাই হয়েছে। এই প্রমাণ অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র ৩-তেও আছে। কৃপা করে নীম্নে পড়ুন।

।। কাণ্ড নং-৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৩।।

প্র যো বিদ্যানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মহ্যান্নিচৈরুচ্চৈ ঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ।।৩।।

প্র-যঃ- জজ্ঞে-বিদ্যানস্য-বন্ধুঃ- বিশ্বা-দেবানাম-জনিমা-বিবক্তি-ব্রহ্মঃ- ব্রহ্মণঃ- উজ্জভার-মধ্যাৎ-নিচৈঃ-উচ্চৈঃ-স্বধা-অভিঃ-প্রতস্থৌ।

অনুবাদ ঃ- (প্র) সর্বপ্রথম (দেবনাম্) দেবতাদের বা ব্রহ্মান্ডের (জজ্ঞে) উৎপত্তির জ্ঞানকে (বিদ্যানস্য) জিজ্ঞাসু ভক্তের (যঃ) যে (বন্ধঃ) বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মাই নিজের সেবককে (জনিমা) সবার উৎপত্তিকর্ত্তা, নিজের দ্বারা তৈরী (সৃজন) করা (বিবক্তি) স্বয়ংই ঠিক ঠিক বিস্তার পূর্বক বলে থাকেন, (ব্রহ্মণঃ) পূর্ণ পরমাত্মা (মধ্যাৎ) নিজের দ্বারা অর্থাৎ শব্দ শক্তি দিয়ে (ব্রহ্মঃ) ব্রহ্ম-ক্ষরপুরুষ অর্থাৎ কালকে (উজ্জভার) উৎপন্ন করে (বিশ্বা) সারা সংসারকে বা সর্ব ব্রহ্মাণ্ড লোককে (উচ্চৈ) উপর সতলোকও আদি (নিচৈঃ) নিচের পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের সর্ব ব্রহ্মাণ্ড (স্বধা) নিজে ধারণ করেন যিনি (অভিঃ) আকর্ষণ শক্তি দিয়ে (প্রতস্থৌ) দুটোই ভালো করে স্থির করেছেন।

ভাবার্থ ঃ- পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা রচনা সৃষ্টির জ্ঞান তথা সর্ব আত্মার উৎপত্তির জ্ঞান আপনার নিজ দাসকে স্বয়ংই সঠিক বলেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা নিজের মধ্য বা আপন শরীর থেকে নিজ শব্দশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম (ক্ষরপুরুষ/কাল)-এর উৎপত্তি করেছেন, এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক্ অনামী লোক, আদি তথা নীচে পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজে ধারণ করে আকর্ষণ শক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

যেমন পূর্ণ পরমাত্মা কবির সাহেব (কবির্দেব) তার নিজ সেবক অর্থাৎ সখা ধর্মদাস, আদরনীয় গরীব দাস আদিকে, নিজের দ্বারা সৃষ্টি রচনার জ্ঞান স্বয়ংই বলেছেন। উপরোক্ত বেদ মন্ত্রও ঐ সমর্থন করছে।

।। কাণ্ড নং ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র ৭।।

যোৎ থর্বানং পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ।

ত্বং বিশ্বেষাং জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ৎ স্বধাবান।। ৭।।

যঃ- অথর্বানম্-পিতরম্-দেববন্ধুম্-বৃহস্পতিম্-নমসা-অব-চ-গচ্ছাৎ ত্বম-বিশ্বেষাম্-জনিতা-যথা-সঃ-কবির্দেবঃ-ন-দভায়ৎ-স্বধাবান্।

অনুবাদ ঃ- (যঃ) যে (অর্থবানম্) অচল অর্থাৎ অবিনাশী (পিতরম্) জগৎপিতা (দেব বন্ধুম্) ভক্তের বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ আত্মার আধার (বৃহস্পতিম্) জগৎগুরু (চ) তথা (নমসা) বিনম্র পূজারী অর্থাৎ বিধিবৎ সাধককে (অব) সুরক্ষার সাথে (গচ্ছাৎ) সতলোক নিয়ে যাওয়াতে সক্ষম যে সতলোক নিয়ে গিয়ে থাকেন (বিশেষাম্) সর্ব ব্রহ্মান্ডোর (জনিতা) রচনা করা জগদম্বা অর্থাৎ মাতার গুণ দ্বারাও যুক্ত (ন দভায়ৎ) ব্রহ্ম/কালের মত ঠকায় না (স্বধাবান্) স্বভাব অর্থাৎ গুণযুক্ত (যথা) তেমনই (সঃ)) সে (ত্বম) নিজে (কবির্দেবঃ করিব্-দেবঃ) কবির্দেব আছেন অর্থাৎ অন্য ভাষায় তাকে কবীর পরমেশ্বরও বলা হয়।

ভাবার্থ ঃ- এই মন্ত্রে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ওই পরমেশ্বরের নাম কর্বির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর। যিনি সর্ব রচনা করেছেন।

যে পরমেশ্বর অচল বাস্তবে অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তেও প্রমাণ আছে) জগৎগুরু আত্মাধার, যে মুক্ত হয়ে সতলোক গিয়েছে তাদের যিনি নিয়ে গিয়েছেন, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনহার, কাল (ব্রহ্ম)-র মত ঠকায় না। তিনিই স্বয়ং কবির প্রভু অর্থাৎ কবীর্দেব। ওই পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের ও প্রাণীদেরকে নিজের শব্দ শক্তিতে উৎপন্ন করার কারণ তাহাকে (জনিতা) মাতাও বলা হয়েছে, তথা (পিতরম্) পিতা ও (বন্ধু)-ভাই, সখা ও বাস্তবে তিনিই আছেন এবং (দেব) পরমেশ্বরই তিনি। এইজন্য এই কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) এর স্তুতি করে থাকে। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম্ দেব দেব। এই পরমেশ্বরের মহিমা ঋক্‌বেদ মন্ডল নং ১ সুক্ত নং ২৪-তে বিস্তৃত বর্ণন আছে।

প্রশ্ন ঃ বেদেতে কবির বা কবির নামের বিবরণ কি করে এসেছে? বেদ তো সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাপ্ত হয়েছিল। কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) তো সন্ ১৩৯৮ তে উৎপন্ন হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম কবির্দেব আছে তথা উপমাত্মক নাম সত, পুরুষ, পরম অক্ষর ব্রহ্ম, পূর্ণ ব্রহ্ম আদি আছে। যেমন দেশের প্রধান মন্ত্রীর শরীরের নাম আলাদা এবং পদের নাম যেমন, প্রধানমন্ত্রী, প্রাইমমিনিস্টর ইত্যাদি। ঠিক ঐ রকম পূর্ণ পরমাত্মা চারিযুগে নামান্তরণ করে এসেছিলেন, তথা সৃষ্টি ও বেদ রচনার পূর্বে ও তিনি অনামী (অনাময়ঃ) লোকে মানব সদৃশ শরীরে বিরাজমান ছিলেন। তারপরে পরব্রহ্ম ও ব্রহ্ম, সর্ব লোক ও বেদের রচনা করেছিলেন এই জন্য বেদে কবির্দেবের বিবরণ (উল্লেখ) আছে।

।।কবীর সাহেব দ্বারা বিভীষণ ও মন্দোদরী রাবণের পত্নীকে শরণে নেওয়া।।

পরমেশ্বর মুনিন্দ্র নাম ধরে ত্রেতা যুগে, অনল অর্থাৎ নল তথা অনীল অর্থাৎ নল ও নীলকে শরণে নেওয়ার পরে শ্রীলঙ্কায় গেলেন। ওইখানে এক পরমভক্ত চন্দ্র বিজয়ের ষোলজন সদস্যের পুণ্য পরিবার থাকত। তারা ভাট জাতিতে উৎপন্ন পুণ্য কর্ম প্রাণী ছিল। পরমেশ্বর মুনিন্দ্র (কবির্দেব) -এর নাম উপদেশ পুরো পরিবার প্রাপ্ত করেছিলেন। পরম ভক্ত চন্দ্র বিজয়ের পত্নী ভক্তিমতী কর্মবতী লঙ্কায় রাবণের পত্নী মন্দোদরী রানীর কাছে চাকরী (সেবা) করত। রানী মন্দোদরীর সঙ্গে হাসি মজাক চুটকলি, শুনিয়ে রাণীর মনোরঞ্জন করতো। আর ভক্ত চন্দ্রবিজয় রাজা রাবণের কাছে দরবারে চাকরি (সেবা) করত। রাজার বড়াই গান শুনিয়ে প্রসন্ন করত।

ভক্ত চন্দ্রবিজয়ের পত্নী ভক্তিমতি কর্মবতী পরমেশ্বরের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করার পরে, রানী মন্দোদরীকে প্রভুর রচনা করা সৃষ্টি, নিজের গুরুদেব মুনিন্দ্রের কাছ থেকে শুনে মন্দোদরীকে রোজ শুনাতো।

ভক্তিমতীর দ্বারা মন্দোদরীর আনন্দ প্রাপ্ত হতে লাগল। কয়েক ঘন্টা ধরে প্রভুর সতকথা ভক্তিমতী কর্মবতী শুনাতে থাকত, এবং মন্দোদরীর চোখের জল বইতে থাকত। একদিন রানী মন্দোদরী কর্মবতীকে জিজ্ঞাসা, তোমাকে এই কথাকে শুনিয়াছে? তো আগে হাসি মজাক, অনাপ-শনাপ কথা বলতেন এতটা পরিবর্তন পরমাত্মা তুল্য সন্ত বিনা সম্ভব নয়। তখন কর্মবতী বললেন, এক পরম সন্ত দ্বারা এই কয়েকদিন আগে উপদেশ নিয়েছি। রানী মন্দোদরী সন্তকে দেখার অভিলাষা ব্যক্ত করে বললেন, আপনার গুরু এবার আসলে আমার ঘরে অবশ্যই নিয়ে আসবে। মন্দোদরী রাণীর কথা শুনে, মাথা ঝুকিয়ে সৎকার পূর্বক বললেন, আপনার আজ্ঞায় আমি তাই করব। তবে আমার এক বিনতী, যে সন্তকে তাহার আদেশ বিনা আনা উচিৎ নয়। স্বয়ং গিয়ে দর্শন করাই শ্রেয়কর হয় তবে পরে যেমন আপনার ইচ্ছা। মহারানী মন্দোদরী বললেন, এবার আপনার গুরুদেব আসলে আমাকে অবশ্যই বলবে, আমি স্বয়ং ই দর্শন করব।

পরমেশ্বর আবার শ্রী লঙ্কায় কৃপা করে গেলেন এবং মন্দোদরীকে নাম উপদেশ দিলেন। কিছু সময় পরে মন্দোদরীর আপন দেওর শ্রী ভক্ত বিভীষণকেও উপদেশ দিয়ে নিয়ে এলেন। ভক্তিমতি মন্দোদরী উপদেশ প্রাপ্ত করে দিনরাত প্রভুর স্মরণে লীন হতে লাগল। নিজের স্বামী রাবণকেও সদ্গুরু মুনিন্দ্র দ্বারা উপদেশ নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করতেন। কিন্তু রাবণ শোনেনি তথা সে বলতো আমি মহামৃত্যুঞ্জয়ের (শিবের) ভক্তি করি। তার থেকে বড় কোন শক্তি নেই। আপনাকে কেউ ফোঁসলিয়েছে।

কয়েকদিন পরে বনবাস প্রাপ্ত সীতাকে অপহরণ করে রাবণ তাকে নয়লখা বাগানে বন্দী করে রেখেছে। ভক্তিমতী মন্দোদরীর বার বার প্রার্থনা করাতেও , মাতা সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেয় না। তখন মন্দোদরী তার গুরুদেব মুনিন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, মহারাজ আমার স্বামী পরের স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে, এসব আমার দ্বারা সহ্য হয় না। সে তাকে কোন মতেই ছাড়তে স্বীকার নয়, আপনি দয়া করেন প্রভু। আজ পর্যন্ত্য জীবনে আমি এমন দুঃখ দেখিনি।

পরমেশ্বর মুনিন্দ্র বললেন, পুত্রী মন্দোদরী, ঐ স্ত্রী কোন সাধারণ স্ত্রী নয়। শ্রী বিষ্ণুর অভিশাপে এই পৃথিবীতে এসেছে, ও রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসী আছে। এদেরকে চৌদ্দ বৎসর বনবাস হয়েছে, এবং লক্ষ্মীই সীতা রূপে এসেছে। রামচন্দ্রের পত্নীরূপে বনবাসে ছিল। ওকে রাবণ এক সাধু বেশে ঠকিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে ও স্বয়ং লক্ষী, সেই এখন সীতা একে শীঘ্র ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজের জীবনের ভিক্ষা যাঞ্চনা রাবণ করে, তবেই এতে রাবণের শুভ হবে।

ভক্তিমতি মন্দোদরী অনেকবার প্রার্থনা করার পরেও রাবণ মানে নি তথা বলত ওই দুই চালবাজ জঙ্গলে ঘোরা ব্যক্তি, আমার কি করতে পারে আমার কাছে অগণিত সেনা আছে। আমার এক লাখ পুত্র সোয়া লাখ নাতি আছে। আমার পুত্র মেঘনাদ স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের পুত্রীকে বিয়ে

করে রেখেছে। তেত্রীশ কোটি দেবতাদের আমি বন্দী বানিয়ে রেখেছি, তুই আমাকেই ও দুই বেসাহারা ঘুরে বেড়ানো বনবাসীদের ভগবান বলে মেনে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস্? এই স্ত্রীকে আমি ফেরৎ দেব না।

মন্দোদরী ভক্তিমার্গের জ্ঞান যে পূজ্য গুরুদেবের কাছ থেকে শুনেছিলেন তাহা শুনিয়ে রাবণকে খুব বুঝিয়েছিলেন। বিভীষণও নিজের বড়ভাইকে বুঝিয়ে ছিলেন, রাবণ বিভীষণকে সেইজন্য খুব পিটিয়েছিল আর বলেছিল, তুই রামচন্দ্রের পক্ষে সব সময় কথা বলিস্, যা ওর কাছে চলে যা।

একদিন ভক্তিমতী মন্দোদরী নিজের পূজনীয় গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করে বলেন গুরুদেব! আমার সিঁথের সিঁদুর উজার হয়ে যাচ্ছে। একবার আপনি আমার স্বামীকে বোঝান। যদি আপনার কথা না শোনেন, তাহলে আমার বিধবা হতেও কোন দুঃখ হবে না। গুরুদেব মুনিন্দ্র রাণীর কথা শুনে, রাবণের দরবারে গিয়ে দ্বারপালকে বললেন রাবণের সঙ্গে দেখা করতে চাই, দ্বারপাল বলল ঋষিবর, এখন আমাদের মহারাজার সভায় দরবার লেগে রয়েছে। এই সময়ে ভিতরের খবর বাইরে আসতে পারবে, কিন্তু বাইরের খবর ভিতরে যেতে পারবে না। আমি বিবশ আছি, তখন পূর্ণ প্রভু অন্তর্ধান হয়ে রাবণের দরবারে উপস্থিত হলেন। এরমধ্যে রাবণের দৃষ্টি ঋষিবরের উপর পড়তেই গর্জন করে বললেন, এই ঋষিকে আমার আজ্ঞা বিনা ভিতরে কে ঢুকতে বলেছে? তাকে এখুনি এনে আমার সামনে শিরচ্ছেদ করো। তখন ঋষিবর (পরমেশ্বর মুণিন্দ্র) বললেন রাজন দ্বারপাল আমাকে স্পষ্ট মানা করে দিয়েছিল। সে জানেই না যে আমি কি করে ভিতরে প্রবেশ করেছি। তখন পূর্ণ প্রভু নিজেকে অদৃশ্য করে বোঝালেন যে আমি এইভাবেই এসেছিলাম, এই বলে আবার প্রকট হলেন। তখন রাজা বললেন, কি কারণে এসেছেন? তখন ঋষিবর রূপী প্রভু বললেন, আপনি এক যোদ্ধা হয়ে এক অবলা নারীকে অপরহণ করে এনেছেন? এটা আপনার শুরবীরতা ও মর্যাদার বিপরীত, এ কোন সাধারণ নারী নয়, এ লক্ষীর অবতার আর রামচন্দ্র এর স্বামী সে হল বিষ্ণুর অবতার, অতএব এই মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে, তুমি তোমার জীবনের ভীক্ষা চেয়ে নাও এতেই তোমার শুভ। এ কথা শুনেই তমোগুণ (শিবের) উপাসক রাবণ ক্রোধিত হয়ে, তলোয়ার নিয়ে সিংহাসন থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠে লাফিয়ে নীচে নেমে, নাদান (অবুঝ) প্রাণীর মত তলোবার দিয়ে অন্ধা-ধুন্ধ সত্তরবার ঋষির উপর মারতে চেষ্টা করল, পরমেশ্বর মুনিন্দ্রের হাতে কেবল ঝাঁটার একটি কাঠি ছিল, যেটা একটা ঢালের কাজ করছিল, তলোয়ারের আঘাত ওই ঝাঁটার কাঠি দ্বারা ঠেকানো হচ্ছিল। রাবণ দেখল সামান্য একটা কাঠি এই তলোবারের আঘাৎ ঠেকাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন, কোন লোহার পিলারের উপর তলোয়ারের ঘর্ষণ হচ্ছে আর কাঠি বাঁকাও হচ্ছে না! রাবণ বুঝতে পারল তিনি কোনো সাধারণ ঋষি নয়;তাই বলল, আমি আপনার একটাও কথা শুনব না, আপনি চলে যান। পরমেশ্বর অন্তর্ধান হলেন, এসে মন্দোদরীকে সব বৃত্তান্ত বললেন, রাণী বললেন গুরুদেব এখন আমার বিধবা হতেও কোন কষ্ট হবে না।

শ্রীরামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধও হল, তাতে রাবণও মারা যায়। যে লঙ্কা রাজ্যতে রাবণ তমোগুণ শিবের কঠিন সাধনা করে অর্থাৎ দশবার নিজের মাথা বলি দিয়েছিল, তাছাড়া তেত্রীশ কোটি দেবী দেবতারা যার কাছে বন্দী, তিনিও শেষ পর্যন্ত পূর্ণসুখ প্রাপ্ত না হয়ে নরক গমনের ভাগী হয়ে গিয়েছিল। এরই বিপরীত তার ভাই বিভীষণ পূর্ণ পরমাত্মার সতনাম সাধক বিনা কঠিন সাধনা

করে পূর্ণ প্রভুর কৃপাতে লঙ্কারাজ্যের রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। হাজার বছর পর্যন্ত্য বিভীষণ লঙ্কারাজ্যের সুখ ভোগ করেছিলেন তথা প্রভুর কৃপায় রাজ্যে শান্তি প্রাপ্ত হয়ে বাস করেছিল। সর্ব রাক্ষস ব্যক্তির বিনাশ হয়ে গিয়েছিল। ভক্তিমতি মন্দোদরী ও ভক্ত বিভীষণ এবং পরম ভক্ত চন্দ্রবিজয়ের পরিবারের ষোল সদস্য তথা অন্যরা যারা পূর্ণ পরমেশ্বরের উপদেশ প্রাপ্ত করে আজীবন মর্যাদাবৎ সৎভক্তি করেছে, তারা সর্বসাধক এই পৃথিবীর উপরও সুখী ছিল এবং অন্ত সময়ে পরমেশ্বরের বিমানে বসে সৎলোকে (শাশ্বত-ম্-স্থানম্)-তে চলে গিয়েছিল। এইজন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র নং ১২ থেকে ১৫ তে বলেছে। তিন গুণের সাধনাতে পাওয়া ক্ষণিক সুবিধা অর্থাৎ রজগুণীব্রহ্মার ; সতগুনী-বিষ্ণুর ও তমোগুণীশিবের দেওয়া লাভ ক্ষণিকের জন্য তবে চিরস্থায়ী নয়। এই গুণের কারণ জ্ঞান হরণ হয়ে যায়, রাক্ষস স্বভাব যুক্ত, মানুষের মধ্যে নীচ, মূর্খরাও আমাকে (কালকে) ভজে না। আবার গীতা অধ্যায় ৭ মন্ত্র ১৮ তে গীতা জ্ঞান দাতা (কাল) প্রভু বলছে, কোনো এক উদার আত্মাই আমার ই (কালেরই) সাধনা করে। কারণ সে তত্ত্বদর্শী সন্ত পায়নি, সেও পরিস্কার আত্মা থেকেই গিয়েছে কিন্তু আমার (অনুওমাম্) অতি অশ্রেষ্ঠ (গতিম্) মুক্তির স্থিতিতে আশ্রিত থেকেই। সেও পূর্ণ মুক্ত নয়। এইজন্য পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৮ মন্ত্র নং ৬২-তে বলছে, হে অর্জুন তুই সর্ব ভাব দিয়ে ওই পরমেশ্বরের (পূর্ণ পরমাত্মা তৎ ব্রহ্ম)-র শরণে যা। তার কৃপাতেই তুই পরম শান্তি ও সতলোক বা সনাতন পরমধামকে প্রাপ্ত পাবি।

এইজন্য পুণ্য আত্মাদের কাছে নিবেদন যে, এই দাসেরও দাসের কাছে পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তির বাস্তবিক বিধি আছে, নিঃশুল্ক (বিনামূল্যে) উপদেশ নাম নিয়ে নিজের আত্ম কল্যাণও লাভ করেন।

।। দ্বাপর যুগে ইন্দ্রমতিকে শরনে নেওয়া।।

দ্বাপর যুগে চন্দ্র বিজয় নামে এক রাজা ছিলেন। তার পত্নী ইন্দ্রমতী খুবই ধার্মিক স্বভাবের নারী ছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব আদর সৎকার করতেন, তিনি এক গুরুদেবও বানিয়ে রেখেছিলেন। ঐ গুরুদেব রাণীকে বলতেন পুত্রী সাধু সন্ন্যাসীদের খুব যত্ন আহ্বান করবে, সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন করালে খুব লাভ হয় একাদশীর ব্রত পালন, মন্ত্র জপ আদি সাধনা ইত্যাদি, সে ভগবৎ ভক্তিতে দৃঢ় ভাবে লেগে থাকত। এও বলেছিলেন, সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন খাইয়ে গেলে পরের জন্মেও রাণী হয়ে জন্মাবি আর পরে তুই স্বর্গে যাবি। রাণী ভাবল প্রতিদিন এক সন্তকে অবশ্যই খাওয়াবো। এই প্রতিজ্ঞা করেছে যে প্রত্যেক দিন এক সাধুকে খাওয়াইয়ে পরে নিজে খাব। এতে এক স্মৃতি থেকে যাবে কোনদিন যাতে আমার ভুল না হয়ে যায়। রাণী প্রতিদিন আগে এক সাধুকে খাওয়াইয়ে পরে নিজে স্বয়ং খেতেন। এই ভাবে এক বছর ক্রমে চলতে পাগল।

এক সময় হরিদ্বারেতে কুম্ভর মেলার সংযোগ হয়েছিল। যত ত্রিগুণ মায়ার উপাসক সাধু সন্ন্যাসী ছিল, সবাই কুম্ভ মেলার স্নানে চলে গিয়েছিল। এই কারণে কয়দিন রাণীকে সাধু সন্ন্যাস কাউকেই পায়নি। তাই রাণীও খেতে পারেননি। চতুর্থ দিনে রাণী তার দাসীকে বলছেন। দাসী দেখতো কোন সাধু সন্ত পাওয়া যায় নাকি? তা না হলে আজ আমার প্রাণ চলেই যাবে। আর জীবিত থাকতে পারব না। তবে অন্ন খাব না তাতে আমার প্রাণ বেড়িয়ে যাক না কেন। ওই দীন-দয়াল কবীর পরমেশ্বর নিজের পূর্ববালা ভক্তকে শরণে নেওয়ার জন্য, না জানি কি কি কারণ

বানিয়ে দেন? দাসী ছাদের উপর চড়ে দেখছে সামনে রাস্তা দিয়ে এক সাধু সন্তের মত কেউ আসছে। সাদা কাপড় পড়া, দ্বাপর যুগে কবীর পরমেশ্বর করুণাময়ী নামে এসেছিলেন। দাসী নীচে নেমে রাণীকে বললেন, এক ব্যক্তি সাদা কাপড় পড়া সাধুর মত দেখা দেখতে লাগছে, রাণী বললেন তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। দাসী মহলের বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করে বলল, সাহেব, আপনাকে রাণীমা মনে করছেন। করুণাময়ী সাহেব বললেন, রাণী আমায় কেন মনে করছেন? রাণীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? দাসী সব কথা বললেন, করুণাময় (কবীর) সাহেব বললেন, রাণীর দরকার হলে এখানে আসে যেন ; আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি দাসী আর সে রাণী। আমি সেখানে গেলে কেউ যদি বলে কে ডেকেছে আপনাকে? রাজাও যদি কিছু বলে দেয়, আর পুত্রী সাধুদের অনাদর অনেক পাপদায়ক হয়। দাসী মহলে গিয়ে রাণীকে সব কথা শোনালেন। রাণীর শরীর খুব অসুস্থ কয়দিন না খেয়ে আছেন তাই দাসিকে বললেন, দাসী আমার হাত ধরে নিয়ে চল। রাণী দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন পরবরদিগার! ইচ্ছা তো করছে আপনাকে কাঁধে করে বসিয়ে মহলে নিয়ে যাই। করুণাময় সাহেব বললেন, পুত্রী, আমি এই দেখতে চেয়েছিলাম যে, তোর ভিতরে শ্রদ্ধা আছে কি নেই, তুই এমনই ক্ষিদেতে মরছিস্। রাণী নিজের হাতে রান্না করে। কবির সাহেব (করুণাময়)-কে খেতে বললেন তিনি বললেন আমি খাই না। আমার শরীর খাওয়ার জন্য নয়। রাণী তখন বললেন আমিও-তাহলে খাব না, তাই শুনে ভগবান করুণাময় সাহেব খেলেন, এবং রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই যে সাধনা করছিস এই সাধনা কে করতে বলেছে? রাণী বললেন আমার গুরুদেবের আদেশ। এবং তিনি আদেশ দিয়েছেন। ইন্দ্রমতী আরও বললেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের পূজা, একাদশীর ব্রত, তীর্থ ভ্রমণ, দেবীপূজা শ্রাদ্ধ করা ও সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা করা ইত্যাদিও করি। করুণাময় (কবীর) সাহেব বললেন, যে সাধনা তোর গুরুদেব দিয়েছে—এতে তোর জন্ম মৃত্যু-স্বর্গ নরক এবং চুরাশী লাখ যোনীতে ঘুরলেও মুক্ত হতে পারবি না। রাণী বললেন, মহারাজ, যত সন্ত, মহারাজ আছে সব নিজের নিজের প্রভুত্বতা বানাতে থাকে। তবে আমার গুরুদেবের বিষয়ে কিছু বলবেন না, তাইতে আমি মুক্ত হই বা না হই।

এবার করুণাময় (কবীর) সাহেব এই রকম সরল সোজা জীবকে কেমনভাবে বোঝাবেন? এ যার লেজ ধরে বসেছে, সে একে তো ছাড়তে চায় না, মরতে পারে। পরে করুণাময় সাহেব বলল পুত্রী যা তোর ইচ্ছা;আমি নিন্দা করছি না। আমি কি তোমার গুরুদেবকে গালাগালি দিয়েছি? না কিছু খারাপ বলেছি? আমি তো ভক্তিমার্গের কথা বলছি, এসব ভক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ। তোকে পাড় তো হতে দেবে না, আর সামনে যে কর্ম দন্ড ভোগ না তা কাটবে, তবে শোন আজ থেকে তিনদিন পরে তোর মৃত্যু হবে। না তোর গুরু বাঁচাতে পারবে, আর না তোর সাধনা বাঁচাতে পারবে। (যখন মরণের সময় আসে জীবের ভয় হতে লাগে, এমনিভাবে তো কেউ কিছু মানে না)। রাণী জানে যে সন্ত কোনদিন মিথ্যা বলেন না। তবে এরকম না হয় যে আমি পরশুই মারা যায়। তাই করুণাময় (কবীর) সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, সাহেব আমার কি জীবন বাঁচতে পারে না? পরমেশ্বর (কবীর) সাহেব বললে হ্যাঁ বাঁচতে পারে, যদি তুই আমার থেকে উপদেশ নিস আর আমার শিষ্য হতে পারিস, এবং আগের পূজা সব ত্যাগ করবি, তাহলে তোর জীবন বাঁচতে পারে। ইন্দ্রমতি বললেন, আমি শুনেছি যে গুরুদেব নাকি বদলাতে নেই, পাপ হয়। কবীর সাহেব (করুণাময়)

বললেন, পুত্রী এটাও তোর ভ্রম, যেমন এক ডাক্তার (বৈদ্য) থেকে ঔষধ নিয়ে কোন লাভ না হলে কি ডাক্তার পাল্টানো হয় না ? এক জুনিয়ার স্কুলের শিক্ষক, আর এক উচ্চ কক্ষের অধ্যক্ষক হয় না ? পুত্রী, সামনে এগোতে হলে;নীচ কক্ষের শিক্ষককে ছাড়তে হয়। তা না হলে কি কেউ জুনিয়র শিক্ষক ধরে কি উচ্চ কক্ষের পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান পাবে কি ? সেইজন্য এখন তোর আগের পড়া ছেড়ে তোকে উচ্চ কক্ষের পড়া পড়াতে এসেছি আমি। এমনিতো তুই মানতী না কিন্তু সন্ত বলছে সেটা সত্যি মেনে মানবি। তখন ইন্দ্রমতি বললেন আপনি যেমন বলবেন আমি তেমনই করব। করুণাময় (কবীর) সাহেব রাণীকে উপদেশ দিলেন। আর বললেন তৃতীয়দিন আমার রূপ ধরে যমদূত কাল আসবে, তুই তার দিকে তাকাবি না, আর আমি যে নাম জপতে দিয়েছি, দুই মিনিট পর্যন্ত্য ওই নাম জপ করবি। দুই মিনিট পরে তার দিকে তাকাবি। তার পরে তার সৎকার করবি, আর গুরুদেব বলে তাড়াতাড়ি চরণে পড়ে যাবি, এটা আমার শুধু এইবারের আদেশ, রাণী বলল ঠিক আছে।

এখন রাণীর চিন্তা হয়ে গিয়েছে, শ্রদ্ধা দিয়ে জপ করা শুরু করে দিল। (কবীর) করুণাময় সাহেবের রূপ ধরে কাল এসে, ডাকল ইন্দ্রমতি, ইন্দ্রমতি, এমনি তো আগেই রাণীর ভয় ছিল, জপতে শুরু করেছে, কালের দিকে দুই মিনিট পর্যন্ত্য তাকায়নি। যখন কালের রূপ বদলে গিয়ে, কালের যেমন রূপ তেমন হয়ে গেল, তখন কালের আর গুরুদেব করুণাময়ের স্বরূপে নেই। তখন কাল বুঝল ইন্দ্রমতির কাছে কোন শক্তিযুক্ত মন্ত্র আছে। তাই যাওয়ার সময় কালদূত বলল তোকে পরে দেখে নেব, এখন তো বেঁচে গেলি। রাণীর কি আনন্দ যে মৃত্যুর হাত থেকে তার গুরুদেব বাঁচিয়ে দিলেন। দাসীকে খুশী খুশী হয়ে বলতে লাগলেন। রাজার কাছে গিয়েও বললেন, আজ আমার মৃত্যুর কথা ছিল, গুরুদেবের জন্য বেঁচে গিয়েছি। আমাকে কালদূত নিতে এসেছিল। রাজা এই কথা শুনে বলল, তুই তো এই রকমই ড্রামা করতে থাকিস্ সব সময়। কাল যদি আসতই তাহলে কি তোকে ছেড়ে দিত ? এ সব সাধু সন্ত শুধু তামাসা দেখায় লোককে ভড়কায়। রাজার এই কথা রাণী কি করে মানবে ? খুশীতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে কালদূত সাপ হয়ে এসে রাণীকে কেটে দিল। যেই সাপে কেটেছে রাণী বুঝেতে পেরে, জোড়ে আওয়াজ করে বললেন আমায় সাপে কেটেছে। চাকররা দৌড়া দৌড়ি শুরু করলো, চাকর দেখল ঘরে জল বের করা ছিদ্র দিয়ে সাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। রাণী নিজের গুরুদেবকে স্মরণ করে বেঁহুস হয়ে গেল, করুণাময়ী (কবীর) সাহেব ওখানে প্রকট হলেন। লোককে দেখানোর জন্য মন্ত্র বললেন (উনিতো বিনা মন্ত্রতেই জীবিত করতে পারতেন, মন্ত্র বলার কোন আবশ্যকতা নাই) ইন্দ্রমতীকে জীবিত করে দিলেন। রাণী ধন্যবাদ দিয়ে বললেন বন্দীছোড়, আজ আমি যদি আপনার কাছ থেকে উপদেশ না নিতাম তাহলে আজও আমি বাঁচতাম না। সাহেব পরমেশ্বর বললেন, ইন্দ্রমতি এই কালকে তোর ঘরে ঢুকতেই দিতাম না, তোর উপর এ হামলাও করতে পরতো না কিন্তু বিশ্বাস করতি না। তুই ভাবতি তোর উপর কোন আপত্তি আসতই না। গুরুদেব হয়তো মিথ্যা বলে ভয় দেখাচ্ছেন। এইজন্যে একটু ঝটকা দিলাম। নয়তো তুই বিশ্বাস করতি না।

ধর্মদাস যঁহা ঘনা অন্ধারা, বিন পরিচয় জীব যমকে চারা।।

কবীর সাহেব (করুণাময় গুরুদেব) বললেন এখন আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তোর মৃত্যু

হবে। **গরীব দাস বলেন—**

গরীব কাল ডরে করতার সে, জয় জয় জয় জগদ্বীশ।
জৌরা জৌরা ঝাড়তী, পগরজ তারে শীশ।।

এ কাল কবীর পরমেশ্বর (কবীর ভগবান) ভয় পায়, আর এই মৃত্যু কবীর সাহেবের জুতো ঝাড়ে, অর্থ্যাৎ চাকর তুল্য ।ফির ওই ধুলো নিজের মাথায় লাগায় আর বলে আপনি যাকে মারতে আদেশ দেবেন তার কাছেই যাব, আর নয়তো যাব না।

গরীব, কাল জো পিসে পিসনা, জৌরা হে পণিহার।
এ দো অসম মজুর হে, মেরে সাহেবকে দরবার।।

এই কাল যে এইখানকার ২১ ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান (ব্রহ্ম) আছে, যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশের পিতা। এ তো আমার কবীর সাহেবের আটা পিসে থাকা অর্থাৎ পাকা চাকর, আর জৌরা (মৃত্যু) এ কবীর সাহেবের চাকরানী অর্থাৎ জল ভরে। এই দুই আসল মজদুর আমার সাহেবের দরবারে। কিছু দিন পরে সাহেব আবার এসে, ইন্দ্রমতিকে সতনাম প্রদান করলেন।

কিছুদিন পরে করুণাময় সাহেব ইন্দ্রমতীর অতি শ্রদ্ধা দেখে সারনাম দিলেন। শব্দর উপলদ্ধি করালেন। যখন সাহেব চলে যাচ্ছিলেন তখন ইন্দ্রমতী প্রার্থনা করলেন, গুরুদেব! আমার পতি রাজাকে একটু বোঝান মালিক, এও যেন আপনার কথা মানে। আপনার চরণে আসে, তাহলে আমার জীবন সফল হবে। চন্দ্রবিজয় রাজাকে করুণাময় (কবীর সাহেব) বললেন, চন্দ্রবিজয় তুমিও মন্ত্র উপদেশ নিয়ে নাও, এই দুই দিনের রাজপাট আর ঠাট্ কতদিন থাকবে? আবার চুরাশী লাখ যোনীর প্রাণীতে চলে যেতে হবে। তখন চন্দ্রবিজয় রাজা বললেন, আমি তো নাম নেব না, তবে রাণীকে আমি মানাও করব না। তাতে খাজানা বিলিয়ে দান করে দিক্ বা সতসঙ্গ করুক না কেন? আমি মানা করব না। তখন কবীর পরমেশ্বর (করুণাময়) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নাম নেবে না কেন? তখন রাজা বলল, আমার বড় বড় পার্টিতে যেতে হয়। করুণাময় বললেন, পার্টিতে গেলে নাম কি বাধা করবে? সভাতে যাও ওখানে গিয়ে কাজু খাও, দুধ খাও, শরবৎ খাও শুধু মদ প্রয়োগ করো না। মদ খাওয়া মহাপাপ। কিন্তু রাজা মানলেন না।

রাণীর প্রার্থনার পর করুণাময় (কবীর) সাহেব আবার রাজাকে বোঝালেন, নাম ছাড়া এই জীবন এমনিই বৃথা হয়ে যাবে। নাম নিয়ে নেও, রাজা বললেন গুরুদেব আমাকে আপনি নাম উপদেশ নিতে বলবেন না। আপনার শিষ্যা রাণীকে আমি মানা করব না। তাতে সে যত দান করুক বা যতই সৎসঙ্গ করুক। সাহেব বললেন পুত্রী, এই দুইদিনের সুখ দেখে এর বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তুই প্রভুর চরণে লেগেই থাক;আর নিজের আত্মকল্যাণ কর। এখানে কেউ কারও স্বামী না, কেউ কাহারও পত্নী নয়। দুই দিনের সম্বন্ধ, নিজের কর্ম তৈরী কর পুত্রী। আজ ইন্দ্রমতী ৮০ বছরের বুড়ি হয়েছে, কোথায় এই ইন্দ্রমতির চল্লিশ বছরের সময়ে মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল, আজ আশি বছর হয়েছে। এখন শরীরও নড়াচড়া করতে সক্ষম হয় না। তখন একদিন গুরুদেব করুণাময় বললেন, ইন্দ্রমতি এখন কি চাস? সতলোকে যাবি? ইন্দ্রমতী বললেন, সাহেব আমি তৈরী আছি, একদম তৈরী আছি দাতা।

করুণাময় সাহেব (কবীর সাহেব) বললেন, তোর নাতি নাতনির জন্য কোন মমতা তো

নেই? রাণী বললেন একদম নেই সাহেব। আপনি জ্ঞানই এমন নির্মল দিয়েছেন। এত খারাপ লোকে (পৃথিবী থেকে) থাকার কি ইচ্ছা হতে পারে? কবীর (করুণাময় গুরুদেব) সাহেব বললেন চল পুত্রী। রাণীর প্রাণ চলে গেল। সাহেব কবীর (করুণাময়) রাণী ইন্দ্রমতীর আত্মাকে উপরে নিয়ে গেলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এক মান সরোবর আছে। ঐ মান সরোবরে নিয়ে গিয়ে এই আত্মাকে স্নান করাতে হয়। এই প্রাণীকে সাহেব কিছু সময় সরোবরে রাখেন। তাই বলল আবার বল যদি তোর কিছু ইচ্ছা থাকে দ্বিতীয়বার জন্ম নিতে হবে। যদি মনের মধ্যে কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে সতলোকে যেতে পারবি না। ইন্দ্রমতী বললেন, সাহেব আপনিতো অন্তর্যামী, কোন ইচ্ছা নেই, আপনার চরণের ইচ্ছা, তবে মনে একশঙ্কা যেকি, আমার যে স্বামী সে তো কোন দিন কোন ধার্মিক কাজে আমায় বাধা দেয়নি। আজকাল স্বামীরা তো বাঁধা দিয়ে থাকে। যদি সে আমাকে মানা করে দিত, তাহলে আজ আমি আপনার চরণে আসতে পারতাম না। আর আমার কল্যাণও হত না, তার এই শুভকর্মে যদি কোন ফল হয়ে থাকে, তবে তাকেও দয়া করুন দাতা। তখন ভগবান সাহেব দেখল এই ভোলা সরল জীব আবার পিছনের দিক টানছে। সাহেব বললেন ঠিক আছে পুত্রী আরও দুইচার বৎসর এখানে থাক।

এবার দুই বৎসর হওয়ার পরে রাজাও মরণ শয্যায়। নাম উপদেশ নেওয়া নেই, যমদূত আসায় রাজা উঠানে চক্কর খেয়ে পড়ে যায়। যমদূত রাজার ঘাড় ধরে, রাজার পায়খানা পেশাব বেরিয়ে গেল। করুণাময় সাহেব রাণীকে বললেন, দেখ তোর স্বামীর কি দশা, ওই মান সরোবর থেকে রাণীকে দেখালেন, তখন রাণী বলল হে দাতা! যদি রাজার ভক্তিতে কোন সহযোগের ফল হয়ে থাকে, তো দয়া করুন। রাণীর আবার একটু মমতা হল। এই ভেবে মান-সরোবর থেকে ওখানে গেলেন যেখানে রাজা অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে, যম তার প্রাণ বের করছিল। কবীর সাহেব আসতেই যমদূত রাজার প্রাণ ছেড়ে উড়ে চলে গেলেন। যেমন মরা জিনিষ ছেড়ে শকুন উড়ে যায়। চন্দ্রবিজয় রাজা হোঁশ এলে, সামনে করুণাময় ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু চন্দ্রবিজয়কেই দেখা দিয়েছে, অন্য কেউ দেখতে পারছে না। চন্দ্রবিজয় চরণে পড়ে ক্ষমা চাইলেন, আমাকে ক্ষমা করুন দাতা, আমার জীবন বাঁচান। কেননা সেতো দেখতে পারছিল যে, যমদূত কেমন করে প্রাণ বের করে নেয়। (যখন জীবের চোখ খোলে তার আগে তো অনেক সর্বনাশ হয়ে যায়) আমায় ক্ষমা করুন দাতা, আমার প্রাণ বাঁচান মালিক। কবীর পরমেশ্বর (করুণাময়) বললেন, রাজা আজও ওই কথা। ওই দিনও ওই কথা বলেছিলাম যে, নাম নিতে হবে। রাজা বলল, আমি নাম নেব, আজই নেব। কবীর সাহেব নাম দিলেন আর বললেন, এখন তোকে দুই বৎসরের আয়ু দিচ্ছি। যদি এর মধ্যে নাম জপতে এক শ্বাস ফাঁকা যায়, তো আবার কর্মদন্ড ভোগ করার জন্য এই কালের ব্রহ্মাণ্ডের থেকে যাবে সতলোকে যেতে পারবে না।

কবীর, জীবন তো থোরা ভলা, জৈ সৎ সুমরন হো।
লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখে ধরে না কো।।

শুভ কর্মেতে সহযোগ দেওয়া, আগের জন্মের কর্ম এবং সাথে শ্রদ্ধার কারণে দুই বৎসর স্মরণে তথা তিন নাম প্রদান করে, কবীর সাহেব চন্দ্রবিজয়কেও পাড় করে নিয়ে যায়। বলো সদ্‌গুরু দেব কি জয়, বন্দী ছোড় কি জয়।

পরমেশ্বর কবীর সাহেব শ্রদ্ধালুদের আয়ূ বাড়িয়ে দেন, এবং তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করেন, উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই প্রমাণ অনেক আগের। বর্তমানে সাধারণ ব্যক্তি বিশ্বাস করে না। বর্তমানে পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শক্তিতে এই দাস দ্বারা কষ্ট নির্বান তথা আয়ূ বৃদ্ধির অনেক অনেক প্রমাণ পড়ুন এই পুস্তক **"পরমেশ্বরের সার সন্দেশ"** (সংবাদ)।।

।। পবিত্র পুরানের রহস্য।।

পুরানো গ্রন্থকে বুঝতে হলে কৃপা করে ধ্যান দেবেন শ্রী ব্রহ্মা পুরাণ, শ্রীবিষ্ণু পুরাণ তথা শ্রী শিব পুরাণ ব্রহ্মর লীলা থেকে প্রারম্ভ হয়ে থাকে। যাতে প্রথম অব্যক্ত গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৫-তে বলেছে। যে গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং ৩২ তে বলেছে আমি কাল আছি। একেই ক্ষর পুরুষ বা জ্যোতি নিরঞ্জন ও বলা হয়, এই সদাশিব, কাল রূপী ব্রহ্ম ও বলা হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডতে এক ব্রহ্মলোকের রচনা করে তার উপরের অংশতে থাকেন।

ইনাকেই মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মা ও মহাশিব বলা হয়, এবং ঐ ক্ষেত্রকে কাশীও বলা হয়। ওখানে রজোগুণ প্রধান, সতগুণ প্রধান, তমোগুণ প্রধান, তিন স্থান বানিয়ে, নিজের পত্নী দূর্গা (মহালক্ষী)-র সাথে থেকে তিন পুত্র রাজগুণ ব্রহ্মা,সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবকে উৎপন্ন করে অচেতন করে রাখতেন, অচেতন অবস্থাতেই তাদের লালন-পালন করতেন। যুবক হলে ব্রহ্মাকে পদ্ম ফুলের উপর, বিষ্ণুকে শেষনাগের উপর ও শিবকে কৈলাশ পর্বতে চেতন করে দিতেন। এই তিন প্রভুর স্বয়ং নিজের জ্ঞান নেই যে তাদের উৎপত্তি কর্ত্তা কে? এই কাল রূপী ব্রহ্মই বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে, নিজের নাভি থেকে পদ্মফুল উৎপন্ন করে, তার উপর ব্রহ্মাকে রেখে সচেতন করে দিতেন। এই কাল যখন ইচ্ছা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব রূপ ধারণ করে দৃষ্টি গোচর হতেন। এই কাল তার বাস্তবিক (আসল) রূপে কখনও প্রকট হতেন না, যে কাল শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জ্ঞান দেওয়ার সময় দেখিয়েছিল। গীতা অধ্যায় ১০ ও ১১-তে প্রমাণ আছে। শ্রীমদ ভগবত গীতা অধ্যায় ১১-তে শ্লোক ৪৭-৪৮ তে বলেছে অর্জুন এটাই আমার বাস্তবিক কালরূপ, তুই ছাড়া (অতিরিক্ত) না তো আগে কেউ দেখেছে, না কেউ দেখতে পারবে। এতো তোর অনুগ্রহে আমি দেখিয়েছি। এই আমি (ব্রহ্মার) হাজার হাত ও চোখ বালা কাল রূপ, বেদে বর্ণিত বিধিতে যেমন যজ্ঞ, ক্তঁ নামের জপ আদি দ্বারা কখনও দেখা যায় না।

ভাবার্থ হল বেদে বর্ণিত বিধি দ্বারা প্রভু প্রাপ্তি হয় না। এইজন্য ঋষিরা মহর্ষিরা বেদের "ক্তঁ" নামকে প্রভু প্রাপ্তি হয় ভেবে, প্রভু প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ তথা ক্তঁ নাম জপের ঘোর সাধনা করতেন, কিন্তু ব্রহ্মের দর্শন হত না। কেউ পদ্মফুলের প্রকাশ দেখতেন, কেউ শরীরের মধ্যে জ্যোতি দেখতেন, কেউ ধুন (আওয়াজ) শুনতেন, যে কিনা কাল ব্রহ্মের ছলচাতুরী। কেউ কেউ সহস্র কমলের এক হাজার জ্যোতি থেকে বের হওয়া প্রকাশ দেখে প্রভু প্রাপ্তি হয়ে গিয়েছে মেনে নিতেন। যেমন কোন স্থানে একই রঙের হাজার বাতি একের সাথে আরেকটা জুড়ে দিলে ঝলমল করে। দূর থেকে যে ব্যক্তি দেখবে এক প্রকাশ সমূহকেই দেখতে পায়, ঝাড় বাতির মত। কাছে গেলে বুঝতে পারে, এতো অনেক বলভ একসাথে গোলাকারভাবে এক সঙ্গেই প্রকাশ দিচ্ছে।

এই প্রকার কোন কোন সাধক হঠযোগ করে শরীরের অন্তমুর্খ হয়ে, কিছু আতিশ বাজিকে

দেখে প্রভু প্রাপ্তি মেনে নেন। কালের এই জালকে আনন্দ মেনে নিজের অনমোল (দূর্লভ) মানব শরীরকে নষ্ট করেন। বেদেতে স্পষ্ট লেখা আছে পরমেশ্বর সশরীর আছেন।

।। যজুর্বেদ অধ্যায় ১ মন্ত্র ১৫ ও অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১ তে প্রমাণ আছে ।।

অগ্নে তনুর্ অসি। বিষ্ণবে ত্বা সোমস্য তণুর অসি।

যার শব্দার্থ হল ঃ পরমেশ্বর সশরীর আছেন। ঐ সর্বপালন কর্ত্তা অমর পুরুষ (সতপুরুষ) এর শরীর আছে অর্থাৎ পরমেশ্বর আকারেই আছেন। এইজন্য ঋষিরা প্রভু দর্শনের জন্য ঘোর তপস্যা করেছেন। তবে বেদে বর্ণিত বিধিতে প্রভু প্রাপ্তি হতে পারে নি। এইজন্য আজ পর্যন্ত্য সর্ব সাধকরা, ঋষিরা, ও মহর্ষিরা নিজের অনুভবের পুস্তক রচনা করে গিয়েছেন যা বেদের বিরুদ্ধে। এখন সকল ভক্ত সমাজ পবিত্র বেদের স্থানে অন্য মহর্ষি বা সন্তোদের অনুভব দ্বারা বানানো পুস্তকের জ্ঞানের উপর আধারিত হয়ে গিয়েছেন।

পবিত্র বেদে ও শ্রী মদভগবত গীতার জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম বলছে, তিন গুণী (রাজা গুণী-ব্রহ্মা, সতগুণী-বিষ্ণু ও তমোগুণী-শিব) এরা ইষ্ট রূপে পূজার যোগ্য নহে, কেননা এরা নাশবান, এরা শুধু কর্মের আধারে যেমন ফল হয়ে থাকে তেমনই দিতে পারে। পাপের ক্ষমা বা মোক্ষলাভ করাতে ইহারা পারে না। এদের যারাই পূজা করুক তাদের আগের জন্মের কামাই করা পাপ বা পুণ্যির ফল, কষ্ট থাকুক বা সুখ থাকুক ভোগ করতেই হবে। এই তিনপ্রভুর সাধনাতে সংসারের জন্য ক্ষণিক সুখ লাভ হতে পারে কিন্তু মোক্ষলাভ হবে না, অতএব এই তিন প্রভুরা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) দেখা দিলে যাদের ক্ষণিক লাভের উপর আস্থা হয়, তারা রাক্ষস স্বভাব ধারণ করা হয়ে থাকে, মানুষের মধ্যে নীচ, দুষ্কর্ম করতে থাকে, এরা মুর্খ আমা (কাল/ব্রহ্ম)-কে ভজে না (প্রমাণ শ্রীমদ ভগবত গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত্য)। কেননা ব্রহ্মের সাধক অনেক সময় ধরে ব্রহ্মলোকে বানানো মহাস্বর্গেতে নিজের কামাইয়ের কারণে কিছুদিন সুখ ভোগ করতে পারে। এইজন্য কাল প্রভু বলছে, এই তিন প্রভু থেকে কিছু বেশী ফল প্রাপ্ত আমি দিতে পারি। তবে এই ব্রহ্মলোক তথা কাল (ব্রহ্ম) ও নাশবান। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক নং ১৬-তে বলেছে, ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত সব নাশবান। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২ তথা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৫-তে স্বয়ং গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম বলছে যেকি, আমারও জন্ম মৃত্যু হয়, অর্থাৎ নাশবান। এইজন্য পবিত্রগীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮-তে বলেছে যিনি চতুর্থ প্রকারে আমার (ব্রহ্মের) সাধক এবং যিনি জ্ঞানী আছেন, সে বেদের জ্ঞান আধারে জেনে যায় যে, কেবল এক পূর্ণ পরমাত্মাই ইষ্ট রূপে পূজ্য, তিনিই পাপনাশক, পূর্ণ মোক্ষদায়ক, তথা মানব শরীর প্রভুপ্রাপ্তির জন্য সবাই পেয়েছি। তাই সবাই মেনে নিয়েছে এই এক ওঁ মন্ত্রই প্রভু প্রাপ্তির মন্ত্র। এই ওঁ মন্ত্র জপ করে হাজার বৎসর সাধনা করে, নিজেদের শরীরকেও নৌছাবর (নষ্ট) করে দিয়েছে। পরন্তু প্রভু দর্শন হয়নি, অন্য অন্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব কিছু সিদ্ধিও প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ স্বর্গ ও মহাস্বর্গ আদিতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছে। পরে আবার যখন ভজন কামাই ও পুণ্যর কামাই সমাপ্ত হবে তারপরে পুনর জন্ম মৃত্যু তথা চুরাশী লাখ প্রাণীদের শরীরে ঘোর কষ্ট ও নরকে পাপ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ তথা পবিত্র গীতা অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৩৪-তে উপরোক্ত দুই-ই শাস্ত্রের জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম বলেছে যে, ওই পূর্ণ পরমাত্মার বিষয়েতে আমি (কাল রূপী ব্রহ্ম) পূর্ণতত্ত্ব জানি

না। ওই পরমেশ্বরের বিষয়ে সম্পূর্ণ খবর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও ওই পরমেশ্বরকে পাওয়ার বিধি বা পূর্ণ মোক্ষ মার্গের সমস্ত সংবাদ (খবর) জানতে হলে তত্ত্বদর্শী সন্তের খোঁজ কর। পরে তিনি যেমন সাধনা বলবেন তেমন করবে। তার পরে সেই পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করতে হবে। সেখানে যাওয়া সাধকের পুনরায় ফিরে আসতে হয় না এই সংসারে। পরে পূর্ণ মোক্ষপ্রাপ্ত করে সদা কালের জন্য জন্ম মৃত্যু ও চুরাশী লাখ যোনীর কষ্ট এবং নরকের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে তথা পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত করে (শাশ্বতম্ স্থানম্) অবিনাশী লোক অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত হয়ে যাবে (প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ থেকে ৪ ও গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৬২ তথা ঋকবেদ মন্ডল ১ সুক্ত ২৪ মন্ত্র ১-২-তে)।

তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে সমস্ত ঋষিজন বেদের অনুসারে সাধনা করেও মহা কষ্টের মধ্যেও রয়ে গিয়েছে। এই জন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮-তে বলা হয়েছে, যিনি জ্ঞানী আত্মা আছে সে আছে তো খুব উদার কেননা প্রভু প্রাপ্তির জন্য তন-মন-ধন দ্বারা বেদের সাধনা করে। পরন্তু সেও আমার (কাল ব্রহ্মা)-র (অনুত্তমাম্) অতি অশ্রেষ্ঠ (খারাপ) গতি অর্থাৎ সাধনা দ্বারা পাওয়া লাভের উপর আশ্রিত আছে;যার কারণ তাদেরও পূর্ণ মোক্ষলাভ হয় না। জন্ম মৃত্যু তথা নানা প্রাণীদের শরীরে বা নরকের কর্মাধার দ্বারা যে কষ্ট তাহা কখনও সমাপ্ত হতে পারে না।

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল রূপী ব্রহ্ম) সে প্রতিজ্ঞা করেছিল দূর্গার কাছে, আমি কখনও কাউকে; কোন সাধনার দ্বারা নিজের বাস্তবিক রূপে দর্শন দেব না। সেইজন্য ঐ কাল রূপী ব্রহ্মই আপন পুত্র (ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব)-র রূপে এসে দেখা দিয়ে নানা চরিত্রের অভিনয় করে থাকে। সেইজন্য অন্য জন ভাবে এই লীলা বিষ্ণু করেছে, এই লীলা ব্রহ্মায় করেছে এই লীলা শিব করেছে। যেমন সাধারণ ব্যক্তি বলে, ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে হয়েছে। ওই সময় বিষ্ণু রূপে কাল নিজের নাভি থেকে কমল (পদ্ম) ফুল প্রকট করেছিল।

ব্রহ্মা পুরাণ (সৃষ্টির বর্ণন নামক অধ্যায়)-তে শ্রী লোমহর্ষণ ঋষি (যাকে সুত ও বলা যায়) তার-নিজের গুরুদেব ব্যাস ঋষি থেকে শুনে জ্ঞান বলেছিলেন। শ্রী ব্যাস ঋষি নারদের কাছ তেখে শুনে আর নারদ তার নিজের পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে জানকারী প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীব্রহ্মার স্বয়ং জ্ঞান নেই যে, সে কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল;(শ্রী দেবী পুরাণ তৃতীয় স্কন্দে) আছে। তবে এর ভাবার্থ এ নয় যে কি পুরাণের জ্ঞান ভুল আছে। যে জ্ঞান ব্রহ্মা ও চেতনা আসার পরে অর্থাৎ হোঁস আসার পরে বলেছিলেন;সেটা ওই স্তর পর্যন্ত্য সঠিক। পরন্তু চেতনা হওয়ার অর্থাৎ হোঁশ আসার পূর্বের জ্ঞান রূপ কথা (লোকবেদ) আছে। যে পূর্ণ পরমেশ্বর প্রথম সত্যযুগে সত সুকৃত নামে প্রকট হয়ে, তত্ত্বদর্শী সন্ত রূপে তত্ত্বজ্ঞান এবং বাস্তবিক সৃষ্টি রচনার জ্ঞান ব্রহ্মা তথা মনু আদিকে দিয়েছিলেন। এরা শুনেও অনশুনা করে দিয়েছিলেন। তার পরে যখন ব্রহ্মার কাছে এদের বংশের ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতে লাগল পরে ও তখন তার শুনা কিছু কথা আর কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে পূর্বের জ্ঞানের সাথে বলেছে। সেই জন্য কোন পুরাণে নির্ণয়ক জ্ঞান যুক্ত নেই। কোন পুরাণ আধারে সিদ্ধ হয় যে বিষ্ণুর উৎপত্তি ব্রহ্মা দ্বারা হয়েছে আর কোন পুরাণে সিদ্ধ করেছে শ্রী ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষ্ণুর দ্বারা হয়েছে। এই সব আদি আদির কারণে সমস্ত ঋষিজন তথা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব সংশয়ের মধ্যেই রয়েছিলেন আর এখনও রয়েছেন।

।। শ্রী ব্রহ্মা ও শ্রী বিষ্ণুর যুদ্ধ ।।

শ্রী শিব পুরাণ (বিদ্যেশ্বর সংহিতা অধ্যায় ৬ অনুবাদক দীন দয়াল শর্মা, প্রকাশক রামায়ণ প্রেস মুম্বই। পৃষ্ঠা ৬৭ তথা সম্পাদক পন্ডিত রামলগ্ন পান্ডে "বিশারদ" প্রকাশক সাবিত্র ঠাকুর, প্রকাশন রথযাত্রা বারাণসী, ব্রাঞ্চ-নাটি ইমলি বারাণসির বিদ্যেশ্বর সংহিতা অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা ৫৪ তথা টীকাকার ডাঃ ব্রহ্মানন্দ ত্রিপাঠী সাহিত্য আয়ূর্বেদ সাহিত্য আয়ূর্বেদ জ্যোতিষ আচার্য, এম, এ.পী.এচ.ডী.ডী.এস.সী.এ। প্রকাশক চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ৩৮ ইউ-এ জবাহর নগর। বাংলো রোড, দিল্লি, সংস্কৃত সহিত শিব পুরাণের বিদ্যেশ্বর সংহিতা অধ্যায় ৬ পৃষ্ঠা ৪৫-তে)।

শ্রী ব্রহ্মা শ্রী বিষ্ণুর কাছে এসেছিলেন। ওই সময় লক্ষী ও বিষ্ণু দুইজনে শেষ শয্যায় শুয়েছিলেন সাথে অনুচরও ছিল। শ্রী ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলছেন, পুত্র ওঠ্ দেখ্ তোর বাবা এসেছে, আমি তোর প্রভু। এরপরে বিষ্ণু বললেন এসো, বসো আমি তোমার পিতা আছি। তবে তোমার মুখ বাঁকা কেনো হয়ে গিয়েছে। ব্রহ্মা বললেন, হে পুত্র ! এখন তোর অভিমান হয়েছে, আমি তোর সংরক্ষকই নয়, আমি সমস্ত জগতের পিতা। বিষ্ণু বললেন চোর, তুই বড়প্পন (নিজেকে বড়) কি দেখাচ্ছিস ? সব জগৎ তো আমার মধ্যে নিবাস করে। তুই আমার নাভি কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছিস্ আর আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার আর এই রকম কথা বলছিস। এই বলে দুই প্রভু অস্ত্রদ্বারা লড়তে শুরু করে দেন। একজন আরেকজনের বক্ষস্থলে আঘাত করে। এই দেখে সদাশিব (কালরূপ ব্রহ্ম) এক তেজোময় লিঙ্গ দুইজনের মাঝখানে দাঁড় করে দিলেন, তবেই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। (এই উপরোক্ত বিবরণ গীতা প্রেস গোরখপুর বালা শিবপুরাণে লেখা আছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত সহিত যে উপরে লেখা আছে এবং অন্য দুই সম্পাদকের তথা প্রকাশক বালা শিবপুরাণে সঠিক আছে)।

বিচার করেন ঃ— শ্রী শিবপুরাণ শ্রী বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রী ব্রহ্মা পুরাণ এবং শ্রী দেবী মহাপুরাণে তিন প্রভু ও সদাশিব (কালরূপী ব্রহ্মা) তথা দেবীর (শিবা-প্রকৃতি) জীবন লীলা আছে। এর আধারে সমস্ত ঋষিগণ ও গুরুগন জ্ঞান শুনিয়েছেন বা শুনাতেন। যদি কোনো পবিত্র পুরাণে ভিন্ন জ্ঞান বলে থাকে, সেটা পাঠ্য ক্রমের (সিলেবসের) বিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়াতে ব্যর্থ।

উপরোক্ত যুদ্ধের বিবরণ পবিত্র শিব পুরাণে আছে, যেখানে দুই প্রভুই পাঁচ বছরের বাচ্চার মত লড়াই করেছিল। একজন বলে তুই আমার পুত্র আরেকজন বলে তুই আমার পুত্র, আমি তোর বাপ। একজন আরেক জনকে ঘুসি লাথি মারামারি সব রকমই করে ঝগড়া করেছে। এই চরিত্র ত্রিলোক নাথদের।

উপরোক্ত তিন পুরাণ (শ্রীব্রহ্মা পুরাণ, শ্রী বিষ্ণু পুরাণ তথা শ্রী শিবপুরাণ)-এর প্রারম্ভ তো কালরূপী ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন থেকে হয়েছে, যিনি ব্রহ্মালোকে মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিব রূপধারণ করে থাকে এবং তার নিজের লীলা ও ওই উপরোক্ত রূপেই করে থাকেন। নিজের বাস্তবিক কালরূপ লুকিয়ে রাখেন ও পরে বিবরণ রাজোগুণ-ব্রহ্মার সতগুণ-বিষ্ণুর ও তমোগুণ-শিবের লীলার মাধ্যমে হয়ে থাকে। উপরোক্ত জ্ঞানের আধারে পবিত্র পুরাণকে বুঝতে খুব আসান (সরল) হবে।

।। শ্রী বিষ্ণু পুরাণ ।।

(অনুবাদক শ্রী মুনিলাল গুপ্ত প্রকাশক গোবিন্দভবন কার্যালয়, গীতা প্রেস গোরখপুর)।

শ্রী বিষ্ণুপুরাণের জ্ঞান শ্রী পারাশর ঋষি নিজের শিষ্য শ্রী মৈত্রেয় ঋষিকে বলেছিলেন। শ্রী পরাশর ঋষি বিবাহ করেই গৃহ ত্যাগ করেন, বনে সাধনা করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। তার ধর্ম-পত্নী বললেন কেবলই বিয়ে হয়েছে আর আপনি এখনই ঘর ত্যাগ করে যাচ্ছেন। আপনি-সন্তান উৎপত্তি করার পরে সাধনা করতে যান। তখন পরাশর ঋষি বললেন যে, সাধনা করার পরে সন্তান উৎপন্ন করলে, সে তাহলে সুসংস্কার বালা সন্তান উৎপন্ন হবে। আমি কিছু সময় কাটার পরে আপনার জন্য আমার শক্তি (বীর্য) কোন এক পাখীর দ্বারা পাঠিয়ে দেব, আপনি গ্রহণ করে নেবেন। এই বলে ঘর ত্যাগ করে বানপ্রস্থ হলেন। এক বৎসর সাধনা করার পর, নিজের বীর্য বের করে, এক পাতায় বেঁধে নিজের মন্ত্র শক্তি দিয়ে শুক্রাণু রক্ষা করে, এক কাক্‌কে বললেন, এই পাতা আমার পত্নীকে দিয়ে আয়। কাক ওই পাতা নিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তার ঠোঁট থেকে ওই পাতার পুরিয়া নদীর মধ্যে পড়ে যায়, তাহা এক মাছে খেয়ে নেয়। কয়েকদিন পরে ঐ মাছকে এক মাঝি ধরে কাটে, কাটার পরে একটা মেয়ে বের হয়। ওই মাঝি সেই মেয়ের নাম সত্যবতী রাখল। (আবার ওই মেয়ের (মাছের পেট থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে তার আরেক নাম) মছোদরী রেখেছিল। সত্যবতী (মছোদরী)-কে নিজের পুত্রীর মত পালন করত।

কাক ফিরে গিয়ে পরাশর ঋষিকে সব বৃত্তান্ত শোনায়। যখন সাধনা সমাপ্ত করে শ্রী পরাশর ঋষি ষোল বছর পরে গৃহে ফিরে আসে, তখন নদী পাড় হওয়ার জন্য মাঝিকে ডেকে বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি ওপাড়ে নিয়ে চলো, আমার পত্নী আমার প্রতীক্ষা করছে। ওই সময় মাঝি তখন খেতে বসেছিল। শ্রী পরাশর ঋষির বীজ দ্বারা যে মাছ থেকে উৎপন্ন চৌদ্দ বছরের যুবা কন্যা ছিল, সে নিজের পিতার খাবার নিয়ে ওখানেই উপস্থিত ছিল। মাঝি জানত যে, সাধনা তপস্যা করে আসা ঋষি সিদ্ধিযুক্ত হয়ে থাকেন। আজ্ঞা পালন না করলে রেগে অভিশাপ দেবেন। মাঝি বলল ঋষিবর আমি খেতে বসেছি, অধুরা (অর্ধেক) খাওয়া ছেড়ে আসলে অন্নদেবের অপমান হবে আমার পাপ লাগবে।

কিন্তু পরাশর মুনি একটুও শুনিনি। ঋষিকে উতাবলা হচ্ছে জেনে মাঝি নিজের যুবতী পুত্রীকে বলল ঋষিকে ওপাড় ছেড়ে আয়। পিতার আদেশ পেয়ে পুত্রী নৌকায় ঋষি পরাশরকে নিয়ে রওনা দেয়। নদীর মাঝখানে যাওয়ার পরে, নিজেরই বীজ শক্তিতে (বীর্যতে) মাছের পেট থেকে উৎপন্ন হওয়া মেয়ের অর্থাৎ নিজের পুত্রীর সঙ্গে দুষ্কর্ম করার ইচ্ছা প্রকট করেন। মেয়েটাও নিজের পালক পিতার অর্থাৎ মাঝি পিতার কাছ থেকে ঋষিদের ক্রোধে অভিশাপ প্রাপ্ত দুঃখী ব্যক্তির কথা কাহিনী শুনত, অভিশাপের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কন্যা বললে ঋষিবর! আপনি ব্রাহ্মন, আর আমি এক শুদ্রের পুত্রী আছি। এইশুনেও ঋষির যেন কোন চিন্তা নেই, মেয়েটা তখন নিজের ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্য বলল ঋষিবর ! আমার শরীর থেকে মাছের দূর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঋষি পরাশর তখন নিজের সিদ্ধি শক্তি দ্বারা মাছের দূর্গন্ধ সমাপ্ত করে দিলেন। পরে মেয়েটা বলল দুই কিনারা সব লোক দেখবে। ঋষি পরাশর গঙ্গা নদীর জল হাতে নিয়ে মন্ত্র শক্তি দ্বারা আকাশে ছুঁড়ে মারতেই সবদিকে কুয়াশায় ছেয়ে গেল এবং নিজের মনোরথ পূর্ণ করে। মেয়েটা তার পালক

পিতাকে পালক মাতার মাধ্যমে পুরো ঘটনা অবগত করাল এবং একথাও বলল ঋষির নাম পরাশর অর্থাৎ বশিষ্ঠ ঋষির পৌত্র (নাতি)। সময় আসতেই কুমারী কন্যার গর্ভ থেকে শ্রী ব্যাসদেবের উৎপত্তি হয়। ঐ শ্রী পরাশর ঋষির দ্বারা বিষ্ণুপুরাণ রচনা হয়। শ্রী পরাশর বললেন, হে মৈত্রেয়, যে জ্ঞান আমি তোমাকে শুনাতে যাচ্ছি ওই প্রসঙ্গ দক্ষাদিমুনি নর্মদার পাড়ে রাজা পুরু কুৎস কে শুনিয়েছিলেন। পুরু কুৎস সারস্বত কে আর সারস্বত আমাকে বলেছিল। শ্রী পরাশর শ্রী বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩-তে বলেছে, এই জগৎ বিষ্ণু দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তার মধ্যে স্থিত আছে। তিনি এর স্থিতি ও লয় কর্ত্তা। অধ্যায় ২ শ্লোক ১৫-১৬ পৃষ্ঠা ৪-তে বলছে হে দ্বিজ; পরব্রহ্মের প্রথম রূপ পুরুষ অর্থাৎ ভগবানের মত লাগে, কিন্তু ব্যক্ত (মহাবিষ্ণু রূপে প্রকট হওয়া) বা অব্যক্ত (অদৃশ রূপে বাস্তবিক কাল রূপে একুশ ব্রহ্মাণ্ডে থাকা) তার অন্য রূপ আছে অতএব "কাল" তার পরম রূপ আছে। ভগবান বিষ্ণু যে কাল রূপে ও ব্যক্ত আর অব্যক্ত রূপে স্থিত হয়ে আছে, এটা তার বালবত লীলা।

অধ্যায় ২ শ্লোক নং ২৭ পৃষ্ঠা ৫-তে বলেছে-হে মৈত্রেয় ! প্রলয় কালে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির সাম্য (সমান) অবস্থাতে স্থির হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক হলে পরে বিষ্ণু ভগবানের কাল রূপ প্রবৃত হয়ে থাকে।

অধ্যায় ২ শ্লোক নং ২৮ থেকে ৩০ পৃষ্ঠা ৫-তদন্তর (স্বর্গকাল উপস্থিত হলে পরে) ওই পরব্রহ্ম পরমাত্মা বিশ্বরূপ সর্বব্যাপী সর্বভূতেশ্বর সর্বাত্মা পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছা থেকে বিকারী প্রধান আর অবিকারী পুরুষে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে ক্ষোভিত করেছে।। ২৮-২৯।। যে প্রকার ক্রিয়াশীল না হওয়ার পরেও গন্ধ নিজের সন্নিধি মাত্রতেই প্রধান ও পুরুষকে প্রেরিত করে।

বিশেষ ঃ— শ্লোক সংখ্যা ২৮ থেকে ৩০-তে স্পষ্ট করেছে যে কি প্রকৃতি (দূর্গা) ও পুরুষ (কাল প্রভু) থেকে অন্য কোন আরও পরমেশ্বর আছেন, যিনি এই দুইজনকে দিয়ে পুনর সৃষ্টির রচনার জন্য প্রেরিত করে থাকেন।

অধ্যায় ২ পৃষ্ঠা ৮-উপর শ্লোক ৬৬-তে লেখা আছে, তিনি প্রভু বিষ্ণু সৃষ্টা (ব্রহ্মা) হয়ে নিজেই সৃষ্টি করেন। শ্লোক সংখ্যা ৭০-তে লেখা আছে, ভগবান বিষ্ণুই ব্রহ্মা আদি অবস্থার দ্বারা রচনে বালা। তিনিই রচতে থাকে, আর স্বয়ংই সংহৃত অর্থাৎ মরতে থাকে। অধ্যায় ৪ শ্লোক ৪ পৃষ্ঠা ১১-তে লেখা আছে যেকি, কোন অন্য এক পরমেশ্বর আছে যে ব্রহ্মা শিব আদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আছেন। অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৪-১৫, ১৭-২২ পৃষ্ঠা ১১-১২-তে লেখা আছে। পৃথিবী বলছে-হে কাল স্বরূপ। আপনাকে নমস্কার, হে প্রভু ! আপনিই জগতের সৃষ্টির আদির জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র রূপ ধারণ করে থাকো। আপনার যে রূপ অবতার রূপে প্রকট হয়ে থাকে, তাকেই দেবগণ পূজা করে। আপনিই ওঁ-কার আছেন। অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫০ পৃষ্ঠা ১৪-তে লেখা, পরে ওই ভগবান হরি রজোগুণ যুক্ত হয়ে চতুর্মুখ ধারী ব্রহ্মা রূপ ধারণ করে সৃষ্টি রচনা করেছে।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, পরাশর মুনি, একজনের কাছ থেকে শুনে রাখা জ্ঞান অর্থাৎ লোকবেদের আধারে শ্রী বিষ্ণুপুরাণ রচনা করা হয়েছে। কেননা বাস্তবিক জ্ঞান পূর্ণ পরমাত্মা প্রথম সত্যযুগে স্বয়ং প্রকট হয়ে শ্রী ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা কিছু সত্য জ্ঞান আর কিছু (স্বনির্মিত) কাল্পনিক জ্ঞান নিজের বংশকে বলেছিলেন। এক থেকে অন্যকে শুনতে ও শুনাতেই লোকবেদ

হওয়ার পরে ওই জ্ঞান পরাশর ঋষি প্রাপ্ত হয়। শ্রী পরাশর বিষ্ণুকে কালও বলেছেন এবং পরব্রহ্ম ও বলেছেন। উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে যে বিষ্ণু অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ কাল, নিজের উৎপত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব রূপে সৃষ্টি উৎপন্ন করেন। ব্রহ্ম (কাল) ই ব্রহ্ম লোকে তিন রূপে প্রকট হয়ে লীলা করে ছল করেন। সে স্বয়ংই মরে (বিশেষ জানকারী (জানার জন্য) কৃপা করে পড়ুন "প্রলয়ের জানকারী" পুস্তক 'গহরী নজর গীতা'তে অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ এর ব্যাখ্যাতে)। ওই ব্রহ্ম লোকে তিন স্থান বানিয়েছে। এক রজোগুণ প্রধান, তাতে ওই কাল রূপী ব্রহ্ম নিজে ব্রহ্মা রূপ ধারণ করে থাকে, এবং নিজ পত্নী দূর্গাকে সাথে রেখে এক রজোগুণ প্রধান পুত্র উৎপন্ন করেন। তার নাম ব্রহ্মা রেখেছেন। তার দ্বারা এক ব্রহ্মাণ্ডে উৎপত্তি করায়। এই প্রকার ওই ব্রহ্ম লোকে এক সতগুণ প্রধান স্থান বানিয়ে স্বয়ং বিষ্ণু রূপ ধারণ করে থাকে এবং তার পত্নী দূর্গা (প্রকৃতি) কে পত্নী রূপে রেখে এক সতগুণযুক্ত পুত্র উৎপন্ন করে, তার নাম বিষ্ণু রাখে। ওই পুত্রকে কে ব্রহ্মাণ্ডে তিন লোক (পৃথিবী, পাতাল ও স্বর্গ)-তে স্থিতি বানিয়ে রাখার কার্য করায়। (প্রমাণ শিবপুরাণ গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত অনুবাদ হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিমন লাল গোস্বামী রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬-৭ পৃষ্ঠা ১০২-১০৩)।

ব্রহ্ম লোকেই এক তমোগুণ প্রধান তৃতীয় স্থান রচনা করে, তাতে স্বয়ংশিব রূপ ধারণ করে কাল থাকে তথা নিজের পত্নী দূর্গা (প্রকৃতি)-কে সাথে রেখে পতি পত্নীর ব্যবহার করে তৃতীয় পুত্র তমোগুণ যুক্ত উৎপন্ন করেন। তার নাম শঙ্কর (শিব) রাখে। এই পুত্র দ্বারা তিন লোকের প্রাণীকে সংহার করে।

বিষ্ণু পুরাণ অধ্যায় ৪ পর্যন্ত্য যে জ্ঞান আছে, সে সব জ্ঞান কাল রূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতিনিরঞ্জনের জ্ঞান।

অধ্যায় ৫ থেকে পরের মেলানো জ্ঞান কালের পুত্র সতোগুণ বিষ্ণুর লীলার আছে, তথা তার অবতার শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ আদির জ্ঞান।

বিশেষ বিচার করার কথা যে ঃ— বিষ্ণু পুরাণের বক্তা শ্রী পরাশর ঋষি ছিলেন। ঐ জ্ঞান দক্ষাদি ঋষির মুখ থেকে পুরুকুৎস শুনেছে, পুরুকুৎস থেকে সারস্বত আর সারস্বতের কাছ থেকে পরাশর ঋষি শুনে। ঐ জ্ঞান শ্রী বিষ্ণু পুরাণে লিপিবদ্ধ করেছেন। যা কিনা সবার কর কমলে আছে। এতে কেবল এক ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান তাও অধুরা আছে। শ্রী দেবীপুরাণ, শ্রী শিব পুরাণ আদি পুরাণের জ্ঞানও ব্রহ্মাই দিয়েছেন। পরাশর ঋষির জ্ঞান ও শ্রী ব্রহ্মার দ্বারা দিয়া জ্ঞানের সমান হতে পারে না। এই জন্য শ্রী বিষ্ণুপুরাণকে বোঝার জন্য দেবীপুরাণ ও শিবপুরাণের সহযোগ নিতে হবে। কেননা এ জ্ঞান দক্ষাদি ঋষির পিতা ব্রহ্মা দিয়েছিলেন। শ্রীদেবী পুরাণ তথা শ্রী শিবপুরাণকে বোঝার জন্য শ্রীমদ ভগবত গীতা ও চারি বেদের সহযোগ নিতে হবে। কেননা এ জ্ঞান স্বয়ং ভগবান কালরূপী ব্রহ্ম দ্বারা দিয়ে দিয়েছেন। যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে উৎপন্ন কর্ত্তা বা পিতা। পবিত্র বেদ ও পবিত্র শ্রীমদ ভগবত গীতার জ্ঞানকে বুঝতে হলে, স্বসম বেদ অর্থাৎ সুক্ষ বেদের সহযোগ নিতে হবে যা কালরূপী ব্রহ্মের উৎপত্তি কর্ত্তা অর্থাৎ পিতা পরম অক্ষর ব্রহ্ম (কবির্দেব) দিয়েছেন। যে (কিবগীর্ভিঃ) কবীর বাণী দ্বারা স্বয়ং সৎপুরুষ প্রকট হয়ে বলেছিলেন। (ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত্য প্রমাণ আছে।

।। শ্রী ব্রহ্মা পুরাণ ।।

এই পুরাণের বক্তা শ্রী লোমহর্ষণ ঋষি, যিনি ব্যাস ঋষির শিষ্য ছিলেন ! যাকে সূতজি ও বলা হয়। শ্রী লোমহর্ষন (সূতজি) বলছেন, এ জ্ঞান প্রথমে শ্রী ব্রহ্মা দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ মুণিকে শুনিয়েছিলেন। তাহাই আমি শুনাচ্ছি। এই পুরাণের সৃষ্টির বর্ণন নামক অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ২৭৭ থেকে ২৭৯ পর্যন্ত্য) বলেছেন যে, শ্রী বিষ্ণু সর্ববিশ্বের আধার আছেন; যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে জগতের উৎপত্তি তথা পালন ও সংহার করেন। ওই ভগবান বিষ্ণুকে আমার নমস্কার।

যে নিত্য সদসত্ সরূপ তথা কারণভূত অব্যক্ত প্রকৃতি আছেন তাকেই প্রধান বলা হয়। তার দ্বারা পুরুষ এই বিশ্বের নির্মাণ করেছেন। অমিত তেজস্বী ব্রহ্মাকেই পুরুষ বুঝে নিও। সে সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করেন তথা ভগবান নারায়ণের আশ্রিত। স্বয়ম্ভু ভগবান নারায়ণ জলের সৃষ্টি করেছেন। নারায়ণ থেকে উৎপত্তি হওয়ার কারন জল কে নার বলা হয়। ভগবান প্রথমে জলের উপর বিশ্রাম করেছেন। এইজন্য ভগবানকে নারায়ণ বলা হয়। ভগবান জলের মধ্যে নিজের শক্তি ছেড়ে তার থেকে এক সুবর্ণময় ডিম প্রকট হয়েছে। তাতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে, এই রকম শোনা যায়। এক বর্ষ পর্যন্ত্য ডিমের মধ্যে নিবাস করে, ব্রহ্মা তাকে দুই টুকরো করে দিলেন। এক থেকে ধুলোক হয়েছে আর অন্য থেকে ভূলোক।

তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মা নিজের ক্রোধ থেকে রুদ্রকে প্রকট করে। উপরোক্ত জ্ঞান ঋষি লোমহর্ষণ (সূতজি)-র বলা যাহা পরে শুনে শুনে (লোকবেদ) হয়ে যায় যা অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। কেননা বক্তা বলছেন এই রকম শুনেছি। ইহা পূর্ণ জানতে হলে শ্রী দেবী পুরাণ, শ্রী শিব মহাপুরাণ, শ্রী মদ ভাগবত গীতা এবং চারি বেদে ও পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান যা স্বসম বেদ অর্থাৎ যাকে কবির্বাণী (কবীর বাণী) বলা হয়। তারজন্য কৃপা করে পড়ুন "গহরী নজর গীতা-তে 'পরমেশ্বরের সার সংবাদ, পরিভাষা প্রভুর তথা, যথার্থ জ্ঞান প্রকাশে। (বাস্তবিক জ্ঞানকে স্বয়ং প্রকট হয়ে কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) নিজের প্রিয় সেবক ধর্মদাস সাহেব (বান্ধব গড় বালা)-কে পুনরবার ঠিকঠাক করে বলে গিয়েছিলেন। যা এই পুস্তকে, সৃষ্টি রচনাতে বর্ণিত আছে কৃপা করে পড়ুন)।

শ্রী পরাশর ঋষি কাল ব্রহ্মকে পরব্রহ্মও বলেন এবং ব্রহ্মও তথা বিষ্ণুও বলেন আবার একেই অনাদি বা অমরও বলেন। এই ব্রহ্মের নাকি বা কালের নাকি জন্ম মৃত্যু হয় না। তারজন্য এই ঋষি বুদ্ধি অতএব বাল বুদ্ধি সিদ্ধ হয়।

বিচার করুন ঃ— বিষ্ণু পুরাণের জ্ঞান এক ঋষি দ্বারা বলা হয়েছে (যা কিনা একমুখ থেকে অন্য মুখে শোনা জ্ঞান যাকে রূপকথাও বলা যেতে পারে) এই দন্ত কথার আধারেই বলা হয়েছে। ব্রহ্মা পুরাণের জ্ঞান লোমহর্ষণ ঋষি দক্ষাদি ঋষির কাছ থেকে শুনেছিলেন তাই লেখা আছে। এইজন্য বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মাপুরাণ বুঝতে হলে, শ্রী দেবী পুরাণ তথা শিব পুরাণের সহযোগ নিতে হবে। যে স্বয়ং ব্রহ্মাজি নিজের পুত্র নারদকে শুনিয়েছিলেন, শ্রী ব্যাস ঋষি দ্বারা গ্রহণ হয়েছিল ও লেখা হয়েছিল। অন্য পুরাণের জ্ঞান ব্রহ্মার জ্ঞানের সমান হতে পারে না। এইজন্য অন্য পুরাণ বুঝতে হলে দেবীপুরাণ ও শিবপুরানের সহযোগ নিতে হবে। কেননা এ জ্ঞান দক্ষাদি ঋষির পিতা ব্রহ্মা বলেছিলেন। শ্রী দেবীপুরাণ ও শ্রীশিব পুরাণকে বুঝতে হলে শ্রীমদ ভগবত ও চারিবেদের সহযোগ নিতে হবে। কেননা এ জ্ঞান স্বয়ং ভগবান কাল রূপী ব্রহ্ম দ্বারা দেওয়া হয়েছিল। যে কিনা

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপন্ন কর্তা বা পিতা। পবিত্র বেদ ও পবিত্র শ্রীমদভাগবত গীতার জ্ঞান বুঝতে হলে স্বসম বেদ অর্থাৎ সুক্ষ্ম বেদের সহযোগ নিতে হবে। যিনি কাল রূপী ব্রহ্মার উৎপত্তি কর্ত্তা, অর্থাৎ পরম পিতা অক্ষর ব্রহ্ম(কবির্দেব) এর দেওয়া। যে (কবিগীর্ভিঃ) কবিরবাণী দ্বারা স্বয়ং সতপুরুষ প্রকট হয়ে বলেছিলেন। (ঋক্‌বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত প্রমাণ আছে।) আর শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে ভগবান কাল অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং নিজের স্থিতির কথা বলেছিল যা সত্য আছে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৮ তে বলেছে, আমি (কাল রূপী ব্রহ্ম) আমার নিজের একুশ ব্রহ্মান্ডের মধ্যে যত প্রাণী আছে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ আছি। সে যেরকম স্থূল শরীরে নাশবান হোক বা আত্মারূপে অবিনাশী হোক। এই জন্য লোক বেদে (শুনাশুনি জ্ঞান)-এর আধারে আমায় পুরযোত্তম মানে। বাস্তবে পুরযোত্তম তো আমা (ক্ষরপুরুষ/কাল) থেকে তথা অক্ষরপুরুষ (পরব্রহ্ম) -থেকেও অন্য একজন আছে। তাকেই বাস্তবে ভগবান বা পরমাত্মা বলা হয়। তিন লোকে প্রবেশ করে সকলকে ধারণ পোষণ করেন। তিনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর। (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭)। গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম স্বয়ং বলছে যে, হে অর্জুন! তোর এবং আমার বহুবার জন্ম হয়েছে, সে কথা তুই জানিস না আমি জানি। শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৫ অধ্যায় ২ শ্লোক নং ১২-তে প্রমাণ আছে এবং অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮ তে নিজের সাধনাকেও (অমুত্তমাম্) অতি অশ্রেষ্ঠ বলেছে। এইজন্য অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলছে হে অর্জুন! সর্ব ভাব দিয়ে ওই পরমেশ্বরের শরণে যা, যার কৃপাতে তোর পরমশান্তি প্রাপ্ত হবে আর কোন দিন সে স্থান নষ্ট হয় না, এমন লোক অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত হবে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪-তে বলছে, যখন তোকে তত্ত্বদর্শী প্রাপ্ত হয়ে যাবে (যে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ তথা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১-তে বর্ণিত আছে) তার পরে ওই পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা দরকার; যেখানে গেলে সাধকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না, অতএব পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। যে পরমেশ্বরের দ্বারা এই সমস্ত সংসার উৎপন্ন হয়েছে তথা যিনি সবাইকে ধারণ-পোষণ করে থাকেন। আমি (গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্মরূপী কাল)-ও ওই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণে আছি। পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাহার ভক্তি সাধনা ও পূজা করা উচিৎ।

।। শ্রী দেবী মহাপুরাণ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করেন।।

"শ্রী দেবী পুরাণ থেকে আংশিক লেখা এবং সার বিচার"

(সংক্ষিপ্ত শ্রীমদ দেবী ভাগবত, সচিত্র, মোটা টাইপ কেবল হিন্দি, সম্পাদক হণুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিম্মনলাল গোস্বামী, প্রকাশক গোবিন্দ-ভবন-কার্যালয়, গীতা প্রেস, গোরখপুর)

।। শ্রী জগদম্বিকায়ৈ নমঃ।।

শ্রী দেবী মদভাগবত

তৃতীয় স্কন্ধ

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রী ব্যাসের কাছে ব্রহ্মাণ্ডের রচনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তখন শ্রী ব্যাসজি বললেন রাজন, আমি এই প্রশ্নই নারদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; সেই বর্ণন আপনাকে শুনাচ্ছি

তারপরে ব্যাসজি বললেন যে, আমি নারদকে জিজ্ঞাসা করি যে এই ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা কে? কেউ বলে শঙ্কর ভগবান এর রচয়িতা। কেউ বলে বিষ্ণু ভগবান, কেউ বলে ব্রহ্মা তথা অনেক ব্রাহ্মণে ভবাণীকে সর্ব মনোরথ পূর্ণ করে বলে। সে আদিমায়া মহশক্তি তথা পরম পুরুষের সাথে থেকে কাজ সম্পাদন করে থাকেন প্রকৃতি। ব্রহ্মের সাথে তার অভেদ সম্পর্ক আছে। (পৃষ্ঠা ১১৪)

নারদ বলছেন — ব্যাসজি, প্রাচীন সময়ের কথা ;এই সন্দেহ আমার হৃদয়েও উৎপন্ন হয়ে ছিল। তখন আমি নিজের পিতা অমিত তেজস্বী ব্রহ্মার স্থানে গেলাম;আর তার কাছে এই বিষয়ে, যা তুমি এখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে, ওই বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। 'আমি বললাম পিতা ! এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে? এর রচনা আপনি করেছেন না, বিষ্ণু ভগবান করেছেন না শিব প্রভু করেছেন, কৃপা করে সত্য সত্য বলবেন।

ব্রহ্মা বললেন — পৃষ্ঠা ১১৫ থেকে ১২০ তথা ১২৩, ১২৫, ১২৮, ১২৯ পুত্র! আমি এই প্রশ্নের কি উত্তর দেব? এই প্রশ্ন খুবই জটিল। পূর্বকালে সমস্ত জায়গায় জলই জল ছিল। তখন পদ্মফুল থেকে আমি উৎপত্তি হয়েছি, আমি পদ্মফুলে বসে বিচার করতে লাগলাম যে, এই অগাধ জলের মধ্যে আমি কিভাবে উৎপন্ন হলাম? কে আমাকে রক্ষা করেছেন? পদ্মফুলের ডান্ডি ধরে আমি জলের তলায় গেলাম। ওখানে আমি বিষ্ণুকে শেষ নাগের শয্যায় দর্শন করলাম, সে যোগ নিদ্রায় বশীভূত হয়ে গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে ছিল। এর মধ্যে ভগবতী যোগ নিদ্রাকে মনে পড়ে। আমি তার স্তবন করলাম। তখন সে ভগবতী কল্যাণময়ী শ্রী বিষ্ণুর বিগ্রহ থেকে বেরিয়ে অচিন্ত রূপধারণ করে আকাশে বিরাজমান হয়ে গেল। দিব্য আভূষণ তার অঙ্গে পড়ছে। যখন যোগনিদ্রা বিষ্ণুর শরীর থেকে বেরিয়ে আকাশে বিরাজমান হয়ে গেলেন, তখনই শ্রীহরি উঠে বসলেন। তখন ওখানে আমি আর বিষ্ণুই ছিলাম, ওখানে রুদ্রও প্রকট হয়ে গেল। তখন আমাদের তিনজনকে দেবী বললেন-ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর! তোমরা ঠিকমত সাবধান হয়ে নিজ নিজ কাজে সংলগ্ন হয়ে যাও। সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহার এ তোমাদের কাজ। এর মধ্যে এক সুন্দর বিমান আকাশ থেকে নামতে দেখে, দেবী বললেন, দেবতারা তোমরা নির্ভীক হয়ে ওই বিমানে প্রবেশ কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, আজ তোমাদের এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাব।

আমরা তিন দেবতা ওই বিমানে বসা মাত্র, দেবী নিজ সামর্থে বিমানকে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। এর মধ্যে আমাদের বিমান খুব তেজভাবে উড়তে লাগল আর ওই দিব্যধাম-ব্রহ্ম লোকে গিয়ে পৌঁছায়। ওখানে এক অন্য ব্রহ্মা বিরাজমান ছিল। তাকে দেখে ভগবান বিষ্ণু ও শিবের বড় আশ্চর্য্য মনে করল, তাই ভগবান শঙ্কর ও বিষ্ণু আমাকে জিজ্ঞাসা করল চতুরানন! এ অবিনাশী ব্রহ্মা কে? আমি বললাম আমি কিছু জানি না, সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা তিনি কে? ব্রহ্মবললেন, ভগবান! আমি কে? আর আমার উদ্দেশ্য কি, ওই উলঝনে আমার মন চক্কর কাটছে।

এরমধ্যে মনের মত বিমান তীব্রগামী ভাবে ছুটে কৈলাস পর্বতের শিখরে গিয়ে পৌঁছাল ওখানে বিমান পৌঁছতেই ওই ভব্য ভবন থেকে ত্রিনেত্র ধারী ভগবান শঙ্কর বেরোলেন, সে নন্দীবৃষভের উপর বসে ছিল।

কয়েকক্ষণ বাদ ওই বিমান শিখর থেকে পবনের বেগে উড়ে বৈকুন্ঠ লোকে পৌঁছায়। ওখানে ভগবতী লক্ষীর বিলাস ভবন ছিল, তবে পুত্র নারদ ওখানে আমি যা সম্পত্তি দেখেছি, তার বর্ণন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ওই উত্তমপুরীকে দেখে বিষ্ণুর মন আশ্চর্য্য সমুদ্রে হাবুডাবু খেতে লাগল। ওখানে কমললোচন শ্রীহরি বিরাজমান ছিল তার চার হাত ছিল।

এর মধ্যে হাওয়ার বেগে উড়তে লাগল, সামনে অমৃতের সমান মিষ্টি জলের সমুদ্র পেলাম। সেখানে এক মনোহর দ্বীপ ছিল।

ওই দ্বীপে এক মঙ্গলময় পালঙ্ক বিছানো ছিল। ওই উত্তম পালঙ্কের উপর এক দিব্য রমনী বসে ছিলেন। আমরা সব মিলে বলাবলি করছি, এই সুন্দরী কে? এর নাম বা কি? আমরা এর বিষয়ে একদম অনভিজ্ঞ আছি।

পুত্র নারদ! এমন সন্দেহ গ্রহ হয়ে আমরা ওখানেই ছিলাম, তখন ভগবান বিষ্ণু ওই চারুসাহিনী ভগবতীকে দেখে, বিবেক পূর্বক নিশ্চয় করে নেয়, এ ভগবতী জগৎ অম্বিকাই হবে। তখন তিনি বললেন এই ভগবতী আমাদের সবার আদি কারণ। মহাবিদ্যা ও মহামায়া তার নাম, তিনি পূর্ণ প্রকৃতি, ও বিশ্বেশ্বরী, বেদগর্ভা ইনাকেই শিবা বলা হয়। এই সেই দিবঙ্গনা আছে, যে প্রলয়ার্ণবে আমাকে দর্শন দিয়েছিল। ওই সময় আমার বালকরূপ ছিল, আমাকে ঝুলনায় ঝুলাতো, (বটবৃক্ষের পাতার উপর এক সুদৃঢ় বিছানা বিছানো ছিল। তার উপর শুয়ে আমি আমার পায়ের আঙুল চুষতাম মুখে নিয়ে আর খেলতাম। এই দেবী গান গেয়ে আমাকে ঝুলাতো, তিনি সেই দেবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। ইনাকে দেখে আমার আগের কথা মনে পড়েছে ইনিই আমাদের সবার জননী।

শ্রী বিষ্ণু সময়ানুসারে ঐ ভগবতী ভুবনেশ্বরীর স্তুতি আরম্ভ করে, ভগবান বিষ্ণু বললেন— প্রকৃতি দেবিকে নমস্কার, ভগবতী বিধাত্রীকে নিরন্তর নমস্কার, তুমি শুদ্ধস্বরূপা আছ, এই সারা সংসার তোমার থেকে উদ্ভাসিত আছে। আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা ও শঙ্কর আমরা সবাই তোমার কৃপাতেই বিদ্যমান আছি। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম/উৎপন্ন) আর তিরোভাব (মৃত্যু) হয়ে থাকে। কেবল তুমিই নিত্য, জগৎজননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী আছো।

ভগবান শঙ্কর বললেন—দেবী! যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমার দ্বারা প্রকট হয়ে থাকে, তারপরে উৎপন্ন হওয়া ব্রহ্মাও যদি তোমার বালক হয় তবে আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান হলাম না? অর্থাৎ আমাকেও উৎপন্ন করেছো তুমিই। এই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করায় তোমার গুণ সদা সমর্থ আছে। ওই তিন গুণে উৎপন্ন আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর নিয়মিত অনুসার কার্য্যতে তৎপর বা ব্যস্ত থাকি। পরে বিষ্ণু বললেন, আমি ব্রহ্মা ও ও শিব বিমানে চড়ে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় আমরা নতুন নতুন জগৎ দেখতে পাই, তখন ভবানীকে বললাম ভবানী! তবে বলেন তো ঐগুলো কে বানিয়েছেন?

এইজন্য এই প্রথম দেখুন, শ্রী মদ দেবীভাগবত মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণ দাস প্রকাশ মুম্বই, এর মধ্যে সংস্কৃত সহিত হিন্দি অনুবাদ আছে।

।। তৃতীয় স্কন্দে অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক ৪২।।

ব্রহ্মা- অহম্ ঈশ্বর ঃ ফিল তে প্রভাবাৎসর্বে বযং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ,

কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা।। ৪২।।

হিন্দি অনুবাদ ঃ— হে মাত! ব্রহ্মা, আমিও শিব তোমারই প্রভাবে জন্মবান আছি, নিত্য নই বা আমরা অবিনাশী নই, তবে অন্য ইন্দ্রাদি দ্বিতীয় দেবতারা কি প্রকারে নিত্য হতে পারে? তুমিই অবিনাশী প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী ই আছো। (৪২)

।। পৃষ্ঠা ১১-১২ অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ৮ ।।

যদি দয়ার্দমনা ন সদাংঽবিকে কথমহং বিহিত ঃ চ তমোগুণ ঃ
কমলজশ্চ রজোগুণ সম্ভব ঃ সুবিহিত ঃ কিমু সত্যগুণং হরিঃ। (৪)

অনুবাদ ঃ— ভগবান শঙ্কর বললেন:- হে মাত! যদি আমার উপর আপনি দয়াযুক্ত হন, তাহলে তমোগুণ কেনো বানালেন, পদ্মফুল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজো গুণ কেন বানালেন, আর বিষ্ণুকে সতগুণ কেন বানালেন? অর্থাৎ জীবকে জন্ম-মত্যু রূপী দুষ্কর্মতে কেন লাগালেন?

শ্লোক ১২ ঃ রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদম্ শিবে।

হিন্দি (বাংলা) — আপনার পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে আপনি সদা ভোগবিলাস করতে থাকেন। আপনার গতি কেউ জানে না।

ব্রহ্মা বলেছিলেন — আমিও মহামায়া জগদম্বিকার চরণে পড়েছি আর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি মাত! বেদ বলে "একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", আছেন তাহলে কি ওই আত্মস্বরূপা আপনি না অন্য কোন পুরুষ?

দেবী বললেন — আমি আর ব্রহ্ম একই আছি। আমাতে ও ব্রহ্মতে কোনদিন কিঞ্চিৎ মাত্র ভেদ নেই। গৌরী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, বৈষ্ণবী, শিবা, বারুণী, কৌবেরী, নারসিংহী আর বাসবী, এইসব আমারই রূপ আছে। পরে বললেন ব্রহ্মা, এই শক্তিকে তুমি নিজের স্ত্রী বানাও, 'মহাসরস্বতী' নামে বিখ্যাত এই সুন্দরী এখন সদা তোমার স্ত্রী হয়ে থাকবে। পরে ভগবতী জগদম্বা ভগবান বিষ্ণুকে বললেন, বিষ্ণো! মনকে মুগ্ধ করে দেয়, এই মহালক্ষীকে তুমি নিয়ে যাও। এ সদা তোমার বক্ষস্থলে বিরাজমান থাকবে।

আবার শঙ্করকে দেবী বললেন, শঙ্কর! মনকে মুগ্ধ করে থাকে এই 'মহাকালী' গৌরী নামে বিখ্যাত আছে। তুমি একে পত্নীরূপে স্বীকার কর।

এখন আমার কার্য্য সিদ্ধ করার জন্য বিমানে বসে তোমরা শীঘ্র যাও। কোনো কঠিন কার্য্য উপস্থিত হলে যখনই আমাকে স্মরণ করবে তখনই আমি তোমাদের সামনে আসব। দেবতারা! আমার ও সনাতন পরমাত্মার ধ্যান তোমরা সব সময় করা উচিৎ। আর আমাদের দুইজনের স্মরণ করতে থাকলে, তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ হতে কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ থাকবে না।

ব্রহ্মা বললেন ঃ—এই প্রকার বলে ভগবতী জগদম্বিকা আমাদের বিদায় দিলেন। তিনি শুদ্ধ আচারবালী শক্তিতে ভগবান বিষ্ণুর জন্য মহালক্ষ্মী, শঙ্করের জন্য মহাকালী, আর আমার জন্য মহাসরস্বতীকে পত্নী বানানোর আজ্ঞা দিলেন, তারপরে ওই স্থান থেকে চলে যায়।

সার বিচার ঃ— এক ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তবিক স্থিতিতে ব্যাস মহর্ষি, মহর্ষি নারদ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর ও অনভিজ্ঞ আছেন। এটাও স্পষ্ট যে, শ্রী দুর্গাকে প্রকৃতিও বলা হয় তথা দূর্গা ও ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন/কাল) পতি পত্নী সম্বন্ধও আছে। এইজন্য লিখেছে যে, ব্রহ্মের সাথে প্রকৃতির

অভেদ সম্বন্ধ, যেমন পত্নীকে অর্ধাঙ্গীনিও বলা হয়।

শ্রী ব্রহ্মা তো নিজেই জানে না যে কোথা থেকে সে উৎপন্ন হয়েছে। হাজার বৎসর পর্যন্ত্য পৃথিবীর খোঁজ করেছে পরন্তু পায় নি।

তখন আকাশ বাণীর আধারে হাজার বৎসর তপ করে।

পদ্মফুলের ডান্ডি (কান্ড) ধরে নীচে গিয়ে দেখে শেষ নাগের শয্যায় বিষ্ণু অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। শ্রী বিষ্ণুর শরীর থেকে এক দেবী বের হয় (প্রেতনির মত) যে সুন্দর আভূষণ পড়ে আকাশে বিরাজমান হলেন। তখন বিষ্ণু সচেতন হয়। এর মধ্যে শঙ্কর আসেন।

উপরোক্ত বিবরণে সিদ্ধ হয়েছে তিন ভগবানকে অচেতন (বেঁহুশ) করে রেখেছিলেন, পরে সচেতন করে, পরে আকাশ থেকে বিমান এসে তিন প্রভুকে আদেশ দিলেন, বিমান উড়তে লাগল। উপরে গিয়ে দেখে এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও এক শিব যারা ব্রহ্মলোকে আছেন।

বিচার করেন — ব্রহ্মলোকে দ্বিতীয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেখেছিলেন, এইসব জ্যোতি নিরঞ্জনেরই (ব্রহ্মর) কলাবাজী (চালাকী বাজি) আছে, তিনিই তিন রূপ ধারণ করে, ব্রহ্মলোকে তিন গুপ্ত স্থান (এক রজোগুণ প্রধান ক্ষেত্র, এক সতগুণ প্রধান ক্ষেত্র আর এক তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্র) বানিয়ে রেখেছে এবং সেখানে প্রকৃতি (দূর্গা-অষ্টাঙ্গী)-কে নিজের পত্নী রূপে রেখেছে। যখন এই দুইজন রজোগুণ প্রধান ক্ষেত্রে থাকেন, তখন এ কালকে মহাব্রহ্ম ও দূর্গাকে মহাসাবিত্রী বলা হয় আর এই দুইজনের সংযোগে যে পুত্র রজোগুণ প্রদান ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় তার নাম ব্রহ্মা রাখে অতএব প্রাপ্ত বয়স হওয়ার আগে অচেতন করে, লালন পালন করে পরে পদ্মফুলের উপর সচেতন করে রাখে। আবার যখন এই দুইজন মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষী রূপে (কাল ও দূর্গা) সতগুণ প্রধান ক্ষেত্রে থাকে, এবং পতি পত্নীর ব্যবহারে যে পুত্র হয়, তার নাম বিষ্ণু রাখে সে সতগুণ প্রধান হয়ে থাকে। একেও প্রাপ্ত বয়স হওয়ার আগে অচেতন করে লালন পালন করে, পরে শেষ নাগের শয্যায় অচেতন করে ঘুমিয়ে রাখে প্রাপ্ত বয়স হলে সচেতন করে লালন পালন করে, পরে নাগের শয্যায় অচেতন করে ঘুমায়ে রাখে প্রাপ্ত বয়স হলে সচেতন করে। পরে এই দুইজন যখন তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্রে থাকে, তখন শিবা মানে দূর্গা তথা মহাশিব বা সদাশিব পতিপত্নী ব্যবহারে যে পুত্র এই ক্ষেত্রে হয় সে তমোগুণ প্রধান হয়, তার নাম শিব রাখে একেও অচেতন করে রেখে, প্রাপ্ত বয়স হলে সচেতন করে। পরে তিনজনকে একসঙ্গে বিমানে বসিয়ে উপরের দৃশ্য দেখায়। কেননা এরা যেন নিজেকে কোনোদিন সর্বেসর্বা না ভাবে। গুণ প্রধান ক্ষেত্রকে বোঝার জন্য।

এক উদাহরণ—কোন বাংলোতে তিন কামরা (রুম) আছে। মনে করেন একটা রুমে দেশভক্ত শহীদের চিত্র লাগানো আছে;যখন কোন ব্যক্তি ওই রুমে যায়, তখন তার বিচারও ঠিক দেশ ভক্তের মত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কামরায় (রুমে) সাধু মহাপুরুষদের চিত্র লাগানো আছে, সেই রুমে প্রবেশ করলেই মন শান্ত এবং প্রভু ভক্তির ভাব হয়ে যায়।

আর তৃতীয় কামরায় (রুমে) অশ্লীল, অর্ধনগ্ন স্ত্রী পুরুষ বা হিরো হিরোইনদের চিত্র লাগানো আছে, সেখানে প্রবেশ করতেই মনের মধ্যে বকবাস অর্থাৎ খারাপ মনোভাব এসে যায়।

ঠিক এই প্রকার ব্রহ্মলোকে কালরূপী ব্রহ্ম তিন স্থান এক এক গুণ প্রধান বানিয়েছে। তিন প্রভুই (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) নিজের গুণের প্রভাব কেমন ভাবে ঢালেন।

উদাহরণ যেমন— রান্নাঘরে শুকনো লঙ্কার গুড়ি দিয়ে সম্ভারা দেওয়া তরকারীতে, সেই লঙ্কার গুণ যখন সব রুমের ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায় তখন ব্যক্তিদের ছিঁক এসে যায়। লঙ্কা তো রান্না ঘরে ছিল কিন্তু তার নিরাকার শক্তি বা গুণের কারণে দূরে থাকা ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করে দেয়। ঠিক এই প্রকার তিন প্রভু (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) নিজ নিজ লোকে থেকে, তিন লোক (পৃথিবী লোক, পাতাল লোক, ও স্বর্গ লোক)-এ প্রাণীদের প্রভাবিত করে রাখেন। যেমন মোবাইল ফোনের রেঞ্জ দ্বারা ফোন কার্য্য করে, ঠিক এই প্রকার অদৃশ্য শক্তিরূপী গুণ দিয়ে তিন দেবতা তার পিতা কালের সৃষ্টি তারই আহারের জন্য চালাচ্ছেন। দূর্গার নিজের আলাদা লোকও আছে, যেখানে সে নিজের বাস্তবিক রূপে দর্শন দেন। যখন এদের বিমান দূর্গার দ্বীপে পৌঁছায়, তখন জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ কালরূপী ব্রহ্ম বিষ্ণুকে বাল্যকালের স্মৃতি মনে করিয়েছেন। তার জন্য বিষ্ণু বলেছে যে, এ দূর্গা আমাদের তিনজনের মাতা। আমি বালকরূপে পালঙ্কে শুয়ে থাকতাম। তিনি আমায় গান করে ঝুলাতেন তাই বিষ্ণু বলতে পারলেন আপনিই আমাদের মাতা। আমি ব্রহ্মা শিব তো জন্মবান হয়েছি। আমাদের তো আবির্ভাব মানে জন্ম ও তিরোভাব মানে মৃত্যু হয়ে থাকে তাই আমরা অবিনাশী নই। আপনি প্রকৃতি দেবী। এই কথা শঙ্কর ও স্বীকার করেছেন যে কি এও বলেছেন, আমি তমোগুণী লীলা করতে পারা শিব কি আপনার পুত্র হলাম না ? আমিও আপনার পুত্র। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

পরে এই তিন দেবতার বিয়েও দূর্গা করিয়েছেন। প্রকৃতি দেবী (দূর্গা) তার নিজ শব্দ শক্তি দ্বারাই নিজের অন্য রূপ ধারণ করেছিলেন। ব্রহ্মার বিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে, বিষ্ণুর বিয়ে লক্ষীর সঙ্গে ও শিবের বিয়ে কালী বা উমার সঙ্গে দিয়ে এদের আলাদা আলাদা দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম) তার শ্বাস দ্বারা সমুদ্রেতে চার বেদ লুকিয়ে রেখেছিল পরে সাগর মন্থনের সময়ে উপরে প্রকট হয়ে যায়। জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালের) আদেশে দূর্গা চার বেদ ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা নিজের মাতা (দূর্গা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বেদেতে যে ব্রহ্ম (প্রভু) বলা হয়েছে সেই প্রভু কি আপনি না কি অন্য কোন পুরুষ ?

দূর্গা কালের ভয়ে বাস্তবিক লুকানোর চেষ্টা করে বললেন, আমি এবং ব্রহ্ম একই, কোন ভেদ নেই, তবুও বাস্তবিক লুকায়নি। দূর্গা আবার বললেন, তোমরা তিনজন আমার ও ব্রহ্মর সদা স্মরণ করতে থেকো। আমাদের স্মরণ করার সময় যদি কোন কঠিন কার্য হয় তাহলে আমি হঠাৎ সামনে আসব।

বিশেষ—কেননা কাল দূর্গাকে বলে রেখেছিল, আমার ভেদ কাউকে দেবে না বা বলবে না। এই ভয়ে দূর্গা সর্ব জগৎকে বাস্তবিকতা থেকে অপরিচিত রাখেন। ইনারা নিজের তিন পুত্রকেও ঠকানোর মধ্যে রেখেছেন। এর কারণ হল, কালকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীদের নিত্য আহার করার। এই জন্য তার তিন পুত্রদের দ্বারা আহার তৈরী করান। শ্রী ব্রহ্মাকে রজোগুণে প্রভাবিত করে সর্ব প্রাণীদের দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করান।

শ্রী বিষ্ণুকে সতোগুণ দিয়ে, একজন অন্য জনের উপরে মোহ উৎপন্ন করিয়ে স্থিতি অর্থাৎ কাল জালের মধ্যে জড়িয়ে রাখেন আর শ্রী শঙ্কর তমোগুণ দ্বারা সংহার করিয়ে কালের আহার তৈরী করান।

পড়ে তিন প্রভুকেও মেরে খায় তথা নতুন পুন্য কর্মী প্রাণীর থেকে তিন পুত্র উৎপন্ন করে নিজের কার্য জারী রাখে। আর আগের তিন পুত্র যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে চুরাশী লাখ যোনীতে ও স্বর্গ নরকে কর্ম আধারের চক্র লাগিয়ে রাখে। এই প্রমাণ শিব মহাপুরাণ, রুদ্র সংহিতা, প্রথম (সৃষ্টি) খন্ড, অধ্যায় ৬,৭ তথা ৮ ও ৯-তে আছে।

।। "শ্রী শিব মহাপুরাণের সার বিচার" ।।

"শিব পুরাণ"

"শ্রী শিব মহাপুরাণ (অনুবাদক: শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার। প্রকাশক : গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, গীতা প্রেস গোরখপুর) মোটা টাইপ, অধ্যায় ৬ রুদ্রসংহিতা, প্রথম খন্ড (সৃষ্টি) থেকে নিষ্কর্ষ"

নিজের পুত্র নারদ শ্রী শিব ও শ্রী শিবার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর শ্রী ব্রহ্মা বললেন, (পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১০২) যে পরব্রহ্মর বিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানে পূর্ণ যুক্তির দ্বারা এই প্রকার বিকল্প করা যায়, সেই নিরাকার পরব্রহ্ম ওই সাকার রূপে সদাশিব রূপধারণ করে মনুষ্য রূপে প্রকট হয়। সদাশিব নিজের শরীরে এক স্ত্রীকে উৎপন্ন করেছে, যাকে প্রধান, প্রকৃতি, অম্বিকা, ত্রিদেব জননী (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা) বলা হয়। যার আট হাত আছে।

।। 'শ্রী বিষ্ণুর উৎপত্তি" ।।

যে ওই সদাশিব আছে, তাকে পরম পুরুষ, ঈশ্বর, শিব, শম্ভু আর মহেশ্বর বলা হয়। সে তার সারা অঙ্গে ভস্ম মাখায়ে থাকে। ঐ কাল রূপী ব্রহ্ম এক শিবলোক নামক (ব্রহ্মলোকে-তমোগুণ প্রধান ক্ষেত্র) ধাম বানিয়েছে। তাকে কাশী বলা হয়। শিব ও শিবা পতি পত্নী রূপে থেকে এক পুত্র উৎপন্ন করেছে, যার নাম বিষ্ণু রেখেছে। অধ্যায় ৭, রুদ্র সংহিতা, শিব মহাপুরাণ (পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪)।

।। "শ্রী ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি" ।।

অধ্যায় ৭,৮,৯ (পৃষ্ঠা ১০৫-১১০) শ্রী ব্রহ্মা বলেছে যে, শ্রী শিব ও শিবা (কাল রূপী ব্রহ্মও দূর্গা প্রকৃতি অষ্টঙ্গী) পতি পত্নীর মিলনে আমারও উৎপত্তি করেছে, এবং আমায় অচেতন করে পদ্মফুলে রেখে দিয়েছে। ওই কাল মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করে নাভি থেকে এক পদ্ম উৎপন্ন করে। ব্রহ্মা পরে আরও বললেন, আমার হুঁশে এলো, কমল (পদ্মফুলের মূল (শিকড়) খুঁজতে চেয়েছি পায়নি। তবে তপস্যা করার পর আকাশবাণী হওয়ার পরে বিষ্ণু ও আমার কোন কথায় লড়াই হয়। (বিবরণ এই পুস্তকে পৃষ্ঠা ৫৪৯-তে) তখন আমাদের মাঝখানে এক তেজময় লিঙ্গ প্রকট হয় তথা ওঁ, ওঁ নাদ প্রকট হয় এবং ওই লিঙ্গর উপর অ-উ-ম এই তিন অক্ষর লেখা ছিল। তখন রুদ্র রপ ধারণ করে সদাশিব পাঁচমুখ মানব রূপ প্রকট হয়। তার সাথে শিব (দূর্গা)-ও ছিল।

পরে শঙ্কর হঠাৎ প্রকট হলেন (কেননা ও প্রথমে অচেতন ছিল ফির সচেতন করে তিনজনকেই এক জায়গায় করে দিয়েছে) আর বললেন, তোমরা তিনজন সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কার্য সামলাও।

রজোগুণ প্রধান ব্রহ্মা, সতোগুণ প্রধান বিষ্ণু ও তমোগুণ প্রধান শিব। এই প্রকার তিন

দেবতার গুণ, পরন্তু শিব (কালরূপী ব্রহ্ম) গুণাতীত মানা হয়েছে, পৃষ্ঠা ১১০-তে আছে।

সার বিচার ঃ— উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, কাল রূপী ব্রহ্ম অর্থাৎ সদাশিব ও দুর্গা (প্রকৃতি) শ্রী ব্রহ্মা শ্রী বিষ্ণু তথা শ্রী শিবেরই মাতা ও পিতা। দুর্গাকে প্রকৃতি ও প্রধানও বলা হয়, তাহার আট হাত (ভূজা) আছে। এই সদাশিব অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন কালের শরীর অর্থাৎ পেট থেকে বেরিয়েছে। ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল ও প্রকৃতি (দূর্গা) সব প্রাণীদের ভ্রমিত করে রাখে। নিজের পুত্রদেরকেও বাস্তবিক সত্যকথা বলে না। কারণ হল যে, কাল (ব্রহ্ম)-এর একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের যাতে খবর না হয়ে যায় যে, সে কাল ব্রহ্ম তপ্ত শিলায় এক লাখ মানব শরীর ধারীকে ভেজে খায়। এই জন্য জন্ম মৃত্যু তথা অন্য দুঃখদায়ক যোনিতে যন্ত্রণা দেয় আর নিজের তিন পুত্র রজোগুণ ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু তমোগুণ শিব দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি, (পালন) ও সংহার করিয়ে নিজের খাদ্য তৈরী করায়। কেননা কালকে এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীদের আহার করার অভিশাপ লেগেছিল। কৃপা করে শ্রীমদ ভাগবত গীতাতে দেখেন, কাল (ব্রহ্ম) তথা প্রকৃতি (দূর্গা)-র পত্নি কর্ম দ্বারা রজোগুণ ব্রহ্মা, সতোগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের উৎপত্তি।

।। "তিন গুণ কি ? প্রমাণ সহিত" ।।

"তিন গুণ রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব আছেন। ব্রহ্ম (কাল) এবং প্রকৃতি (দূর্গা)-থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তিনজনই নাশবান।"

প্রমাণঃ— গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরান যার সম্পাদক হলেন, শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠ স. ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা "এই প্রকাশ ব্রহ্মা-বিষ্ণু তথা শিব তিন দেবতার গুণ আছে, কিন্তু শিবকে (ব্রহ্ম-কাল) গুণাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ— গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ্ দেবীভাগবত পুরাণ যার সম্পাদক হলেন, শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমনলাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩ ঃ— ভগবান বিষ্ণু দূর্গার স্তুতি করে ও বললেন আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শঙ্কর তোমারই কৃপাতে বিদ্যমান আছি। আমাদের তো আবির্ভাব (জন্ম) তথা তিরোভাব (মৃত্যু) হয়ে থাকে। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই, তুমিই নিত্য, জগৎজননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী আছ।

ভগবান শঙ্কর বললেন ঃ— যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমা হইতে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে আমি তমোগুণী লালী করে থাকা শঙ্কর কি তোমার সন্তান নই ? অতএব আমাকেও উৎপন্ন করেছ তুমি। এই সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করাতে তোমার গুণ সদা আছে এই তিনগুণ থেকে উৎপন্ন আমি, ব্রহ্মা বিষ্ণু নিয়মানুসারে কার্য্যতে তৎপর থাকি।

উপরোক্ত এই বিবরণ কেবল হিন্দিতে অনুবাদিত শ্রী দেবীপুরাণেতে আছে, যাতে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। এই জন্য শ্রী মদ্‌দেবী ভাগবত মহাপুরাণ, সভাষটিকম্ সমহাত্যসম্ খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণদাস প্রকাশ মুম্বই, এতে সংস্কৃত সহিত হিন্দি অনুবাদ করা আছে এই প্রমানগুলো দেখুন।

।। তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক ৪২ ।।

ব্রহ্মা ঃ— অহম্, ঈশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাৎ সর্বে বয়ং জনি যুতা ন সদা তু নিত্যাঃ
কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতি পুরানা ।। ৪২।।

হিন্দি থেকে বাংলা অনুবাদ ঃ— হে মাত! ব্রহ্মা আমি তথা শিব তোমারই প্রভাবে জন্মবান হয়েছি; নিত্য নই অর্থাৎ আমি অবিনাশী নই, তাহলে ইন্দ্রাদি অন্য দেবতারা কি প্রকারে নিত্য হতে পারে? তুমিই অবিনাশী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবীই আছ। (৪২)

।। পৃষ্ঠা ১১-১২ অধ্যায় ৫ শ্লোক নং ৮।।

যদি দয়ার্দ মনা ন সদাংবিকে কথমহং বিহিতঃ চ তমোগুণ ঃ

কমলজশ্চ রজোগুণ সম্ভব ঃ সুবিহিত ঃ কিমু সত্বগুণং হরি ঃ।। ৮।।

অনুবাদ ঃ—ভগবান শঙ্কর বললেনঃ— হে মাত! যদি আমার উপর আপনি দয়াযুক্ত হন, তাহলে আমাকে তমোগুণ কেনো বানিয়েছেন, পদ্মফুল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ কিসের জন্য বানিয়েছেন ও বিষ্ণুকে সতগুণ কেন বানিয়েছেন? অর্থাৎ জীবদের জন্ম-মৃত্যুরূপী দুষ্কর্মতে কেনো লাগিয়েছেন?

শ্লোক ১২ঃ—

রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদ্ম শিবে।। ১২।।

অনুবাদ ঃ- আপনার পতিপুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা ভোগ-বিলাস করতে থাকেন। আপনার গতি কেউ জানে না।

।। "নিষ্কর্ষ" ।।

শ্রীমদভগবত গীতার জ্ঞানও এই কাল রূপী ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবশ রূপে প্রবেশ হয়ে বলেছিল। উপরোক্ত পবিত্র পুরানেতে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রকৃতি, দূর্গাকে বলা হয়েছে, তথা সদাশিব অর্থাৎ কালরূপী ব্রহ্ম তথা প্রকৃতি থেকে রজোগুণ-ব্রহ্মা সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের উৎপত্তি পতি-পত্নি মিলনের দ্বারাই হয়েছে। এর সাক্ষী শ্রীমদভাগবত গীতাও আছে। শ্রী গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের সার, এইজন্য এতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাংকেতিক শব্দ (কোড বর্ডস)-তে আছে। যা কিনা তত্ত্বদর্শী সন্তই বোঝাতে পারবেন। এখন কৃপা করে পবিত্র শ্রীভাগবত গীতাতে দেখেন। অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫-তে পবিত্র শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে বলা হয়েছে কাল ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রেতবত প্রবেশ করে বলেছিল যেকি প্রকৃতি (দূর্গা) তো আমার পত্নী, আমি ব্রহ্ম এর যোনীতে বীজ স্থাপনা করি, যার দ্বারা সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। আমি সবার পিতা এবং প্রকৃতি (দূর্গা) কে সবার মাতা বলা হয়। প্রকৃতি (দূর্গা)-থেকে উৎপন্ন তিনগুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব)-জীবাত্মাকে কর্মাধার দিয়ে শরীরে বাঁধে, অর্থাৎ এ তিন সর্ব প্রাণীদের সংস্কারের আধারে উৎপত্তি, স্থিতি তথা সংহার করে ফাঁসিয়ে রাখে। অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২তে বলেছে যে, আমি কাল আছি, সর্বকে খাওয়ার জন্য প্রকট হয়েছি, অধ্যায় ১১ শ্লোক ২১-তে অর্জুন বলছে, আপনি তো ঋষিদেরও খাচ্ছেন (গ্রাস) করছেন, দেবতারা, মহর্ষিগণ, ও সিদ্ধগণ ভয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে রক্ষা প্রার্থনা করছে। বেদের স্রোত্রো দ্বারা আপনার স্তুতি করছে। পরন্তু আপনি সবাইকে খাচ্ছেন। কিছু আপনার দাড়িতে ঝুলে রয়েছে, কাহারও মাথা দাঁতে বেঁধে রয়েছে, কিছু আপনার মুখের মধ্যে প্রবেশ করছে।

।। রাজাগুণ ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব এই ত্রিদেবের পূজা ব্যর্থ বলা হয়েছে।।

এখানে গীতা জ্ঞান দাতা প্রভু (শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২ থেকে ১৫ পর্য্যন্ত-তে) বলছেন, তিন গুণ (রজগুণ ব্রহ্মা সতগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব)-যুক্ত পূজা করা ব্যক্তির জ্ঞান হরণ করে নেওয়া হয়েছে, এদের উপর যে আমি আছি তবুও আমার ভক্তি পূজাও করে না। তিন প্রভু (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব) পর্যন্ত্যই সাধনা করা ব্যক্তি রাক্ষস স্বভাব ধারণ করে রয়েছে, মানুষের মধ্যে নীচ, দুষ্কর্ম করা মূর্খ এই তিনজনের উপর আমাকে (ব্রহ্মকে) পূজা করে না।

শ্রীমদভাগবত জ্ঞান দাতা প্রভু গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১৮-তে নিজের ভক্তিকেও অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তমাম্) বলেছে।

এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ এবং গীতা অধ্যায় ১৮ -শ্লোক নং ৬২ ও ৬৬ তে কোন অন্য পরমেশ্বরের শরণে যেতে বলেছে।

সেই সময় গীতার জ্ঞানে বলা হয়েছিল, তার আগে না তো আঠারো পুরাণ ছিল আর না কই এগারো উপনিষদ্ বা ছয় শাস্ত্র ছিল। যা পরে ঋষিরা নিজের নিজের অনুভবে পুস্তক রচনা করেছেন। ঐ সময় কেবল চারিবেদ শাস্ত্র রূপে প্রমাণিত ছিল। আর সেই পবিত্র চারিবেদের সারাংশ এই পবিত্র গীতা বর্ণিত হয়েছে।



।। শাস্ত্রার্থ বিষয় ।।

(শাস্ত্রার্থ পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানকে উলঝিয়ে দিয়েছে)

শাস্ত্রার্থ কেমন হত ?

দুই বিদ্যান প্রশ্ন-উত্তর করতেন এবং শ্রোতাগণ বহু সংখ্যায় শাস্ত্রার্থের প্রশ্ন উত্তর শুনার জন্য বিদ্যমান হতেন। হার জিতের ফ্যাসলা শ্রোতাদের হাতে ছিল, যাদের স্বয়ং জ্ঞান নেই যে এই দুই বিদ্যান কি বলছে? যিনি সংস্কৃত বেশী বেশী উচ্চারণ করতেন তাকে শ্রোতারা হাততালি বাজিয়ে বিজয় হওয়ার প্রমাণ দিত। এই ভাবে বিদ্যানদের হার জিতের ফ্যাসলা অবিদ্যানের হাতে ছিল।

প্রমান ঃ—পুস্তক "শ্রীমদ দয়ানন্দ প্রকাশ" লেখক শ্রী সত্যানন্দ মহারাজ

প্রকাশক ঃ— সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভ্য ৩/৫ মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন রাম লীলা ময়দান নয়া-দিল্লি-২ গঙ্গা কান্ত অষ্টম সর্গ পৃষ্ঠা ৮৯-তে থেকে যেমন লেখা ছিল

তেমন ই লেখাঃ— তিন দিন পর্যন্ত্য, প্রতি সন্ধ্যায় (প্রতি সন্ধ্যা) কৃষ্ণানন্দ ও স্বামীজির শাস্ত্রার্থ হত। একদিন শাস্ত্রার্থের সময় কোন একব্যক্তি কৃষ্ণানন্দ থেকে সাকারবাদের অবলম্বণ করে তাহার উপর শাস্ত্রার্থ চলে। স্বামীজির তো এমনটাই চেয়ে ছিল। তিনি ধারাপ্রবাহ সংস্কৃত বলতে বলতে নিরাকার সিদ্ধান্তের উপর বেদ ও উপনিষদের এক ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, আর কৃষ্ণানন্দকে তার অর্থ মানার জন্য বাধিত করে। কৃষ্ণানন্দ কোন প্রমাণ দিতে পারেননি। কেবল গীতার ঐ শ্লোক "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" লোকের দিকে মুখ করে তাকিয়ে পড়তে লাগলেন। স্বামীজি রেগে গর্জন করে বললেন, আপনি তর্ক আমার সঙ্গে করছেন অতএব আমারই অভিমুখ হন। কিন্তু ওর তো বিচারই উঠে গিয়েছে, আর লাইন ভুলে যায়। মুখে থুথুর ঝাক এসে যায়। গলার শ্বাস বন্ধ হতে চলে, মুখ ফিকা পরে যায়, কোন প্রকার লাজ থাকে, এই জন্য তিনি তর্ক শাস্ত্রের শরণ নিয়ে স্বামীজিকে বললেন, আচ্ছা লক্ষণের লক্ষণ বলেন ? স্বামীজি উত্তর দিলেন, যেমন কারণের কারণ হয় না, তেমনই লক্ষণের লক্ষণ হয় না। সভায় লোকেরা হেসে কৃষ্ণন্দকে হার প্রকাশিত করে দেন আর কৃষ্ণনন্দ ঘাবরিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন।

উপরোক্ত লেখাতে স্পষ্ট হয় যে,—বিদ্যানদের হার জিৎ অবিদ্যানের হাতে ছিল স্বামী দয়ানন্দ অনরগল সংস্কৃত বলত তাই মহর্ষি দয়ানন্দ স্বামীকে বিজেতা ঘোষণা করে দিয়েছিল এবং পরমাত্মাকে নিরাকারই মেনে নেন। কিন্তু যজুর্বেদ অধ্যায় ১ মন্ত্র ১৫ তথা যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১-তে স্পষ্ট আছে যে পরমাত্মা সশরীর সাকারে আছেন। স্বামী দয়ানন্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবচন করার প্রমাণ:— "সত্যার্থ প্রকাশ" ভূমিকা পৃষ্ঠা ৮-তে স্বামী দয়ানন্দ বললেন, প্রথমবার সত্যার্থ প্রকাশ ছাপিয়েছি। ওই সময়ে আমার হিন্দি ভাল করে হত না। কেননা ছোটবেলা থেকে সন্ ১৮৮২ (সংবৎ ১৯৩৯) পর্যন্ত্য সংস্কৃতে ভাষণ দিতাম। তাতে সিদ্ধ হয়, স্বামী সংস্কৃত ভাষাতেই শব্দার্থ করতেন সংবত্ ১৯৩৯ (সন ১৮৮২)-তে সত্যার্থ প্রকাশ পুস্তককে দ্বিতীয়বার ছাপানোর এক বৎসর পরে সন্ ১৮৮৩-তে স্বামী দয়ানন্দ নিধন হন। স্পষ্ট হয়েছে যে কি নিধন হওয়ার এক বর্ষ পূর্বে স্বামী দয়ানন্দ হিন্দি ভাষাকে জেনেছেন। এর আগে সংস্কৃত ভাষায় প্রবচন (ব্যাখ্যান) করতেন। শ্রোতাগণ সংস্কৃত ভাষাতে অপরিচিত ছিল, আর সেই অপরিচিত শ্রোতারা বিদ্যানদের

হার জিতের ফ্যাসলা করত।

এখন দাসেরও দাস (রামপাল দাস)-এর ইচ্ছা সর্ব পবিত্র ধর্মের প্রভু যিনি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখা পুন্যাত্মারা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরিচিত হয়ে যান, তখন সত্য ও অসত্যের তত্ত্ব নিজেরাই বুঝবেন অথবা নকল হীরা ও আসল হীরা স্বয়ংই জানবেন।

কথা ঃ— এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তার দুই পুত্র একজন ষোল বছর আরেকজন আঠারো বছরের হয়েছে, এর মধ্যে তার পিতার মৃত্যু হয়। তার মা একটা কাপড়ে বেঁধে কিছু হীরা সন্তানের হাতে দিয়ে বললেন, পুত্র এই হীরা নিয়ে তোমার জ্যাঠামশাইকে দিয়ে বলবে, আমাদের কাছে টাকাপয়সা নেই, এই হীরা আপনার কাছে রেখে আমাদের আপনার ব্যবসার সঙ্গে ভাগীদারী করে নেন। আমরা একা বালক ব্যাপার করতে পারি না। দুজন বাচ্চা মায়ের কাপড়ে বাঁধা হীরা নিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে গেলেন আর মা যা বলেছিলেন সেইভাবে প্রার্থনা করলেন। ওই জ্যাঠামশাই হীরার দিকে তাকিয়ে দেখলেন আর বাচ্চার প্রার্থনা স্বীকার করে বললেন এই হীরা তোমার মাকে সামলিয়ে রাখতে বলো। আর তোমরা আমার সাথে অন্য শহরে চলো ওখানে আমি অনেক উধারে মাল পাই, পরে ফিরে এসে এই হীরার প্রয়োগ করবো। দুইজন বালক জ্যাঠামশাইয়ে সাথে অন্য শহরে গেলেন একদিন জ্যাঠামশাই এক হীরা বাচ্চাকে দিয়ে বললেন পুত্র এই হীরা, ঐ শেঠকে দিয়ে এসো, যার কাছ থেকে ৫০ হাজারের মাল নিয়ে এসেছিলাম এবং তাকে বলবে এই হীরা রাখ পরে এসে ঋণ শোধ করে হীরা ফিরিয়ে নেব। দুই বাচ্চা ঐ শেঠের কাছে জ্যাঠামশাইয়ের শেখানো কথা বলে হীরা দিলেন, শেঠ এক স্বর্ণকারকে ডেকে ঐ হীরা দেখালেন, স্বর্ণকার দেখে বললেন, এই পাথরের তো একশো টাকাও দাম না, এতো নকল হীরা, শেঠ এই বলে গলির মধ্যে রেগে ছুড়ে ফেলেদিলেন এবং ভালমন্দ বেশী কথাও শুনিয়ে দিলেন। বাচ্চা দুইজন গলি থেকে নকল হীরা উঠিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জ্যাঠামশাইকে সব কথা বললেন।

জ্যাঠামশাই বললেন পুত্র তিনি স্বর্ণকার, তিনি যা বলেছেন সব সত্যই বলেছেন, এটা বাস্তবে নকল হীরা ছিল, এর দাম একশো টাকাও নয়। পুত্র আমার ভুল হয়েছিল, হীরা তো এইটা ভুল করে আমি নকল হীরা দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন যাও আর শেঠকে বলবে, আমার জ্যাঠামশাই ঠগ্‌বাজ নয়, আসল হীরার জায়গায় ভুল করে নকল হীরা দিয়ে দিয়েছেন। দুই ভাই আবার গিলেন ওই শেঠের কাছে, আর বলল আমার জ্যাঠামশাই ঠগবাজ নয়, আসল হীরার জায়গায় ভুল করে নকল হীরা চলে এসেছিল। এইটা আসল হীরা এটা নাও (স্বর্ণকার বললেন বাস্তবে এইটাই আসল হীরা, আর ওইটা নকল হীরা)। তারপর জিনিষ পত্র নিয়ে দুই বাচ্চা ও জ্যাঠামশাই দেশের বাড়ি আসলেন, তখন বাচ্চাদের বললেন, যাও এখন তোমার মায়ের কাছ থেকে ওই হীরা নিয়ে এসো। দুই বাচ্চা নিজের মায়ের কাছ থেকে সেই কাপড়ে বাঁধা হীরা এনে খুলে দেখে একটাও আসল হীরা নেই, সব নকল। বাচ্চাদের জ্যাঠামশাই দুই জনকে আগেই আসল ও নকল হীরা কোনটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দুই জন পুত্র তার মাকে বললেন, মা এতো আসল হীরা না, নকল হীরা। দুইজন বাচ্চাই জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এসে বলছে, জ্যাঠামশাই আমার মা খুব সরল। আসল হীরা ও নকল হীরার জ্ঞান নেই। ওই কাপড়ে বাঁধা নকল হীরা ছিল। জ্যাঠামশাই বললেন পুত্র যেই দিন ওই পুটলি আমার কাছে নিয়ে এসেছিলে ঐ দিন ওটা নকল হীরা ছিল আমি জানতাম। যদি আমি সেই

দিনই নকল হীরা বলতাম, তাহলে তোমার মা ভাবত আজ আমার স্বামী মারা গিয়েছে, তাই আসল হীরাকে নকল হীরা বলছে। পুত্র আজ সেইজন্য তোমাদেরকে আসল হীরা ও নকল হীরা চেনানো শিখিয়ে দিয়েছি। তাই তোমরা স্বয়ংই ফ্যাসলা করতে পেরেছ।

বিশেষঃ—এই প্রকার আজ দাসের এই ইচ্ছা যে, এই তত্ত্বজ্ঞানকে জনগণের কাছে পৌছিয়ে দিই এবং তারা শাস্ত্রের প্রমাণ দেখে, স্বয়ং আপনারা জেনে ও পড়ে শুনে সত্য ও অসত্যকে যোগ্য রূপে জেনে নিন।

শাস্ত্রার্থ আগে বিদ্যানরা করতেন এবং তাদের হার জিতের ফ্যাসলা অবিদ্যানরা করতো, এইভাবে সত্যকে চেপে রেখে তাদের বিদ্যানের পরিচয় দিতেন। এই দাস চান যে, প্রভু প্রেমী পুন্যাত্মারা শাস্ত্র পড়ে জানুক তারপর স্বয়ংই জেনে বুঝেই যাবেন।

।। শাস্ত্রার্থ মহর্ষি সর্বানন্দ ও পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব)-এর সঙ্গে।।

এক সর্বানন্দ নামের মহর্ষি ছিলেন। তার পূজ্য মাতা শ্রীমতি সারদা দেবী, পাপ কর্মফলের জন্য যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তিনি কষ্ট নিবারণের জন্য যন্ত্র-মন্ত্র-যজ্ঞ বছরের পর বছর করে এসেছেন, বৈদ্যের কাছে থেকে ঔষধ খেয়েছেন কিছুতেই কষ্ট নিবারণ হয় নাই। ওই সময়ের মহর্ষির কাছ থেকে উপদেশও নিয়েছেন, মহর্ষি বলতেন প্রারব্ধ (আগের)-কর্মফল ভুগতেই হয়। সেই কর্মের ফলে কোন ক্ষমা নেই। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বালিকে বধ করেছিল। ওই পাপের কর্মদন্ড শ্রীরাম (বিষ্ণু) বালীর আত্মা শ্রীকৃষ্ণ অবতারের সময় ভুগতে হয়েছে। বালির আত্মা দ্বাপরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বিষাক্ত তীর দিয়ে শিকারী হয়ে বধ করেছিল। এই প্রকারের কথা সাধু মহর্ষি গুরুদের মুখ থেকে শোনা। প্রারব্ধ কর্মফল কেঁদে কেঁদে ভোগ করছিলেন। একদিন কোন নিজের কুটুম্বর মুখ থেকে শুনে কাশীতে গিয়ে স্বয়ং সশরীরে প্রকট হয়েছিলেন (কবির্দেব) কবির পরমেশ্বরের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করলে ওই দিনই রোগ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ৩২-তে লেখা যে, কবিরং ঘারিরসি” অর্থাৎ (কবীর্) কবীর (অংঘারি) পাপের শত্রু (অসি) আছে। এই পবিত্র যজুর্বেদে অধ্যায় ৮ মন্ত্র ১৩-তে লেখা আছে যে, পরমাত্মা (এনস: এনস:) অধর্মের অধর্ম অর্থাৎ পাপের উপর পাপ ঘোর পাপকেও সমাপ্ত করে দেন। প্রভু কবির্দেব (কবির পরমেশ্বর) বললেন, পুত্রী সারদা, এই সুখ তোমার ভাগ্যে ছিল না। আমি আমার কোষ থেকে প্রদান করেছি তথা পাপ বিনাশক হওয়ার প্রমাণ দিলাম। আপনার পুত্র মহর্ষি সর্বানন্দ বলে বেড়ায় যে কি প্রভু পাপ ক্ষমা (বিনাশ) করতে পারে না তথা আপনি আমার কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করে আত্মকল্যাণ করো। ভক্তিমতি সারদা স্বয়ং এসে পরমেশ্বর কবীর প্রভু (কবির্দেব) থেকে উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যাণ করিয়েছেন। মহর্ষি সর্বানন্দ যে কিনা ভক্তিমতি সারদার পুত্র ছিল, শাস্ত্রার্থর অনেক অভিমান ছিল। মহর্ষি সর্বানন্দ তার সমকালিন সর্ব বিদ্যানদের শাস্ত্রার্থ করে পরাজিত করেছিলেন। তারপর ভাবল একথা প্রত্যেককে বলা লাগে যে আমি সর্ব বিদ্যানকে পরাজয় করেছি। কেননা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে, নিজের নাম সর্বাজিত, রাখি। এই ভেবে নিজের মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বললেন মা, আমার নাম বদলে, সর্বাজিত রাখো। মা বললেন পুত্র কেন সর্বানন্দ কি খারাপ নাম ? মহর্ষি সর্বানন্দ বললেন মা আমি শাস্ত্রর্থে সর্ব বিদ্যানদের হারিয়ে দিয়েছি, তাই আমার নাম

সর্বাজিত রেখে দাও। মা বললেন পুত্র, এক বিদ্যান আমার গুরু মহারাজ কবির্দেব (কবীর প্রভু) উনাকেও পরাজিৎ করে দাও, পরে ওইখান থেকে আমার পুত্র আসলেই সর্বাজিত রেখে দেব। মায়ের এই কথা শুনে সর্বানন্দ তো প্রথমে হেঁসেছে পরে বললেন মা, তুমি একদম সরল সোজা। ওই জুলাহা (ধানক/তাঁতী) কবীর তো অশিক্ষিত, ওকে কি পরাজিৎ করব? এখনই যাব এখনই আসব।

মহর্ষি সর্বানন্দ সর্ব শাস্ত্র এক বলদের গাড়ীর উপর রেখে কবির্দেব (কবীর পরেমশ্বর)-এর ঝোপড়ীর সামনে এলেন। পরমেশ্বর কবীরের ধর্ম মেয়ে কমালী আগে কুঁয়োর পাশে মিলেছিল। সে দরজার কাছে এসে বললেন আসেন মহর্ষিদেব, এইটাই পরম পিতা কবীরের ঘর। সর্বানন্দ মেয়ে কমালীকে দিয়ে নিজের ঘটি জলে এমন ভাবে ভরেছে যে, যদি একটু জল আরও ঢালে তো বাইরে পড়ে যাবে তথা মেয়ে কমালীকে বললেন, পুত্রী এই লোটা (ঘটি) ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়ে কবীরকে দিয়ে দেবে এবং যে উত্তর তিনি দেবেন আমায় এসে বলবে। মেয়ে কমালী দ্বারা নিয়ে আসা ঘটিতে পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব) এক কাপড় সেলাই করা বড় সুঁচ ফেলে দিলে, কিছু জল বাইরে পৃথিবীর উপর পড়ে যায়, আর পুত্রীকে বললেন, এই ঘটি সর্বানন্দকে ফিরিয়ে দেও। ঘটি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর; পুত্রী কমালীকে সর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, কি উত্তর দিলেন কবীর? কমালী প্রভুর দ্বারা সুঁচ দেওয়ার বৃত্তান্ত শুনালেন। তখন মহর্ষি সর্বানন্দ পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব)-কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আমার প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন? প্রভু কবীর জিজ্ঞাসা করলেন কি? প্রশ্ন ছিল আপনার?

সর্বানন্দ মহর্ষি বললেন, আমি সর্ব বিদ্যানদের শাস্ত্রার্থতে পরাজিত করে দিয়েছি। আমি আমার মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমার নাম সর্বাজিত রাখো। আমার মা বললেন আপনাকে পরাজিত করলেই আমার নাম পরিবর্তন করে দেবেন। আপনার কাছে ঘটিতে পূর্ণ রূপে জল ভরে পাঠানোর তাৎপর্য হল যে, আমি জ্ঞানে এমন পরিপূর্ণ যেমন ওই লোটার (ঘটির) জল। কারণ এর উপর আর জল থাকবে না, সে বাইরে পড়ে যাবে, অর্থাৎ আমার সাথে জ্ঞান চর্চা করে কোন লাভ হবে না।

আপনার জ্ঞান আমার মধ্যে সমাবে না ব্যর্থই থুথুর মত হবে। এইজন্য হার মেনে লিখে দাও, এতে আপনার হিত হবে।

পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) বললেন যে, আপনার জলে পরিপূর্ণ ঘটিতে লোহার সুঁচ ফেলার অভিপ্রায় হল যে কি, আমার জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) এত ভারী (সত্য) আছে, যে এক সুঁচ ঘটির জলকে বের করে নীচে ফেলে দেয়। এই প্রকার আমার তত্ত্বজ্ঞান, আপনার অসত্য জ্ঞান (রূপ কথা) কে বের করে আপনার হৃদয়ে সমিয়ে যাবে।

মহর্ষি সর্বানন্দ বললেন প্রশ্ন করেন। এক বহু চর্চিত বিদ্যানকে তাঁতীর (জুলা হা/ধানক) মোহল্লা (কলোনী)-তে আসতে দেখে আসে পাশের ভোলাভালা অশিক্ষিত তাঁতীর শাস্ত্রার্থ শোনার জন্য একত্রিত হলো।

পূজ্য কবিরদেব প্রশ্ন করলেনঃ—

কৌন ব্রহ্মা কা পিতা হে, কৌন বিষ্ণুকে মাঁ
শঙ্কর কা দাদা কৌন হে, সর্বানন্দ দে বতা।।

উত্তর মহর্ষি সর্বানন্দেরঃ—ব্রহ্মা রজোগুণ, বিষ্ণু সতগুণ ও শিব তমোগুণ যুক্ত আছে। এই তিনজনই অজর-অমর ও অবিনাশী, সর্বেশ্বর-মহেশ্বর-মৃত্যুঞ্জয় আছে। ইনাদের মাতা পিতা কেহ নাই। আপনি অজ্ঞানী, আপনার শাস্ত্রের কোন জ্ঞান নেই, এই জন্যে উট-পটাঙ্গ স বা উল্টো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। সর্ব শ্রোতারা তালি বাজিয়ে সর্বানন্দের সমর্থন করলেন।

পূজ্য কবীর প্রভু (কবির্দেব) বললেন, মহর্ষি আপনি শ্রীমদ ভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্দ তথা শ্রী শিবপুরাণে ৬ ও ৭-তে রুদ্র সংহিতা অধ্যায় প্রভুর সাক্ষী রেখে, গীতার উপর হাত রেখে পড়ে অনুবাদ শুনান। মহর্ষি সর্বানন্দ পবিত্র গীতায় হাত রেখে শপথ করে বললেন, সঠিক সঠিক বলব।

পবিত্র পুরাণকে প্রভু কবীর (কবির্দেব) বলার পরে ধ্যান দিয়ে পড়লেন। শ্রী শিবপুরাণ (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, যার অনুবাদক হল শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার)-তে পৃষ্ঠা নং ১০০ থেকে ১০৩-তে লেখা আছে যে, সদাশিব অর্থাৎ কাল রূপী ব্রহ্ম তথা প্রকৃতি (দূর্গা)-র সংযোগে (পতি-পত্নী) দ্বারা সতগুণ বিষ্ণু, রজোগুণ ব্রহ্মা ও তমোগুণ শিবের জন্ম হয়েছে। এই প্রকৃতি (দূর্গা) যে অষ্টাঙ্গী বলা হয়, ত্রিদেব জননী (তিনজন-ব্রহ্মা, বিষ্ণু-শিব)-এর মাতা বলা হয়েছে।

পবিত্র শ্রীমদ দেবীপুরাণ (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, অনুবাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও চিমন লাল গোস্বামী) তৃতীয় স্কন্ধতে পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত্য-তে স্পষ্ট বর্ণন আছে যে, ভগবান বিষ্ণু বলছেন যে কি, এই প্রকৃতি (দূর্গা) আমাদের তিনজনেরই মাতা। আমি ইনাকে ওই সময় দেখেছিলাম, যখন আমি ছোট্ট বাচ্চা ছিলাম। মায়ের স্তুতি করে বিষ্ণু বলছেন, হে মাতা আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শিব নাশবান। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হয়ে থাকে।

আপনি প্রকৃতি দেবী আছেন। ভগবান শঙ্কর বললেন, হে মাতা যদি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আপনার থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে আমি শঙ্কর ও আপনার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছি, অতএব আপনি আমারও মাতা আছেন।

মহর্ষি সর্বানন্দ প্রথমেই শোনাশুনি অর্ধেক শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞান (লোক বেদ)-এর আধারে তিন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু তথা শিব)-কে অবিনাশী ও অজন্মা বলতে থাকত। পুরাণ পড়তেন তবুও অজ্ঞানীই ছিল। কেননা ব্রহ্ম (কাল) পবিত্র গীতাতে বলতেন আমি সর্ব প্রাণী (যারা আমার একুশ ব্রহ্মাণ্ডের অধীন আছে)দের বুদ্ধি আছি। যখন ইচ্ছা জ্ঞান প্রদান করে দিই তথা যখন ইচ্ছা অজ্ঞান ভরে দিই। ওই সময় পূর্ণ পরমাত্মার বলার পরে কাল (ব্রহ্ম)-র প্রেসার (চাপ) সরে গিয়েছিল তাই সর্বানন্দের স্পষ্ট জ্ঞান হয়েছিল। বাস্তবে এই রকমই লেখা আছে। কিন্তু মান হানির ভয়ে বললেন, আমি সর্ব কিছু পড়েছি, এই রকম কোথাও লেখা নেই। কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)-কে বললেন তুই মিথ্যাবাদী তুই কি জানিস শাস্ত্রের বিষয়। আমি প্রত্যেকদিন পড়ে থাকি। পরে সর্বানন্দ ধারা প্রবাহিক সংস্কৃত বলা শুরু করে, কুড়ি মিনিট পর্যন্ত্য কোন এক বেদবাণী মুখস্ত বলতে লাগে কিন্তু পুরাণ আরা শুনাতে পারিনি।

সর্ব উপস্থিত ভোলা-ভালা (সরল-সোজা) শ্রোতা গণ তো সংস্কৃত বোঝে না, সর্বানন্দের কণ্ঠস্থ সংস্কৃত শুনে প্রভাবিত হয়ে সর্বানন্দ মহর্ষির সমর্থনে বাহ-বাহ মহাজ্ঞানী বলতে লাগল এবং সর্বানন্দকে বিজয়ী ঘোষণা করল, পরমেশ্বর কবীর (কবির্দেব)-কে পরাজিত ভেবে নিল। পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব)-বললেন, সর্বানন্দ জী আপনি পবিত্র গীতার শপথ খেয়েছিলেন, সেটাও কি ভুলে গিয়েছ? যখন সামনে লেখা শাস্ত্রের সত্য প্রমাণকে মানবেন না, তাহলে আমি হারলাম তুমি জিতলে।

এখন একটা কথা মনে পড়ছে, এক জমিদারের পুত্র সপ্তম ক্লাশে পড়ত। সে কিছু ইংরাজী ভাষা শিখেছিল। একদিন দুই পিতা ও পুত্র গরুর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। সামনে দিয়ে এক ইংরেজ আসছিল, সে এই পিতা পুত্রের কাছে ইংরাজি ভাষায় রাস্তার কথা জানতে চাইলেন। তখন পিতা পুত্রকে বলছেন, পুত্র এই ইংরেজ নিজেকে খুব বেশী শিক্ষিত সিদ্ধ করতে চাইছে, তুমিও তো ইংরাজি ভাষা জান, বের করে দাও এর শিক্ষার ঘমন্ত (অভিমান শুনিয়ে দাও কিছু ইংরাজি ভাষা। জমিদারের পুত্র ইংরাজি ভাষাতে এক অসুখে পড়ার ছুটির প্রার্থনার পত্র, পুরো পরে শুনিয়ে দিয়েছে। ইংরেজ ওই নাদান (অবুজ) বাচ্চাকে বলছেন, রাস্তার কথা শুনাবে, তা নাকি অসুখের পড়ার প্রার্থনার চিঠিপত্র শুনাচ্ছে। সে মাথায় হাত রেখে ইংরেজ তার গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। জমিদার মূর্খের মত ইংরাজি তো কিছু বুঝলেন না, ছেলের ইংরাজি বলা দেখে বিজয় পুত্রর মাথা থপ থপিয়ে সাবাসি দিলেন, বাহ বাহ পুত্র তুইতো আমার জীবন সফল করে দিয়েছিস্। আজকে তুই ইংরেজী ভাষায়ালাকে পরাজিত করে দিয়েছিস। তখন পুত্র বলছে পিতা, ত্তস্তচন্দ্বব্দদ্ধ ঠক্তজনন্দ্ধস্তু (আমার প্রিয় বন্ধু নামের পুস্তক)-ও মনে আছে। যদি তাই শোনাতাম তো ইংরেজ গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত। এই প্রকারে কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) কিছু জিজ্ঞাসা করেন, সর্বানন্দ এই সপ্তম ক্লাশের বাচ্চার মত মুখস্ত করা সংস্কৃত শোনালেন। পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) বললেন, সর্বানন্দ তুমি জিতলে আর আমি হারলাম। মহর্ষি সর্বানন্দ বললেন লিখে দাও, আমি কাঁচা কাজ করি না। পরমাত্মা কবীর (কবির্দেব) এই কৃপাও তুমি করে দাও। যা লেখার লিখে দাও, আমি আঙুল ছাপ দিয়ে দেব। মহর্ষি সর্বানন্দ লিখেছেন যে কি শাস্ত্রার্থতে সর্বানন্দ বিজয়ী হয়েছে তথা কবীর সাহেব পরাজিত হয়েছেন। আর কবীর পরমেশ্বরের আঙুলের ছাপ নিলেন। নিজের মায়ের কাছে গিয়ে সর্বানন্দ মহর্ষি বললেন, মাতা নেন আপনার গুরুদেবের পরাজিত হওয়ার প্রমাণ। ভক্তিমতী সারদা মাতা বললেন, পুত্র পড়ে তো শুনাও। যখন সর্বানন্দ পড়ছিলেন, তাতে লেখা রয়েছে, সর্বানন্দ পরাজিত হয়েছেন আর কবীর পরমেশ্বর জিতেছেন। সর্বানন্দের মাতা বললেন, পুত্র তুমি তো বলছিলে আমি বিজয়ী হয়েছি, এতো দেখছি তুমি হেরে এসেছো। মহর্ষি সর্বানন্দ বললেন, মাতা আমি লাগাতার শাস্ত্রতে ব্যস্ত ছিলাম, এই জন্য নিদ্রাবশে আমার লিখতে হয়তো ভুল হয়ে গিয়েছে। এখন আবার যাব গিয়ে ঠিক করে লিখে নিয়ে আসব। মাতা শর্ত লাগিয়েছিলেন, বিজয়ী হওয়ার কোন লিখিত প্রমাণ দিলে তাহলে আমি মানব, মুখে মুখে বললে মানব না। মহর্ষি সর্বানন্দ দ্বিতীয়বার গিয়ে বললেন, কবীর সাহেব, আমার লিখতে কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার লিখতে হবে। সাহেব বললেন ঠিক আছে লিখে নাও। সর্বানন্দ আবারও লিখে বৃদ্ধ আঙুলের ছাপ লাগিয়ে মাতার কাছে আসলেন, আবার ওই বিপরীতই লেখা রয়েছে। মাকে বললেন আবারও

যাচ্ছি। তৃতীয়বার লিখিয়ে নিয়ে এসে, ঘরে প্রবেশ করার আগে দেখছে যে ঠিক আছে। সর্বানন্দ ওই লেখা থেকে দৃষ্টি হাটায়নি তথা এগিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই বললেন মাতা শুনাবো বলে পড়তে গেলে হঠাৎ চোখের সামনেই অক্ষর বদলে গেল। তৃতীয়বার আবার ওই প্রমাণ লিখা হয়েছে যে, শাস্ত্রার্থে সর্বানন্দ হেরে গিয়েছে এবং কবীর সাহেবের বিজয় হয়েছে। সর্বানন্দ কিছু বলতে পারেনি। তখন তার মাতা বললেন, পুত্র বলছিস না কেন? পড়ে শোনা কি লেখা আছে? মাতা জানতেন অবুঝ পুত্র, পাহাড়ের সাথে টকরাতে যাচ্ছে। মাতা সর্বানন্দকে বললেন পুত্র, পরমেশ্বর এসেছেন, গিয়ে চরণে পড়ে ভুল প্রার্থনা করে ক্ষমা চেয়ে নে। আর উপদেশ নিয়ে নিজের জীবন সফল কর। সর্বানন্দ নিজের মায়ের চরণ ছুয়ে কাঁদছে আর বলছেন মাতা স্বয়ং প্রভুই এসেছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলেন, আমার একা যেতে লজ্জা করছে। সর্বানন্দের সাথে মাতা কবীর পরমেশ্বরের কাছে গিয়ে পুত্রকে উপদেশ দেওয়ালেন এবং ক্ষমা যাঞ্চনা চাইলেন। তখন ওই মহর্ষি অবুঝ প্রাণী পূর্ণ পরমাত্মার চরণে আসলেই উদ্ধার হবে। পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) বললেন সর্বানন্দ তুমি অক্ষর জ্ঞানের আধারেও শাস্ত্রকে বোঝনি। কেননা আমার স্মরণে না আসা পর্যন্ত্য ব্রহ্ম/কাল বুদ্ধিকে বিকশিত হতে দেয় না। এখন ফিরে এই পবিত্র গীতা ও পবিত্র বেদ ও পবিত্র পুরাণ পড়ো। এখন তুমি ব্রাহ্মণ হলে। ব্রাহ্মণ সই ব্রহ্ম জানে, বিদ্যান ওই যে পূর্ণ ব্রহ্মকে চেনে। পরে নিজের কল্যাণ করে।

বিশেষঃ— আজ থেকে ৫৫০ বর্ষ পূবে এই পবিত্র বেদ, পবিত্র গীতা ও পবিত্র পুরাণে লেখা জ্ঞান কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) নিজের সাধারণ বাণীর দ্বারা সবাইকে বলে গিয়েছেন। যে ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত্য মহর্ষি ব্যাকরণ ত্রুটি যুক্ত ভাষা বলে, পড়তেও আবশ্যক মনে করেনি বা বুঝতে চায়নি। আরও তারা বলতেন কবীর তো অজ্ঞানী, এর অক্ষর জ্ঞান তো কিছুই নেই। এ কি বোঝে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্রের মধ্যে লুকানো থাকা গুঢ় রহস্যকে। আমরা বিদ্যান আছি, যা আমরা বলি সে সব শাস্ত্রে লেখা আছে। অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিবের কোন মাতা পিতা নেই। এতো অজন্মা-অজর অবিনাশী ও সর্বেশ্বর, মহেশ্বর, এবং মৃত্যুঞ্জয়। সর্ব সৃষ্টির রচনহার ও ত্রিগুণযুক্ত। আদি আদি ব্যাখ্যা ঠুকে এখনও বলে বেড়ায়। আজ সেই পবিত্র শাস্ত্র এই দাসের কাছেও আছে। যাহতে তিন প্রভু (ব্রহ্মা-রজোগুণী, বিষ্ণু-সতগুণী এবং শিব-তমগুণী)-র মাতা পিতা স্পষ্ট বিবরণ আছে। কবীর সাহেব প্রকট হওয়ার সময়ে বা তার আগেও আমাদেরই পূর্ব পুরুষরা অধিকাংশই অশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষিত বর্গদেরও শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ণ রূপে ছিল না। ওই সময় কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব)-র দ্বারা বলা জ্ঞান সত্যকে জেনে বুঝে মিথ্যা করে দিত, আর বলতো কবীর মিথ্যা বলে, কোন শাস্ত্রতে নেই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কোন মাতা পিতা আছে। তবে পবিত্র পুরাণ সাক্ষী আছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম মৃত্যুও হয়ে থাকে এবং এরা অবিনাশী নয়। তিন দেবতার মাতা প্রকৃতি (দূর্গা/অষ্টাঙ্গী) ও পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম/কাল) রূপী আছে।

আজ সমস্ত মানব সমাজ ভাই-বোন, বালক-যবান বয়স্ক গুরুজন, ছেলে ও মেয়ে শিক্ষিত হয়েছেন, আজ এদেরকে কেউ ফোঁসলাতে পারবেনা যে কি শাস্ত্রে এসব লেখা নেই, এই বলে। যেমন কবীর পরমেশ্বরের লেখা বাণী।

পূজ্য কবির্দেবের অমৃতবাণী ঃ—

ধর্মদাস যহ জগ বৌরানা। কই ন জানে পদ নিরবানা।।
অব মে তুমসে কহো চিতাই, ত্রিয়দেবন কি উৎপত্তি ভাই।।
জ্ঞানী শুনে জো হৃদে লগাই, মূর্খ শুনে জো গম্য না পাই।।
মা অষ্টাঙ্গী পিতা নিরঞ্জন, বে জম দারুণ বংশন অঞ্জন।।
পহিলে কিন্থ নিরঞ্জন রাই, পিছে সে মায়া উপজাই।।
ধর্মরায় কিনহো ভোগ-বিলাসা, মায়াকো রহি তব আশা।।
তীন পুত্র অষ্টঙ্গী যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে।।
তিন দেব বিস্তার চালায়ে, ইনমে এ জগ ধোখা খায়ে।।
তিন লোক অপনে সুত দীন্থা, সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লীন্থা।।
অলখ নিরঞ্জন সুন্য ঠিকানা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেদ না জানা।।
অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা তিন লোক জীব কিন্থ অহারা।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহী বাঁচায়ে, সকল খায় পুন ধুর উড়ায়ে।।
তিনকে সুত হে তিনো দেবা, আন্ধর জীব করত হে সেবা।।
তিনদেব ওর অবতারা, তাকো ভজে সকল সংসারা।।
তিন গুণকা এই বিস্তারা, ধর্মদাস সে কহ পুকারা।।
গুণ তিনোকি ভক্তিমে, ভুল পরো সংসার।।
কহে কবির নিজ নাম বিন, কৈসৈং উতরে পাড়।।

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে—পরমেশ্বর কবীর সাহেব আপন প্রিয় সেবক শ্রীধর্মদাস সাহেবকে বলছেন, ধর্মদাস এসব সংসার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিচলিত আছে। কেউই পূর্ণ মোক্ষ মার্গ ও সৃষ্টি রচনার পূর্ণ জ্ঞানের খবর জানে না। এইজন্য তোমাকে আমার দ্বারা রচনা সৃষ্টির কথা শুনাব। বুদ্ধিমান শীঘ্রই বুঝবে এবং হৃদয়ে রাখবে, আর যারা অবুঝ অজ্ঞানী কালের চক্রতে পড়া, সে প্রমাণ দেখেও মানবে না;ভক্তিযুক্ত পুণ্যাত্মারা হৃদয়ে বসাবে। এখন আমি বলছি তিন ভগবান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবের উৎপত্তি কেমন করে হয়েছে? এদের মাতার নাম অষ্টাঙ্গী (দূর্গা বা প্রকৃতি) এবং পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম, কাল) আছে। এই ব্রহ্মকালের উৎপত্তি এক ডিম থেকে হয়েছে পরে দূর্গা উৎপত্তি হয়েছে। দূর্গার রূপে আসক্ত হয়ে (কাল) ব্রহ্ম ভুল কাজ মানে ছেড়-ছাড় অশ্লীল ব্যবহার দূর্গার সাথে করতে চেয়েছে, দূর্গা ভয়ে কালের মুখ দিয়ে সুক্ষ রূপে পেটে ঢুকে গিয়েছিল শরণ নেওয়ার জন্য। আমি ওখানে গিয়ে দূর্গাকে পেট (উদর)-থেকে বের করে, একুশ ব্রহ্মাণ্ড সহিত ১৬ সংখ দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন ও প্রকৃতি দূর্গা ভোগ-বিলাসে এই তিনগুণ দেবের উৎপত্তি করেছে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে। এই তিনগুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সতগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব)-কে পূজা করে সর্বপ্রাণী কাল জালে ফাঁসতে থাকে। যতসময় বাস্তবিক মন্ত্র না মিলবে পূর্ণ মোক্ষ কি করে হবে।

।। ভুলে যাওয়া পথিকের সতমার্গের সন্ধান।।

"ঈশাবন্তী বোনের দুঃখ ভরা কাহিনী"

আমি ভক্তিমতী ঈশাবন্তী দেবী, স্বামী শ্রী ভক্ত সুরেশ দাস অহলাবত পুত্র শ্রী প্রতাপ সিং অহলাবত, পানা গঞ্জা, গ্রাম-ডীঘল, জেলা-ঝজ্জর নিবাসী। হে বন্দী ছোড় সত-গুরু রামপালজি! আমি ও আমার পরিবার সবাই আপনার চরণের ধূলি আছি। আপনি আমাদের ওই সুখ দিয়েছেন, যা আমরা কল্পনাও করিনি বা না কল্পনা করতে পারি। আজ আমি যে বৃতান্ত লিখছি, যা আপনি আমাদের বক্‌শিষ রূপে দিয়েছেন, যাতে আমার এই দুঃখ ভরা কাহিনী শুনে, আমারই মত কোন দুঃখী পরিবার আপনার আশির্বাদে কল্যাণ করতে পারেন। আমাদের জীবন একেবারে অন্ধকারময় ছিল, যদি আপনার চরণে আজ না হতাম, তাহলে জীবিত থাকতাম না।

আমি অসাধ্য রোগে ভুগছিলাম, আমার ভাই ভাপড়ৌদা নিবাসী ওমপ্রকাশ পুত্র শ্রী দয়ানন্দ রাঠী, যে হরিয়ানা পুলিশের চাকরি করতো, সেও এই অসুখে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছে। আমিও ওই স্টেজে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি এই অবস্থায় পৌঁছেছিলাম যে হাত পা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল ও কথাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক অনেক ডাক্তার ওঝা বৈদ্য দেখিয়েছি কোথাও ঠিক করতে পারেনি। আমার স্বামী এতই মদ খেতেন যে তিনি ঘরে আসলে বাচ্চারা খাটের নীচে লুকাতো। ঘরের কাসা পিতলের বাসনও মদের নেশায় বেচে মদ খেতেন, অনেক ঋণি হয়ে গিয়েছিলাম। পাড়া প্রতিবেশী ও অসহ্য মনে করতেন। একদিন মদের নেশায় আমাকে উঠিয়ে, এক কুয়োর কাছে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, এর মধ্যে মহাপাপী প্রেত বলছে, কার কত শক্তি আছে দেখব, আমি তো এই ঘর সর্বনাশ করে ছাড়ব। আমার ভাই আমার জন্য অনেক পয়সা কড়ি ডাক্তারের পিছনে নষ্ট করেছে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। স্বামী মদ খেত, বাচ্চা ছোট ছোট ছিল। শশুড় বাড়ীতে কোন সাহারা ছিল না। আমার এক ভাই সুখবীর যে ডী.টি.সীতে ড্রাইবর ছিল, সে সদগুরু রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, বোন সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ দিয়ে নিয়ে আসি। মরতে তো তোকে হবেই, শেষ উপায় করি। এরপর আমার পিতা দয়ানন্দ রাঠী বললেন, নামে কি কেউ ঠিক হয় নাকি? এর পরে আমার ভাই নাম উপদেশের মহিমা সবাইকে বোঝালেন। তার পরে সবাই বললেন দেখা যাক, এরপর আমাকে সন্তরাম পাল মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। ওই সময় সতগুরুদেব গ্রাম পাঞ্জাব ছেড়ে দিল্লিতে সতসঙ্গ করছিলেন। পুরোপরিবার আমাকে নিয়ে রাত ১০ টার সময় মহারাজের চরণে নিয়ে গেলেন। এই ঘটনা ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬-তে শুনালেন।

আমার ভাই পূজ্য গুরুদেব রামপাল মহারাজকে আমার দুঃখের কাহিনী শুনালেন। গুরুদেব রাত ১০টার সময়ে সৎসঙ্গের মধ্যে আগে আমাকে নাম প্রদান করলেন। তার আগে আমার কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, জিভ নড়তো না, বা উঠত না। যেদিন ২৬ ডিসেম্বর। সেদিন সকালে উঠে এবং আমার মুখ থেকে কথা বলা শুরু হয়েছিল। নিজের ভাইকে বললাম, এতদিনে অর্থাৎ এত বছর পরে, মনে হচ্ছে, আমি আমার শরীরে আছি। এমন মনে হল যে আমার শরীর থেকে কোন ভারি জিনিষ নেমে গেল। আমাকে কথা বলতে দেখে, আমার ভাই সুখবীর অবাক হয়ে বললেন, এতো সাক্ষাৎ কবীর পরমেশ্বর এসেছেন। আমি বিড়ি খেতাম, ওইদিন থেকে ছেড়ে দিয়েছি,

আমার স্বামী ভক্ত সুরেশ বললেন, তুমি কি নাম নিয়ে এসেছ, আমি দেখছি তোমার নামে কি শক্তি আছে? নিজের মা কে বলছিলেন, এ কেমন নাম নিয়ে এসেছে, সকালে বাচ্চারা গুড্ মোর্নিং-এর জায়গায় সৎ সাহেব বোলতে লেগেছে। ভক্ত সুরেশ এক বছর পর্যন্ত এইরকমই মদ খেতেন ও ঘরে রোজ ঝগড়া করতেন।

একদিন এই বন্দী ছোড় কবীর সাহেব, গরীব দাস সাহেব এবং রামপাল মহারাজের ফটো ভাঙতে যাচ্ছিলেন, তখন আমি হাত জোড় করে বন্দী ছোড়কে প্রার্থনা করি, হে বন্দী ছোড় আপনি এর বুদ্ধিকে কন্ট্রোল করতে পারেন তখন বন্দী ছোড় নিজেই ইনাকে এমন চমৎকার দেখিয়েছেন যে আমার স্বামী পূজা স্থলে গিয়ে ফটো রেখে দিয়ে, উল্টো পায়ে দন্ডবৎ প্রণাম করলেন, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত্য মদ বিড়ি খায় না, সব ত্যাগ করেছেন। এই ঘটনার প্রমাণ আছে গবাহ্ পানা গঞ্জা ও ডীঘল গ্রামে। আমার পূণর্জন্ম দেখে, আমার দুখে দুখী আমার ভাই রাজেন্দ্র সিং রাঠী ডি,এস,পি(হরিয়ানার) ও ভাই ওমপ্রকাশ রাঠী উকিল (দিল্লির) সহিত পুরো পরিবার নামদান নিয়েছেন। নাম উপদেশ নেওয়ার পরে কবীর পরমেশ্বর এমন এমন সুখ দিয়েছেন, যার কল্পনাও করা যায় না। আমার মহিষকে সাপে কেটেছিল, মহিষের অবস্থা খুবই খারাপ। ডাক্তারকে দেখালাম বললেন, একে কোন বিষযুক্ত জানোয়ার কেটেছে এবং দশটা ইনজেক্সন লাগিয়েছেন। পরের দিন আমার মহিষের চোখ দিয়ে নীল জল বইতে শুরু করল এবং মহিষ অন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার পারবে না বললেন। সেদিন রাত্রে সতগুরু রাম পাল জি স্বপ্নে এসে, মহিষের শরীরের উপর হাত বুলালেন। সকালে আমি ও পাশের ঘরের লোক নিজের চোখে মহিষের মুখের মধ্যে সাপকে দেখলাম আর বের করলাম। মহিষের স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে গিয়েছে দুধও দিচ্ছে। এমন এমন না জানি কত সুখ গুরুদেব রূপী পরমেশ্বর আমাদের দিয়েছেন। কাল আমাদের কাছে ১০ টাকা ও ছিল না আজ জমিতে ফসল ফলে টাকা পয়সার অভাব নেই, কারর কাছে হাত পাততে হয় না। দেনাও শোধ হয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী বলেন তোমার গুরুদেব রাম ভগবান। অজ্ঞানী অবুঝ কি জানবে আপনার মহিমা ? সন্ত রামপাল মহারাজের বিরোধীর কাজ শুধু কাদা ছোড়া। যার উপর তার কৃপা হয়েছে সে জানে আপনার কাছে কি কি পেয়েছি আমি সব প্রভু প্রেমীর কাছে প্রার্থনা করছি, মরতে তো হবেই একদিন, তবে এই সুযোগ কেউ ছাড়বেন না, পরে যেন অফসোস না করতে হয়। গুরুদেবের কাছ থেকে নাম নেওয়ার পর এত সুখ মিলেছে, হে পরমেশ্বর আমি বর্ণন করতে পারছিনা। তবুও বর্ণন করার চেষ্টা করছি। আমি আপনার কাছ থেকে ১৯৯৬তে নাম নিয়েছি, তার ঠিক দেড় বছর পরের এক ঘটনা বলছি—

একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখি, আমি এক গ্রামে গিয়ে শশ্মান কতদূর এবং কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বলল কাল এখানে আসবে আমাকে সে জায়গাও দেখিয়েছে। সে জায়গার নাম মুণ্ডান পানা, সেখানে শশ্মান ছিল। যখন সকাল হয়েছে তো আমার হাজা হয়ে গিয়ে, মাথায় এমন যন্ত্রণা হচ্ছে যেন, এখনই মাথা ফেটে মরে যাব। এর মধ্যে মৃত্যু ও এসে গিয়েছে। ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে, তিনি ইনজেক্সন দিলেন, তার পরে ডাক্তার বললেন এতো মারা গিয়েছে। তার পরে চার দূত দেখতে পাই। তারা আমায় দুইদিক থেকে টানা শুরু করে আর বলছে আমাদের ভগবান পাঠিয়েছে, আপনাকে নিয়ে যেতে, আপনার আয়ূ শেষ। আমি বললাম, আমার গুরুদেব নিয়ে

যেতে দেবেন না। তখন তারা বলল তোমার গুরুদেব কি করবে? তোমার সময় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, আমরা এমনই করব তোমার হাত দিয়েই তোমার মারব, পরে আমার দুই হাত ধরে আমার গলা জোড়ে দাবায় আর প্রাণ আমার চোখে এসে যায়। আমি কিছু বলতে পারিনি। বন্দী ছোড় বলেন, "আ যম তেরে ঘট নে ঘেরৈ, তু রাম নাম কহন নহী পাবেগা", ওইরকম স্থিতি আমার হয়েছিল, তার পরে কবীর সাহেব পদ্মফুলে বসে আছেন এমন অবস্থায় আমার সামনে প্রকট হলেন, এর মধ্যে আমার ভিতর দিয়ে পূজ্য সদগুরু রামপাল মহারাজের আওয়াজ এসেছে, এই মেয়েকে আপনি কি করে নিয়ে যাবেন? একে আমি যেতে দেব না, একে যখন আমি চাইব তখনই নিয়ে যাব। এর যদি পাত্রবং হাত কেটে দাও তাও আমি জুড়িয়ে দেব। গুরুদেব আরও অনেক কথা বলেছেন যা আমি বর্ণন করতে পারছি না। তার পরে যম দূত পালিয়ে গেলেন। তখন গুরুদেব আমায় বললেন পুত্রী, ভয় পেয়ো না, তোর মৃত্যুকে আমি সরিয়ে দিয়েছি, এখন আমি যখন চাইব তখন নিয়ে যাব।

আমার একটা মহিষ ছিল, সে কয়েকদিন পরেই বাচ্চা দেবে। একদিন একদম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারকে ডাকায়, সে টাইম হওয়ার আগেই বাচ্চা হাত দিয়ে বের করেছেন। পড়ে মহিষের ফুল পড়েনি, আমি ফুলের নাড়িতে এক টুকরো ইট বেঁধে দিই, পড়ে ইটের ভারে নাড়ি ছিড়ে যায়, এর মধ্যে কিছুক্ষণ পরে মহিষের স্বাস্থ্য খুবই শোচনীয়, সবাই বলছে মহিষ এখন আর বাঁচবে না। আমি ঘাবড়িয়ে পাঁচ ডাক্তার ডাকতে গিয়েছি, এক ডাক্তারও আসতে চায়নি, বলে আমরা পারব না। ওই পরমাত্মা যদি কিছু করতে পারে। এর পরে দুঃখে আমিও আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভাবছি আজ আর বাঁচাতে পারব না। তখন আমি স্বামীকে বললাম ভক্তজি, আশা ছেড়ো না আমাদের বন্দী ছোড় (গুরুদেব) সব ঠিক করে দেবেন, এরপরে বন্দী ছোড়ের ফটোর সামনে দন্ডবৎ প্রণাম করলাম ও প্রার্থনা করলাম। পরের দিন সকালে এক ডাক্তারের কাছে গেলাম, সে এসে দেখে বললেন বাঁচবে না, আর এও তিনি বললেন, আমাদের মহিষের এমন হয়েছিল বাঁচে নি। তিনি বললেন, যদিও বাঁচে কিন্তু দুধ দেবে না। তার সাতদিন পরে স্বপ্নে গুরুদেব দেখা দিয়ে মহিষের ফুল বের করে দিয়েছেন। সকালে দেখি ফুল পড়েছে মহিষ একদম সুস্থ হয়ে গিয়েছে এবং ১৫ কিলো দুধও দিয়েছে। এ আমার বন্দী ছোড়ের কৃপা আছে, আমাদের আশেপাশে এই অবস্থায় ৪/৫ মহিষ মারা গিয়েছিল।

আমার ছোট ছেলে যার বয়স ১৪ বৎসর নবনিত নাম, এর যখন ছয় মাস বয়স ছিল তখন নিমোনিয়া হয়েছিল, ৫ বছর পর্যন্ত সমাপ্তই হয় না অসুখ বিসুখ। একদিন ওকে আমি সদগুরু রামপাল মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা দিয়ে নিয়ে আসি, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোন অসুখই হয় নি। আজ তার বয়সী সব বাচ্চা থেকে ওর স্বাস্থ্য একদম ফিটফাট্ এসবই সদগুরুই কৃপাতে।

একদিন পূর্ণিমার সৎসঙ্গের সময় ২০০৪ সাল, বৃষ্টি না হওয়ার কারণে, আমার ধান গাছ একদম শুকিয়ে যাচ্ছিল, বছরে এক দুবার ছোট ছোট নদীর শাখার জল এক দুইবার নালার মাধ্যমে আসে আবার চলে যায়। এখন নদীর জলের আসতে প্রায় একমাস দেরী লাগতে পারে। আমি পূর্ণিমার সেই সতসঙ্গ সমাপ্ত করে যখন জমি দেখতে গিয়েছি, দেখি আমার ১৫ বিঘা জমিতে জলে ভরে গিয়েছে, এটা স্বপ্নেও ভাবা অসম্ভব, ঐ বার সবার জমিতে ১০ মন ধান হয়েছে আমার

জমিতে ২০ মন ধান হয়েছে। সবাই বলতো তোমার গুরুদেবের কৃপায় তোমার জমিতে জল এসেছে। আমাদের এই হরিয়ানায় টিউবয়েলের জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, আমাদের নদীর শাখার জলের উপরই নির্ভর করতে হয়।

এই রকম ছোট ছোট বড় বড় অনেক সুখ দিয়েছেন যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এখন আজ আমার পুত্র দুইজন (ভক্ত অমিত ও নবনিত) সদগুরু রামপাল মহারাজের কৃপায় ২০১০-তে পুলিশের চাকরি পেয়েছে। আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে পাঠকদের কাছে প্রার্থনা যে সুখী জীবন ও আত্মার কল্যাণের জন্য অবশ্যই সতলোক আশ্রমে গিয়ে সদগুরু রামপাল মহারাজের কাছ থেকে মুফৎ নাম প্রাপ্ত করুন, মানব জীবন নষ্ট করবেন না। কবীর পরমেশ্বর বাণী ঃ—

কাল করে সো আজ কর, আজ করে সে অব
পলমে প্রলয় হোগী, বহুর করোগে কব।।
সত সাহেব! জয় বন্দী ছোড়! সৎ গুরু রামপাল মহারাজজি কি জয়!

।। "ভাঙা সংসার গড়েছেন" ।।

আমি ভক্ত রমেশ পুত্র শ্রী উমেদ সিং, গ্রাম-পেটবাড়, তহশীল-হান্সি, জেঃ-হিসার নিবাসী, এখন এমপ্লাইজ কলোণী, জেলের সামনে জীন্দে সপরিবার থাকি। নাম নেওয়ার আগে আমরা ভূতদেরই পূজা করতাম, আমাদের গ্রামে বাবা সরিয়ার মান্যতা ছিল, যেখানে আমি প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমায় প্রদ্বীপ জ্বালাতে যেতাম। আর প্রতি শুক্রবার, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রীর ব্রতও করতাম। মা বাবার ও পূর্ব পুরুষদের শ্রাদ্ধ পিন্ডদানও করতাম। এসব করেও আমার ঘর একদম্ ভেঙে গিয়েছে। যখন আমার বয়স বারো বৎসর তখন আমার বাবা মারা যায়। ঘরে তিনজন মাত্র সদস্য ছিলাম এবং তিনজনেরই কোনো না কোনো কারণে লড়াই চালু থাকত।

তিন জনকেই ভূত প্রেত খুব দুঃখী করে রাখত এবং অসুখ বিসুখও আমাদের ঘর থেকে যেত না। কেউ বলতো পাঁচ হাজার দাও আমি একদম ঠিক করে দেব, কেউ বলতো দশ হাজার দিলে কোনদিনই কোন ভূত প্রেত কাছে আসবে না।

আমি একদম উজাড় হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরে কোন আরাম বা শান্তি বলতে কিছুই ছিল না। আমার নিজের আত্মীয় ভক্ত রঘুবীর সিংহ গ্রাম-কৌংথ কলাং, নিবাসী;তার কথায় আমার মা সন্ ১৯৯৬ তে সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলেন। আমার মা বলাতে আমার পত্নীও সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম নিয়েছে। নাম নেওয়ার এক বছরের মধ্যে আমার পত্নীর এক পুত্র হয়। আমার ভগবান থেকে মন উঠে গিয়েছিল। এই জন্য আমি নাম নেই নি। আর মা ও পত্নীকেও সন্তের কাছে যেতে মানা করতাম।

আমার ছেলে যখন পনেরো দিনের হয়েছে সেদিন খুব অসুখে পড়েছিল, ডাক্তার দেখে বললেন, সকালে হয়তো মারা যেতে পারে, একে এখন নিয়ে যাও। সন্ধ্যা বেলায় এক ভক্ত বন্দী ছোড় সদগুরু রামপাল মহারাজের বিষয়ে বললেন যে জিন্দ এক জায়গা সেখানে গুরুদেব এসেছেন। তিনি পূর্ণ সন্ত, তিনিই এই বাচ্চাকে যদি ঠিক করতে পারেন। আমি ডাক্তার ও বৈদ্য ওঝা দেখিয়ে সর্বহারা হয়ে গিয়েছি। আমার তো ভগবান থেকে মন উঠেই গিয়েছিল তাই তাকে মানে সেই

ভক্তকে মানা করে দিয়েছি। তিনি দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করে আমায় বললেন স্বয়ং ভগবানের অবতার আমার গুরুদেব এই পৃথিবীতে এসেছেন। যদি তিনি দয়া করে তাহলে এই বাচ্চা ঠিক হতে পারে। ওই ভক্তের এতটা বিশ্বাস দেখে আমি আমার মাকে অনুমতি দিলাম। আমার মা ওই বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে সতগুরু রামপাল মহারাজের চরণে রেখে দিয়ে বললেন, মহারাজ এই বাচ্চা মারা গিয়েছে এখন আপনিই একে ঠিক করতে পারেন। তখন রামপাল মহারাজজী বললেন কবীর পরমেশ্বরের দয়ায় এ বাচ্চা ঠিক হয়ে যাবে। পরের দিন যে বাচ্চার মরার কথা সেই বাচ্চা ভাল হয়ে গিয়েছে। বন্দী ছোড় সতগুরু রামপাল মহারাজ কি জয়।

আমার ভাঙা সংসার সদগুরু রামপাল মহারাজের কৃপায় দ্বিতীয়বার বসে গিয়েছে। এত চমৎকার দেখার পরেও পাপের অন্ধকারের জন্য আমি নাম নিইনি। আগের মত দেবদেবীর পূজা শুরু করেছি। আমাদের ঘরে যখন সৎগুরু রামপাল মহারাজ, গরীব দাস মহারাজের বাণী পাঠ করতেন, তখন আমি বাইরে গিয়ে মদ খেতাম। এক বৎসর পরে আমাদের ঘরে পাঠ হচ্ছিল সন্ধ্যার সময় বন্দী ছোড় সতগুরু রামপাল মহারাজজী সতসঙ্গ করেছিলেন। সেদিন আমি সতসঙ্গ শুনেছি ও নামও নিয়েছি। তখন থেকে আমাদের ঘরে দুঃখ নামের কোন কিছুই নেই। আমার মা কারর কথায় পড়ে, নাম খন্ডিত করে দিয়েছিলেন। কিছু সময় পশ্চাৎ সন্ ২০০০ সালে মাঁয়ের পায়ে জ্বলন হতে লাগল। ডাক্তার দেখিয়েছি, তিনি বললেন ব্লাড ক্যানসার হয়েছে। তিনি ১০/১৫ দিনের মধ্যে মারা যাবে। যদি চন্ডিগড়ে পি.জি.আই তে নিয়ে যাও তো দেড় লাখ খরচ লাগতে পারে, তবে এক বছর পর্যন্ত্য হয়তো বাঁচতে পারে। কিন্তু যন্ত্রণা কম হবে না। সতগুরু, রামপাল মহারাজ বললেন, আপনার মা নাম খন্ডিত করে দিয়েছে। যেমন কারেন্টের বিল না ভরলে লাইন কেটে দেওয়া হয়। তাকে চালু করার জন্য যেমন আবার দরখাস্ত লিখতে হয় ঠিক এও তেমন। আমার মা ভুল স্বীকার করলেন এবং গুরুদেবের কাছে ক্ষমা চাইলেন। মহারাজজী দ্বিতীয়বার নাম প্রদান করলেন ও মাথায় হাত দিয়ে আশির্বাদ দিলেন। মাথায় হাত রাখতেই ব্যাথা জ্বলন কমে গেল। কমপক্ষে দুই বৎসর পরে মাড়ির দাঁত পড়ে যাওয়ার কারণে সেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। ডাক্তার দাঁত বের করার পরে সেলাই ও করেছে কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। পরে ডাক্তার চেকাপ করে বললেন ব্লাড ক্যানসার হয়েছে এবং ফেটে গিয়েছে। এখন এ ঠিক হবে না, ইনাকে ঘরে নিয়ে যাও, এই রক্ত বের হতে থাকবে দুই দিন পরে মারা যাবে। ফির পরের দিন পায়খানাও পেশাব থেকেও রক্ত পড়া শুরু হল। তখন আমি রামপাল মহারাজজীকে ফোনে সব কথা বললাম ডাক্তার যা যা বলেছেন। তখন তিনি বললেন বন্দী ছোড় যা করবেন ভাল করবেন। পরের দিন রাত দুটোর সময় যমদূত তাকে নিতে এসেছে;আমার মা আমাকে বললেন, তোর বাবা আমাকে নিতে এসেছে (যিনি দশবছর আগে মারা গেছেন)। এই বলতেই যমদূত আমার মায়ের ভিতরে প্রবেশ করল আর বলতে লাগল, একে আমি নিতে এসেছি, আর নিয়েই যাব, এর সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাকে চা খেতে দে। তার জন্য চা চড়িয়ে দিয়েছি এর মধ্যে যমদূত বলছে তোমরা জান না তোমাদের ঘরে কত বড় শক্তি আছে, সে আমাকে মারছে, এখানে আমি থাকতে পারছি না, আমাকে তাড়াতাড়ি চা খাওয়া, তাকে চা দিলাম, সে গরম চা খেয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল তোমাদের ঘরে পূর্ণ পরমাত্মা দাঁড়িয়ে আছে। আমি একে নিয়ে যেতে পারছি না। এই

বলতেই সে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যে ওই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। জিভ ও দাঁত কালো হয়ে গিয়েছিল। সে সব পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। সতগুরু রামপাল মহারাজের কৃপাতে তিনি পূর্ণ সুস্থ হলেন। তার পরে পাঁচ বৎসর আয়ু বাড়িয়ে দিলেন কবীর পরমেশ্বর সাহেব। ২৪ শে জুলাই ২০০৫-তে সত্য ভক্তি করে সতলোকে প্রস্থান করলেন। বন্দী ছোড় রাম পালজী কি জয় সৎ সাহেব।

।। কিডনি ঠিক করলেন ও শয়তানকে মানুষ বানালেন ।।

আমি ভক্ত জগদীশ পুত্র শ্রীপ্রভুরাম, গ্রাম-পাঞ্জাব খোড়, দিল্লি-৮১। ডী.টী.সী.(দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন)-তে মেকানিক। আমাকে মদে রাক্ষস বৃত্তির মানুষ বানিয়ে দিয়েছিল। মদ খাওয়া, মাংস, মাছ, সিগরেট, বিড়ি খেতাম।

আমি চাকরি থেকে সন্ধ্যা ৭/৮ বাজে ফিরতাম। কখন মদ বেশী খাওয়া হয়ে গেলে রাত্র ১০ সাড়ে ১০টা বেজে যেত। মদ খাওয়ার পরে পাগলের মত এদিক ওদিক পড়ে যেতাম। এই অবস্থায় এসে ঘরে ঢুকে মেয়ে ও ছেলের সাথে পত্নীকেও পিটতাম;এটা আমার প্রতিদিনের কাজ ছিল ঠিক তেমন। বাচ্চারা ভয়ে এদিক ওদিক লুকিয়ে থাকত। বাবার ভালবাসা যে কেমন তারা সেটা পেত না। মদ খেয়ে চোখ সব সময় লাল থাকত। তাই বাচ্চারা ভয়ে সামনে আসত না।

অন্যদিকে আমার ধর্মপত্নী তার দুঃখী জীবনের সাথে ভয়ানক রোগ নিয়ে মরণের শ্বাস গুনছে। তার দুটো কীডনিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার বলতেন ঔষধ খেতে থাকো, তবে ছয় মাস পর্যন্ত্য টিকতে পারে, তারপরে জীবিত থাকা মুশকিল। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল আর ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়া হসপিটাল দিল্লি থেকে রিপোর্ট এসেছে দুটো কিডনীই খারাপ হয়ে গিয়েছে। ছয়মাসের বেশী জীবিত থাকবে না সাথে ঔষধ যতদিন বাঁচবে চালিয়ে যেতে হবে। ওই সন্তানের কি দশা যার পিতা মদ খেয়ে নেশায় চবিবশ ঘণ্টা থাকে আর মা-মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছে। কোন ওজন উঠানো ভারি কাজ করতে পারে না। যখন ওই ছোট ছোট মাসুম ফুলের মত বাচ্চারা জানল যে তাদের মা আর ছয় মাস পর্যন্ত্য বাঁচবে, সেই বাচ্চার চোখের জল বইতে থাকে। এক তো বাবা মদখোর ওদিকে মা জীবনের শেষ দিন গুনছেন। আমাদের কি হবে? তিন মেয়ে ও এক ছেলে মায়ের কাছে বসে কাঁদে আর ভগবানকে বলছে, হে ভগবান মায়ের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও, এখানে কার সাহারায় বাঁচব?

পরমাত্মা ওই বাচ্চাদের ও মায়ের ডাক শুনলেন, আর আমাদের ও শুভ কর্ম উদয় হয়েছে যে, আমাদের বাড়ীর পাশে ভক্তিমতি নিহালী দেবী তার গুরুদেব সন্ত রামপাল মহারাজের আজ্ঞানুসার ডিসেম্বর ৩০/৩১/১লা জানুয়ারী ১৯৯০ সালে সতগুরু গরীবদাস জী মহারাজের অমৃতময় বাণী তিন দিনের অখন্ড পাঠ নিজের ঘরে করালেন। সেখানে সন্ত রামপাল মহারাজ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সাল রাত্র ৯ থেকে ১১ বাজে পর্যন্ত্য সৎসঙ্গ করেছিলেন। আমার ধর্মপত্নী সুমিত্রা দেবীও পাশের বাড়ীতে সতসঙ্গ শুনতে গিয়েছিল। কিছু সময় পরে আমি (জগদীশ) ও চাকরী থেকে ঘরে এসেছি। ঘরে এসে বাচ্চাদের কাছে শুনি তার মা পাশের নিহালী দেবীর ঘরে সৎসঙ্গ শুনতে গিয়েছে। এই শুনে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম, বললাম কোন পাখন্ডির কাছে গিয়েছে সৎসঙ্গ শুনতে? আমি এখনই মেরে ওকে ঘরে আনছি। এই বিচার করে আমি ভক্তমতী নিহালী দেবীর

ঘরে চলে গিয়েছি। মদ খেয়েই ছিলাম;যখন আমি নিহালী দেবীর ঘরে পৌঁছেছি তো সন্ত রামপাল মহারাজ জী সৎসঙ্গ করছিলেন। অনেক সংখ্যায় লোক সৎসঙ্গ শুনছিলেন। তাদের সবাই কে দেখে আমি কিছু বলিনি, চুপচাপ পিছনে গিয়ে বসে পড়লাম। আমি সৎসঙ্গ শুনলাম, সৎসঙ্গে মহারাজ বললেন যেঃ—

শরাব পীবৈ কড়বা পানী, সত্তর জনম শ্বাণ কে জানী
গরীব, সো নারী জারী করৈ, সুরাপান সো বার।
এক চিল্লম হুঁক্কা ভরৈ, ডুটব কালী ধার,
কবীর মানুষ জনম পায় কর, নহী ভজৈ হরি নাম।
জৈসা কূয়া জল বিনা, খুদবায়া কি কাম।।

মহারাজজী সৎসঙ্গে বলছিলেন, যে বাচ্চাকে তার পিতার বুকে থাকা উচিৎ ওই মদখোর বাপকে দেখে বাচ্চা লুকিয়ে বেড়ায়। সেই মদখোর ব্যক্তি নিজেও দুঃখী, ধনহানি, সমাজে সম্মান ইজ্জৎ সমাপ্ত এবং পরিবার ও রিস্তোদর (কুটুম্ব) সাথে পাড়া প্রতিবেশী ও তাকে বদদূয়া (অভিশাপ) দেয়। আর পত্নী ও বাচ্চার উপর তো দুঃখের পাহাড় নেমে আসে। সাথে পত্নীর মা-বাবা, ভাই-বোন আদি দিন রাত চিন্তাতে থাকেন। এই সবার পাপ ঐ অবুঝ মদখোরের মাথায় চাপে। মনুষ্য জনম তো প্রভু তার নিজের আত্ম কল্যাণ করার জন্য দিয়েছেন, এই মানব দেহকে এইভাবে মদ, মাংস খেয়ে নষ্ট করা উচিৎ নয়। প্রভু ভক্তি করা উচিৎ। যেমন যে বাচ্চা স্কুলে যেতে চায় না, শিক্ষা গ্রহণ করে না, সারাদিন দুষ্টুর মতো কাজ করে বেড়ায়, সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে, পরে সারা জীবন মজদূরী করে জীবন নির্বাহ করতে হয়। যখন তারই সহপাঠী কোন ডাক্তার, শিক্ষক বা অফিসার হয়, তখন সেভাবে আমি যদি দুষ্টুমি বুদ্ধির কাজ না করে ওর মত মন দিয়ে পড়তাম তাহলে আজ আমি এত কষ্ট করতাম না। তবে পরে ভেবে কি হবে, আগে ভাবা উচিৎ ছিল।

কবীর সাহেব বলতেন ঃ—

অচ্ছে দিন পিছে গয়ে, গুরু সে কিয়া ন হেত
অব পছতাবা ক্যা করে, জব চিড়িয়া চুগ গয়ে ক্ষেত।।

এই প্রকার যদি মনুষ্য জনমে, যে প্রাণী প্রভু ভক্তি না করে, তবে সে পশু পক্ষীর যোনীতে যেতে হয়। যে ব্যক্তি মদ খায় সে মদের নেশায় খাবারে ভরা থালা লাথি মেরে ফেলে দেয়। ভক্তি না করলে ভিন্ন ভিন্ন যোনীতে জন্ম নিয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। কখনও কুকুরের যোনীতে ধারণ করে শীতের ঠান্ডায় সারারাত গলি গলিতে ঘুরে বেড়াতে হয় একটু শীতের থেকে বাঁচার জন্য। উপরে বৃষ্টি পড়ে, ক্ষিদের যন্ত্রণায় কাহারও রান্না ঘরে ঢোকে খাবারের জন্য লাঠির বারি খায় পা ভেঙে দেয়, এই যন্ত্রণা জানাবার কেউ নেই। নোংরা খায়, পায়খানা খেতে হয় পেট ভরার জন্য। এই রকম কষ্ট চুরাশী লাখ পশু যোনীর পরে, একবার নিজের আত্মকল্যাণের জন্য ভগবানকে ভক্তি করার জন্যই মানব শরীর ধরা হয়। ওই মদ খাওয়া মদখোরের আত্মা যখন কুকুরের যোনী ভোগ করে। সেই কুকুর যখন মানব শরীরে ছিল, যদি সৎসঙ্গে যেত, ভালো কাজ করত, ভালো বিচারের মানুষ হয়ে নিজের আত্মকল্যাণ করত তাহলে আজ তার কুকুরের যোনীতে মল মূত্র খেতে হত না। মদের নেশা কিছু সময় পর্যন্ত্য থাকে। আর পরমাত্মার নাম ভজলে সর্বদা আনন্দে

থাকা যায়। উপরোক্ত সৎসঙ্গ আদরণীয় সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে শুনে, আমার মদের নেশা ছুমন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। চোখে জল পড়ছে। ঘরে গিয়েছি, ঘুম আসে না। জানুয়ারী ১৯৯৭ দুপুর ১.৩০টার সময় গুরুদেবের কাছে আত্মকল্যাণের জন্য পত্নীকে সাথে নিয়ে গেলাম তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মদ, তামাক, মাংস ছুইনি। আমার পত্নীও সতগুরু রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম নিয়েছে, ওই দিন থেকে সবাই একদম সুস্থ আছি। ডাক্তার ডাক্তারের চিকিৎসা ও অসুখের এক্সরে আদি রিপোর্ট আজও আমার ঘরে রাখা আছে। তার কাছ থেকে আমি ও আমার পত্নী নাম নেওয়ার পর থেকে সুখী হয়েছি। আজও সেই রিপোর্ট জন জনকে দেখায় প্রমাণের জন্য। আজ আমাদের মাঝে এসেছেন প্রভুর দূতের অবতার রূপ, পরমেশ্বরের সংবাদ বাহক সন্ত রামপাল মহারাজ তাকে জানুক। আমরা আজ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কৃপা করে নিঃশুল্ক (বিনা মূল্যে) উপদেশ নিয়ে আপনাদের সর্ব পরিবারের আত্মকল্যাণ করুন। আমার মত শয়তানকে মানব দেহের মূল্যবোধ করিয়েছেন। তাকে শত কোটি প্রণাম জানাই।

।। সৎ সাহেব।। **ভক্ত জগদীশ।**

।। "ভূত ও অসুখে কষ্ট পাওয়া পরিবারকে খুশীতে ভরিয়ে দেওয়া"।।

ভক্তিমতি অপলেশ দেবী পত্নী শ্রী রামেহর পুত্র শ্রী মাঙ্গেরাম, গ্রাম-মিরচ, তহশীল চরখী দাদরী, জিলা ভিবানী (হরিয়ানা)। আমি অপলেশ দেবী, দুঃখী জীবনের এক ঝলক আপনাদের জানাচ্ছি। আমি ও আমার বাচ্চা রাহুল আর জ্যোতি, যারা অতীতের খারাপ সময়ের স্মরণ করলে আজ ও তারা শিউরে ওঠে। যার বর্ণন করলে প্রাণ মুখে চলে আসে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে বদমাশ লোক আমার স্বামীকে ডিউটির সময়েই মেরে দিয়েছিল। কিন্তু এই পূর্ণ পরমাত্মা (কবীর সাহেব) আমাদের ধ্যান রেখেছেন, আর আমার স্বামীকে জীবন দান দিয়েছেন, আজ আমাদের সব পরিবার সহিত বন্দী ছোড় সদগুরু রামপাল মহারাজের দয়াতে পূর্ণ পরমাত্মার চরণে স্থান পেয়েছি। আমার পরিবারে আমার স্বামীকে পরিস্কার কাপড় পড়াতাম। কিছুক্ষণ পরে কোমড়ের অংশ লাল রক্তে ভরে যেত। বাচ্চাদেরও রক্তের বমি হত, আমার হার্টের অসুখে খুব কষ্ট পেতাম। যার কারণে বছর ধরে ঔষধ খেতে হত। আমার স্বামী দিল্লির পুলিশ ছিলেন আমার শরীরে ফোঁড়া-প্যাচরা হত। ঘরে এই সব অসুখের কারণ স্বামীর মগজ খারাপ হয়ে যেত।

এই সব কষ্টের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে জুলাই ২০০০ পর্যন্ত্য এক ডজনেরও বেশী, লোভী লালচী গুরুদেব দরজা খট খটিয়েছি এবং ভারতবর্ষের তীর্থস্থান, যেমন—যমুনা, গঙ্গা, হরিদ্বার, জ্বালাজি, চামুন্ডা, চিন্তপুরনী, নগর ফোর্ট, বালাজি, মেহেন্দিপুর। গুড়গাঁবা বালী মাই ও গোরখ টিলা রাজস্থান এই রকম প্রত্যেক স্থানে বাচ্চাদের নিয়ে চক্কর লাগিয়েও কোন লাভ হয়নি।

এই প্রকার আমাদের পরিবারের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে-পূজা পার্বন রং খেলা, এসব কোনো মসজিদে বসে কাটাতে হত।

আমি খুব ভাগ্যশালী যে আমার সন্তপাল মহারাজের দ্বারা পরমপূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শরণে ঠাঁই পেয়েছে। তখন কোথায় গিয়েছে সে কালের দূত আর সেই ভয়ঙ্কর রোগ। যার চিকিৎসা অল ইন্ডিয়া হসপিটালে চলছিল ? যা সতগুরুদেবের চরণের ধূলির কাছে টিকে থাকতে পারেনি।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে এক কালের পূজা করা এক কবিরাজ ফোন করে জিজ্ঞাসা করছে অপলেশ তোমার নাম ? আমি বললাম হ্যাঁ, আপনার নাম কি ? তখন সে আবার বললেন, এই বলবান নামের ব্যক্তি তোমার কি হয় ? আমি বললাম, আপনার নাম কি ? আপনি কে ? আর এত সব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? তখন সেই কবিরাজ বললেন পুত্রী তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করো না, আমি বলতে চাই না। হান্সী নামের এক জায়গা থেকে বলছি। এই বলবান নামের ব্যক্তি ও তার সাথে আরেকজনও এসেছিল। এই দুইজন আমায় ৩৭০০ টাকা দিয়ে গিয়েছে, তোমাদের পরিবারকে নষ্ট করার জন্য। আর ওই বলবান নামের ব্যক্তি তোমার ফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছে, আমি তার কাছ থেকে এই জন্য নিয়েছিলাম যে দূগতি তোমাদের হয়েছে কি হয়নি। তোমার কাছে ফোন করে জানতে পারব তাই। যেদিন রাত্রে এই খারাপ কাজ করে, ঘুমাতে গিয়েছি, সেই সময়ে সাদা কাপড়ে, যে গুরুকে তুমি ভক্তি পূজা কর, তাকে দেখতে পেয়েছি, তিনি আমাকে বলেছেন এর বদলে তোর পরিণাম তুই নিজেই ভুগবি। এই পরিবার সর্ব শক্তিমান সর্ব কষ্ট হরণ করা পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শরণে আছে, তোর হিম্মৎ কি ? ওই যমদূত কালও এই পরিবারের কিছু নষ্ট করতে পারবে না।

গরীব- জম জৌরা জাসৈ ডরৈ, মিটৈ কর্ম কী লেখ,
অদলী অদল কবীর হে, কুল কে সদগুরু এক।।

পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরকে যম (কাল ও কালের দূত) এবং মৃত্যু ও ভয় পায়। সেই পূর্ণ প্রভু পাপ কর্মের দন্ডের লেখাকেও সমাপ্ত করে দেয়। এর পরে ওই কবিরাজ বললেন পুত্রী তোমাকে বলে দিচ্ছি, তুমি যে দেব পুরযোত্তমের পূজা কর, সে খুব শক্তিশালী। আমি ২৫ বৎসর ধরে এই যাদু-টোনা করে থাকি, না জানি কত পরিবারের সর্বনাশ করে দিয়েছি। তবে আজ প্রথমবার আমার হার হয়েছে। পুত্রী এই শক্তিকে তুমি ছেড়ো না, নয়তো মার খেয়ে যাবে। তোমাদের বিনাশের জন্য বলবান আদি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম, আমি পূর্ণ পরমাত্মার পূজা করি। বলবান আমার স্বামীর বড়ভাই, আমাদের পাকা শত্রু হয়েছে। আজ আমরা এতই আনন্দিত ও গৌরবযুক্ত, কোন বস্তু বা কাজের আবশ্যকতা হলে, সেটা সতগুরুদেব, সত কবীর সাহেব পূর্ণ করে দেন। আজ গুরু ও গোবিন্দ দুইজন দাঁড়িয়ে আমি কার চরণে লাগব। হম বলিহারী সতগুরুদেব রামপাল জীর চরণে তে যে পরমেশ্বরকে দিয়া মিলায়।

হে ভাই ও বোন আমরা পরিবার মিলে আপনাদের এই সংবাদ দিতে চাই যে, যদি আপনাদের সতলোকের রাস্তা পূর্ণ মোক্ষ ও সর্বসুখ প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা হয় আর সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে বন্দী ছোড় সন্ত রামপাল মহারাজের থেকে সতনাম প্রাপ্ত করে আপনাদের দূর্লভ মানব জনম সফল করুন। **সত সাহেব!** **ভক্তিমতি অপলেশ দেবী**

ভক্তমতী অপলেশ দেবী।

।। ভক্ত সতীশের আত্মকথা।।

আমি ভক্ত সতীশ দাস ১৯৩ সেক্টর ৭, আর, কে, পুরম, নই দিল্লি নিবাসী। উপরোক্ত পঙক্তি আমার জীবনের চরিতার্থ হয়েছে। কেননা সৎগুরু, বন্দী ছোড় রামপাল মহারাজের ডিসেম্বর সন্ ১৯৯৭-তে প্রীতমপুরা দিল্লিতে সৎসঙ্গ হয়েছিল। পরে আমার এক বন্ধু বলার পর আমি

সৎসঙ্গ শুনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এতদিন যে দেব দেবীর পূজা বা নিয়ম পরম্পরা গত মেনে করে আসছি, সেই সবকে ছাড়ার কথা শুনে, সতসঙ্গে মন লাগছিল না। সৎগুরু শাস্ত্র থেকে পড়ে পড়ে আমাদের শুনাচ্ছিলেন ও বুঝাচ্ছিলেন, আমার মনে হল। এই বই নিয়ে ঘরেই পড়লে ভাল। এইভাবে কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) আমার বুদ্ধি স্থির করে ভক্তি চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছে।

সতগুরু আমাদের বুঝাচ্ছেন—

গুরু বিন কিন্হে ন পায়া জ্ঞানা, জ্যোং থোথা ভুস ছড়ে কিসনো,
গুরুবিন ভরম না ছুটে ভাই, কোটি উপায় কর চতুরাই।।

এই প্রকার আমার বুদ্ধি স্থির হওয়ার কারণে, আমি এধার ওধারের কথা বলে ঘরে চলে এসেছি। সন্ ১৯৯৯ আমার মা শ্রীমতি মঞ্জু দেবীর ব্রেন টিউমার (ব্রেন ক্যানসার) হয়ে গিয়েছে, তারজন্য দিল্লি সফদর গঞ্জ হাসপাতালে নিরীক্ষণ ও চিকিৎসার সময় একথা জেনেছি। এর পরে আমি তাকে পন্ত হাসপাতাল A.I.I.M.S নয়ী দিল্লিতে আর তার পরে এপ্যোলা হসপিটাল নিউ দিল্লির ডাক্তারকেও দেখিয়েছি। সব ডাক্তার তাড়াতাড়ি অপরেশন করবার জন্য পরামর্শ দিলেন ও বললেন অপরেশনের পরে এক হাতে প্যারালাইসিস হতে পারে। এ্যাপেলো হসপিটালের ডাক্তার তো এও বললেন ইনার চোখ দুটো এখনো কি করে ঠিক আছে? ওই সময়েই আই স্পেশালিষ্ট থেকে টেস্ট করাতে বললেন, আমি তখনই চেক করিয়েছি। তখন আই স্পেশালিষ্ট তার নিউরো সার্জেন পরামর্শ দিলেন পনেরো দিন পরে পরে চোখের পরীক্ষা করাতে থেকো। কখনও দৃষ্টি শক্তি চলে যেতে পারে। কেননা ব্রেন টিউমার এমনই জায়গায় আছে। আমার পত্নীরও আমার দুটো পা বিকলাঙ্গ, তার হাত ও চোখ নষ্ট হওয়ার কথা শুনে, শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত। তখন কোন উপায় না দেখে অন্তে পন্ত হসপিটাল নিউ দিল্লিতে অপরেশন করার কথা ভেবেছি আর ডাক্তারের বলার পরে INMAS হসপিটাল তিমারপুর দিল্লি থেকে M.R.I করেছি এবং অন্যান্য টেস্ট ও করিয়েছি। কেবল অপরেশনের তারিখ নিতে বাকী ছিল। আমার পূর্ণ পরমাত্মা তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজের আগের শোনা সৎ সঙ্গের এই পঙ্ক্তি মনে পড়েছেঃ—

জিন মিলতে সুখ উপজে, মিটেং কোটি উপাধ।
ভূবন চতুর্দশ ঢুণ্ডিও, পরম স্নেহী সাধ।।

আর আমার ভক্তির চ্যানেল পরমেশ্বর ON করে দিয়েছে এবং মনে ভাবনা উৎপন্ন হয়েছে যে, অপরেশনের আগে নাম নিলে কেমন হবে? তখন আমার বন্ধু সাথে প্রীতমপুরা দিল্লিতে গিয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে পূর্ণ পরমাত্মা তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজ থেকে নামদান নিয়ে। পূর্বের সর্ব পূজা বিধি করা ছেড়ে দিয়েছি।

সৎগুরু অখন্ড পাঠ করানোর সলাহ (পরামর্শ) দিয়ে বললেন, পরমাত্মা চাইলে অপরেশন নাও করা লাগতে পারে এবং সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যেতে পারে। আমরা সৎগুরুর আদেশ অনুসারে তিন দিনের অখন্ড পাঠ করিয়েছিলাম, এর পরে ডাক্তারের কাছ থেকে অপরেশনের তারিখ নেওয়ার জন্য পন্ত হসপিটালের দিল্লিতে গেলেন। যে ডাক্তার অপরেশনের জন্য বলেছিলেন, ঐ ডাক্তার অন্য M.R.I-কে দেখে বললেন এখন অপরেশনের কোন দরকার হবে না। তখন শ্রী গুরুর বাণী মনে পড়েছেঃ—

সতগুরু দাতা হে কলি মাহিং, প্রাণ উধারণ উতরে সাঁই
সতগুরু দাতা দীন দয়ালং, জম কিংকর কে তোড়েং জালং।।

আর আমি সৎগুরুর কথা মনে করে করে কাঁদতে লাগলাম আর ভাবলাম হে পরমেশ্বর আমি আপনার মহিমা কোন শব্দে ব্যাখ্যা করব। এই প্রকার কবীর সাহেবের অবতার তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজের কৃপাতে অপরেশন করতে হয়নি। তার পরে এক পয়সারও ট্যাবলেট ঔষধ খায়নি এখন আমি সুখময় জীবন কাটাচ্ছি সৎগুরুর কৃপায়।

২০ নভেম্বর রাতে আমার পত্নীর শরীর মৃত প্রায় অবস্থায় ছিল, পরমেশ্বরের অমৃতজল খাওয়ানোর পরে ঠিক হয়ে যায় এবং হুঁশ আসে। তখন আমি ওকে নিয়ে সৎগুরুর কাছে গিয়ে বললাম, আজ তো এর মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। কবীর পরেমশ্বর ওর আয়ূ বাড়িয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভক্তি করার জন্য।

২২ শে নভেম্বর ২০০৪ আমার পত্নীকে সোনিপত সৎসঙ্গে (প্যারালাইসেস) এটেক করেছিল এবং তার কারণে ওর হাতের শক্তি সমাপ্ত হতে লাগল ওই সময় সদগুরুর হাত ওর হাতে দেখতে লাগল, কমপক্ষে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত্য দেখতে পেল। যখন প্যারালাইসিসের প্রতিক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেল তখন সদগুরুর সেখান হতে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আজ পর্যন্ত্য ও ঠিক আছে প্যারালাইসিস ও ঠিক হয়েছে সতগুরু রামপাল মহারাজ জী যিনি কবীর পরমেশ্বরের অবতার হয়ে এসেছেন, আমাদেরকে উদ্ধার ও সুখী করার জন্য, তাই সিদ্ধ করলেন—

গরীব যম জৌরা জাসে ডরে, মিটে কর্ম কে অংক।
কাগজ কীরে দরগহ দই, চৌদ্দ কোটি ন চম্প।।

ভক্ত সতীশ মেহর।
R.L.F-907/17 রাজনগর-II
পালম কলোণী, নই দিল্লি
মো :- ০৯৭১৮১৮৪৭০৪

।। ভক্ত রাম সরূপ দাসের আত্মকথা।।

(বন্দী ছোড় কবীর পরমেশ্বর কী জয়)

আমি ভক্ত রামসরূপ পুত্র সঙ্গত রাম গ্রাম-বড়ৌলী জেলা-আম্বালা নিবাসী। আমি ১৩ বৎসর ধরে ধন-ধন সৎগুরুর নাম নিয়ে রেখেছিলেম। ছয় বৎসর আগে আমার হাত পা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। কোমড় থেকে নীচে পর্যন্ত্য আমার সারা শরীর মৃতপ্রায় অবস্থা ছিল। আমার দুই ছেলে অম্বালা হসপিটালে নিয়ে গিয়ে প্রাইভেট ডাক্তারও দেখিয়েছিলে। এর দুই বছর বাদ আমাকে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পর P.G.I চন্ডিগড়ও নিয়ে এক বৎসরে দুই বার টেস্ট করিয়েছিল। কেননা যে মেসিনে আমায় টেস্ট করতো, তাতে আমার নম্বর এক মাস পরে হত। তার টেস্টিং ফি ছয় হাজার টাকা ছিল। সেখানে দুইবার টেস্ট করেও আমার রোগ ধরতে পারেনি, দুইবারই আমার মাথার অপরেশনে করতে বলেছিল, কিন্তু তাতে আমার জীবন

চলে যেতে পারে এবং ঠিক হওয়ার কোন গ্যারেন্টি নেই এই বলেছিল, তারপরে আমার পরিবারের সদস্য আমায় বাবা রামদেবের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে কতদিন চিকিৎসা করেছিল কিন্তু কোন কিছু লাভ হয় নি তাই আবার বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিল। পরে আমাকে ঝাড় ফুঁক করা লোকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, পাঞ্জাব হরিয়ানা ও অন্যান্য জায়গায়ও নিয়ে গিয়ে কোথাও আরাম পায়নি।

আমি ভাবতে লাগলাম এখন আর বেশীদিন বাঁচব না। যখন সব দিক থেকে নিরাশা হয়ে গিয়েছি তো একদিন আমার মেয়ে, যাকে শাহপুর (অম্বানা)-এ বিয়ে দিয়েছি, সে আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। আমার জামাই সঞ্জু, কুকু ভগতের কথা বলেছে, যে ১৫ই আগষ্ট ২০০৮-তে আমাকে বরবালা আশ্রমে সৎগুরু বন্দী ছোড় রামপাল মহারাজের কাছে নিয়ে ১৬ ই আগষ্ট ২০০৮-তে নামদান দিয়ে এনেছিলেন তার পরেই আরাম ও সুস্থ হয়েছি। আজ সদগুরুর কৃপাতে এখন আমি জমিতে নিজে নিজে ট্রেক্টর চালায়, সারা জমিতে বুলানোর কাজ করতে পারি। মহারাজের আশির্বাদে আমি দ্বিতীয়বার জনম পেয়েছি। মহারাজের গুণের মহিমা আমি মুখে বর্ণনা করতে পারছি না। শুধু এই প্রার্থনা করছি সব ভক্তবৃন্দের কাছে যে পরমেশ্বরের অসীম কৃপা না হলে, এমন সদগুরু পাওয়া দূর্লভ। সদগুরুর চরণে কোটি কোটি প্রণাম রইল।

বন্দী ছোড় সদগুরু রামপাল মহারাজ কি জয়
আপনার দাস ভক্ত রামসরূপ দাস
গ্রাম - বড়ৌলী, জিলা - অম্বালা।

।। ভক্ত বহীদ খাঁয়ের আত্মকথা।।

(বন্দী ছোড় কবীর সাহেব কি জয়)

বন্দী ছোড়, সৎগুরু রামপাল মহারাজের চরণে কোটি কোটি দন্ডবৎ প্রণাম। আমি বহিদ্ খাঁ, পুত্র, মুন্সি খাঁ গ্রাম ও তহশীল-মেহগ্রাম জেলা-ভিন্ত (মধ্যপ্রদেশ) নিবাসী। আমি তিন বৎসর ধরে অসুখে পড়ে ছিলাম। আমার দুটো কিডনীই খারাপ ছিল। আমি দুই বছর গ্যালিয়রের বড় বড় M.B.B.S ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করিয়েছি, কোন লাভ হয়নি। পরে গ্যালিয়রের ডাক্তার আমায় দিল্লি A.I.M.S (অল ইন্ডিয়া মেডিকেল) এর জন্য রেফার করে দিয়েছে। ওখানকার ডাক্তার সব চেকাপ করে বললেন, ৩ বোতল রক্ত লাগবে, আপনার রক্ত ফিল্টর হবে পরে আপনার কোন সদস্যের কিডনী বের করে আপনাকে অপরেশন করে লাগানো হবে, আর অপরেশনের খরচ ৪ লাখ হবে। আমি টাকা দিতে অক্ষম এই জন্য দিল্লি থেকে ঘরে ফিরে এসেছি। যন্ত্রণায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেননা, খাওয়ায়, চলতে ফিরতে, উঠতে-বসতে অসমর্থ হয়ে গিয়েছিলাম।

তখন কোন এক ব্যক্তি দ্বারা জানতে পারলাম হরিয়ানা বরবালা জেলা-হিসারে পরমাত্মা এসেছেন, যিনি অসাধ্য রোগকে পরমাত্মার ভক্তি দ্বারা ঠিক করে দেন। এই শব্দ শুনে ২৪.৭.২০০৯ আপনার চরণে এসে নামদান নিয়েছি। নামদান নেওয়ার পরে একদম সুস্থ হয়ে গিয়েছি। আমার সতগুরু ! প্রমাণের জন্য সব অসুখের বা রোগের টেস্টের কাগজ আমার কাছে আজও আছে। হে পরম পিতা পরমেশ্বর আপনি যে আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন আপনার কৃপায় দানের ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না। হে আমার সৎগুরু আপনার এই দাসের উপর কৃপা করে এই

রকমই আপনার চরণে রাখবেন?

।। সৎ সাহেব।।

ভক্ত বহীদ খাঁ পুত্র মুন্সী খাঁ
গ্রাম - ডাকখানা ও তহশীল-মেহগ্রাম
জেলা - ভিন্ড (মধ্যপ্রদেশ)
ফোন নং - ০৯৮২৬৩৩৫১৫৪

।। ভক্তিমতি তারা কটটার উপর অসীম কৃপা করেছেন।।

বন্দী ছোড় সতগুরু, রামপাল মহারাজের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। আমি তারা কট্টা জয়পুর নিবাসী সংস্কৃতে এম-এ করেছি। রাজস্থান ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এ ও সংস্কৃতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছে। আমি ছয় লেখকের গীতা, উপনিষদ, পুরাণ ও সব দর্শন শাস্ত্র এবং অনেক গুরুর প্রবচন শুনেছি কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি। একবার জয়পুরে ভাস্কর ভক্তি চ্যানেল সৎগুরু রামপাল মহারাজের প্রোগাম দেখেছিলাম ৩০শে নভেম্বর ২০০৩ নাম উপদেশ নিয়েছি।

ওই সময়ে অনেক রোগের কারণে চিন্তাযুক্ত ছিলাম। মে মাস ১৯৯১-তে বায়োপসী টেস্টের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আমার অলসরেটিব কোলাইটিস (Ulceralive Colitis) নামের রোগ হয়েছে। এতে পাকস্থলীতে ঘা হয়ে থাকে আর পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে। ডাক্তার এর কথা বলেছেন যে, এ রোগের কোথাও চিকিৎসা নেই বা হয় না। আমার ৩-৬-২০০২-তে পাকস্থলীতে অলসর ৭৫cm পর্যন্ত্য বেড়ে গিয়েছে। ১৪-৪-২০০৮ গুরুদেব বলার পর ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। এর মধ্যে ৪টে ট্যাবলেট এমন যে ডাক্তার বলেছেন যদি জীবিত থাকতে ইচ্ছা হয় তাহলে কোন দিন এই ট্যাবলেট বন্ধ করবে না। ২৩-৪-২০০৪-তে আমার Lungs (ফুসফুস)-তে infection হয়ে গিয়েছিল। যখন আমি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম, তখন ডাক্তার আমার এক্স-রে দেখে বললেন, আপনি এমন রোগে ভুগছেন, যাতে জ্বর হওয়া উচিৎ ওজন কম ও রক্ত কমে যাওয়া উচিৎ। তবে আপনি তো একেবারে সুস্থ। আমি বললাম আমার সৎগুরু রামপাল মহারাজের এই কৃপা, কর্মর মার আমার উপর পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু আমার গুরুদেব এই মারের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এইভাবে পরমাত্মা তার নিজের ভক্তের রক্ষা করে থাকেন। এই শুনে ডাক্তার খুব প্রভাবিত হন। জানুয়ারী ৯ তারিখ একবার প্রচারের জন্য যাওয়ার কথা ছিল, রাতভোর রক্তের ধারা বইতে লাগল, মরতে তো হবেই প্রচার করতে করতে মরি এই ভেবে নিলাম। তৃতীয়দিন এমনিতেই ঠিক হয়ে গেল। ডাঃ একবার বললেন কোরটিসুন সটিরাইড (Corlisoon Stiraid) শরীরকে চালানোর জন্য রোজ নিতে হবে। কিন্তু সৎগুরুর আদেশে সব ঔষধ ত্যাগ করে দিয়েছি। আমি তারপরে একটাও ঔষধ খায়নি, আজ সৎগুরু রামপাল মহারাজের কৃপায় সুস্থ আছি। এত দিনের অসুখ আজ গুরুদেবের চরণে আসায় তা একদম ঠিক হয়ে গিয়েছে।

তবে আমার সমস্ত প্রভু ভক্তের কাছে নিবেদন যে, এই রকম সত্যজ্ঞান ও সত্য ভক্তির পথ এই পৃথিবীতে কোন জায়গায় নেই। সৎগুরু রামপাল মহারাজজী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আছেন।

।। সত সাহেব।।

সৎগুরুর চরণে দন্ডবৎ প্রণাম কোটি কোটি

ভক্তি মতি তারা কট্টা
ফোন নং - ০৯৭৭২৩১২৩৩৫

।। গুরু কৃপার মহিমা ।।

আমি শ্রী ত্রিলোক দাস গ্রাম-টীমড়খেড়া জেলা - কটনি মধ্যপ্রদেশ নিবাসী। আমি দিন ২৭-০৬-২০১০-তে নামদান নিয়েছিলাম, যখন নামদান নিয়েছিলাম তখন আমি জানতাম না। যে এ নামদানই নয় শুধু, অমৃত, পান করেছি বলা যায় আমার কথা অতিসয়োক্তি লাগবে। এর মধ্যে আমি যা অনুভব করেছি বা যা কিছু প্রমাণ আমার সামনে হয়েছে, আমি কল্পনাও করিনি যে কি, আমার সাথে এমন চমৎকার হবে, নামদান নেওয়ার ছয় মাস পরে আমার ছেলে অসুখ হয়। যে ছেলের জন্ম পাঁচ মেয়ের পরে হয়েছে। আমার ছেলের চিকিৎসা একভাবে এক মাস পর্যন্ত্য এম.বি.বি.এস ডাক্তারের দ্বারা করাচ্ছিলাম, কিন্তু এক মাসে ঠিক হয়নি। হঠাৎ একদিন আমার ছেলে সকাল ০৯.০০ বাজে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে নিয়ে এক জায়গার নাম উমরিয়াপান সেখানে দৌড়েছি, সব ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে না বলে মানা করে দিয়েছেন। তখন ওখান থেকে সিহোরার এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, উনিও মানা করে দিলেন, আর আমাকে বলতে চাইছেন, যে তোমার ছেলে মারা গিয়েছে। পুত্রর বয়স তখন এক বছর। তখন এক ডাক্তারের কাছে গেলাম সে বললেন অক্সিজেন দেওয়া হলে মনে হয় কিছু হতে পারে। তখন আর এক ট্যাক্সি করে জবলপুর বাচ্চাদের রিসর্চ সেন্টার সেখানে গেলাম। ওখানকার ডাক্তার বললেন, এই বাচ্চার কোথাও নড়চড় হচ্ছে না যেখানে সুঁচ লাগাচ্ছি কিছুই মনে হচ্ছে না। এই বাচ্চাকে ভর্ত্তি করা রিস্ক হয়ে যাবে।

আমি বললাম ভর্ত্তি তো করেন ও চিকিৎসাও চালু করেন বাদ বাকী পরমাত্মার উপর ছেড়ে দেন। ডাক্তার বললেন ছয় ঘন্টার মধ্যে যদি হোঁশ আসে তাহলে তো ঠিক, নয় তো মুশকিল আছে। সকাল নয় টা থেকে রাত্রি নয় টা পর্যন্ত্য হুঁশ আসেনি, ছেলের মা আর আমি কান্না শুরু করে দিয়েছি, আমার ধ্যান হঠাৎ "জ্ঞান গঙ্গা" ও ভক্তি সৌদাগরের সন্দেশ (সংবাদ)"-এ লেখা চমৎকারের দিকে লক্ষ্য গিয়েছে যা,ভক্তদের সাথে ঘটেছে। আমি তখন নিজে নিজেকে সামলিয়ে গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পিত করে বলছি হে গুরুদেব, আমার ছেলেকে রক্ষা করো, আর আমার যা বিশ্বাস আছে গুরুর মহিমার উপর তার লাজ রাখো। যখন বারোটার সময় ডাক্তার আবার এসেছেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন, বাচ্চার কিছু ভাল বোঝ? আমি বললাম যেমন সকালে ছিল এখনই ঠিক তেমনই আছে। ডাক্তার তখন ইনজেক্সন চাইল আর ছেলের পায়ের জাংঘের উপর লাগাতেই ছেলে জোড়ে কাঁদতে লাগল, মনে হল যেন, ইনজেক্সন গুরুদেব লাগিয়েছে, পুরো হসপিটাল হলে খুশীর মহল জেগে উঠেছে। ডাক্তার আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমার ছেলে হোঁশে এসেছে এই রোগয়ালা মানুষ অনেক কমই হুঁশেতে আসে।

বিচারণীয় বিষয় হল ইনজেক্সনে রিয়েকশন্ তো দশ বা বিশ মিনিট পরে হয়ে থাকে। ছেলে তো ইনজেক্সনের সূঁচের ব্যাথায় কেঁদে উঠেছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় এই আশ্চর্য সব পরমেশ্বর কবীর সাহেবের।

পঙক্তি ঃ- সতগুরু শরণ মে আনে সে আই টলৈ বলা, জৈ ভাগ্য মে মৃত্যু হো-কাঁটে মে-টল-যা গুরুজি বললেন মন দিয়ে মন্ত্র জপ করাতে চমৎকার হয়েছে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম,

হসপিটালেই গুরুদেবের চরণে বন্দনা করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম আর কেঁদে ফেলেছিলাম। ডাক্তার বললেন একে আটদিন পর্যন্ত্য চিকিৎসার প্রয়োজন ২৪ ঘন্টায় ৫ হাজার টাকা লাগত। সকালে ডাক্তারের কাছে ছুটি চাইলে বললেন, একে আপনারা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে মারা যেতে পারে, কেননা কেবলই হুঁশ এসেছে। আমি বললাম যা হবে দেখা যাবে। ব্যাস আমার বাচ্চাকে ছুটি দিন।

আজ বাচ্চার ছয় মাস থেকে বেশী হয়ে গিয়েছে, ওর জ্বরও আজ পর্যন্ত্য হয়নি। এই রকম মহিমা দেখে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছি। আমার সাইকেল কেনার সাহস হত না, কেননা আমার পারিবারিক পরিস্থিতি ভাল ছিল না। হঠাৎ স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার বললেন আপনি কি লোন নিতে পছন্দ করবেন, আমি বললাম যদি পায় তাহলে এর থেকে বড় আর কি হতে পারে, আমার পারিবারিক স্থিতি ভাল হয়ে যাবে। ব্যাংক ম্যানেজার আমায় দেড় লাখ টাকা দিলেন। সাইকেল কিনতে না পারা ব্যক্তি হঠাৎ ৫৫০০ টাকার হিরো হোন্ডা গাড়ী নিয়ে এসেছে। আজ আমি গাড়িতে ঘুরছি, আর এক শাসকীয় স্কুলের কেরাণী পদে নিযুক্ত আছি। চাকরি আমি ১৬ বছর ধরে করছি কিন্তু পারিবারিক পরিস্থিতি ঠিক হচ্ছিল না। জবলপুর সংভাগ থেকে প্রমোশন হয়েছে আর আমার সিনগল প্রমোশন হয়েছে, আমি কেরাণী থেকে বাবু হয়ে গিয়েছি, কাল সবাইকে চেয়ার এগিয়ে দেনে বালা, আজ সাহেব হয়ে ওই চেয়ারে বসেছি। আমার বেতন এত হয়েছে যা আমি কোনদিন ভাবিনি। আমার ছোট ভাই বি.এডের আশা ছেড়ে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ ওর কাছে কাউনসলিঙ্গ লেটার এসেছে, ওর বিশ্বাস হয়নি, কেননা ও ২৯ অংকো পেয়েছিল আর বি.এড করতে হলে ৩৩ অংকের উপরে দরকার, কিন্তু এইবার ২৮ অংক বালাকে নিয়ে নিয়েছে। তার জন্য ২৯ অংক হওয়ার কারণে পেয়ে গিয়েছে। আজ ও বি.এড. করছে। এই চার চমৎকার এমনই হয়েছে যে, যার বিষয়ে কোন দিন ভাবতেও পারিনি। তবে রামায়ণে লেখা ওই মনে পড়েছে যে কি, মাতা পিতা গুরু কী বাণী, বিনা বিচার কর শুভ জানি, এই সব চমৎকার এক বৎসরের ভিতর হয়েছে। প্রমাণের জন্য ঃ—

(১) ভারত হসপিটালের সেন্টারের সব ডাকিউমেন্ট

(২) গাড়ীর সব কাগজ পত্র

(৩) প্রমোশনের আদেশ

(৪) বি.এডের কাউসলিঙ্গ লেটার

এই সব নাম দান নেওয়ার ছয়মাস পরেই হয়েছে। কিন্তু শুধু নাম দান নিলেই লাভ হয় না, গুরুদেবের আদেশের মার্গে চলতে হবে।

"হরি রুঠে গুরু ঠৌর হে, গুরু রুঠে নহী ঠৌর"

গুরু দেবের চরণে শিষ্যের সাদর সমর্পিত আছে।

ভক্ত ত্রিলোক দাস বৈরাগী

স হা, গ্রেড-৩

শাস, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মুরবারী

৩২-টীমর খেড়া, জিলা-কটনি (ম.প্র.)

মোবা নং-৯৬৮৫৮৫৪৭৩৩, ৯৪২৪৬২৫০১৪

।। ১১০০ বোলটেজ তার থেকে ছুটানো ।।

আমি ভক্ত সুরেশ দাস পুত্র শ্রী চাঁদ রাম গ্রা: ধনানা, জেলা-সোনীপত, বর্তমান শাস্ত্রীনগর রোহতক (হরিয়ানা) নিবসী। সতগুরু রামপাল মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নেওয়ার পূর্বে আমার ঘরের পরিস্থিতি বা আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। পরিবারের এমন কেউ নেই যে অসুখ ছাড়া আছে। আমার পত্নীকে তো ভূত-প্রেত খুবই বেশী জ্বালাতন করত। এত কষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমি দেব দেবীদের খুব ভক্তি করতাম, হনুমানজীর উপর বেশী আস্থা রাখতাম। কিন্তু ঘরে সঙ্কটের উপর সঙ্কট লেগেই থাকত। কোন কাজে লাভ হত না। পূর্ণ পরমাত্মা সৎগুরু রামপাল মহারাজ আমাদের পরিবারে হওয়ার কারণ, আমি তাকে পূর্ণ পরমাত্মা মানতে পারিনি। যার লোকসান আমাদের কয়েক বর্ষধরে ভুগতে হয়েছে। একদিন সিংহপুরা গ্রাম নিবাসী ভক্ত বিকাশ আমাকে বললেন, তোমাদের ঘরে পূর্ণ পরমাত্মা জগৎ গুরু রামপাল মহারাজ এসেছেন, আর তুমি কোথায় ঘুমিয়ে আছ ? তখন আমি বললাম কাল আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, যে কি আমার তার কথা শুনার সময়ও মেলে না। সারা দিন ডাক্তারের পিছনে চক্কর লাগাতে থাকি আর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। ওই ভক্ত আমাকে অনেক বুঝিয়েছেন, বললেন, পূর্ণ পরমাত্মা এমনই দয়ালু যে, সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নাম নেওয়ার জন্য ২০১০ অক্টোবর মাসে সৎলোক আশ্রম বরবালা গিয়েছিলাম। নাম উপদেশ নেওয়ার পরে সদগুরু নিজের দয়ার দরজা খুলে দিয়েছেন, আমার ওই সুখ অনুভব হতে লেগেছে, যে যার বর্ণন আমার মুখে বলতে মুশকিল হবে।

আমার পত্নীকে ভূত-প্রেত খুব জ্বালাতন করত, সদগুরুর কৃপায় এখন ওর অবস্থা ভাল। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১-তে আমার ছেলে মোহিত বয়স ১২ বছর, আমি মিস্ত্রি আনতে পাঠিয়েছি। আমার ছেলে মিস্ত্রির ছাদের উপর ব্যালকনীতে গিয়েছিল, ওই ব্যালকনীর উপর দিয়ে ১১০০ (এগারো হাজার) বোলটেজের তার ছিল, ছেলে ও তারের দূরত্ব মাত্র একফুট মাত্র ছিল। যখন ছেলে কাছে যায় এবং কারেন্টের তার তাকে টেনে নিয়ে মাথা লেগে গিয়ে এক ইঞ্চি গর্ত হয়ে ঢুকে যায়। আর মুখ জ্বলে গিয়ে সারা শরীরে ঢুকে পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙে তার বেরোতে লেগেছে। ওই সময় সৎগুরু রামপাল মহারাজ আকাশ দিয়ে চমৎকার তেজ শরীরে আসতে দেখতে পেল, যেন হাজার লাইটের আলো গুরুদেবের শরীরে। তিনি ছেলের হাত ধরে কারেন্টের তার থেকে ছাড়িয়ে ব্যালকনিতে শুয়ে দিলেন। তখন ছেলের সঙ্গে মহারাজের অনেক কথা হয়েছিল। যখন গুরুদেব চলে যাচ্ছিলেন, তো ছেলে জিজ্ঞাসা করলেন গুরদেব আপনি কোথায় যাচ্ছেন? গুরুদেব বললেন পুত্র, আমি তোমার সাথে আছি ভয় পেয়োনো। ওই সময় ছেলের মা কাছেই ছিল, তিনি ওই দৃশ্য নিজের চোখের সামনে দেখেছেন এবং অনেক ঘাবরিয়েও গিয়েছিল। কেননা ছেলের শরীরে কারেন্ট জড়িয়ে বের হচ্ছিল। তার পরে ছেলেকে পি.জি.আই রোহতক হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানেও ছেলে গুরুদেবকে দেখে, আমাকে বলল, গুরুদেব আমার সাথে আছেন। মা তুমি ঘাবরিয়ো না। আজ আমরা যদি গুরুদেবের শরণে না যেতাম আজ কোন মতে আমার ছেলে জীবিত থাকত না। আমার পত্নীকে প্রেত মেরে ফেলত, আর আমার সংসার ধ্বংস হয়ে যেত। এ সদগুরু রামপাল মহারাজের কৃপা ও দয়া।

সর্ব পাঠকের কাছে আমার এই প্রার্থনা, আমার এই সত্য ঘটনার কথা পড়ে আপনারা

সতগুরু রামপাল মহারাজের শরণে গিয়ে সময় থাকতে আপনার জীবন ও আত্মার কল্যাণ করান। মানুষের পূর্ব জন্মের পাপ ও আমার গুরুদেবের কৃপায় নষ্ট হয়ে, অঘটন হওয়ার হাত থেকে বাঁচা যায়। সৎগুরু রামপাল মহারাজের সৎসঙ্গ বচনে আমি শুনেছি, পূর্ণ পরমাত্মা বন্দী ছোড় আমাদের সর্বপাপ নাশ করে দেন। এই রকম প্রমাণ ঋকবেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র নং২-তে এং মন্ডল ৯-সুক্ত ৮০ মন্ত্র নং ২-তে ও লেখা আছে যে, যদি কোন রোগীর প্রাণ শক্তি ক্ষীণও হয়ে যায় এবং তার আয়ূ যদি একটুও না থাকে, তার প্রাণের রক্ষা করি, ও তাকে একশো বছর আয়ূ বাড়িয়ে দিই এবং তাকে সমস্ত সুখ প্রদান করি।

ভক্তগণ সদগুরু রামপাল মহারাজ নিজের অমৃত বচনোতে একথাও বলেছেন, প্রত্যেক প্রাণী তার নিজের করা কর্মের সুখ ও দুঃখের ফল ভোগ করে। আজ পর্যন্ত্য সব গুরু, আচার্য্যদের মুখে শুনে আসছি, আমরা যে পূর্ব জন্মের পাপের ও পূণ্যের ফল এ জনেমে ভোগ করছি, এ সব ভোগ করার পরেই শেষ হবে। হে সভ্য পাঠক! সৎগুরু রামপাল মহারাজ বলেন, পাপ কর্মতেই দু:খ হয়; তবে পাপ কর্মই নাশ করলে তো দুঃখের সমাপ্ত হয়ে যায়। যদি ভক্তি করতে করতেও পাপ কর্মের ফল (দুঃখ) ভোগাও করতে হয় তাহলে তো আর ভক্তির কোন আবশ্যকতাই হয় না। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ আমাদের পূর্বের প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ আমার ছেলের মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। আমাদের রামপাল মহারাজ সৎগুরুর কৃপাতে পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর আমাদের পাপের নাশ করে, ছেলের আয়ূ বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদি ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ প্রারব্ধে কর্মের ফল স্বরূপ, ছেলে মারা যেত তাহলে আমাদের সব সদস্য ভক্তিই ত্যাগ করে দিতাম এবং নাস্তিক হয়ে যেতাম। কেননা ওই সময় আমাদের পরমাত্মার জ্ঞান পূর্ণ প্রাপ্ত ছিল না, এখন ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে আর এও বিশ্বাস হয়েছে যে , পরমাত্মা ঈশ্বর একমাত্র কবির্দেব। যিনি পাপ নাশক সর্ব সুখদায়ক ও পূর্ণ মোক্ষদায়ক তথা সদগুরু রামপাল মহারাজ তার পাঠানো অবতার এসেছেন, অতএব আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা অবিলম্বে সৎলোক আশ্রম বরবালায় এসে এবং উপদেশ নামদান নিয়ে নিজেদের ও পরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবদের জীবন ধন্য করুন। আপনাদের কাছে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমার মত জ্ঞানহীন দুঃখীর উপর কৃপা করে জ্ঞানের সৎমার্গ ও মোক্ষমার্গের সন্ধান দিয়েছেন, সেই সৎগুরুর স্মরণে সব দুঃখী এসে সঙ্কট নিবারণ করুন।

যহ সংসার সমঝদা নহী, কহন্দা শাম দোপহরেনু
গরীবদাস ও বক্ত জাত হে, রোবেগে ইস পহরে (সময়) নু।।

প্রার্থী

ভক্ত সুরেশ দাস পুত্র শ্রী চাঁদ রাম
শাস্ত্রী নগর, হিসার বাইপাস, রোহতক
মোবাঃ নং - ০৯৮২৯৫৮৮৬২৮

।। ভক্ত দীপক দাসের পরিবারের আত্মকথা।।

(বন্দীছোড় সৎগুরু রামপালজী মহারাজের দয়া)

এই দাসের নাম দীপক দাস, পিতা শ্রী বলজিৎসিং, গ্রাম-মহলানা, জেলা-সোনীপত। আমাদের তিন পুরুষের সদস্যরা, রাধাস্বামী পন্থের ডেরা বাবা জয়মল সিং-এর কাছ থেকে নাম উপদেশ

নেওয়া ছিল । সর্বপ্রথমে আমার ঠাকুরমার মা অর্থ্যাৎ বাবার দিদিমা নাম উপদেশ নিয়েছিলেন। পরে আমার বাবা মা রাধাস্বামী পন্থের গুরু গোবিন্দ সিং - এর কাছ থেকে নাম উপদেশ নেন। আমি গুরু গোবিন্দ মহারাজকে পূর্ন পুরুষ ভেবে মেনে নিয়েছিলাম এবং এই পন্থের উপর পূর্নশ্রদ্ধা, এই জন্য করতাম যে এই পন্থই বুঝি প্রভু প্রাপ্তি করিয়ে দেবার শ্রেষ্ঠ পন্থ। যেহেতু এই রাধাস্বামী পন্থের বিশাল আয়োজন ও লোকসংখ্যা দেখে আকর্ষিত হয়েছিলাম আর সেবা করার জন্য ডেরা বাবা জয়মল সিং (পাঞ্জাব) তথা ছত্তরপুর-পুসা রোড দিল্লিতেও যেতা। তবে এই পন্থে বয়স হিসাবে নাম দেওয়া হত তার কারনের সেই সময়ে আমার সেই যোগ্য বয়স হয়নি।

আমার মাতা পিতা যখন ছত্তরপুরে নাম উপদেশ নিতে গেলেন, তার পরে বাড়ীতে আমার ছোট ভাইয়ের (পাঁচ বছর) হাত থেকে ভুল বশত অজান্তে প্রতিবেশীর এক বাচ্চার চোখে কোনো এক বস্তু লেগে যায়। বিকালে যখন আমার মা বাবা নাম উপদেশ নিয়ে বাড়ি আসলেন তখন ওই প্রতিবেশী বললেন, আপনার ছেলে আমার ছেলেকে ইচ্ছা করে চোখে আঘাত করেছে তাই সেই দিন থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। তার কারনে তাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা বাড়তে লাগল, আমাদের উপর অশান্তির বাদল নেমে আসল।

সেই ঝগড়ার কারনে আমার ঠাকুরদাদা অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আমার ঠাকুরদাদার মৃত দেহ তখন এক ঘরে রাখা ছিল। ঠিক ওই সময় আমার ঠাকুরমার আত্মা (যে কিনা বারো বছর পূর্বে মারা গিয়েছেন) আমার পিসির দেহে প্রেত হয়ে প্রবেশ করে (আমার ঠাকুরমাও রাধাস্বামী পন্থের সেই পাঁচ নাম জপ করতেন) জীবিত সময় কাশি ও হাঁপানী ছিল সেই ঠাকুরমায়ের মত আমার পিসিও সেই ভাবে কাঁশতে লাগলেন এবং বললেন, আজ তোদের ঠাকুরদাদার জীবন সমাপ্ত হয়ে গেল, তাই তোদের দেখাশোনা করতে এসেছি। সেই কথা শুনে আমি বললাম ঠাকুরমা, তোমাকে তো খুব দুঃখী মনে হচ্ছে, তোমাকে তোমার গুরুদেব তাহলে কি সতলোকে নিয়ে যায়নি ? তখন তিনি বললেন, আমি ভুল সাধনা করার জন্যই আমার এই মানব দূর্লভ জনম ব্যর্থ করে দিয়েছি, আর এখন প্রেত যোনিতে মৃতুর পরে কষ্ট পাচ্ছি, আমি সতলোকে যেতে পারিনি। আমার মা তখন আশ্চর্যের সাথে প্রশ্ন করলেন মাঁ ! আপনার গুরুদেব চরণ সিং কী তাহলে আপনাকে সামলাতে পারেননি ? এই কথা শুনে দুঃখের সাথে বললেন, তিনি কিছুই করেননি তাই আজও কষ্ট পাচ্ছি।

এই ঘটনার দুই বছর পরে একদিন আমার অন্য পিসির (কমলাদেবী) দেহের ভিতরে ঠাকুরদাদার আত্মা প্রেত হয়ে প্রবেশ করে বললেন, আমি খুবই দুঃখী তথা আমার কোনো সদগতি হয়নি, তবে আমি এখন স্নান করতে চাই। শুনে আমার মা বললেন, আপনি তো সতলোকে গিয়েছেন, তবে কি ওখানে স্নান করার জন্য জল নেই ? এই কথার উত্তরে ঠাকুরদাদা কোনো জবাব দেননি (অর্থাৎ পিসির ভিতরে ঠাকুরদাদার আত্মা) পরে আমার মা জল এনে স্নান করাতে চাইলেন, তাই দেখে তিনি বললেন বউমা ! আমি নিজে নিজেই স্নান করবো। তাহার স্নান হয়ে যাওয়ার পর, মা পিসিকে পিসির শাড়ী পরালেন, তাই দেখে তিনি (ঠাকুর দাদার আত্মা) বললেন বউমা ! আমার ধূতি নিয়ে এসো, আমি একাই ধুতি পড়ে নেব। তখন ঘরে ধূতি না থাকার কারনে একটা চাদর দিলেন, পিসি (ঠাকুরদাদার আত্মা) শাড়ীর উপরে সেই চাদর জড়িয়ে নিলেন। পরে বললেন আমাকে চা বানিয়ে দাও। চা দেওয়া মাত্রই গরম গরম চা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন। আমি বললাম ঠাকুরদা ! তাহলে

আপনি কি সতলোকে যাননি? তিনি বললেন আমি খুব কষ্টে আছি, এই কথা শুনে আমার মা বললেন, আপনি তো রাধাস্বামী চরণ সিং মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলেন এবং তার ভক্তিও করতেন, তবে কি তিনি আপনাকে উদ্ধার করেননি? তখন পিসির ভিতরের ঠাকুরদাদার আত্মা বললেন, তিনি আমায় উদ্ধার করিনি, আমি কেবল ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছি এবং খুব দুঃখ পাচ্ছি তথা কষ্টও পাচ্ছি। এইসব ঘটনার কিছুদিনপরে আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায় তার কারনে চশমার বারবার নম্বর বদলাতে থাকি। আমি এক বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যেতাম সেখান একদিন পূর্নব্রহ্মের অবতার সতগুরু রামপালজী মহারাজের এক শিষ্য ভক্ত সন্তরাম দাস আসেন এবং তাহার গুরুদেবের মহিমার কথা শুনিয়ে বললেন, আমার গুরুদেবের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিলে তোমার চোখ ঠিক হয়ে যাবে আরো বললেন এইসব কষ্টদুঃখ থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যই, পরমেশ্বর কবীরসাহেব পূর্ন গুরু রুপে অবতার হয়ে এসেছেন। তখন আমি বললাম আমার বাবা মা তো রাধাস্বামী পন্থের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়েছেন, ভক্ত সন্তরাম তখন বললেন ওই রাধাস্বামী পন্থ কিন্ত স্বয়ং সম্পূর্ন নয়।

এই পন্থের সাধনাতে না তো সতলোক প্রাপ্তি হবে আর না কোন দিন পাপের কর্মফল ভোগ কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে পাপ নষ্ট হবে। এই পাপের ফলের কারনে যে দুঃখ কষ্ট হয় না তার থেকে মুক্তি পাবে। তবে কেবল কবীর পরমেশ্বরের পাঠানো অবতার পূর্ণগুরু ছাড়া অন্য কাহারও দ্বারা এইসব সম্ভব নয় এই পৃথিবীতে সতগুরু রামপালজী মহারাজের যে আধাত্মিক গূঢ় রহস্যের জ্ঞান যদি কাহারও হয়ে যায়, তাহলে তার চোখে দ্বিতীয় কোন গুরুই নজরে পড়বে না। পরমেশ্বরকে প্রাপ্তি আর মুক্তি প্রাপ্তির জন্য তিনি যে তিনটি মন্ত্র জপের নাম উপদেশ দেন, সেই মন্ত্র এই পৃথিবীতে কোনো ধর্ম গুরুর কাছে নেই। আমার বাবার শ্বাসকষ্টের রোগ ছিল, তিনি দশ পা হাঁটতেই হাঁপিয়ে যেতেন এবং তার হাই ও লো ব্লাড প্রেসার রোগ ছিল। আমার বাবার ইলেকশানের ডিউটির সময়ে হার্ট অ্যাটাক হয়, তবে কোনো ভাল কর্ম সংস্কারের কারনে হয়তো তিনি বেঁচে যান। তখন আমি ভাবতাম যে মনে হয় রাধাস্বামী পন্থের সন্ত গুরুবিন্দ্র সিং কৃপাতে এবার বুঝি বাবা বেঁচে গেলেন। কিন্তু এর পরেও বছরের পর বছর এক এক রাত আমার বাবার এক এক পল শ্বাসের কষ্ট দেখেছি যে তিনি একদম মৃত প্রায় অবস্থায় হয়ে যেতেন তাই কান্না ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কেননা ঔষধের ডোজ ডাক্তার যতটা বাড়ানোর দরকার ছিল, শেষ পর্যায়ে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার মা ডেরে বাবা জয়মল সিং থেকে আনা প্রসাদ বাবাকে খাওয়াতেন আর রাধাস্বামী পন্থী গুরুবিন্দ্র সিং মহারাজের মুর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করতেন ও কাঁদতেন। সেই সময় আমার ছোট ভাইয়ের উপরি দৃষ্টি (প্রেতের প্রকোপ) হত অতএব রাত্রে চমকে উঠতো আর বলতো, কে যেন আমার পা টেনে ধরছে, আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না, তাই এর কারনে ভাই সব সময় অসুস্থ থাকত। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বরের দয়াতে ৮ ই অক্টোবর ১৯৯৮ সালে সতগুরু রামপালজী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ গ্রহন করি। সতগুরু রামপালজী মহারাজের কৃপায় বিশ (২০) দিনের মধ্যে আমার চশমা ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় এবং ঔষধ খাওয়াও বন্ধ করে দিলাম। আমার সাথে এই সত্য ঘটনা ঘটার পরে সতগুরু রামপালজী মহারাজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস বেড়ে যায়। পরে ভক্ত সন্তরাম দাস আমার মা বাবাকে বুঝিয়ে বললেন আপনারা পূর্ণপরমাত্মা

কবীর সাহেবের অবতার, পূর্নগুরু তত্ত্বদর্শী রামপালজী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিন তাহলে আপনাদের আর কষ্ট হবে না।

তারপরে আমি আমার মা ও বাবাকে বোঝালাম, তারা বললেন, পূর্বে আমরা রাধাস্বামী পন্থে ছিলাম আর এখন যদি সন্ত রামপালজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে যাই, তাহলে জগতের লোকে কি বলবে? তখন আমি বললাম বাবা! যদি এক ডাক্তার দ্বারা ঠিকমত চিকিৎসা না হয়ে থাকে, তাহলে কি অন্য ডাক্তার পাল্টান না বা বদল করেন না। এই কথা শুনে আমার পরিবারের সকল সদস্য কবীর পরমেশ্বরের শরণে আসেন এবং রাধাস্বামী পন্থের পাঁচ নাম ত্যাগ করে, পূর্ণ সন্ত সদগুরু রামপালজী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিলেন।

সদগুরু কবীর সাহেবজী (কবীর পরমেশ্বর) বলতেন যে,

শরন পড়ে কো গুরু সামলায়,
জানকে বালক ভোলারে।।

সমস্ত পরিবারের সদস্য নাম উপদেশ নেওয়ার পর থেকে আমাদের পরিবারের সুখী জীবন শুরু হতে থাকে। আমার ভাইয়ের উপরি দৃষ্টি (ভূতের প্রকোপ) ঠিক হয়ে যায় এবং বাবার শরীর সুস্থ হয়ে যায়। যিনি পূর্বে এক পা হাঁটতে পারতেন না, তিনি এখন ষাট কিলো ওজনের এক বস্তা ভারী বস্তু নিয়ে হাটতে পারেন। আমরা সবাই পূর্ণ পরমাত্মার অবতার তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজের শরনে থেকে আজ তাহার দয়ায় পূর্ন সুখী আছি।

তবে আমার ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা ও বাবার দিদিমা মনুষ্যজীবনের যে লোকশান হয়েছে তার ক্ষতি পূরন কি এই সকল নকল ধর্ম গুরুরা দিতে পারবেন? কোন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এক লাখ বা এক কোটি টাকা খরচ হবার পর যদি তার জীবন বেঁচে যায়, তাহলে টাকা খরচ হবার কোনো দুঃখ হয় না। কেননা ভাবা হয়ে থাকে তার প্রান তো বেঁচে গেছে। আজ আমার যতই টাকা পয়সা খরচ করলেও আমার ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদার যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা রাধাস্বামী পন্থের দ্বারা বলা পাঁচ নামের সাধনা) করাতে একদম ব্যর্থ হয়েছে(তারা প্রেত ও ভূতের যোনিতে কষ্ট ভূগছেন) তাহা কোনো দিন ফিরে আসবে না। জীবন নিয়ে যে ঠাট্টা তামাসা নকল গুরুরা করেছেন বা করছেন, এই ভক্ত সমাজের বা দূর্লভ মানবের সাথে, তাহা গুরুতর ঘোর অপরাধ ও অন্যায়। কেননা চুরাশী লক্ষযোনী ভোগার পরে প্রাপ্ত হওয়া এই যে দূর্লভ মানব জীবন যা কিনা, কেবল পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার একমাত্র সাধন বা উপায় ছিল, সেটাকেও নষ্ট করেছেন বা করছেন। এই মহা ক্ষতির পূরন কোনো মূল্য দিয়ে পূর্ণ করতে পারবে না।

হে বন্দীছোড় সতপুরুষ রুপী সদগুরু রামপালজী মহারাজ! আপনার অসীম কৃপা হয়েছে যে আমাদের মতো তুচ্ছ জীবের উপর আপনি সত্য জ্ঞান দিয়ে, আপনার শরণে ডেকে নিয়েছেন। তাহা না হলে আমরাও পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে, নিজের মনুষ্য জনমকে সমাপ্ত করে হয়তো, ভূত অথবা প্রেত যোনিতে চলে যেতাম এবং এই শাস্ত্র বিধিযুক্ত সতভক্তি সাধনা প্রাপ্ত করা থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম।

আমি তাই সর্ব বুদ্ধিজীবি সমাজের কাছে প্রার্থনা করি যে এখন ও সময় আছে আপনারা আপনাদের মূল্যবান মানব জীবনের মূল্য বুঝে আপনাদের মানব জনমকে ধন্য করুন। চার যুগে

একটিবার মাত্র এইরকম দুর্লভ সময় আসে। এই সত্য জ্ঞানকে বুঝে নিষ্পক্ষ হয়ে নির্নয় করুন এবং বোঝার পরে খুব শীঘ্র, বন্দীছোর রামপালজী মহারাজের চরনে এসে সতভক্তি প্রাপ্ত করে মানব জীবনের কল্যান করান।

।। সত সাহেব ।।

সদগুরুর চরনের দাস,
ভক্ত দীপক দাস,
মোঃ-০৯৯৯২৬০০৮৫৩

কবীর পরমেশ্বরের অসীম কৃপা

বন্দীছোড় সতগুরু রামপালজী মহারাজের জয়

যজুর্বেদ অধ্যায় ৮ মন্ত্র নং ১৩-তে প্রমান আছে যে পূর্ণ পরমাত্মা পাপী থেকে মহাপাপী ব্যক্তিরও মহাপাপ সম্পুর্ণ রূপে নষ্ট করে দেন, তাছাড়া ভয়ঙ্কর রোগ থেকেও মুক্ত করে দেন। আমি নিজেই হলাম এর প্রত্যক্ষ প্রমান। আমি কেশব মৈনালী, পিতা-শ্রী ইন্দ্র প্রসাদ মৈনালী, গ্রাম-বিকাস সমিতি হরিয়োন, জেলা-সর্লাহী, নেপাল নিবাসী। তবে বর্তমান কাঠমান্ডু উপত্যকা টিমি ভক্তপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছি। আমি নেপালে চুরেভাবর নামক রাজনৈতিক পার্টির অধক্ষ্য এবং পূর্ব সভা সদ আছি। আমার উপর সদগুরু রামপালজী মহারাজের অসীম কৃপা হয়েছে, তাছাড়া আমার পরিবারের সম্পুর্ণ দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়ে পূর্ণ সুখী বানিয়ে দিয়েছেন। সাংসারিক জীবনে আমি সুখী এবং সন্মানিত জীবন কাটাচ্ছি কিন্তু আমি আমার শারিরীক রোগের কারণে, স্পেশালিষ্ট ডাক্তারদের দেখিয়েছি , তাতে কোনো লাভ হয়নি। ৬২ বছর ধরে ধর্মের নামে অজ্ঞানী গুরুর চক্রান্তে পড়ে মানব জীবন নষ্ট করে দিয়েছিলাম।

সতগুরু রামপালজি মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ এবং সৎসঙ্গের জ্ঞান শুনে বুঝতে পেরেছি যে, ৬২ বছর আমার বৃথাই নষ্ট হয়েছে। নেপাল সাংসদের সভাসদ হবার কারণে, সরকারী খরচে যে কোনো ডাক্তার দ্বারা রোগের চিকিৎসা করতে পারতাম কিন্তু নেপালের মেডিকেল বোর্ড এই রোগের জন্য আবেদন করেননি। কেননা, তাদের নিয়মানুসারে আমার রোগের কোনো চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোনো ডাক্তার আমার চিকিৎসা করতে পারবেন না। তাই আমি ভেবে নিলাম যে, জীবনভর আমার দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং যতদিন বেঁচে থাকব, এই ঔষধ খেয়ে যেতে হবে। এর কারনে আমি দুঃখী ছিলাম, হঠাৎ একদিন আমার এক বন্ধু ভোলা দাস, যিনি কয়েক বছর আগেই সতগুরু রামপালজি মহারাজের শিষ্য ছিলেন, আমার এই দুখের কথা শুনে তিনি বললেন, হরিয়ানা বরবালা আশ্রমে গিয়ে আমার গুরুদেবের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিলে, অবশ্যই তোমার সমস্ত দুঃখের সমাধান হবে, এই কথা বলে আমাকে বিশ্বাস দিলেন। আমি এর আগে অনেক বড় বড় গুরুর সঙ্গতকরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বন্ধুর কথায় আমার যেন অন্ধকার মনে প্রদীপের আলোর মতো মনকে স্পর্শ করল। আমি তৃতীয় দিনই সতলোক আশ্রম, চন্ডীগড় রোড, বরবালা, জেলা-হিসার, হরিয়ানাতে (ভারত) রওনা দিলাম এবং পত্নীকেও সঙ্গে নিলাম। কেননা তার পায়ের তলায় ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারনে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, তাছাড়া চোখ

থেকে জল অনর্গল ঝরে পড়ত, জলবিন্দূ নামের রোগ ছিল, যাহা চিকিৎসায় ঠিক হওয়া সম্ভব নয়। ছোট ছেলেও সঙ্গে গিয়েছিল এবং যাওয়ার পথে নেপালের কয়েকজন ভক্তের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, যারা আশ্রমেই যাচ্ছিলেন। এই ভাবে কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই আমরা আশ্রমে পৌঁছে গেলাম।

আমি সন্ত মহন্ত গুরুদের সার্থতে খুবই পরিচিত ছিলাম, তাছাড়াও আমি কোনো প্রবচন না শুনে বা কোনো পুস্তক না পড়েই, বন্ধুর এক কথায় কিংবা সদগুরুর অসীম কৃপায় বরবালা আশ্রমে গিয়েছিলাম। তবে আমি যাওয়া মাত্রই নাম নিতে তৈরী ছিলাম না, আমার সৌভাগ্য যে সত সঙ্গের দিনই আমি গিয়েছিলাম, তাই সতগুরুর সতসঙ্গ শোনার ভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সেই সতসঙ্গ শুনে ও বুঝে জানতে পারলাম যে এই পৃথিবীতে সতগুরু বা তত্বদর্শী রামপালজী মহারাজ ছাড়া অনান্য ধর্মগুরুরা, পন্ডিত আচার্যরা পুরোহিত বা মৌলবীরা আছেন, কোনো গুরুদের কাছে এই তত্বজ্ঞান নেই। অন্যান্য কিছু গুরুরা আছেন, যাহারা নিজেদের সার্থের জন্য পরমেশ্বরের পবিত্র সরল সোজা আত্মাদের ধর্মের নামে, কালব্রহ্মের জালে ফাঁসিয়ে রাখে এবং নরকে পাঠানোর মায়ার কারসাজি রচনা বিস্তার করে, তারা না কোনোদিন পরমেশ্বর পেয়েছেন আর না তাদের পরমেশ্বরের সতভক্তির জ্ঞান আছে। এই সব কাজ তারা সন্মান পাবার জন্য এবং অর্থ সম্পদ বাড়ানোর জন্য করেছেন বা করছেন। এই প্রকার জ্ঞান আর নাম উপদেশ নেবার পরের দিন, সকালের চমৎকার দেখেই বুঝতে পারলাম। ওইখানে যাবার পরেও আমি নাম উপদেশ গ্রহন করিনি, তবে আমার পত্নী নিয়েছিলেন (যদি নামদান না গ্রহন করা হয় তাহলে গুরুর আশীর্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়)। আমি যাওয়া মাত্র নাম উপদেশ না নেওয়ার একটা কারন ছিল, হয়তো রাজনীতির রং গায়ে লাগানো ছিল তাই তাড়াতাড়ি নামদান নিতে চায়নি। কেননা আমি অনান্য গুরুদের ব্যবহারে পরিচিত থাকার কারনে, সহজে কাউকে বিশ্বাস করতাম না। তবে গুরুর কৃপায় কিংবা প্রেরনাতে আমরা তিনজন (পত্নী, ছেলে ও আমি) পরামর্শ করে তারিখ ০২-০৫-২০১২ তে নাম উপদেশ গ্রহন করি। যখন সতগুরুর দর্শনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং গুরুজী আমার সামনে দাড়ালেন, তখন আমি রোগের কথা না বলতেই, গুরুজী আমার মাথায় হাত রেখে বললেন "সব ঠিক হয়ে যাবে" এই বলে আশীর্বাদ দিলেন। সকালে যখন শৌচালয়ে শৌচ করতে যাই, তখন না বাউশি (রোগ) দেখলাম, না শৌচের সঙ্গে ব্লাড (রক্ত) পরতে দেখলাম। দুইদিন আশ্রমে ছিলাম, তাতেই ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস (রোগ) ৮০ প্রতিশত ঠিক হয়ে যায় তবে এখন আমি সম্পুর্ন সুস্থ আছি। পত্নীর পায়ের রোগ ও চোখের জলবিন্দু রোগও ঠিক হয়ে যায়। এদিকে নেপাল কাঠমান্ডূ হাসপাতাল এসে যখন পত্নীর চোখের রোগের জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হয়, ডাক্তার চোখ দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে বললেন, রোগীর চোখে জলবিন্দু নামক রোগের কোনো নামওনিশান নেই, সম্পূর্ন ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমাদের রোগ মুক্তির চমৎকারের কথা, আত্মীয় স্বজনদের কাছে এবং আসেপাশের চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও কোনো না কোনো রোগে ভুগছেন, আমার বড় ভাই ডাক্তার, তবে তার সারা শরীর ফুলে যেতো।

আমার মেয়ের মাসিক ধর্মের সময় অত্যাধির পেটে যন্ত্রনা হত। আমার দ্বিতীয় মেয়ে উকিল, সাইটিকা ও গলার হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে, জীবন থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল তথা আমার বোনের স্বামীরও চোখে জলবিন্দু রোগের কারন দুঃখিত ছিল। এরা সবাই আমাদের

উপর সদগুরুর চমৎকার কৃপা হতে দেখে তারা খুব প্রভাবিত হয়েছিল। আমি সবাইকে **জ্ঞানগঙ্গা পুস্তক** ভালভাবে পড়ার জন্য প্রেরিত করলাম। তাহারা সেই পুস্তক পড়ে, আশ্রমের নিয়ম ও ভক্তির অনেক কিছু জেনে যায়। পরের বার আমি সবাইকে নিয়ে আশ্রমে গেলাম এবং তারা সবাই নাম উপদেশ নিলেন। এখন তারা ভক্তির সাথে বিশ্বাস রেখে সতগুরুর মর্যাদায় রয়েছেন। আজ তারা রোগ মুক্ত হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। সতগুরু রামপালজি মহারাজ পূর্ণ পরমাত্মার প্রতিরূপ নয়, স্বয়ং পরমাত্মাই আছেন। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখে, ভক্তগনকে বলছেন যে আমি পূর্ণ পরমাত্মার দাস আছি। তবে ভক্তি, বিশ্বাস ও জ্ঞানের দ্বারাই সবাই জানতে পারবে। তিনি এসেছেন এই কাল ব্রহ্মের বিছানো মায়াজাল থেকে মুক্ত করে, সতলোকে তাহার (পরমেশ্বরের) দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, তাই তাহাকে বন্দীছোড় নামেও ডাকা হয়। যদি কাহারও বিশ্বাস না হয়, তাহলে প্রতিটি ধর্মের সদ্ গ্রন্থের সাথে প্রমান মিলিয়ে দেখে নেবার জন্য, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। প্রতিটি ধর্মের সদগ্রন্থে তো প্রমান দেখবেন, তবে তারমধ্যে স্বসমবেদ (কবীর বাণী) নামের সদগ্রন্থে ,সৃষ্টির পূর্বের অর্থাৎ আদির কথা জানতে পারবেন। কবীর পরমেশ্বর ৬০০ বছর পূর্বে কবীর বাণীর মাধ্যমে তাহা বলে গিয়েছেন। তাহার (কবীর পরমেশ্বরের) সঙ্গে একবার কাল ব্রহ্মের কথা বার্তা হয়েছিল, পরমেশ্বর তাহাকে (কাল ব্রহ্মকে) বলেছিলেন যে যখন কলিযুগের বয়স পাঁচ হাজার পাঁচশত পাঁচ বছর হবে ,তখন এক তারণহার (ত্রাণকর্ত্তা) উদ্ধারের জন্য ধরতীর (পৃথিবীতে) যাবে, আজ সেই সময় এসেছে । তিনি তাহার কবীর বাণীতে বলেছেন--

পাঁচ হাজার অরু পাঁচ শো পাঁচ।
জব কলি যুগ বীত যায়ে।।
মহা পুরুষ ফর মান তব।
জগ তারণ কো আয়ে ।।

এই ধরনের হাজার হাজার বাণীর মাধ্যমে এবং সমস্ত ধর্মের সদ্গ্রন্থে যে, গূঢ় রহস্যের তত্বজ্ঞান অর্থাৎ অমৃতজ্ঞান লুকিয়ে আছে , সেই সমস্ত তত্বজ্ঞান তত্বদর্শী রামপালজি মহারাজ ছাড়া, কোনো ধর্মগুরুর জানা নেই। আজ সেই অমৃতজ্ঞান আমাদের মাঝে বর্ষার ন্যায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনারা ওই গুরুরূপী ঠক ব্যক্তিদের হাত ছেড়ে, হরিয়ানা (ভারত), জেলা-হিসার, বরবালায় সদ্গুরুর চরণে এসে, বিনা মুল্যে নাম উপদেশ নিয়ে, নিজেদের কল্যান করেন, এ সময় খুবই দূর্লভ। চারিযুগে আর কোনদিন এই সময়টা আসবে কি আসবে না, তাহা এই সদ্গুরু ছাড়া কেহই বলতে পারবেন না। অতএব আপনারা যদি নিজের এই দূর্লভ মনুষ্য জনমকে ও এই সময়কে নষ্ট বা বৃথা না করে, পরিবারের সমস্তসদস্যের কথা মনে করে, তাহাদেরও কল্যান করান ও সদ্গুরুর মর্যাদায় থেকে সুখী জীবনযাপন করুন। সকল পবিত্র ভক্ত সমাজের কাছে আমার এই প্রার্থনা রইল।

।। সৎ সাহেব ।।

কেশব প্রসাদ দাস
(মেনালী), কাঠমান্ডু (নেপাল)
ফোন নং-০ ০৯৭৭-৯৮৪১৮৯২৫৮৩

।। সদ্গুরুর অসীম কৃপার বৃষ্টি ।।

(বন্দিছোড় সদ্গুরু রামপালজি মহারাজের জয়)

আমি ভক্ত শ্যাম দাস (সাপকোটা) মধবালিয়া-৮, কোটিহবা, রূপন্দেহী নেপাল নিবাসী। পেশা-নেপাল সরকারের উপসচিব পদে ভূ-তথা জলাধার সংরক্ষন বিভাগ ববরমহল, কাঠমান্ডু নেপালেতে কার্যরত আছি। আমি অনেক রোগে আক্রান্ত ছিলাম, জপ তথা ধ্যানও করতাম। ব্রহ্মা কুমারী পন্থের কাছে গিয়ে সাতদিনের ক্লাসও করেছিলাম কিন্তু তবুও হাসপাতালে যাওয়া আসা লেগেই থাকত। ধ্যানে বসে অনেক দেবী দেবতাদের (গণেশ, ব্রহ্মা-সাবিত্রী, বিষ্ণু-লক্ষী ও শিব-পার্বতী) তাছাড়া নানা ধরনের বস্তু দেখতে পেতাম। তবে আজ পর্যন্ত্য একটিও রোগ কমেনি তবে বেড়েছে, তারমধ্যে কয়েকটি রোগের নাম ও বিবরণ নিম্নে লেখা আছে- **(১) মেনিয়া** - আমি সাইকেটিক হয়ে দুইবার হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলাম। দুইবারই অনেক ট্যাবলেট দিয়েছিল যাহা দিনে তিনবার খেতে হত। **(২) হাত কাঁপতো** - আমার দুই হাতই খুব জোড়ে জোড়ে কাঁপতো, যার কারনে আমি ঠিকমত সাক্ষর করতে পারতাম না। **(৩) দৃষ্টি শক্তি কমে যায়** - আমি মাইনাস ২.৫ পাওয়ার লেন্স পড়তাম। **(৪) ববাসীর** - এই রোগে দুই তিনবছর পর্যন্ত্য কষ্ট পেয়েছি। আয়ূর্বেদীক ও হ্যোমিওপেথিক ঔষধ খেয়েছি, তবে কিছুদিন ভাল থাকতাম, পরে আবার ব্লিডিং শুরু হয়ে যেত। **(৫) ইউরিক এসিড** - দুই পায়ের হাঁটুর জয়েন্টে ভীষণ ব্যাথা হত। রোগ নিবারণের জন্য এ্যালোপেথিক ও আয়ূর্বেদিক ঔষধ খেয়েছি, কোনো লাভ হয়নি। **(৬) গ্যাসট্রিক** - এই রোগে বুক ও পেটে ভীষণ জ্বলন হত, ভাজা পোড়া, চা, ঠান্ডা জিনিষ ও বাসি খাবার খেলেই, সঙ্গে সঙ্গে পেট বুক জ্বালা করতো। **(৭) বড় পেট হয়ে যায়** - হাঁটতে বা সিঁড়ি চড়তে খুব কষ্ট হত। এতসব রোগের কারণে হয়রান হয়ে যেতাম।

একদিন আমি আমার শশুড়বাড়ী ৪ বাজ গঙ্গা, কপিলবস্তর (নেপাল) একস্থানে জ্ঞান গঙ্গা পুস্তকের প্রসার-প্রচার হচ্ছিল, আমার পত্নী সেখান থেকে একটা পুস্তক বাড়ীতে আনলেন। সেই পুস্তক আমি দুই তিনবার মনো যোগ দিয়ে পড়লাম এবং সংস্কৃত শ্লোকে সম্বন্ধিত বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবত গীতাকে মিলিয়ে দেখার জন্য ইন্টারনেট থেকে খুঁজে পরিক্ষণ করার চেষ্টা করি এবং এই পুস্তকের জ্ঞান আমার কাছে খুবই ভাল লাগল। আমি দেরী না করে ভারতে রওনা দিলাম তথা জগৎগুরু তত্ত্বদর্শীসন্ত রামপালজি মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা ২ নভেম্বর ২০১২ সালে প্রাপ্ত হয়। এখন শুধু মেনিয়া রোগের জন্য একটা ট্যাবলেট (Lithium 400 mg) বিকালেতে খাই। তবে পরমেশ্বরের কৃপাতে সাইক্রেটিক সিস্টম নেই, হাত কাঁপাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ভালভাবে লিখতে পারি। চোখে এখন চশমা নিতে হয়না এবং পত্রিকা পড়তেও কোনো অসুবিধা হয়না তথা অন্যান্য যে সমস্ত রোগ ছিল, সে সবও ঠিক হয়ে গিয়েছে। তবে একদিন তারিখ ২৯-০১-২০১৩ তে আমার বুকে ও পেটে খুব জ্বালা পোড়া হচ্ছিল, ওই দিন রাত্রে তখন আমি তত্ত্বদর্শী সন্ত (গুরু) রামপালজী মহারাজকে মনে মনে স্মরন করতে লাগলাম আর সেই সময়ই যেন সতগুরুর শ্রীচরন আমার বুকে ও পেটে চলতে দেখলাম, তারপরেই আমার সমস্ত জ্বালাই অদৃশ্য বা সমাপ্ত হয়ে গেল, তবে আজ পর্যন্ত্যও সেই জ্বালাপোড়া হয়নি। সমস্ত ভক্ত আত্মাদের কাছে আমার নম্র নিবেদন যে আপনারা পবিত্র পুস্তক **" জ্ঞানগঙ্গা ও ধরতীর উপর অবতার "** পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত

পড়ুন এবং পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান বুঝে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ হৃদয়ে রেখে শীঘ্র কল্যান করানো চেষ্টা করুন। অতএব আত্মার কল্যানের সাথে সাথে সতগুরু রামপালজি মহারাজের প্রদান করা নামদীক্ষা নিয়ে মর্যাদার মধ্যে থেকে সতভক্তি করে, আপনারা আপনাদের এই জন্মে সুসাস্থ্য এবং সুখ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করুন। তবে আমরা অনেকে জানিনা যে আমাদের আদি বাসস্থান ছিল সতলোকে। সেখান থেকে আমরা ভুল করে, এই কালব্রহ্মের রাজ্যে চলে এসেছি। সদ্‌গুরু সতসঙ্গে একদিন বলেছিলেন যে মহাপুরুষরা এই ধরতী (পৃথিবী) থেকে ঐ সতলোকে প্রথমবার গিয়েছিলেন সেইখান থেকে তাহারা দ্বিতীয়বার এই কালের রাজ্যে আসতে চাননি। সেই মহাপুরুষের মধ্যে কয়েকটি নাম বলছি যেমন ঃ- **(১) শ্রী গুরুনানকদেব (২) শ্রী ধর্মদাস সাহেব (৩) শ্রী গরীবদাস সাহেব (৪) শ্রী দাদু সাহেব (৫) শ্রীমলুকদাস সাহেব (৬) শ্রী ঘীসাদাস সাহেব (৭)স্বামী রামানন্দজী ।** সেইখানের (সতলোকের) কোনো কিছু দেখার পরে, এই খানের কিছু ই ভাল লাগবে না। এই কালব্রহ্মের রাজ্যে যদি কেহ মানব জনম ছেড়ে শুয়োরের (পশুর) যোনীতেও জন্ম পায় তবু কাল (ব্রহ্ম) ও মায়া (প্রকৃতিবা দূর্গা বা আদিমায়ারা অষ্টাঙ্গী) সেই পশু যোনীর শুয়োরকেও এমনভাবে মায়ায় জড়িয়ে রাখে যে, তখন তার শুঁয়োরের পশু যোনীও ভাল লাগে । অতএব বুঝতে হবে যে এই প্রকৃতি ও কালের কাছে আমরা সবাই অসহায় তাই কোনো রাস্তার খবর না পেয়ে, আমরা অনিচ্ছাতে এই কালের (ব্রহ্মের) রাজ্যে রয়েছি। তবে আজ আমাদের কালের রাজ্যে অসহায় থাকতে হবে না বা বন্দী থাকতে হবে না। আমাদের এই পৃথিবীতে এখন এসেগিয়েছেন মুক্তিদাতা, আমাদেরই মাঝে সকল প্রানীদের কল্যানার্থে, মুক্তি দিয়ে সতলোক (আপন দেশ) নিয়ে যাবেন। তবে এই সুযোগ মানব জীবনের ভবিষ্যতে কোনোযুগে আসবে কিনা, তাহা কাহারও জানা নেই, তাই সকল ভক্তবৃন্দের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে, সময়কে অপচয় (নষ্ট) না করে, এই মূল্যবান (দূর্লভ) সময়কে দাম দিলেই আপনাদের মানব জীবন ধন্য বা স্বার্থক হবে। তবে এই সুযোগ চারযুগের মধ্যে কোন সময় আসবে জানা নেই আর জানা থাকলেও সেই সময়ে আমার মানব জনম নেবার অধিকার আমার হাতে নেই। কারণ মানব জাতি কালের কাছে খুবই অসহায় কালের মায়াজালের জেলখানা থেকে তালা খোলার চাবির সন্ধান, আমাদের কাহারও কাছে নেই বা কাহারও জানা ছিল না। আজ আমাদের এতই সৌভাগ্য যে যাহা ভাষা বা কোনো কিছুরই দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা। আজ আমাদের মাঝে আমাদের সকলকে মুক্ত করতে ত্রাণকর্তা চাবি নিয়ে এসেছেন তালা খুলতে ! জয় বন্দীছোড় সতগুরু রামপালজী মহারাজ কি জয় ! এই মহাসুযোগ কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিরা হারাতে চাইবেন না। আপনাদের কাছে পুনরায় নিবেদন করছি যে দাঁত থাকতে যেমন বুদ্ধিমানেরা দাঁতের যত্ন নেন, ঠিক সেই রকম দেহে প্রান থাকতে সতভক্তি দ্বারা আত্মার কল্যান করিয়ে মোক্ষ লাভের চেষ্টা করুন। এই সুযোগ হাত থেকে একবার সরে গেলে আর ফিরে পাবেন না যেমন - গাছের ডাল থেকে পাতা ঝরে গেলে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগে না, ঠিক তেমন।

।। সৎ সাহেব ।।

ভক্ত শ্যাম দাস
কাঠমান্ডু (নেপাল),
মোঃ- ০০৯৭৭-৯৮৫১০০৯০৯৯

।। সত কবীর পরমেশ্বরের দয়া।।

(বন্দীছোড় সতগুরু রামপালজী মহারাজ কি জয়)

আমি ভক্ত শ্যাম কুমার দাস, পিতা-লোটন যাদব, বোর্ড নং-৫, কচুড়ী ধনুষা নিবাসী । পেশা-ইলেকট্রিকল ইঞ্জিনিয়ার, নেপাল বতৌর বিদ্যুৎ প্রাধিকরণ বিভাগ, কাঠমান্ডু উপপ্রবন্ধকের পদে কার্যরত আছি। আমার পূর্বের দুঃখী জীবনের ঝলক আপনাদের কাছে প্রকাশ করছি, সেইদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার এক একটা দেহের পশম দাঁড়িয়ে যায়। আমি বিজ্ঞানের বিদ্যার্থী হওয়ার কারণে প্রথম নাস্তিক প্রবৃতির ব্যক্তি ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবার পরেও সেই স্বভাবেরই ছিলাম। হাসি ঠাট্টা ও আনন্দ করাটাকেই জীবন মনে করতাম। ৩৪ বছর বয়সে আমার সুগার (ডায়বেটিস) হয়ে যায়, যার কারণ স্মৃতি শক্তি কমে যায় তাই খুব চিন্তায় থাকতাম। তবে একদিন একটা এমন ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে আমার মন আধ্যাত্মিকের দিকে চলে যায়। ঐ সময় আমি দার জেলাতে সেবারত ছিলাম, তখনই একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। একটি বাসে মাওবাদীদের সঙ্গে নেপালী পাহারাদারদের লড়াই হওয়ার কারণে গুলি ছোড়াছুড়ি হয়, তারমধ্যে আমার এক বন্ধুর মাথায় গুলি লেগে পিছন দিক থেকে বেরিয়ে যায় এবং অনেক লোকেগুলির কারনে মারাও যায়। তবে আমার বন্ধু লখনউতে গিয়ে চিকিৎসা করার কারনে বেঁচে যায়। লখনউ থেকে ফেরার পথে শুনলাম, যে ব্যক্তির হাত ও পায়ে গুলি লেগেছিল সে মারা গিয়েছে। সেইদিন থেকে বুঝলাম পৃথিবীকে চালানোর জন্য কোনো অদৃশ্য শক্তি অবশ্যই আছে। তখন থেকে বিশ্বাস হল যে পরমাত্মা বলে কেউ আছেন, তবে তাকে কিভাবে পাওয়া যাবে? তাহা আমার জানা নেই। প্রথমে আমি ওম্ শান্তি (ব্রহ্ম কুমারী) পন্থ দ্বারা ভক্তিসাধনা শুরু করলাম। পরে যোগী বিকাশ নন্দজি, রামদেবজির জ্ঞান নিয়ে দুবছর যোগ সাধনা করেছি। তাছাড়া দিল্লির কুমারস্বামী মহারাজের কাছে নিয়ম অনুসারে পয়সা কড়ি পাঠিয়ে বিশেষ কৃপা পাবার চেষ্টা করেছিলাম। তবে আমার সুগারের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাছাড়া পরমেশ্বর প্রাপ্তির মার্গও কেউ দেখাননি, তবে পরমেশ্বরকে পাবার খুব ইচ্ছা রাখতাম। এরই মধ্যে **ভক্তি সৌদাগর সন্দেশ** নামের এক পুস্তক, আমার হাতে আসে, আমি সেই বই পড়তে শুরু করলাম এবং জানতে পারলাম যে শ্রী ব্রহ্মার পিতা, শ্রী বিষ্ণুর মাতা এবং শঙ্করের ঠাকুরদাদা কে আছেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া মাত্রই আমার মাথা ঘোরা শুরু হল। আমি ভক্তি সৌদাগর সন্দেশ পুস্তক ৯দিনে কয়েকবারই পড়েছি আর পড়তে পড়তে এমন উৎসুকতা উৎপন্ন হল যে আমি গুরুজীর ওয়েবসাইট খুলে দেখলাম। তখন ধীরে ধীরে আমার জ্ঞানের পিপাসা হতে লাগল। আমি অনেক পুস্তক পড়েছি, তার মধ্যে **"গহরী নজর গীতা", "আধ্যাত্মিক জ্ঞান গঙ্গা" ও "করৌথা কান্ড কা রহস্য"** থেকে সম্পূর্ন হিন্দি পুস্তকগুলি দুই বৎসর পর্যন্ত্য পড়েছি। প্রমান পাবার জন্য " দেবী পূরান , মহাভারত , রামায়ন , গরুড় পুরান, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা " পড়ে দেখলাম। সতগুরু রামপালজী মহারাজের সমস্ত পুস্তকের সাথে সব গ্রন্থের সাথে প্রমানে মিলে যাচ্ছে। তারপরে আমার সতলোক আশ্রম চন্ডিগড় রোড, বরবালা, জেলা-হিসার, হরিয়ানাতে (ভারত) যাবার জন্য আসতে মনে ইচ্ছা জাগল। অতএব মনের মধ্যে এই বিচার হল যে এই এখনকার যত ধর্ম গুরুরা আছেন, সমস্ত নকল, ঢোঙি কারন তারা এই মানব জীবনকে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধনা করা শেখাচ্ছেন, সেই সময় থেকে আমি দেবী দেবতার বা অন্যান্য পূজা

করা ছেড়ে দিয়ে কেবল এক বন্দী ছোড় পরমেশ্বরের পূজা করতে শুরু করলাম।

এ দিকে কবির্দেবের (কবীর সাহেব পূর্নপরমেশ্বর) কৃপাতে, নেপাল সরকারের দপ্তরের কাজের কারনে, ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের ভটিন্ডা শহরে যাবার কথা হয়। আমি জিন্দ থেকে হিসারে আসতে চেয়েছি কিন্তু ওই সময় কিষান আন্দোলন চলার কারনে জিন্দ থেকে ভটিন্ডা চলে গেলাম আর পরে অমৃতসর (পাঞ্জাব) থেকে ফেরার পথে আশ্রমে ফোন করলাম যে আমি আশ্রমে কোনপথে আসতে পারব? তখন আশ্রম থেকে বললেন, আপনি অম্বালা থেকে বাসে করে বরবালা (সতলোক আশ্রম) এসে যান, এই রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু তত পর্যন্ত আমি কিছু পথ আগে এগিয়ে গিয়েছিলাম, পরে কুরুক্ষেত্র (হরিয়ানা) থেকে আসলাম, আর তিন বন্ধুকে ওইখানেই ছেড়ে পরমাত্মা সরূপ গুরুদেবই সন্ধার মধ্যেই সতলোক আশ্রমে নিয়ে আসেন, আশ্রমে এসে দেখি এখানে নামদানও (দীক্ষা) বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে এবং খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা বিনা মূল্যে। পরে আমি সন্ত রামপালজী মহারাজের দ্বারা নাম উপদেশ ও আশির্বাদ নিয়ে পুনরায় নিজের কার্য্য হেতু দিল্লি থেকে হয়ে কাঠমান্ডু নেপাল চলে আসলাম। তার কয়েকদিন পরে আমি পরমাত্মার (পূর্ণব্রহ্ম) চমৎকার দেখলাম যে রোগের চেকাপ করানোর পরে আমার সুগার (ডাইবিটিস) একদম নর্মাল এসেছে। ওইদিন থেকে আমি পূর্ণ শ্রদ্ধা দ্বারা সতগুরু রামপালজি মহারাজের কৃপাতে ভক্তি মন লাগিয়ে করতে লাগলাম। তার পরে আমি আমার পুত্র ও পত্নীকেও আশ্রম থেকে নাম দীক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছি। এর পরে আমার সাথে এক অদ্ভূদ চমৎকার হয় যে, আমার ট্রান্সফার কাঠমান্ডু শহরে হয়ে যায় ঠিক ওই সময়ে পরমাত্মার সেবা নেপালে তাহা হল **"জ্ঞানগঙ্গা"** পুস্তকের প্রচার প্রসার চলছিল, তাতে সহযোগ করলাম। ধীরে ধীরে ভক্ত সমাজের উপর সতগুরুজির অমৃত দয়া বর্ষারমত হতে লাগল এবং নেপালে সতগুরুদেবের জ্ঞানের প্রসাব প্রচুর পরিমানে হতে লাগল, তাছাড়া অনেক ভক্তগন নেপাল থেকে এসে সতলোক আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিতে লাগলেন। আমি প্রত্যেক ভাই-বোন এবং ভক্ত সমাজের কাছে হাত জোড় করে নিবেদন করছি যে নকল সাধু, গুরু এবং মহামন্ডলেশ্বর, স্বামী, ভন্ডসাধুদের চক্করে না পড়ে নিজের দূর্লভ মানব জনম সার্থক বা কল্যান করার জন্য গভীর গুঢ় রহস্যের তত্ত্ব পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে থেকে নিজে পড়ে প্রমান করে জ্ঞানকে বুঝে বিবেক পূর্ণ নির্ণয় নিয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তির পিপাসা হলে সতলোক আশ্রম বরবালা (হরিয়ানা)-তে চলে যান, তাছাড়া এই জ্ঞানগঙ্গা পুস্তকে মোবাইল নম্বর দেখে যোগাযোগ করেও যেতে পারবেন। কারণ তারণহারদের পরমেশ্বর পাঠান কিন্তু যখন জগতের মানবদের পূর্ণজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রয়োজন হয়, অতএব এটা ছাড়া (তত্ত্বজ্ঞান) মানবেব উদ্ধার হওয়া কঠিন মনে হবে কিংবা তাহার ঠিক করা নির্দিষ্ট সময়ে এসেছেন জেনে, তাহার স্বয়ংই আসতে হয়। তবে তিনি নিজেকে ধরা দিতে চাননা, তবে জ্ঞানীজনেরা জ্ঞানের দ্বারাই তাহাকে চেনেন। সকলেই জানেন যে, পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সর্বের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি যখন এই সমস্ত লোক (ব্রহ্মান্ড) সৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেময় সৃষ্টি দেখার সাক্ষী কেউই ছিলেন না এমন কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এবং তাদের মাতাপিতারাও দেখে নি বা জানে না, তাই সেই সৃষ্টির সঠিক খবর একমাত্র পরমেশ্বরই বলতে পারেন বা কোন অবতারের মাধ্যমে সেই গুরুরহস্য তত্ত্ব জ্যানের সংবাদ ভক্ত সমাজের কাছে পৌছে দেন। তাই আমার ভক্ত সমাজের কাছে অনুরোধ

যে **"ধরতী পর অবতার"** নামক পুস্তক, সিডি বা ডিভিডি দেখুন। তাছাড়া সাধনা চ্যানেলে রাত্রি ৭.৫৫ মিনিট থেকে এবং জি জাগরনে রাত্র ৯.১০ মিনিটের সতসঙ্গ শুনুন, পরে নিষ্পক্ষ মনোন (বিচার প্রমান) এবং প্রতিটি ধর্মের সদ্‌গ্রন্থের মধ্য থেকে প্রমান দেখে মিলিয়ে নেবেন। যিনি প্রতিটি ধর্মের সদ্‌গ্রন্থের আধারে সত্য জ্ঞান বলে থাকেন, তাহাকেই তত্ত্বদর্শী সন্ত বলা হয়। আজ আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা পরমাত্মার (পরমেশ্বর) নির্দিষ্ট করা সঠিক সময়ে জন্ম গ্রহন করেছি এবং সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত এই সময়ে আমাদের মাঝে এসেছেন সত্য জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে, আমাদের মত পাপীদের পাপ কাটিয়ে আত্মকল্যান করিয়ে মোক্ষ্য প্রাপ্তি করাতে এসেছেন। তিনিই সেই শ্রদ্ধেয় ও আদরনীয় জগৎগুরু, তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ।

কবীর, সামঝা হ্যায় তো শিরধর পা।
বহুর নেহী হে এইসা।।

।। সৎ সাহেব।।

ভক্ত শ্যামদাস,
কাঠমান্ডু (নেপাল),
মো:- ০০৯৭৭-৯৮৫১০০৯০৯৯

সচ্চিদানন্দায়েশ্চরায় নমো নমঃ

ভূমিকা

সত্যার্থ প্রকাশকে দ্বিতীয়বার শুদ্ধ করে ছাপিয়েছে, কেননা যে সময়ে আমি এ গ্রন্থ 'সত্যার্থপ্রকাশ' বানিয়েছি, ওই সময় আর তার আগে সংস্কৃত ভাষণ করা, পাঠন-পাঠনে সংস্কৃতই বলা এবং জন্মভূমি ভাষা গুজরাটী ছিল, ইত্যাদি কারণে আমার এই ভাষার বিশেষ পরিজ্ঞান ছিল না। এখন এইটাকে ভাল করে ভাষার ব্যাকরণানুসার জেনে অভ্যাসও করেছি, এই সময় এই ভাষা পূর্ব থেকে উত্তম হয়েছে। কোথাও-কোথাও শব্দ বাক্য রচনার ভেদ হয়েছে, সেটা করা উচিৎ ছিল, কেননা তার ভেদ করা বিনা ভাষার পরিপাটি সংশোধন করা কঠিন ছিল, তবে অর্থের ভেদ করা হয়নি, প্রভ্যুত বিশেষ লেখা হয়েছে। হাঁ তবে প্রথম ছাপাবার সময় কোথাও কোথাও ভুল ছিল, ওই সব বের করে ঠিক করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ ১৪ সমুল্লাস অর্থাৎ চৌদ্দ বিভাগে রচিত হয়েছে। এতে দশ দশ সমুল্লাস পূর্বার্দ্ধ এবং চার উত্তরার্দ্ধতে বানানো হয়েছে, কিন্তু অন্ত্যতে দুই সমুল্লাস ও পশ্চাৎ স্বসিদ্বান্ত কোন কারণে প্রথমে ছাপানো হয়েছিল না, এখন সেটাও ছাপানো হয়েছে।

সত্যার্থ প্রকাশ ঃ

দেখে অবিদ্যান লোক অন্য কিছু বিচার করবে, আর বুদ্ধিমান লোক যথাযোগ্য এর অভিপ্রায় বুঝবেন, এইজন্য আমি আমার পরিশ্রমকে সফল বুঝব এবং আমার নিজের অভিপ্রায় সকল সজ্জনের সামনে তুলে ধরছি। একে দেখে ও দেখিয়ে আমার শ্রমকে সফল করুন। এবং এই প্রকার পক্ষপাত না করে সত্যার্থের প্রকাশ করা আমার বা সর্ব মহাশয়গণের মুখ্য কর্ত্তব্য কর্ম।

সর্বাত্মা সর্বান্তর্যামী সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিজের কৃপাতে এই আশয়কে বিস্তৃত ও চিরস্থায়ী করেন।

।। অলমতিবিস্তরেন বুদ্ধিমদ্ধরশিরোমনিষু।।

।। ইতি ভূমিকা।।

স্থান - মহারানার উদয়পুর (স্বামী) দয়ানন্দ সরস্বতী

ভাদ্রপদ সম্বৎ ১৬৩৬

এই ফটো কপি সত্যার্থ প্রকাশের ভূমিকার সম্বন্ধিত বিতরণের আছে।

ओ३म्

सच्चिदानन्दायेश्वराय नमो नमः

भूमिका

सत्यार्थप्रकाश को दूसरी वार शुद्ध करके छपवाया है क्योंकि जिस समय मैंने यह ग्रन्थ **'सत्यार्थप्रकाश'** बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृतभाषण करना, पठन–पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती थी, इत्यादि कारणों से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। अब इसको अच्छे प्रकार भाषा के व्याकरणानुसार जानकर अभ्यास भी कर लिया है, इस समय इसकी भाषा पूर्व से उत्तम हुई है। कहीं--कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, वह करना उचित था, क्योंकि उसके भेद किए विना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं–कहीं भूल रही थी, वह वह निकाल शोधकर ठीक–ठीक करदी गई है।

यह ग्रन्थ १४ समुल्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचित हुआ है। इसमें १० दश समुल्लास पूर्वार्द्ध और चार उत्तरार्द्ध में बने हैं, परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिये हैं।

१२ सत्यार्थप्रकाशः

यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान् लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे, इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता हूं और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मुझ वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य कर्म है।

सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे।

।। अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु।।

।। इति भूमिका।।

स्थान महाराणाजी का उदयपुर **(स्वामी) दयानन्द सरस्वती**

भाद्रपद सम्वत् १९३६

শঙ্কা সমাধান ঃ (১) কিছু বিরোধী ব্যক্তি যে কি তারা মহর্ষি দয়ানন্দর ফোকট মহিমা শুনিয়ে এবং তার দ্বারা রচিত পুস্তক সত্যার্থ প্রকাশ” কে বিক্রি করে নির্বাহ করেন। বলেন

পুস্তক ‘জ্ঞান গঙ্গা”-তে ‘শাস্ত্রার্থ বিষয়” নামক অধ্যায়তে লেখা আছে যে কি, মহর্ষি দয়ানন্দ সন্ ১৮৮২ ছসন্বৎ ১৯৩৯) পর্যন্ত্য সংস্কৃতে ভাষণ দিতেন। এই উচিতৎ নয়, কেননা মহর্ষি দয়ানন্দ “সত্যার্থ প্রকাশের” ভূমিকাতে স্পষ্ট করে রেখেছেন, যে কি সন্ ১৮৭৪ (সনবৎ ১৯৩১)-তে যে সময় “সত্যার্থ প্রকাশে”-কে প্রথমবার লিখেছিলেন। তার আগে সংস্কৃতে তিনি ভাষণ দিতেন, পরে হিন্দিতে জেনেছিলেন।

শঙ্কা সমাধান ঃ—উপরোক্ত ফটো কপি (“সত্যার্থ প্রকাশের সম্বন্ধিত বিবরণ করা হয়েছে। যাতে মহর্ষি দয়ানন্দ স্পষ্ট করেছে, যে সময় সত্যার্থ প্রকাশ বানানো হয়েছিল, ওই সময়ে আমার হিন্দি ভাষার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। আর এখন সনবৎ ১৯৩৯ (সন্ ১৮৮২)-তে স্থান-উদয়পুর মহারাণার উদয়পুর ভাদ্র পদ (সঞ্চৎ ১৯৩৯-সন্ ১৮৮২)-তে দ্বিতীয়বার ছাপিয়েছে, ততক্ষণ মহর্ষির হিন্দি ভাষার জ্ঞান বিশেষ ছিল না। সন্ ১৮৮২ বিশেষ জ্ঞান হওয়ার পরে সত্যার্থ প্রকাশকে শুদ্ধ করে ছাপিয়েছে, এতেও সিদ্ধ হয় যে, মহর্ষি দয়ানন্দ সন্ ১৮৮২ (সম্বৎ ১৯৩৯) পর্যন্ত্য ও সংস্কৃতে শাস্ত্রার্থ করতেন।

দ্বিতীয় কারণ, এই যে কি, দুই বিদ্যান মিলে চর্চা করতেন, তবে তো সংস্কৃত করতেন। কেননা সর্ব শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল। তার হিন্দি অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দ করতেই পারেন না। কেননা যে স্বয়ংই স্বীকার করেছেন সন্ ১৮৮২ (সম্বৎ ১৯৩৯) পর্যন্ত্য আমার হিন্দি ভাষার কোন বিশেষ জ্ঞান ছিল না। সন্ ১৮৮৩ (সম্বৎ ১৯৪০)-তে মহর্ষি দয়ানন্দের মৃত্যু হয়েছে। এতে সিদ্ধ হয় মহর্ষি দয়ানন্দ সন্ ১৮৮২ (সম্বৎ -১৯৩৯) পর্যন্ত্য সংস্কৃত ভাষাতেই শাস্ত্রার্থ করে থাকতেন এবং তার হার জিৎ করার নির্ণয় অপরিচিত শ্রোতাই করতেন, যারা সংস্কৃত জানত না। সেইজন্য দয়ানন্দর মত ব্যক্তিকে মহর্ষি বলে থাকতেন।

যার কারণ মহর্ষি দয়ানন্দ ও কৃষ্ণানন্দের শাস্ত্রার্থতে কৃষ্ণানন্দের পক্ষ দৃঢ় ছিল। যেহেতু কৃষ্ণানন্দ শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৭-এর প্রমাণ দিয়ে সাকার পরমাত্মাকে সিদ্ধ করেছিলেন। “যদা, যদা, হি, ধমস্য, গ্লানি:, ভবতি, ভারত ....এর অর্থ গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদভাগবত গীতাতে এই প্রকার লেখা আছে : - হে ভারত ! যখন যখন ধর্মের গ্লানি (হানি) এবং অধর্মর বৃদ্ধি হবে, তখন তখন আমি আমার রূপকে রচনা করি, অর্থ্যাৎ সাকার রূপে লোকের সম্মুখে প্রকট হই।

ধ্যান দেবেন, মহর্ষি দয়ানন্দর দ্বারা বিষয় বদল করে, সংস্কৃত বলার কারণ সংস্কৃত ভাষাতে, অপরিচিত শ্রোতর নিজের হাসির দ্বারা জ্ঞানহীন দয়ানন্দকে বিজয়ী ঘোষিত করে দিয়েছেন। মহর্ষি দয়ানন্দ তো বিজেতা এমন হয়েছে, যেমন এক জমিদারের পুত্র সপ্তম শ্রেণীতে পড়তে .... শেষ বর্ণন কৃপা করে পড়ুন এই পুস্তকের ৩২৮ নং পৃষ্ঠাতে।।

 ❑❑❑

জীব হমারী জাতী হে, মানব ধর্ম হমারা, হিন্দু মুসলিম, শিখ ইসাই ধর্ম নহী কই ন্যারা।।

ধরতীর উপর অবতার

ভারতবর্ষের এই ছোট গ্রাম ধনানা, যেখানে পরমেশ্বরের অবতার সন্ত রামপাল দাসজী মহারাজের জন্ম হয়।।

হরি এসেছেন হরিয়ানায়

মায়ের কোলে অবতার

পরমাত্মা দ্বারা অবতার রূপে পুত্র প্রাপ্তের কারনে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন পিতা-নন্দরাম ও মাতা-ইন্দ্রাবতী

কবীর- পাঁচ সহংস অরু পাঁচ সৌ, জব কলিযুগ বিত যায়।
মহাপুরুষ ফরমান তব, জগ তারন কো আয়।।